এক নজরে কুরআন

ড. মিজানুর রহমান আজহারি

সত্যায়ন™
প্র কা শ ন

এক-নজরে কুরআন

ড. মিজানুর রহমান আজহারি

সত্যায়ন
প্রকাশন

এক-নজরে কুরআন

ISBN: 978-984-99620-7-6

নিরীক্ষণ : সত্যায়ন সাহিত্য সংসদ

প্রথম সংস্করণ:
ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

২য় মুদ্রণ:
ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়:
আইডিয়া প্রিন্টিং সলিউশন
১১০ ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০।
০১৪০৩ ৮০০ ১০০

ই-কমার্স প্লাটফর্ম:
রকমারি.কম • ওয়াফি লাইফ • আলাদা বই.কম

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন
১১,১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, বাংলাদেশ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (গোল্ড): ১৮৭০ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ 88 ৩88
sottayon@gmail.com
www. sottayon.com

Ek Nojore Quran Written by Dr. Mizanur Rahman Azhari and published by Sottayon Prokashon, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2025.

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অসীম করুণায় সমস্ত ভালো কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে। দরুদ, সালাম আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি—যিনি কুরআনের শাশ্বত বাণী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

কুরআন মানুষকে বারবার ভাবতে বলেছে। আরও বলেছে এর বার্তাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে। তাই এর পঠন-পাঠনকে সহজবোধ্য করতে একুশে বইমেলা ২০২৫-এ প্রকাশিত হচ্ছে দীর্ঘ পরিশ্রমের এক প্রয়াস—*এক-নজরে কুরআন*। ব্যতিক্রমধর্মী এ বইতে কুরআনের সারনির্যাসকে ভিজ্যুয়াল ও ইনফোগ্রাফিক ফরম্যাটে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ গতানুগতিক অনুবাদ বা তাফসির নয়, বরং কুরআনের মূল শিক্ষা, প্রধান থিম, জীবনঘনিষ্ঠ বার্তাগুলো-সহ বহুমাত্রিক চিন্তাকে এখানে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে পাঠক অল্প সময়েই প্রতিটি সূরার মূলকথা ও সংযোগ বুঝতে পারেন। এতে কুরআনের আয়াতসমূহের পারস্পরিক সংযোগ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এবং মহান ইমামদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তাদাব্বুর ও কেইস-স্টাডির মাধ্যমে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কুরআনের সম্পর্ককে করা হয়েছে আরও স্পষ্ট।

এক-নজরে কুরআন—এর মাধ্যমে বর্তমান যুগের নানা শ্রেণী-পেশার পাঠকরা যেন কুরআনের মূল বক্তব্য সহজে বুঝতে পারেন, সেটিই এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। বইটি গবেষকদের জন্য যেমন সহায়ক হবে, তেমনই সাধারণ পাঠকের জন্যও কুরআনকে একেবারে আপন করে তুলবে। কারণ, কুরআনের জ্ঞান বিশ্লেষণধর্মী হলেও এর আবেদন সর্বজনীন। এ বইয়ের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত ও সূরাগুলোকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। শুধু তা-ই নয়, *এক-নজরে কুরআন* বইটি কুরআনের প্রতি ভালোবাসাও বাড়িয়ে দেবে, ইন শা আল্লাহ। সহজ ভাষায় মাইন্ড ম্যাপিং করে সাজানো এই গ্রন্থটি কুরআনের প্রতি আমাদের প্রচলিত মাইন্ডসেটই পালটে দেবে, ইন শা আল্লাহ।

প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা সংস্থা সত্যায়ন প্রকাশনকে পাশে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ। পুরো টিমের দুর্দান্ত পরিশ্রমে বইটি নান্দনিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে মানুষ হিসেবে যেহেতু আমরা কেউ-ই ভুলের ঊর্ধ্বে নই, তাই কোনো অসংগতি আপনাদের চোখে পড়লে, দয়া করে আমাদের জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করে নেব, ইন শা আল্লাহ।

ড. মিজানুর রহমান আজহারি
০৩.০২.২০২৫

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

কুরআন বোঝার মূলনীতি

কুরআন মানব-জাতির জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বাণী। এটি এমন এক কিতাব, যা মানুষকে তার জীবন পরিচালনা করবার জন্য পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা দেয়। তবে কুরআন বোঝার জন্য নির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি বা নীতিমালা অনুসরণ করা অপরিহার্য। কারণ, ভুল ব্যাখ্যা কুরআনের প্রকৃত অর্থ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে এবং বিপথগামিতার কারণ হতে পারে। এখানে কুরআন বোঝার গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি বর্ণনা করা হলো।

১. নিয়তের বিশুদ্ধতা

কুরআন বোঝার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো, পাঠকের নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া। কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—সঠিক পথের অনুসন্ধান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। জ্ঞান অর্জনকে আত্মপ্রচার কিংবা বিতর্কের হাতিয়ার বানানো কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়ত যদি নিরপেক্ষ ও সৎ না হয়, তবে তার মাধ্যমে সঠিক পথ পাওয়া যায় না। হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى

"নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।
প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পায়, যার নিয়ত সে করে।"

(বুখারি, ১; মুসলিম, ১৯০৭)

তাই, সবকিছুর আগে আমাদের জন্য জরুরি হলো, নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া। আর এই বিশুদ্ধতা অর্জনে কয়েকটি পথ অবলম্বন করা যেতে পারে:

কুরআন-পাঠ শুরু করার আগে ও পাঠ চলাকালে আল্লাহকে স্মরণ করা, এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

নিজের নিয়তকে যাচাই করা—যেন এতে কোনো দুনিয়াবি উদ্দেশ্য বা অন্যের প্রশংসা লাভের আশা না থাকে।

নিয়তে যদি কোনো ভুল উদ্দেশ্য মিশে যায়, তবে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং নিয়ত সংশোধন করে নেওয়া।

২. কুরআনের মাধ্যমে কুরআন বোঝা

কুরআন নিজেই নিজের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। একটি আয়াতের অর্থ বোঝার জন্য কুরআনের অন্য আয়াতগুলো পর্যালোচনা করা উচিত। কারণ, কুরআনের কোনো একটি আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট হলে, অনেক-সময় দেখা যায়—কুরআনের অন্য জায়গায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন : সূরা ফাতিহার ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও—
তাদের পথ, যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছ।"

এখানে অনুগ্রহ-প্রাপ্ত কারা, তাদের পরিচয় নেই। সেটা আমরা খুঁজে পাই সূরা নিসার ৬৯ নং আয়াতে—

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيْقًا

"যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চলে, তারা থাকবে নবি, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গে—যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; বন্ধু হিসেবে তারা অত্যন্ত চমৎকার।"

সুতরাং, পরিপূর্ণভাবে কুরআন বোঝার জন্য একই বিষয়ে কুরআনের অন্য জায়গায় কী এসেছে, সেদিকে সতর্কভাবে খেয়াল রাখা উচিত।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ

কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাখ্যা ও সুন্নাহ অপরিহার্য। কেননা তিনিই কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকারী এবং কুরআনের প্রতিটি বিধান তাঁর জীবন ও কর্মে বাস্তবায়িত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস ও সুন্নাহ কুরআন বোঝার একটি মৌলিক চাবিকাঠি। হাদীস ও সুন্নাহ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। কুরআন অনেক ক্ষেত্রে সারসংক্ষেপ আকারে দিকনির্দেশনা দিয়েছে, আর সেই নির্দেশনাগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা হাদীস ও সুন্নাহর মাধ্যমে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ : নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে কুরআন। তবে কীভাবে নামাজ আদায় করতে হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে তা শিখিয়েছেন। একইভাবে, রমাদানের রোযা, যাকাত, হজ্জ-সহ ইসলামের অন্যান্য বিধানের বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সুন্নাহতে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছি (মানুষের আসল দায়িত্ব) স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার এই পয়গাম, যাতে মানব-জাতির উদ্দেশ্যে যা নাযিল করা হয়েছে, সেগুলো তুমি তাদের সামনে স্পষ্ট করে দিতে পারো।" (সূরা নাহল, ১৬:৪৪)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দায়িত্ব শুধু কুরআন প্রচার করা নয়; বরং এর সঠিক ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৪. সাহাবিদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিরা ছিলেন কুরআনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ শিক্ষার্থী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে সরাসরি কুরআনের ব্যাখ্যা শিখেছেন। কুরআনের নাযিল হওয়ার প্রতিটি প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতেন তাঁরা। সুতরাং তাঁদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাহাবিরা কুরআন বোঝার প্রতি ছিলেন খুবই মনোযোগী। ওহি নাযিল হতে-না-হতেই তারা ছুটে যেতেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। প্রতিটি আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সম্পর্কে ভালোমত জেনে নিতেন। কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও তৎসংক্রান্ত নির্দেশনা গেঁথে যেত তাদের হৃদয়ে। আর তাদের জীবনেও দেখা যায় এই মহান জ্ঞানের প্রতিফলন। সুতরাং, যেভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবেই বুঝতে চাইলে, আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে চোখ রাখতে হবে।

৫. শানে নুযুল বা নাযিলের প্রেক্ষাপট জানা

কুরআনের বহু আয়াত নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট জানলে আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝা সহজ হয়। শানে নুযুলের জ্ঞান ছাড়া আয়াতের মর্মার্থ বোঝা কঠিন। বিষয়টা উদাহরণের মাধ্যমে বেশ স্পষ্ট হবে: সূরা মুজাদালার ১ নং আয়াতটি দেখুন—

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

“আল্লাহ সেই মহিলার কথা ভালোভাবে শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সঙ্গে তর্ক করছিল আর আল্লাহর কাছে নালিশ পেশ করছিল। আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথাই শুনছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব শোনেন, দেখেন।”

এই আয়াতটি খাওলা বিনতু সা’লাবা ﵂-এর ঘটনা নিয়ে নাযিল হয়েছে। তার স্বামী তাকে ‘যিহার’ পদ্ধতিতে তালাক দেন। যা ছিল অবৈধভাবে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগের একটি প্রাচীন আরব প্রথা। তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিধান তখন পর্যন্ত কুরআনে ছিল না। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে যিহার-এর জন্য কাফফারা নির্ধারণ করেন। এই প্রেক্ষাপট না জানলে আয়াতের মূল বার্তা অনুধাবন করা বেশ কঠিন। তাই সঠিকভাবে কুরআন বুঝতে হলে শানে নুযুলগুলো ভালো করে জানতে হবে।

৬. নির্ভরযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীর অধ্যয়ন করা

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা গভীরভাবে বুঝতে নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ অধ্যয়ন করার বিকল্প নেই। তাফসীর হলো কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা; যা আল্লাহর বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য, শানে নুযুল (নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট), শব্দের গভীর অর্থ, এবং তত্ত্বগত বিষয় বিশ্লেষণ করতে সহায়ক। ইসলামের বিভিন্ন যুগে বহু জ্ঞানী ও প্রখ্যাত তাফসীরবিদ কুরআনের তাফসীর রচনা করেছেন। নিচে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য তাফসীরের নাম দেওয়া হলো:

- ✓ তাফসীরুত-তাবারি।
- ✓ তাফসীরুস সা’দি।
- ✓ তাফসীরুল বাগাবি।
- ✓ রূহুল মাআনি।
- ✓ তাফসীরু ইবনি কাসীর।
- ✓ মাআরিফুল কুরআন।
- ✓ তাফসীরুল কুরতুবি।
- ✓ তাফহীমুল কুরআন।

৭. আরবি ভাষার গভীর জ্ঞান

কুরআন নাযিল হয়েছে আরবি ভাষায়। তাই এর গভীরতা বোঝার জন্য আরবি ভাষার বিশুদ্ধ জ্ঞান খুবই জরুরি। আরবি ব্যাকরণ, শব্দের গঠন, শব্দার্থ এবং সাহিত্য-অলংকার বুঝতে পারা কুরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবন নিশ্চিত করে। কারণ, কুরআনে ব্যবহৃত হওয়া প্রতিটি শব্দ, বাক্যের গঠন, উপমা এবং কাব্যিক শৈলী বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। এই কারণে, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে আরবি ভাষার বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক।

৮. যুক্তি ও ইজতিহাদের সঠিক প্রয়োগ

কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে যুক্তি ও ইজতিহাদ ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা অবশ্যই ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। নিজের মতামত বা মনগড়া ব্যাখ্যা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ أٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"(ও গণমানুষ,) যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আর আনুগত্য করো তাঁর রাসূল ও তোমাদের কর্তৃত্বশালীদের। আর কোনো বিষয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে পেশ করো, যদি আল্লাহ ও পরকালের ওপর তোমাদের ঈমান থেকে থাকে। এটিই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সবচেয়ে কল্যাণকর ও সুন্দর পদ্ধতি।" (সূরা নিসা, ৪:৫৯)

এই আয়াত অনুসারে বোঝা যায়—কোনো বিষয়ের সমাধান পাবার জন্য প্রথমে দেখতে হবে কুরআন। তাতে পাওয়া না গেলে, দেখতে হবে নবিজির সুন্নাহ। তাতেও পাওয়া না গেলে আলিমদের কাছে তা উপস্থাপন করতে হবে। এরপরের ধাপ হলো কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী নিজের যুক্তি ও ইজতিহাদ পেশ করা।

৯. কুরআনের সর্বজনীন বার্তা বোঝা

কুরআন একটি নির্দিষ্ট জাতি বা সময়ের জন্য নয়; এটি সকল যুগ, সকল জাতি এবং সকল মানুষের জন্য। তাই কুরআন বোঝার জন্য আমাদেরকে এর সর্বজনীন বার্তাকে সামনে রেখেই অধ্যয়ন করতে হবে।

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব-জাতির জন্য একটি মহা মূল্যবান সম্পদ। এটি বোঝার জন্য শুদ্ধ নিয়ত, সঠিক জ্ঞান এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির প্রয়োজন। কুরআনের গভীরতা উপলব্ধি করতে হলে এর প্রতিটি শব্দ, বাক্য এবং বার্তাকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। যদি আমরা সঠিক নিয়ম মেনে কুরআন অধ্যয়ন করি, তবেই এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আলোর পথ দেখাবে এবং আখিরাতে সফলতা অর্জনের পথ সুগম করবে।

কুরআন সংকলনের ইতিহাস

কুরআন মাজীদ লিখিত আকারে সংকলিত হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছে—১ম ধাপ : নবি ﷺ-এর যুগ, ২য় ধাপ : আবু বকর ؓ-এর যুগ, ৩য় ধাপ : উসমান ؓ-এর যুগ। আর এই শেষ ধাপে যখন সংকলন করা হয়, তখন কুরআনের অনেকগুলো প্রতিলিপি তৈরি করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

১ম ধাপ : নবি ﷺ-এর যুগে

নবি ﷺ-এর যুগে কুরআন সংকলনের প্রথম এবং প্রধান উপায় ছিল—মুখস্থ করা ও হৃদয়ে ধারণ করা। কারণ, নবি ﷺ ছিলেন একজন 'উম্মি' অর্থাৎ যিনি লিখতে-পড়তে জানতেন না। আর তিনি এমন এক জাতির মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, যারা মূলত মুখস্থ বিদ্যার ওপরই নির্ভর করত। আবার সে সময় লেখার উপকরণও সহজলভ্য ছিল না। তাই মূলত সাহাবিরা কুরআন মুখস্থ করাকেই প্রাধান্য দিতেন। এটি ছিল তখনকার আরবদের সাধারণ রীতি। তারা তাদের কবিতা, বংশপরিচয়, গৌরবগাঁথা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো মুখস্থ রাখত।

নবি ﷺ-এর কাছে যখন ওহি আসত, তখনই তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন। ফলে কুরআন সংরক্ষণের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ছিল—নবি ﷺ-এর স্মৃতিশক্তি, যেখানে কোনো ভুল-ভ্রান্তি বা পরিবর্তনের আশঙ্কা ছিল না। তদুপরি, অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে প্রতি বছর রমাদান মাসে তিনি জিবরীল ؑ-এর কাছে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন। নবি ﷺ-এর ইন্তেকালের বছরে তিনি জিবরীল ؑ-এর সঙ্গে পূর্ণ কুরআন দুবার খতম করেন।

সাহাবায়ে কেরাম ؓ-ও কুরআনের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। তারা কুরআন মুখস্থ করা ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। কুরআন অধ্যয়ন ও বোঝার জন্য তারা ছিলেন অধীর আগ্রহী। কে কতটুকু কুরআন মুখস্থ করেছেন, তার ভিত্তিতে তাদের মাঝে মর্যাদার পার্থক্য হতো। এমনকি কোনো কোনো নারী সাহাবির জন্য তার বিয়ের মোহর হতো একটি কুরআনের সূরা, যা তার স্বামী তাঁকে শেখাতেন।

তারা ঘুমের আরাম ও বিশ্রাম ত্যাগ করে রাত জেগে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। গভীর রাতে কেউ সাহাবায়ে কেরামের ঘরের পাশ দিয়ে গেলে শুনতে পেতেন কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ, যা মৌমাছির গুঞ্জনের মতো প্রতিধ্বনিত হতো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের মধ্যে কুরআনের প্রতি এই ভালোবাসা ও যত্ন আরও দৃঢ় করতেন। তিনি তাঁদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহি পৌঁছে দিতেন এবং দূরবর্তী সাহাবিদের কাছে কুরআন শিক্ষার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতেন। যেমন : তিনি মদীনায় হিজরতের পূর্বে মুসআব ইবনু উমাইর ও ইবনু উম্মি মাকতুম ؓ-কে পাঠান, যাতে তারা মদীনাবাসীদের ইসলাম শেখান এবং কুরআন তিলাওয়াত করান। একইভাবে, হিজরতের পর তিনি মক্কায় মুআজ ইবন জাবাল ؓ-কে পাঠান, যাতে তিনি মানুষকে কুরআন মুখস্থ করান ও তিলাওয়াত শেখান।

উবাদা ইবনুস সামিত ﵁ বলেন, 'যখন কেউ হিজরত করে মদীনায় আসত, তখন নবি ﷺ তাকে আমাদের মধ্যে কোনো এক সাহাবির কাছে দিয়ে দিতেন, যাতে সে তাকে কুরআন শেখায়।' তিনি আরও বলেন, 'মসজিদে নববিতে কুরআন তিলাওয়াতের শব্দে একপ্রকার গুঞ্জন সৃষ্টি হতো, এমনকি নবি ﷺ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—তোমরা আওয়াজ একটু নিচু করো, যেন একে অপরের সঙ্গে শব্দ মিশে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।'

(দেখুন—বুখারি, ৪৯৯৮; ইবনু মাজাহ, ১৭৬৯; যুরকানি, মানাহিলুল ইরফান, ১/২৪১, ২৪৭)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় অসংখ্য সাহাবি কুরআন হিফজ করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে ছিলেন—চার খলীফা : আবু বকর, উমর, উসমান, আলি এবং তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ ইবনু আমর, মুআবিয়া, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব, আয়িশা, হাফসা, উম্মু সালামা।

আর আনসারদের মধ্যে ছিলেন—উবাই ইবনু কা'ব, যাইদ ইবনু সাবিত, মুআয ইবনু জাবাল, আবুদ দারদা, মুজাম্মা' ইবনু হারিসা, আনাস ইবনু মালিক, আবু যাইদ ﵃।

মোটকথা, ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন মুখস্থ করার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ তখন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুব কম। আরবদের প্রাকৃতিক স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, যার ফলে তারা সহজেই কুরআন সংরক্ষণ ও প্রচার করতে সক্ষম হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ আরবের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

(দেখুন—যুরকানি, মানাহিলুল ইরফান, ১/২৪২-২৪৩)

যেভাবে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হতো

তবে নবি ﷺ-এর যুগে যে কুরআন কেবল মুখস্থই করা হয়েছিল, তা নয়। বরং লিখিতও হয়েছিল। নবি ﷺ কুরআনের সংরক্ষণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই লেখা ও মুখস্থ করা—উভয় ক্ষেত্রেই যত্ন নেওয়া হয়েছিল। নবি ﷺ নিজে ওহি লেখার জন্য বিশেষ লেখক নিয়োগ করেছিলেন। যখনই নতুন আয়াত নাযিল হতো, তিনি ওহি-লেখকদের ডেকে বলতেন, যেন তা লেখা হয় এবং নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। এর ফলে কুরআন শুধু মুখস্থ নয়, বরং লিখিত আকারেও সংরক্ষিত ছিল।

ওহি-লেখকদের নাম :

আবু বকর ইবনু আবী কুহাফা, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবী তালিব, মুআবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান, উবাই ইবনু কা'ব, যাইদ ইবনু সাবিত ﵃ প্রমুখ।

সাহাবিগণ বিভিন্ন বস্তুতে কুরআন লিখতেন; যেমন : খেজুর গাছের পাতা, চামড়া ও পাথরের টুকরো পশুর হাড়, বিশেষত কাঁধের হাড়। এরপর এই সমস্ত লিখিত অংশ রাসূল ﷺ-এর ঘরে সংরক্ষিত থাকত। তবে তখনো কুরআন একত্রিত করে এক খণ্ড পুস্তক বা মুসহাফ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তবে যা-কিছু লিপিবদ্ধ হতো, সেখানকার কুরআনের আয়াত ও সূরার

বিন্যাস কোনো মানুষের ইচ্ছায় হয়নি, বরং জিবরাইল ﷺ-এর নির্দেশনাতেই হয়েছে। নবি ﷺ যখনই কোনো নতুন আয়াত পেতেন, তিনি সাহাবিদের বলতেন, "এই আয়াতটি অমুক সূরার অমুক স্থানে রাখো।"

(দেখুন—আবু উবাইদ, ফাদায়িলুল কুরআন, পৃ. ২৮০; বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ৭/১৫৩)

এইভাবে কুরআন সংকলনের প্রথম ধাপে মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখিত আকারেও তা সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তখনো এটি এককভাবে মুসহাফ আকারে লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং বিভিন্ন উপকরণে বিক্ষিপ্তভাবে লেখা ছিল। এই পদ্ধতি আল্লাহর নির্দেশে ও নবি ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছিল, যা পরবর্তী যুগে আনুষ্ঠানিকভাবে সংকলিত হয়।

(দেখুন—যুরকানি, মানাহিলুল ইরফান, ১/২৪৬-২৪৮, ২৮৬; মুহাম্মাদ আবু শাহবা, আল-মাদখাল লি-দিরাসাতিল কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩১৪)

২য় ধাপ : আবু বকর ﷺ-এর যুগ

রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই গোটা কুরআন লিখা হয়েছিল। তবে, তা ছিল বিক্ষিপ্ত আকারে, সাহাবিদের কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কোনো আয়াত ছিল চামড়ায় বা গাছের পাতায়, কোনোটি আবার লিখিত ছিল হাড় কিংবা অন্য কিছুতে। আবার, কোনো সাহাবির কাছে একটি সূরা লেখা ছিল, কোনো সাহাবির কাছে পাঁচ-দশটি, কারও কাছে হয়তো মাত্র কয়েকটি আয়াতই ছিল লিখিত অবস্থায়। মোটকথা, বর্তমানের প্রচলিত মুসহাফের মতো কুরআনের পূর্ণাঙ্গ কোনো কপি ছিল না তখন।

আবু বকর সিদ্দীক ﷺ-এর খিলাফাতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেজ সাহাবি শহীদ হন। এর প্রেক্ষিতে তিনি কুরআনকে এক-খণ্ডে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। না হলে আশঙ্কা ছিল—এভাবে হাফেজ সাহাবিগণ শহীদ হতে থাকলে, কুরআন মাজীদের বড় একটি অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো যাইদ ইবনু সাবিত ﷺ-কে। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়েও ওহি লেখার কাজ করেছিলেন। দায়িত্ব পাওয়ার পর, যাইদ ﷺ অনুসন্ধানে নেমে পড়লেন—গাছের পাতা, পাথরের ফলক কিংবা মানুষের স্মৃতি—সকল উৎস থেকে তিনি কুরআন মাজীদ একত্র করতে লাগলেন।

(দেখুন—বুখারি, ৪৯৮৬; তিরমিযি, ৩১০৩; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ৭৯৯৫)

কুরআন সংকলন-পদ্ধতি

কুরআন সংকলনের ইতিহাস জানতে গেলে, যাইদ ইবনু সাবিত ﷺ-এর কর্মপদ্ধতি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। যাইদ নিজে একজন কুরআনের হাফেজ ছিলেন। সুতরাং, পূর্ণ কুরআন তিনি নিজ স্মৃতি থেকেও লিখে নিতে পারতেন। তিনি ছাড়াও তখন আরও বহু হাফেজ উপস্থিত ছিলেন। একটি পরিষদ বানিয়ে তাঁদের মাধ্যমেও কুরআন সংকলনের কাজ করা যেত। তা ছাড়া নবি ﷺ-এর যুগে কুরআনের যে কপি তৈরি করা হয়েছিল, যাইদ ﷺ তা থেকেও কুরআনের অনুলিপি তৈরি করতে পারতেন। কিন্তু অধিক সতর্কতা বজায় রাখতে, তিনি বিশেষ একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। বরং উপরিউক্ত সবগুলো বিষয়কেই তিনি সামনে রেখেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিশ্বস্ত সাহাবিদের লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে

একেকটি আয়াতের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হবার পর (মুতাওয়াতির), সেটিকে তিনি নিজ সংকলনে স্থান দিয়েছেন। এ ছাড়া নবি ﷺ-এর সময়কার লিখিত আয়াতগুলোগুলো যেসকল সাহাবির কাছে গচ্ছিত ছিল, যাইদ ؓ খুঁজে খুঁজে সেগুলোকে একত্রিত করেন। যাতে করে, নতুন সংকলনটি নবি ﷺ-এর যামানায় লিখিত অংশগুলোর অনুরূপ হয়। তাই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল—যার কাছে কুরআন মাজীদের যে আয়াত লিপিবদ্ধ আছে, সে যেন তা যাইদ ؓ-এর কাছে জমা দেয়। অতঃপর কেউ যখন তাঁর কাছে লিখিত কোনো আয়াত নিয়ে আসত, যাইদ ؓ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সত্যতা পরখ করে নিতেন--

- ✓ যেহেতু তিনি নিজে হাফেজ ছিলেন, তাই আগত আয়াত/আয়াতগুলোকে তিনি সবার আগে নিজের স্মৃতির সাথে মিলিয়ে নিতেন।

- ✓ উমর ؓ-ও ছিলেন কুরআনের হাফেজ। তাই আবু বকর ؓ তাঁকেও যাইদ ؓ-এর সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেন—যাতে করে, কোনো আয়াত গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে তাঁরা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

- ✓ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করা হতো। কোনো আয়াত গ্রহণ করবার ক্ষেত্রে দুজন নির্ভরযোগ্য সাহাবিকে এ-মর্মে সাক্ষ্য দিতে হতো যে, এই আয়াতটি রাসূল ﷺ-এর সামনে লেখা হয়েছিল।

- ✓ সবশেষে লিপিবদ্ধ আয়াতগুলোকে সেই সকল আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখা হতো, যা একাধিক সাহাবির কাছে সংরক্ষিত ছিল।

তবে সংকলিত এই মুসহাফটিতে সূরাগুলোকে বিন্যস্তভাবে সাজানো হয়নি। বরং প্রতিটি সূরাকে আলাদা আলাদাভাবে লেখা হয়েছিল।

(দেখুন—ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ৯/১৪-১৫; যুরকানি, মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন, ১/২৫২; যারকাশি, আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ১/২৩৭-২৩৮; সুয়ুতি, আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ১/২০৫)

৩য় ধাপ : উসমান ؓ-এর যুগ

আরবের ব্যবসায়ীরা নতুন যে অঞ্চলেই যেতেন, সেখানেই ইসলামের সুমহান বার্তা পৌঁছে দিতে লাগলেন। এর ফলে, উসমান ؓ-এর শাসনামলেই ইসলামি-খিলাফাত পৌঁছে যায় রোম ও ইরানের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত। আর সেসব ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই কুরআন শিখতে লাগলেন সেসব এলাকার নও-মুসলিমরা। তবে, তখন কুরআন পড়ার রীতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদেরকে বিভিন্ন কিরাআত বা পাঠরীতিতে কুরআন শিখিয়েছেন। তো, ব্যবসায়ী সাহাবিদের মধ্যে যিনি যেই পাঠরীতি রপ্ত করেছেন, তিনি সেভাবেই অন্যদেরকে শেখাতে লাগলেন। আর পাঠরীতির এই বৈচিত্র্যতার ব্যাপারে তখনকার সবারই জানাশোনা ছিল। তাই, এ-বিষয়ে কারও কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কুরআন যত প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছাতে লাগল, খটকাও তত বাড়তে লাগল। ওসব অঞ্চলের মানুষ কুরআনের এর কিরাআত-বৈচিত্র্যের কথা জানত না। ফলে, তাদের মধ্যকার প্রতিটি গোত্র মনে করত, আমাদের পাঠরীতিই সঠিক, আর বাকিরা সব ভুলভাবে কুরআন পড়ছে! এভাবে কুরআনকে ঘিরে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দানা বাঁধতে শুরু করে। এ দ্বন্দ্বের কারণে আশঙ্কা

ছিল—মানুষ হয়তো কুরআনের মুতাওয়াতির বা প্রতিষ্ঠিত কিরাআতসমূহকে অস্বীকার করে, ভয়ানক গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

ওদিকে, মদীনায় যাইদ ইবনু সাবিত ﵁-এর সংরক্ষিত কপি ছাড়া আর কোনো নির্ভরযোগ্য কপি ছিল না—যেটি মুসলিম-বিশ্বে প্রামাণ্য-গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ, অন্যান্য যেসকল কপি বিভিন্ন সাহাবিদের কাছে ছিল, সেগুলো ছিল তাদের ব্যক্তি-উদ্যোগে সংকলিত। তা ছাড়া সেগুলোতে সমস্ত কিরাআত একত্র করা হয়নি। ফলে, এই দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকরী পন্থা ছিল একটাই—একটি সংকলনে সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিরাআত একত্র করা এবং তা দেখে সহীহ ও ভুল কিরাআত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া। আর সেই সংকলনকে সারা মুসলিম-বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। উসমান ﵁ তাঁর শাসনামলে ঠিক এই মহৎ কাজটিই সম্পন্ন করেন।

আবু বকর ﵁ যেই মুসহাফটি প্রস্তুত করে রেখে গিয়েছিলেন, সেটি সংরক্ষিত ছিল উম্মুল মুমিনীন হাফসা ﵂-এর কাছে। উসমান ﵁ চারজন সাহাবির সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করেন। তাঁরা হলেন—যাইদ ইবনু সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র, সাঈদ ইবনুল আস ও আবদুর রহমান ইবনু হারিছ ইবনি হিশাম ﷺ। তাঁদের দায়িত্ব ছিল, আবু বকর ﵁-এর সংকলিত মুসহাফটির বেশ কিছু অনুলিপি তৈরি করা। তবে অনুলিপিতে সূরাগুলোকে বিন্যস্তরূপে লিখতে হবে। এই চারজন সাহাবির মধ্যে যাইদ ইবনু সাবিত ﵁ ছিলেন আনসারী। আর বাকিরা ছিলেন কুরাইশি। উসমান ﵁-এর নির্দেশনা ছিল—যদি এই চার জনের মধ্যে কুরআনের কোনো অংশ নিয়ে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তা হলে কুরাইশি-রীতি অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, কুরআন মাজীদ তাদের ভাষাতেই নাযিল হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই কাজে উক্ত চার সাহাবি-ই নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সাহাবিকেও তাঁদের সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সূরাগুলোকে বিন্যস্ত করার পাশাপাশি তারা আরেকটি দারুণ কাজ করেছিলেন। কুরআনের আয়াতগুলোকে এমনভাবে লিখলেন—যেখানে কোনো নুকতা ও হরকত ব্যবহার করেননি। এর ফলে, মুতাওয়াতির সবগুলো কিরাআতই এসে পড়ল। কোনো পাঠরীতিকেই প্রাধান্য না দিয়ে, বরং সবগুলো রীতিতেই কুরআন পড়বার ব্যবস্থা রাখা হলো। পরিশেষে, সম্মিলিতভাবে সত্যায়িত কপিটির একাধিক অনুলিপি তৈরি করা হয়। আবু হাতিম সিজিস্তানি ﵀-এর অভিমত অনুসারে ৭টি কপি তৈরি করা হয়েছিল। একটি কপি মদীনাতে রেখে বাদবাকি সবগুলো কপিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। একটি মক্কায়, একটি শামে, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বসরায় ও একটি কূফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যাতে করে, কুরআনের পাঠ-রীতিকে কেন্দ্র করে আর কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হতে না পারে।

(দেখুন—যুরকানি, মানাহিলুল ইরফান, ১/২৫৫-২৬৩; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ৯/২০; ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ১/৮৭; সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদি, তাফহীমুল কুরআন, ২৭-২৯; তাকি উসমানি, তাওযীহুল কুরআন, ১/২১-২৫)

কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেমন হবে

কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যত মজবুত হবে, আমরা তত শক্তিশালী হব। ভালো মানুষ হব। তখন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও হবে সুমধুর। আল্লাহর রঙে রঙিন হবে আমাদের পুরো জীবন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখন নেই বললেই চলে। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়। অথচ কুরআন পড়ার সময় হয় না আমাদের। আসলে আমরা কুরআনের মূল্যই বুঝি না! অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কুরআনের মর্যাদা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নিচের হাদীসগুলো খেয়াল করুন—

নবি ﷺ বলেছেন,

فَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلٰى خَلْقِهِ

"সৃষ্টিকুলের ওপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, সকল কথার ওপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব তেমন।" (তিরমিযি ২৯২৬)

নবি ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَّيَضَعُ بِهِ أٰخَرِيْنَ

"আল্লাহ এ-কিতাবের ভিত্তিতে কিছু লোকের উত্থান ঘটাবেন, আর এরই ভিত্তিতে অন্যদের পতন ঘটাবেন।" (মুসলিম ৯৯৬)

নবি ﷺ বলেছেন,

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا

"কুরআনকে-সঙ্গ-দেওয়া ব্যক্তিকে বলা হবে, 'পড়ো আর ওপরে ওঠো। দুনিয়ায় তুমি যেভাবে ধীরস্থিরভাবে তিলাওয়াত করতে, সেভাবে তিলাওয়াত করো। তুমি সর্বশেষ যে-আয়াত পাঠ করবে, সেখানেই হবে তোমার ঠিকানা।' " (আবু দাউদ ১৪৬৪)

তাই কুরআনকে বানাতে হবে আমাদের সবচেয়ে আপন। ফিকে হয়ে যাওয়া-সম্পর্ককে করতে হবে সতেজ। কুরআনের সঙ্গে আমাদের নড়বড়ে সম্পর্ককে কীভাবে আরও মজবুত করা যায়, সে ব্যাপারে এখানে কয়েকটি পরামর্শ উল্লেখ করছি। এগুলো মেনে চললে কুরআন আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে নেবে, ইন শা আল্লাহ।

১. কুরআনকে জানা ও তাদাব্বুর করা

প্রথমত, কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কুরআনকে জানতে হবে। কুরআন বোঝার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

"এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার কাছে নাযিল করেছি, যাতে এর বার্তাগুলো নিয়ে মানুষ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা (সেগুলো) স্মরণ রাখে।"

(সূরা সোয়াদ, ৩৮:২৯)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

"তারা কি কুরআনের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসত, তা হলে তারা এর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী অনেক বিষয় দেখতে পেত।" (সূরা নিসা, ৪:৮২)

সুতরাং কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে আমাদেরকে তাদাব্বুর ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কুরআন বোঝার জন্য তাফসীর অধ্যয়ন করতে হবে। প্রত্যেক আয়াতের পেছনে যে মহান শিক্ষা, নির্দেশনা ও হিকমত লুকিয়ে আছে, সেগুলো জানতে হবে। তাহলে কুরআনের সাথে আমাদের ঘুণে-ধরা সম্পর্ক মজবুত হবে, ইন শা আল্লাহ।

২. তিলাওয়াত করা এবং মুখস্থ করা

কুরআন তিলাওয়াত করা একটি ইবাদাত। এর প্রতিটি হরফের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের নেকি দেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়বে, তার জন্য একটি সাওয়াব রয়েছে। আর প্রতিটি সাওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে।" (তিরমিযি, ২৯১০)

তিলাওয়াতের পাশাপাশি কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ মুখস্থ করাও গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের নামাজের জন্য এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআনের আলোকে পথচলার জন্য সহায়ক।

৩. তিলাওয়াতের সময় আদব মেনে চলা

কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিছু বিশেষ আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে, যা পালন করলে তিলাওয়াত অধিকতর ফজিলতপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়। কুরআন তিলাওয়াতের কিছু আদব উল্লেখ করা হলো:

পবিত্র থাকা তিলাওয়াত করার আগে ওজু করা। শরীর, পোশাক ও তিলাওয়াতের স্থান পরিষ্কার রাখা। নাপাক অবস্থায় তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা।

কিবলামুখী হওয়া কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া তিলাওয়াত শুরু করার আগে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম' পড়া। (দেখুন—সূরা নাহল, ১৬:৯৮)

বিসমিল্লাহ বলা প্রত্যেক সূরা শুরুর আগে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলা। তবে সূরা তাওবা এর ব্যতিক্রম।

শুদ্ধভাবে পড়া তাজবীদ সহকারে শুদ্ধভাবে এবং অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা। উচ্চারণে ভুল হলে অর্থ বিকৃত হতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি।

ধীরে ধীরে পড়া কুরআন ধীরে ধীরে, সুন্দর সুরে এবং মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা।
(দেখুন—সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩:৪)

বিনয় ও ভীতি সহকারে পড়া জাহান্নামের আয়াত পড়লে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং জান্নাতের আয়াত পড়লে জান্নাত কামনা করা।

কুরআন দেখে পড়া মুখস্থ জানলেও কুরআনের মুসহাফ দেখে তিলাওয়াত করা বরকতময়। এতে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।

অন্য কাজে ব্যস্ত না থাকা তিলাওয়াতের সময় একাগ্রচিত্ত হওয়া। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বা তিলাওয়াতের মধ্যে মনোযোগের বিঘ্ন ঘটানো থেকে বিরত থাকা।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় স্থির থাকা দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে বা ব্যস্ত অবস্থায় তিলাওয়াত না করা; বরং স্থির হয়ে বসে তিলাওয়াত করা উত্তম।

নিরিবিলি পরিবেশে তিলাওয়াত করা এমন পরিবেশে তিলাওয়াত করা, যেখানে মনোযোগ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা কম।

তিলাওয়াতের পর দুআ করা তিলাওয়াত শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং তাঁর কাছে ক্ষমা ও কল্যাণ প্রার্থনা করা।

এগুলো ছাড়াও কুরআনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পৃষ্ঠাগুলো পরিষ্কার রাখা এবং পড়া শেষ হলে সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. কুরআনের ওপর আমল করা

কুরআনের সাথে সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর ওপর আমল করা। কুরআনকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى

"যে আমার দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করবে, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে না, দুরবস্থায়ও পড়বে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ, আর কিয়ামাতের দিন তাকে ওঠাব অন্ধ করে।" (সূরা ত্ব-হা, ২০:১২৩)

কুরআন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আমরা যদি সেগুলো অনুযায়ী আমাদের আচার-আচরণ, লেনদেন, ইবাদাত-বন্দেগি এবং সামাজিক দায়িত্বগুলো পালন করি, তবে কুরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও দৃঢ় হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জিত হবে, ইন শা আল্লাহ।

৫. কুরআনের শিক্ষা প্রচার করা

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এর শিক্ষাকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া। দাওয়াহ একটি মহান কাজ এবং নবিদের কাজ।

নবি ﷺ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।"

(বুখারি, ৫০২৭)

তাই আমরা নিজেরা কুরআন শেখার পাশাপাশি আমাদের পরিবার, সন্তান এবং সমাজকে কুরআনের পথে আহ্বান করব।

৬. কুরআনের দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা

আত্মা পরিশুদ্ধ করার অন্যতম মাধ্যম—কুরআন। আমরা যদি কুরআনের আলোকে চলি, তাহলে আমাদের হৃদয় এবং মন কলুষমুক্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ أَقْوَمُ

"নিঃসন্দেহে এই কুরআন এমন পথ দেখায় যা (সবকিছুর জন্য) সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ।"

(সূরা ইসরা, ১৭:৯)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

"যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়, আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা অধ্যয়ন করে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদেরকে আবৃত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।" (মুসলিম, ২৬৯৯)

ওপরের এই পরামর্শগুলো মেনে চললে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে জীবন্ত, গভীর ও অর্থবহ। কুরআন আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন। সুতরাং আমরা যদি কুরআনের সাথে সত্যিকার অর্থে একটি দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, তবে আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ই সফল হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআনের প্রকৃত হক আদায় করার তাওফীক দিন, আ-মীন।

গ্রন্থটি নির্মাণের গল্প

কুরআন পাঠিয়েছেন আল্লাহ সহজ ও প্রাঞ্জল করে। সবার জন্য বোঝার উপযোগী করে। কিন্তু আরবি ভাষা জানা না-থাকায়, আমরা অনেকেই কুরআন পাঠের আসল স্বাদটা নিতে পারি না। তা ছাড়া হাল-আমলে ব্যস্ততার তো শেষ নেই!

এই ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবাত। এমন হলে কেমন হয়—প্রত্যেকের সংগ্রহে একটা বই থাকবে, যেখানে একনজর চোখ বোলালেই এক-একটা সূরার মূলকথা হৃদয়ে গেঁথে যাবে! মাথায় একটা চমৎকার ম্যাপ হয়ে থাকবে! ভাষাটাও হওয়া চাই সহজ-সরল, ঝরঝরে। যেন পড়তে বেশ আরাম লাগে। এসব ভাবনা প্রতিনিয়তই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াত।

এদিকে আল-আজহার ও মালয়েশিয়াতে পড়াকালীন, কুরআন নিয়ে নানারকম বই পড়ার সুযোগ হয়েছে। কোনোটার প্রেজেন্টেশন খুবই হৃদয়কাড়া। কোনোটি আবার বেশ তথ্যবহুল। তা ছাড়া দাওয়াহ'র কাজে সুদূর আফ্রিকা থেকে অ্যামেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য-সহ নানান দেশে পাড়ি জমিয়েছি। আগ্রহ নিয়ে ঘুরে দেখেছি সেখানকার বড় বড় লাইব্রেরিগুলো। সুবহানাল্লাহ! কুরআনের ওপর যে কত শত গ্রন্থ লেখা হয়েছে, তার কোনো হিসেব নেই। সেসব দেখে কুরআন নিয়ে একটা ব্যতিক্রমী কাজ করবার আকাঙ্ক্ষা, দিন দিন বাড়তে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ! এরপর কুরআনের ওপর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনার কয়েকটি কিতাব আমার দৃষ্টিগোচর হয়। সবগুলো কিতাবই ইনফোগ্রাফিক। মাইন্ড-ম্যাপিং করে তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সেসব বইয়ের মধ্যে দু-চারটির নাম না-বললেই নয়।

১. বিতাক্বতু সুওয়ারিল কুরআন (بطاقات سور القرآن) ; ২. বিতাক্বতুত তা'রীফি বি-সুওয়ারিল মুসহাফিশ শরিফ (بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف) ; ৩. মাআলিমুস সুওয়ার (معالم السور) ; ৪. Know Your Quran by Alimah Nadia Sadiq ; ৫. Quranic Diagrammatic Overview by Masood Khan.

এগুলোর প্রত্যেকটিরই কিছু-না-কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু সবগুলো বইতেই কমবেশি ঘাটতি রয়ে গেছে। কোনোটায় হয়তো তথ্যের চেয়ে কালার-ডিজাইনের ওপরই বেশি ফোকাস করা হয়েছে। কোনোটা আবার খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের; ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তেমন একটা নেই, মোটাদাগে কিছু কী-ওয়ার্ড লিখে রাখা হয়েছে। আরও বুঝতে পারলাম—কিছু বইয়ে তুরাসি ধারাটি সামনে রাখা হয়নি। মানে, প্রাচীন তাফসীরগুলো সেভাবে কাভারেজ পায়নি।

যাহোক, ইনফোগ্রাফিক উপস্থাপনা, ডিজাইন ও ম্যাপিংয়ের মোটামুটি একটা ধারণা এ বইগুলো থেকে পাওয়া গেল। বাকি কাজটা আমার জন্য সহজ। গত প্রায় একযুগ ধরে আমি কুরআন গবেষণা করছি। তাফসীর করতে গিয়ে আমাকে শতশত নোটস নিতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমার সেসব পঠন-পাঠন ও চিন্তা-গবেষণার সারনির্যাসই হলো 'এক-নজরে কুরআন' গ্রন্থটি।

কুরআনের কমন কিছু ফিচার আরবি ও ইংরেজি ইনফোগ্রাফিক বইগুলোতেও পাওয়া যাবে। তবে 'এক-নজরে কুরআন' গ্রন্থটিতে আমি আমার নিজস্ব চিন্তার আলোকে আরও বেশ কিছু দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করেছি। যেমন : মেজর থিম, কজ অ্যান্ড ইফেক্ট, কেইস-স্টাডি, গতিপথ, ওভারভিউ, শানে নুযুল, ফজিলত, কিছু শব্দ জানতেই হয় ইত্যাদি। শানে নুযুলের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীসে যেগুলো প্রমাণিত, সেগুলো তো অবশ্যই এনেছি। আর বাকি সূরাগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাফসীর-গ্রন্থের আলোকে নাযিলের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। ঠিক একইভাবে প্রতিটি সূরারই কোনো-না-কোনো ফজিলত তুলে এনেছি হাদীসের বিশাল ভান্ডার থেকে। মোটকথা এই বইটির প্রতিটি ফিচারই ভাবনার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, ইন শা আল্লাহ। পাঠকরা পাবেন কুরআন বোঝার সত্যিকার আনন্দ।

আমি চাই বাংলা ভাষায় কুরআনের ওপর এরকম আরও অনেক কাজ আসুক।

যেভাবে সাজানো হয়েছে এক-নজরে কুরআন

কুরআন কথা বলে মানুষের সাথে। কখনো কাঁদায়, কখনো-বা আন্দোলিত করে। জীবনঘনিষ্ঠ সব বিষয়ের আলাপ দিয়ে কুরআনের বিষয়বস্তু সাজানো। তবে কুরআনের সাথে মজবুত সম্পর্ক না থাকায়, আমরা বুঝে উঠতে পারি না—কুরআন থেকে ঠিক কীভাবে উপকৃত হব। বাস্তবতা হলো—ব্যস্ত এই জীবনে কুরআন-চর্চা খুব একটা হয় না।

এক-নজরে কুরআন একটি গবেষণাধর্মী বই, যা কুরআনকে জানার তৃষ্ণা বাড়াবে। কুরআনের সাথে আমাদের বন্ধন গড়ে তুলবে, আর কুরআন থেকে উপকৃত হবার পথও বাতলে দেবে। অল্প সময়ের জন্য এই বইটিতে চোখ বোলালেও, একেকটি সূরার মূলকথা, মেজর থিম ও ফজিলত জেনে নেওয়া সম্ভব। এ বইতে দেখানো হয়েছে প্রতিটি সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক। কোন সূরা কখন, কোথায় এবং কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে, উঠে এসেছে সেসব চিত্রও। একটি সূরার সাথে তার আগে-পরের সূরার সম্পর্কও এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সাথে তাদাব্বুর ও কেইস-স্টাডিতে জায়গা পেয়েছে জীবনঘনিষ্ঠ কিছু আলাপ। মোটকথা, কুরআনকে যে হাজারো দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায়, কুরআনের সাথে যে মানুষের কানেক্টিভিটি এত গভীর হতে পারে, তা অনায়াসেই অনুভব করা যাবে, ইন শা আল্লাহ।

তারতীব বিন-নুযুল

সম্পূর্ণ কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি। নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন এসেছে ধারাবাহিকভাবে। কখনো হয়তো নবিজি মদীনার রাস্তায় হাঁটছেন, এমন সময় নাযিল হয়েছে কয়েকটি আয়াত। আবার কখনো যুদ্ধ থেকে ফিরছেন অথবা ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখনই নাযিল হয়েছে গোটা একটি সূরা। এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে ধীরে-ধীরে কুরআন পূর্ণ

হয়েছে—১১৪টি সূরা দিয়ে। নাযিলের এই ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে কোন সূরাটির ক্রমিক নম্বর কত, তার আগে ও পরে কোন সূরা নাযিল হয়েছে, তা-ই জানানো হয়েছে এ অংশে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

শুরুর দিকে কুরআনের বিভিন্ন অংশ ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। পরবর্তী সময়ে আবু বকর ﵁ এক-খণ্ডে কুরআন সংকলন করবার উদ্যোগ নেন। তবে সেই কাজ উসমান ﵁ খিলাফত পর্যন্ত গড়ায়। উসমান ﵁-এর শাসনামলেই কুরআন সংকলনের কাজটি পূর্ণতা পায়। এজন্য বর্তমানে আমরা যে কুরআনটি হাতে নিয়ে পড়ি, সেটিকে 'উসমানি-মুসহাফ' বলা হয়। বর্তমান-কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী সূরা নম্বর এবং তার আগে-পরের সূরার নাম কী, তা জায়গা পেয়েছে 'তারতীব ফিল-মুসহাফ' অংশে।

এক-নজরে

প্রতিটি সূরা কখন, কোথায় নাযিল হয়েছে, সেই তথ্য দেওয়া হয়েছে এই অংশে। পাশাপাশি সূরাটির আয়াত-সংখ্যা ও সূরা নম্বর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি সূরার একটি সংক্ষিপ্ত-পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

নামের রহস্য

সূরার নামকরণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি । অনেক ক্ষেত্রেই সূরার মূল থিমের ভিত্তিতে নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সূরা নিসা-র কথা। 'নিসা' অর্থ হলো 'নারী'। এ সূরাটিতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে নারী-সম্পর্কিত আলোচনা। তাই সূরার নামও হয়েছে 'নিসা'। কখনো আবার নাম দেওয়া হয়েছে সূরার ভেতরকার বিশেষ কোনো ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে। যেমন—সূরা বাকারা। বনী ইসরাঈলের গাভি জবাইকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা এই সূরার বিশেষ আকর্ষণ। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এই সূরার নাম 'বাকারা' বা গাভি।

'নামের রহস্য'-অংশে কোন সূরার নামকরণ কীভাবে হলো, তা-ই দেখানো হয়েছে।

মেজর থিম

প্রতিটি সূরাতে অসংখ্য থিম বা প্রসঙ্গের দেখা মেলে। সেই থিমগুলোকে কেন্দ্র করেই পুরো সূরাটির আলোচনা সামনে এগিয়েছে। তবে কুরআন কখনো ফোকাস করেছে বিশেষ কিছু পয়েন্টে—'মেজর থিম' অংশে সেই বিষয়গুলোকেই বেছে বেছে তুলে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

আমরা অনেক-সময়ই কুরআনের একেকটা সূরা পড়া শেষ করে মুসহাফ রেখে দিই। সূরার শুরু আর শেষের সম্পর্কটা খতিয়ে দেখি না। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সূরার শুরু ও শেষটা মিলিয়ে দারুণ একটা সম্বন্ধ তৈরি হয়। হয়তো কোনো সূরা মুমিনদের গুণাগুণ জানিয়ে শুরু হলো। এরপর নানা বিষয়ে আলোচনার পর সূরাটি শেষও হলো মুমিনদের আলোচনা

দিয়ে—জান্নাতে তাদের অফুরান সুখের বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে। প্রতিটি সূরার এই শুরু-শেষ সম্পর্কের মিরাকলকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বইটির এই অংশে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

একটি সূরার সাথে অপর একটি সূরার কোনো সম্পর্ক আছে কি-না, সেই প্রশ্নটি হয়তো কখনো মনের মধ্যে ভেসে ওঠেনি। অথচ পরপর দুটো সূরার মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। কখনো এমনটাও দেখা যায়—দুটি সূরার মাঝখান থেকে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' অংশটা ঢেকে রাখলে, বুঝবার উপায় থাকে না যে, আরেকটি সূরা শুরু হয়ে গেছে। বইয়ের এ-অংশে এই সৌন্দর্যের দিকে ফোকাস করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে—এক একটি সূরা তার আগে-পরের অন্য সূরাগুলোর সাথে কতটা কানেক্টেড।

শানে নুযুল

কুরআনের সূরাগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। সেসব প্রেক্ষাপট জানা থাকলে, কুরআন বোঝা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। জীবনের সাথে বার্তাগুলো মিলিয়ে নিয়ে, নিজের পথচলাটা সঠিক করা যায়। বইটির 'শানে নুযুল' অংশে চেষ্টা করা হয়েছে—কুরআনের ১১৪টি সূরার ক্ষেত্রেই সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে হাজির করবার।

সেগমেন্ট

প্রতিটি সূরাকে তিনটি সেগমেন্ট বা পর্বে ভাঙা হয়েছে—যাতে অল্প কথায় প্রতিটি সূরার ব্যাপারে আগাগোড়া একটা ধারণা পাওয়া যায়। এতে যে-কোনো সূরা খুব সহজেই অনুধাবন করার সুযোগ হবে, ইন শা আল্লাহ।

ফজিলত

কুরআনের সব সূরাই বরকতময়। তবে কিছু সূরা রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে রাসূল ﷺ আমাদেরকে বিশেষভাবে কিছু ফজিলত জানিয়ে দিয়েছেন। হাদীসের ভিত্তিতে কোন সূরার কী ফজিলত, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে বইয়ের এই অংশে।

গতিপথ

কুরআন নাযিল হয়েছে সমাজকে টার্গেট করে। মানুষকে উদ্দেশ্য করে। তাই কুরআনের আলোচনা এক জায়গায় স্থির থাকেনি। খানিক বাদে বাদে প্রসঙ্গ পালটেছে।

অতীতের আলোচনা শেষ করে বর্তমান প্রজন্মের সাথে তা মিলিয়ে দিয়েছে। ঠিক করে দিয়েছে এ-যুগের মানুষের কর্মপন্থা। বইয়ের এ অংশে আলোচনা এগিয়েছে একটি 'সেন্ট্রাল থিম'-কে বৃত্তবন্দি করে। তার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে চারটি 'সাব-থিম'। এরপর সেই 'সাব-থিম'গুলোকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ওভারভিউ

'ওভারভিউ' অংশে উঠে এসেছে প্রতিটি সূরার আয়াতভিত্তিক অথবা আয়াত-রেঞ্জ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ। সূরা যত বড়ই হোক-না-কেন, সর্বোচ্চ দশটি কলামের মধ্যেই সারকথা তুলে

ধরা হয়েছে। এ ছাড়া এই চার্টটা মনোযোগ দিয়ে একটুখানি দেখে নিলে, প্রতিটি সূরাতে আল্লাহ যা-কিছু বলেছেন, অল্প সময়েই তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মুমিনরা সচেতন হয়। সে জানে প্রতিটি কাজেরই থাকে একটি পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ 'প্রভাব'। তাই তার প্রতিটি কাজের পেছনে কোনো-না-কোনো বৈধ 'কারণ' থাকতে হয়। বইয়ের এই অংশে প্রতিটি সূরা থেকে একটি করে 'কজ' বা 'কারণ' দেখানো হয়েছে। আর সেই 'কারণ'-কে কেন্দ্র করে যে কাজ করা হবে, তার 'প্রভাব' বা 'ইফেক্ট'-ও দেখানো হয়েছে।

রিফ্লেকশনস/তাদাব্বুর

কুরআন মানুষকে বারবার ভাবতে বলেছে, মাথা খাটাতে বলেছে। কিন্তু অনেকেই বুঝে উঠতে পারে না—কুরআনের ঠিক কোন কোন বিষয় নিয়ে ভাববার সুযোগ আছে। 'তাদাব্বুর' অংশে চেষ্টা করা হয়েছে, সেরকম এক-দুটো আয়াত হাজির করবার; যেখানে ভাবনার খোরাক মিলবে। কুরআনের বার্তা নিয়ে একবার ভাবতে শুরু করলে পাঠক রীতিমতো চমকে উঠবেন—কুরআন আমাদের এতটা আপন জানতাম-ই না! ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল—একমাত্র কুরআনই যে সঠিক পথ দেখাতে পারে, এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে।

কেইস-স্টাডি

কুরআন মানুষের সামনে অসংখ্য নজির হাজির করেছে। এসব উদাহরণ সামনে রাখলে, মানুষের করণীয়-বর্জনীয় নির্ধারণ করা সহজ হয়ে যায়। গবেষণা ক্ষেত্রে কেইস-স্টাডি খুবই পরিচিত একটি টার্ম। যেখানে অতীতের ঘটনাপ্রবাহকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করা হয়। তেমনিভাবে, কুরআন শুধু পড়ার বিষয় নয়। বরং গবেষণা করার বিষয়ও। সেদিক থেকে কুরআনের এক-একটি আয়াতকে নিজের জীবনের সাথে কতটা খাপ খাওয়ানো যায়, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করা যায়—সেটাই হলো আসল কথা। বইটির এই অংশে বর্তমান সময়টাকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে কুরআনিক লেন্স দিয়ে

কিছু শব্দ জানতেই হয়

কিছু শব্দকে একেবারে 'রুট লেভেল' থেকে ভেঙে দেখানো হয়েছে। এই শব্দগুলোকে কুরআন কী অর্থে ব্যবহার করেছে, তা সহজ-সাবলীলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে এই শব্দগুলোর ব্যবহারিক সৌন্দর্য এবং এর নিগূঢ় তাৎপর্য জানলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

রেফারেন্স

এক-নজরে কুরআন বইয়ে মহান ইমামদের কথামালাকে সামনে রাখা হয়েছে। কখনো কখনো কয়েকজন ইমামের বক্তব্যের সারনির্যাস নিজের ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। আবার কখনো অনেকগুলো হাদীসের মর্মার্থ একত্র করে পাঠকের সামনে তুলে আনা হয়েছে। হুবহু বক্তব্য তুলে না ধরায়, এরকম জায়গাগুলোতে রেফারেন্সের শুরুতে 'দেখুন'-শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। যাতে করে সচেতন পাঠকগণ মূল কিতাবগুলো দেখে নিতে পারেন।

সূরা ফাতিহা سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

তারতীব বিন-নুযুল।

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫ম সূরা। এর আগে সূরা মুদ্দাসসির ও পরে সূরা লাহাব নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ।

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি একেবারে পয়লা সূরা। শুরুতে আনার কারণ, এ সূরাতে অল্পকথায় তুলে ধরা হয়েছে পুরো কুরআনের নির্যাস বা সারকথা।

এক নজরে ফাতিহা

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ০১
- আয়াত: ০৭
- মাক্কি

ফাতিহাতুল কিতাব | উম্মুল কুরআন | আস-সাবউল মাসানি

নামের রহস্য ?

'ফাতিহা' মানে 'শুরু; সূচনা; ভূমিকা'। সূরা ফাতিহার তিনটি নাম আছে: (১) **ফাতিহাতুল কিতাব** বা কুরআনের সূচনা। কেননা, কুরআন মাজীদ শুরুই হয়েছে এ-সূরা দিয়ে। (২) **উম্মুল কুরআন** বা কুরআনের মূল। কেননা, গোটা কুরআনের মূল ম্যাসেজ এতে অল্পকথায় জায়গা পেয়েছে। আর (৩) **আস-সাবউল মাসানি** বা বারবার-পাঠ-করার সাতটি আয়াত। কেননা, সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত আছে—যেগুলো প্রতি নামাজে বারবার পড়তে হয়।

(দেখুন—তিরমিযি, ৩১২৪; বাগাবি, তাফসীর, ১/৭০; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/১৪৫)

মেজর থিম

০১ আল্লাহকে চেনা। তাঁর প্রশংসা ও বড়ত্ব ঘোষণা করা।

০২ কেবল তাঁরই গোলামি করা। তাঁর দুয়ারেই হাত পাতা।

০৩ দিন-রাত তাঁর কাছে সঠিক পথের দিশা চাওয়া।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে রব হিসেবে আল্লাহ তাঁর কাজ বা দায়িত্বের কথা জানিয়েছেন। সেটা হলো—বিশ্ব-জগৎ পরিচালনা করা ও বান্দার প্রয়োজন মেটানো। আর শেষে 'আবদ' বা বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তা হলো—কেবল তাঁরই দাসত্ব করা।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা ফাতিহার সম্পর্ক বিশেষ কোনো সূরার সঙ্গে নয়। বরং কুরআনের সবগুলো সূরার সঙ্গেই এর কিছু-না-কিছু সম্পর্ক আছে। মূলত, সূরা ফাতিহার পর বাকি যে ১১৩টি সূরা, সেগুলো সূরা ফাতিহারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এজন্যই নামাজে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য যেকোনো সূরা মিলিয়ে পড়তে হয়।

শানে নুযুল

কুরআন কিন্তু গতানুগতিক কোনো বই নয়। কুরআন হলো জীবন-যাপনের প্রেসক্রিপশন। মানুষের একেক দরকারে নেমে এসেছে এর একেক সূরা। তো কোন দরকারে, কী প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে একেকটা আয়াত—তার দলিল-দস্তাবেজকেই বলে শানে নুযুল। প্রায় সবগুলো বিশুদ্ধ তাফসীর ঘেঁটেও সূরা ফাতিহার এরকম কোনো শানে নুযুলের সন্ধান মেলেনি। বোঝাই যাচ্ছে—সূরা ফাতিহা বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য নিয়ে নাযিল হয়নি। ওটা বরং মহান রবের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিস্ময়কর উপহার। তবে হ্যাঁ, সূরা ফাতিহা যখন নাযিল হয়, তখনকার মক্কার চাল-চিত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে কিছু ব্যাপার বুঝতে পারা যায়। যেমন: তখন পবিত্র কা'বা-ঘরের আশপাশে বিস্তর মূর্তিপূজা হতো। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ শুনিয়ে দিলেন তাওহীদের মর্মস্পর্শী ঘোষণা—আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত চলবে না। মূর্তি তো দূরে থাক, অন্য কোনো বিশ্বাস বা মতবাদেরও পূজা করা যাবে না। আবার, ইসলামের ছায়াতলে আসায় তখনকার মুশরিকরা মুসলিমদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ শোনালেন সান্ত্বনার বাণী—একটু সবুর করো। বিচার-দিনে যার যা পাওনা, সব মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর শেষমেশ সরল পথ চাইতে বলার মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম জাতিকে তিনি গেঁথে দিলেন একই সুতোয়। আমাদের তাই একটাই পরিচয়—প্রত্যেকে সরল পথের অনুসারী, ঐক্যবদ্ধ এক জাতি।

(দেখুন—সূরা নাহল, ১৬:৮৯; বুখারি, ৫০০৬; মুসলিম, ৮০৬, ১৭১৫, ২৫৮৬)

সেগমেন্ট

আল্লাহ

প্রথম অংশে আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

আল্লাহ ও বান্দা

মাঝের অংশে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে যে চুক্তি—তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বান্দা

আর শেষ অংশে তুলে ধরেছেন বান্দার পরিচয়।

ফজিলত

কুরআনের সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ সূরা: নবিজি এক সাহাবিকে বললেন: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْأٰنِ "আমি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মহিমান্বিত একটি সূরা শেখাব। সেই সূরাটি হলো সূরাতুল ফাতিহা।" (বুখারি, ৪৪৭৪)

রোগের চিকিৎসা: রাসূল ﷺ বলেন: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ سُمٍّ "সূরা ফাতিহা সমস্ত রোগের চিকিৎসা।" (ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/১৪৬)

উজ্জ্বল আলো: একবার জিবরীল ﵇-এর সঙ্গে বসে ছিলেন নবিজি। এমন সময় আসমানের একটি দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। এ দরজাটি এর আগে কখনো খোলা হয়নি। তখন ওটা দিয়ে নেমে এলেন এক ফেরেশতা। নবিজিকে সালাম দিয়ে বললেন: হে আল্লাহর নবি, দুটো আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যে-আলো-দুটো শুধু আপনাকেই দেওয়া হয়েছে, আপনার আগের কোনো নবিকে দেওয়া হয়নি। একটি হলো সূরা ফাতিহা। আর অন্যটি সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত। ওখান থেকে একটি হরফ পাঠ করলেও বিনিময়ে আপনাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। (মুসলিম, ৮০৬)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

বিশ্ব-জগৎ নিয়ে আপনি যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করবেন; → আল্লাহ তাআলাকে তত বেশি চিনতে পারবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা: সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সঠিক পথ ও সফলতা চাওয়া

১. আল্লাহর ক্ষমতা ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি
আল্লাহ—বিশ্ব-জগতের অধিপতি; রাজাধিরাজ। এই বিশেষণ শুধু তাঁর বেলাতেই সাজে। তবে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও, তিনি তাঁর বান্দাদের বেলায় ভীষণ দয়াবান। প্রশংসা কেবল তাঁরই।

২. বিচার দিবসের সত্যায়ন
একমাত্র আল্লাহই এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের আলো-বাতাস-পানি জুগিয়ে যাচ্ছেন। আর তিনিই কিয়ামাতের দিন বান্দার সকল কাজের হিসেব বুঝে নেবেন।

৩. দাসত্বের ঘোষণা ও সাহায্য প্রার্থনা
মহামহিম এই রবের সামনেই কেবল মানুষ মাথা নোয়াতে পারে। আর সাহায্যও চাইতে পারে শুধু তাঁর কাছেই।

৪. সঠিক পথের দিশা
তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে—তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন। সেই সাথে বিপথ থেকে যেন আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

কেইস-স্টাডি

সূরা ফাতিহায় গোটা মানব-জাতিকে তিন দলে ভাগ করা হয়েছে। **১. সঠিকপথ-প্রাপ্ত:** এদের জ্ঞান আছে ও সে-অনুযায়ী কাজও করে—নবি-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ-বান্দাগণ। **২. আল্লাহর গযব-প্রাপ্ত:** জ্ঞান আছে ঠিকই, কিন্তু সে-অনুযায়ী কাজ করে না—ইহুদিরা এ দলের আওতায়। **৩. পথভ্রষ্ট:** এরা টুকটাক ধর্মকর্ম করে, কিন্তু সেটা জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়। মানে, আমল আছে কিন্তু ইলম নেই। পথভ্রষ্টদের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ খ্রিষ্টানরা।

কুরআনে আল্লাহ অসংখ্য ঘটনার মাধ্যমে বারবার আমাদের সামনে এই তিন দলের পরিচয় স্পষ্ট করেছেন। এখন আমাদের কাজ হলো, সেসব ঘটনা গভীরভাবে ভেবে দেখা। আমাদের মধ্যেও অভিশপ্ত ইহুদিদের স্বভাব ঢুকে পড়ছে কি না, খ্রিষ্টানদের মতো আমরাও ইলম ছাড়াই আমল করে নিজেকে কামেল ভাবছি কি না, এসব খতিয়ে দেখা। অন্যদিকে সঠিক পথের অনুসারী—আমাদের প্রিয় নবি ﷺ, নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও অন্যান্য নবি ﷺ। এ ছাড়াও

সঠিক পথ পেয়েছেন লুকমান ও আসহাফে কাহফের যুবকেরা। তাদের ঘটনাগুলো নিয়েও নিবিড় গবেষণা করে দেখতে হবে—আদতে আমরা কতটুকু তাদের অনুসারী হতে পারলাম।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/১৭৬; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/২১৫)

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর নামে শুরু না-করলে, কোনো কাজই পূর্ণতা পায় না।	১	যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সর্বোত্তম পথ-প্রদর্শক। তাই তাঁর কাছেই সঠিক পথের দিশা চাইতে হবে।	৬
জগতে যত প্রশংসা-বাক্য আছে; সব, সবটুকু আল্লাহর জন্য—যিনি সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-জগৎ।	২	অনুসরণ করা চাই পূর্বসূরিদের—যারা সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন।	৭
সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তাঁর অফুরান ভালোবাসা।	৩	জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা বিপথে গেছে—তথা ইহুদিরা—তাদের অনুসরণ নয়।	৭
ভালোবাসেন বলে বান্দা যাচ্ছেতাই করবে—তা নয়। বিচার দিনে অন্যায় কাজের শাস্তিও দেবেন তিনি।	৪	আর জ্ঞান না-থাকার কারণে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে—তথা খ্রিষ্টানরা—ওদেরও অনুসরণ নয়।	৭
তাঁকে রব হিসেবে চেনার পর প্রথম কাজ—তাঁর দাসত্ব করা।	৫		

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

'বিসমিল্লাহ'—কথাটি শুনতে খুব ছোট, কিন্তু ভীষণ পাওয়ারফুল। এটা আপনাকে সরাসরি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করিয়ে দেয়। কোনো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা মানে—কাজটি এখন আর আপনার একার নয়। বরং আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন আল্লাহ নিজেই। তখন বসে না থেকে এগিয়ে আসবেন ফেরেশতারাও। এখানেই শেষ নয়, বিশ্ব-জগতের সবকিছু আপনার কাজটি বেগবান করতে হয়ে উঠবে তৎপর। এ ছাড়া বিসমিল্লাহ বলে কোনো সাধারণ দুনিয়াবি কাজ শুরু করলেও, তা নেক আমলের খাতায় জমা হতে থাকবে।

(দেখুন—নববি, আল-আযকার, ১৪৩)

সূরা ফাতিহা আমাদেরকে দুআর আদব শেখায়। বান্দা যখন দুআ করবে, তখন শুরুতে তার দয়ালু রব ও মালিকের প্রশংসা করবে। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ধরে ডেকে ডেকে তাঁর কাছে চাইবে। তাঁকে ডাকবে ভয় আর আশা নিয়ে। দুআতে শুধু ভালো বিষয়গুলোই চাইবে না; মন্দ জিনিস থেকে মুক্তি পাবার জন্যও দুআ করবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/২০৮)

সূরা ফাতিহায় আমাদেরকে 'সঠিক পথ' চাইতে বলা হয়েছে। এখন, সঠিক পথ মানেটা কী আসলে? সহজ উত্তর—ইসলাম। কিন্তু এর অন্য একটি দিকও আছে। 'সঠিক পথ' মানে—সকল ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা। ধরুন, আপনি একটা কিছু করতে গিয়ে বেশ খটকায় পড়ে গেছেন। কাজটা করা ঠিক হবে কি হবে না। ভাবতে ভাবতে দিশেহারা। ওই সময় 'اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ/আমাকে সঠিক পথ দেখাও' এই ছোট্ট দুআটিই আপনার জন্য আঁধার রাতে মশাল হয়ে হাজির হবে। আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন—কাজটা করা আদৌ ঠিক হচ্ছে কি না। তাই যেকোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে একবার হলেও পড়ে নিন—সূরা ফাতিহা।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/১৭৪)

'আল্লাহ' শব্দটি এসেছে إِلٰهٌ/ইলাহ থেকে। ইলাহ মানে এমন এক সত্তা—যাঁর দাসত্ব করে সবকিছু এবং যাঁর ইবাদাত করে সমস্ত সৃষ্টি। (هُوَ الَّذِيْ يَأْلَهُهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ)। (দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/১২১)



'রহমান' ও 'রহীম' দুটো শব্দই 'রেহেম' থেকে এসেছে। রেহেম মানে মায়ের গর্ভ। মা তার গর্ভে ধরেন বলেই সন্তানকে এত ভালোবাসেন। সেখান থেকেই শব্দ দুটোর অর্থ—'দয়া, করুণা, ভালোবাসা'। তবে 'রহমান' বলতে সাধারণ অর্থে ভালোবাসা বোঝায়—যেটা ক্ষণস্থায়ী ও সকল সৃষ্টির জন্য। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন: আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামটি এই দুনিয়ার বেলায় প্রযোজ্য। তার মানে, দুনিয়াতে তিনি কাউকেই তাঁর করুণা থেকে দূরে ঠেলে দেন না। একজন মুমিনকে যেমন রিযিক দেন—বাতাস, অক্সিজেন, খাবার বা পানি—একজন কাফিরকেও তিনি এসব নিয়ামাত ভোগ করবার সুযোগ দেন। কিন্তু পরকালে তিনি তাঁর 'রহমান' গুণটি প্রকাশ করবেন না। মানে, অবাধ্য কাফির-মুশরিকদের জন্য সেদিন তাঁর কোনো দয়া বা ভালোবাসার ছিটেফোঁটা থাকবে না।

(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ২৭-২৮)

'রহীম' বলতে বিশেষ রকমের ভালোবাসা বোঝায়—যেটা চিরস্থায়ী ও কেবল মুমিন বান্দার জন্য। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন: আল্লাহ তাআলার 'রহীম' নামটি পরকালের বেলায় প্রযোজ্য। তার মানে, পরকালে কেবল মুমিন বান্দারাই তাঁর করুণা ও ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হবেন। (দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ২৭-২৮)

ইবাদাত মানে আনুগত্য করা। শুধু আনুগত্য নয়, বরং অতি বিনয় ও ভক্তির সাথে আনুগত্য। আল্লাহ যা করতে বলবেন, বিনাবাক্যে তা মেনে নেওয়াকেই সত্যিকারের ইবাদাত বলে। (দেখুন—নাহহাস, মাআনিল কুরআন, ১/১০)

সূরা বাকারা سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮৭-তম সূরা। এর আগে সূরা মুতাফফিফীন ও পরে সূরা আনফাল নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২য় সূরা। এর আগে আছে সূরা ফাতিহা ও পরে সূরা আলে ইমরান।

এক নজরে বাকারা

- মাদানি যুগের ১ম সূরা
- সূরা নং: ০২
- আয়াত: ২৮৬
- মাদানি

নামের রহস্য

‘বাকারা’ মানে ‘গাভি’। বনী ইসরাঈলের এক লোক খুন হলো। বিবাদ মেটাতে তারা মুসা ﷺ-এর কাছে গেল। মুসা ﷺ বললেন—এক কাজ করো, একটা গাভি জবাই করো। তারপর ওটার একটা অংশ দিয়ে খুন-হওয়া লোকটির গায়ে সামান্য আঘাত করো। দেখবে সে দিব্যি জীবিত হয়ে খুনির নাম বলে দিচ্ছে। কিন্তু বনী ইসরাঈল বলে কথা! এরকম একটা সহজ হুকুমকেও তারা প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন করে জটিল করে তুলল! এ-সূরার ৬৭ থেকে ৭৩ নং আয়াতে সেই ঘটনাই জায়গা পেয়েছে। সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে ‘বাকারা’।

মেজর থিম

০১ সঠিক পথের সন্ধান। ইতিহাসের শিক্ষা।

০২ পারিবারিক ও সামাজিক আইন।

০৩ মুসলিম সমাজে ঐক্য। ভালো কাজে উৎসাহ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক।

সূরার শুরুতেই একজন খাঁটি মুমিনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: খাঁটি মুমিন তো সে, যে ঈমান আনে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের ওপর। আর সূরার শেষে এসে 'গায়েব' তথা অদৃশ্য বিষয় কোনগুলো, তা আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গায়েব মানে: আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসূল, পুলসিরাত, মীযান, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা ফাতিহার শেষ দিকে, বান্দা তার রবের কাছে সঠিক পথের দিশা চেয়েছে। আর এ-সূরায় রব তাঁর বান্দাকে সঠিক পথের দিশা জানিয়েছেন। এ-সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে: কুরআন—এমন এক কিতাব—যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা মুত্তাকীদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়।

শানে নুযূল

হিজরত করে মদীনায় এলেন নবিজি। মদীনার অ-দূরেই ইহুদিদের বসতি। ইহুদিরা নিজেদেরকে তাওরাতের অনুসারী দাবি করত। ফলে ইসলাম, রাসূল বা আসমানি কিতাব—এগুলো সম্পর্কে ওদের ভালোই জানাশোনা। সেই হিসেবে আশা ছিল—নবিজি মদীনায় ঠাঁই নেওয়া-মাত্রই, ইসলাম কবুল করবে ইহুদিরা। কিন্তু তা ঘটল না, ঘটল ঠিক উলটোটা। ইহুদিরা নবিজিকে চিনেও, না চেনার ভান করল, সত্য মেনে নিতে রাজি হলো না। কারণ কী? ইহুদিরা আসলে তাওরাত অনুসরণ করত নামকাওয়াস্তে। তাওরাতের যেসব বিধান ওদের রুচি-মতো হতো না, সেগুলো ওরা বদলে ফেলত। নিজেরা নিজেরা আইন বানাত, আর সুযোগ বুঝে তা 'আল্লাহর বিধান' বলে চালিয়ে দিত। সুদ, যিনা, মিথ্যা কথা—এসব ছিল ওদের কাছে ডালভাত। তো, ওরা যখন দেখল, নবিজির অনুসরণ করলে পাপের দরজায় খিল পড়বে, খায়েশ-মতো আর কুকর্ম করা যাবে না, তখনই ওরা বেঁকে বসল। আল্লাহ তখন এ-সূরার বেশ অনেকগুলো আয়াত ওদের সম্বোধন করে নাযিল করলেন। ঝকঝকে আয়নার মতো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হলো ইহুদিদের সত্যিকার ইতিহাস। আল্লাহ ওদেরকে জানিয়ে দিলেন—তোমরা যে নিজেদেরকে তাওরাতের অনুসারী দাবি করছো, তা মোটেও সত্য নয়। এই যে তোমাদের ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজ। আবার সে-সময়টায় মদীনাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল মুনাফিকরা। তাদেরকে নিয়েও আলোচনা হলো বিস্তর। তা ছাড়া মদীনা ততদিনে একটি ছোটখাটো ইসলামি রাষ্ট্র। রাষ্ট্র চালাতে আইন লাগে। এই সূরার মাধ্যমে ধাপে ধাপে সেই আইন পাঠানো হলো। নাগরিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, রাজনীতি—ইত্যাদি ব্যাপারে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের আইনি রূপরেখা কেমন হবে, তার খুঁটিনাটি আলাপ নিয়েই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/২৩৯; বাগাবি, তাফসীর, ১/১৮০; যামাখশারি, আল-কাশশাফ, ১/৫৩৩)

সেগমেন্ট

ঐশী সূচনা

সূরার পয়লা অংশেই মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস এসেছে। মানে, আমাদের দৃষ্টিটা আসমানের দিকে নেওয়া হলো। বলা হলো, যেখান থেকে তোমাদের সূচনা, সেখান থেকেই হিদায়াতের আলো ও বিধান পাঠানো হবে।

দুনিয়াবি ইতিহাস

এবার দৃষ্টি নামিয়ে আনা হলো দুনিয়ায়—অতীত মানুষের দিকে। অতীতে বহু মানুষ কীভাবে সেই আসমানি রশি ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহকে-দেওয়া ওয়াদা ভুলে থেকেছে, সেই ইতিহাস জানানো হলো।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

এবার এই দুটো দৃশ্যপট সামনে রেখে, আমাদেরকে আমাদের কর্মপন্থা বুঝিয়ে দেওয়া হলো। আসমানি টর্চ-লাইটটি ফের হাতে তুলে নিয়ে নতুনভাবে পথচলার দিক-নির্দেশনা দেওয়া হলো সূরার শেষ ভাগে।

ফজিলত

রাসূল ﷺ বলেছেন: اِقْرَؤُوا الْبَقَرَةَ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ؛ "তোমরা সূরা বাকারা পড়ো। কেননা, তা আঁকড়ে ধরায় বরকত। আর ছেড়ে দেওয়ায় আফসোস। তা ছাড়া জাদুকররা ওটার সামনে টিকতে পারে না।" (মুসলিম, ৮০৪)

নবিজি আরও বলেছেন: "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না। মনে রাখবে, যে-ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, শয়তান সে-ঘর থেকে পালিয়ে যায়।" (মুসলিম, ৭৮০)

নবিজি বলেছেন, "যে-ব্যক্তি (কুরআনের) প্রথম সাতটি সূরা আঁকড়ে ধরে, সে জ্ঞানী।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৪৪৪৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কঠিন সময়ে যত ধৈর্য ধরা আর নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া যাবে, → আল্লাহর সাহায্যও তত তাড়াতাড়ি নেমে আসবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
বনী ইসরাঈলের হাত থেকে বনী ইসমাঈলের হাতে নেতৃত্বের পরিবর্তন।

১. আল্লাহর প্রতিনিধি
মানুষকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। দুনিয়ার বুকে আল্লাহর আইন কার্যকর করাই হলো মানুষের প্রধান দায়িত্ব।

২. বনী ইসরাঈলের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও শিক্ষা
সময়ের ধারাবাহিকতায় বনী ইসরাঈলের ওপরও সেই একই দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ফলে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাও তারা হারিয়ে ফেলে।

৩. স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মুসলিমদের উত্থান
পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বের এই দায়িত্ব আল্লাহ বনী ইসমাঈল অর্থাৎ মুসলিম-জাতিকে দিলেন। নেতৃত্বের পালাবদলের দৃষ্টান্ত হিসেবে মুসলিমদের জন্য কিবলার দিক পরিবর্তন করে দিলেন তিনি।

৪. আইন ও নৈতিকতা
নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো নৈতিকতা। তাই মুসলিমদের জন্য আল্লাহ ঠিক করে দিলেন—ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ পরিচালনার ফ্রেমওয়ার্ক। প্রণয়ন করলেন ইসলামের বেশকিছু মৌলিক বিধান।

কেইস-স্টাডি

ইহুদিরা বাইতুল মাকদিসকে কিবলা মানে। তাই আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য আলাদা কিবলা ঠিক করে দিলেন। সেটা হলো—পবিত্র কা'বা। এরকম বহু ঘটনা আছে যেখানে দেখা যায়—ইহুদিরা যা যা করত, নবিজি মুসলিমদেরকে তার চেয়ে ভিন্নটা করতে বলতেন। ইহুদিদের অভ্যেস, রীতি-রেওয়াজ বা সংস্কৃতির সাথে মুসলিমদের একচুলও মিল থাকুক, নবিজি তা কখনো চাইতেন না। এ কারণেই মুসলিমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। তো, কিবলা পরিবর্তনের এই ঘটনায়, শহুরে-শিক্ষিত কিছু বাঙালি-মুসলমানের জন্য ভাবনার খোরাক আছে। বাঙালিয়ানার নামে তারা যে দিন দিন কলকাতাই কৃষ্টি-কালচার লুফে নিচ্ছে, এটা এক ভয়ের কথা। 'শিক্ষিত' এই মানুষগুলো কি তাদের নিজস্ব পরিচয় নষ্ট করে দিতে চাইছে, যে পরিচয় তারা পেয়েছে স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে? তারা কি নিজেদেরকে মূর্তিপূজারিদের একটা কপি ভার্সন হিসেবে দেখতে চাচ্ছে? তা হলে তারা জেনে রাখুক, কিয়ামাতের দিন তারা 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র প্যাঁচা-বানর আর বাঘ-কুমির হাতে করেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। ভিন্ন জাতির পৌত্তলিক সংস্কৃতি প্রমোট করবার অপরাধে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের ওপর সেদিন ভীষণ রেগে থাকবেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ৬৫২, ৪০৩১; বুখারি, ৭৩২০; মুসলিম, ২৬৬৯)

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মুত্তাকীদের গুণাবলি এবং কাফির-মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।	১-২০	ইহুদি-খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো ধর্মের রীতি-রেওয়াজ-সংস্কৃতি মুসলিমরা অনুসরণ করতে পারে না।	১৪২-১৭৭
আদম সৃষ্টির ঘটনা, ইবলিসের প্রতিক্রিয়া এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় দুনিয়ার বুকে মানুষের অবতরণ।	২১-৩৯	ওয়ারিশ বণ্টন, রোযা, হজ্জ, কিসাস ও জিহাদ বিষয়ে বেশকিছু নির্দেশনা এসেছে। দেওয়া হয়েছে প্রকৃত আনুগত্যের পরিচয়।	১৭৮-২০৩
দুনিয়ায় মানব-জাতির ক্রমধারায় বনী ইসরাঈলের আগমন। তাদের লাগাতার অবাধ্যতা ও ফলস্বরূপ লাঞ্ছনার কাহিনি।	৪০-৭৪	সবর করার গুরুত্ব ও পুরস্কার সম্পর্কিত আলোচনা। এসেছে বিয়ে, তালাক ও দুগ্ধপোষ্য-সন্তানের ক্ষেত্রে কিছু বিধি-বিধান।	২০৪-২৪২
শুধু নবিজি নন, ইহুদিরা মুসা ﷺ-এর সাথেও বেয়াদবি করেছে। তাদের সেই অবাধ্যতা ও ষড়যন্ত্র আজও চলমান।	৭৫-১২৩	পুনরুজ্জীবনের দুটি বিস্ময়কর নজির তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি শেখানো হয়েছে দান-সাদাকা করার ইসলামি আদব।	২৪৩-২৭৪
ইবরাহীম ﷺ ছিলেন সঠিক পথের দিশারি। তিনি মুসলিমদের অনুসরণীয় আদর্শ। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দাবি সম্পূর্ণ বানোয়াট।	১২৪-১৪১	সুদের ক্ষতি ও লেনদেনে স্বচ্ছতার গুরুত্ব সম্পর্কিত আলোচনা। একটি চমৎকার দুআ দিয়ে সূরার সমাপ্তি।	২৭৫-২৮৬

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরা ফাতিহাতে রবের কাছে আমরা সঠিক পথের সন্ধান চেয়েছি। সূরা বাকারায় আমাদের সেই ডাকে আল্লাহ সাড়া দিলেন। দুনিয়ার মানুষকে জানালেন—সঠিক পথের সন্ধান আছে কুরআনে। তবে একটা কথা, কুরআন ঢালাওভাবে সবাইকে সঠিক পথ দেখাবে না। কুরআনের সাথে যার আচরণ যেমন, কুরআনও তাকে ঠিক ততটুকু পথই দেখাবে। যারা কুরআন পড়ে অহংকার নিয়ে, সবজান্তা একটা ভাব নিয়ে, তারা নির্ঘাত সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যারা কুরআন পড়বে বিনয়ের সাথে, হিদায়াত-প্রত্যাশী হয়ে—কুরআন তার জন্য আলো ঝলমলে হয়ে উঠবে। ঠিক এজন্যই এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে: কুরআন পথ দেখায় মুত্তাকীদের।

(দেখুন—ইবনু হিব্বান, ১২৪; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ১৮৫৫)

মানুষ-মাত্রই ভুল করবে, পা পিছলাবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভুল করবার পরে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়, সেটাই দেখবার বিষয়। সেটাই প্রমাণ করবে রবের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন। এই ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যই, আদম ﷺ-এর ঘটনা সূরা বাকারার গোড়াতে আনা হয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা শক্তিশালী রিমাইন্ডার যে—জগতের সেরা মানুষদের দ্বারাও ভুল হয়েছে, তাই আমরাও ভুল করব। কিন্তু ভুল হয়ে যাবার পর তাঁরা গোঁয়ার্তুমি করেননি, ভুলটা আঁকড়ে ধরে থাকেননি। বরং শাস্তির ভয়ে বিনয়ে গলে পড়েছেন। এত এত তাওবা করেছেন যে—তাদের ভুলের চাইতেও তাওবার ওজন অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। এর ঠিক বিপরীতে ছিল ইবলিস ও ফিরআউন। তারা খুব জোরের সাথে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সত্যকে চেনার পরও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। একটাই কারণ—তাদের অন্ধ ঔদ্ধত্য, বিচ্ছিরি অহংকার। ফলে, সঠিক পথ ও তাদের মাঝে, ইস্পাত-কঠিন দেয়াল তৈরি হয়ে গেছে। আর তাদের সবশেষ ঠিকানাও হয়েছে জাহান্নাম। হ্যাঁ, অহংকারের করুণ পরিণতি এমনই।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৪৯৯; ইবনু মাজাহ, ৪২৫১; মুসলিম, ৯১)

মানুষ সৃষ্টির আগে, আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি দুনিয়াতে খলিফা তথা প্রতিনিধি পাঠাব। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, এই 'খলিফা' কথাটির অর্থই আমাদের ঠিকঠাক জানা নেই। গোড়াতেই গলদ! আমরা এখন কাপড়-সেলাই-করা দরজিকে বানিয়েছি খলিফা। গাঁও-গেরামে আবার এলাকার মাতবরগুলোকেও 'খলিফা' ডাকতে দেখা যায়। আফসোস, শত আফসোস। 'খলিফা'-র মতো একটি ওজনদার শব্দকে আমরা এভাবে নষ্ট করে ফেললাম! অথচ খলিফা হলেন— خَلِيفَةٌ لَهٗ يَحْكُمُ فِيهَا بَيْنَ خَلْقِهِ بِحُكْمِهِ যারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে, তাঁরই হুকুম-মতো বিচার-ফায়সালা করবে। এতে বোঝা গেল—আমরা নিজেদেরকে তখনই আল্লাহর 'খলিফা' পরিচয় দিতে পারব, যখন দুনিয়াতে তাঁর হুকুম বা খিলাফাত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদের ভেতর থাকবে। 'খলিফা'র আরেকটি অর্থ রয়েছে: 'দেখভালকারী'। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির কোনোকিছু যেন নষ্ট না হয়, তা দেখেশুনে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। সুতরাং সেই ব্যাপারেও আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। (দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/৪৫১)



'তাকওয়া' কথাটি এসেছে 'তাকী' থেকে। 'তাকী' মানে-নিজেকে বাঁচিয়ে চলে যে। ঘোড়ার খুরের নিচে লোহার একরকমের চাকতি বসানো হয়। ওটাকে বলে 'নাল'। ঘোড়া যখন তুমুল বেগে ছুটে চলে, তখন পায়ের তলায় অনেক-সময় কাঁটা, নুড়ি-পাথর, বরইয়ের আঁটি—এরকম জিনিস পড়তে পারে। আর তাতে ঘোড়ার পায়ের তলা কেটে যায়, কখনো মারাত্মক জখম হয়। কিন্তু লোহার ওই নাল পরানো থাকলে, এরকম কোনো ভয় থাকে না। তো, যখন ঘোড়ার খুরে নাল পরানো থাকে না, খালি থাকে, তখন ওই ঘোড়াকে বলা হয় তাকী। কেননা, ঘোড়াটিকে তখন খুব সাবধানি হয়ে, দেখেশুনে পথ চলতে হয়। আর তাকী থেকেই এসেছে তাকওয়া। তার মানে, মুমিন যখন দুনিয়ায় জীবন-যাপন করবে, তখন ওই নাল-বিহীন ঘোড়ার মতোই সাবধানি হবে। এমনভাবে পথ চলবে যাতে গুনাহের আঁচড় তার অন্তরে না লাগে। এভাবে গুনাহ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে, নিজেকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবার নামই তাকওয়া। (দেখুন—ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, ১৫/৪০৫)

সূরা আলে ইমরান

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮৯-তম সূরা। এর আগে সূরা আনফাল ও পরে সূরা আহযাব নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩য় সূরা। এর আগে আছে সূরা বাকারা ও পরে সূরা নিসা।

এক-নজরে আলে ইমরান

- ৩য় হিজরিতে নাযিল
- সূরা নং: ০৩
- আয়াত: ২০০
- মাদানি

নামের রহস্য

'আলে ইমরান' মানে 'ইমরান-পরিবার'। মারইয়াম, ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া ﷺ ছিলেন ইমরান-পরিবারের সদস্য। এ-সূরার বেশিরভাগ আয়াতে ইমরান-পরিবারের আলোচনা জায়গা পেয়েছে। ঈমান ও হিদায়াতের প্রশ্নে এই পরিবার পরীক্ষার-পর-পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। আবার ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর চূড়ান্ত ভরসার মাধ্যমে তাঁরা সেসব পাহাড়-সম পরীক্ষা উতরেও গেছেন। গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁরা উদাহরণ। সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে আলে ইমরান।

মেজর থিম

০১. মারইয়াম ও ঈসা ﷺ-এর ঘটনা। উহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা ও শিক্ষা।

০২. ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে ডিবেট। মুসলিমদের দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ।

০৩. আল্লাহর পথে খরচ করতে উৎসাহ। পরকালের প্রস্তুতি ও দুনিয়ার বাস্তবতা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে: আল্লাহ তাআলা সত্য-কুরআন পাঠিয়েছেন—যাতে মানুষের জন্য সঠিক পথের সন্ধান আছে। অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও সঠিক পথের একমাত্র উৎস তিনি। আর সূরার শেষে এসে ফোকাসটা ঈমানদারদের ওপর নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঈমানের ওপর অটল থাকা, আর ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাইবার কথা। তার মানে, সূরার শুরু-শেষ মিলে একটা চক্রের মতন—যার শুরু হয়েছে হিদায়াতের কথা দিয়ে, আর শেষ হয়েছে তা বাস্তবায়নের কথা বলে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরাটি হলো—সূরা বাকারা; যার শেষ দিকের আয়াতগুলো আসমানি কিতাব ও আল্লাহর ওপর ঈমান সম্পর্কে। আর এ-সূরার শুরুতেও এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আসমানি কিতাবগুলোর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযূল

এর আগে ঈমানদারদের বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে—তোমরা সত্যিকার মুমিন কি-না, তা অবশ্যই পরখ করে দেখা হবে। তাই পরীক্ষার জন্য তৈরি থেকো। এবার সত্যিই একের-পর-এক পরীক্ষা মুমিনদের ঘিরে ধরতে লাগল। সুযোগ বুঝে বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠল মদীনার ইহুদি গোত্রগুলোও। দেদারসে একের-পর-এক চুক্তি ভাঙছে। চুক্তি তো ভাঙছেই, আবার গোপনে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে হাতও মেলাচ্ছে। পরিস্থিতি যখন এ-ই—নবিজি তখন ইহুদি গোত্র বনু কাইনুকাকে মদীনা থেকে উৎখাত করতে বাধ্য হলেন। এই ঘটনায় বাকি ইহুদিরা খেপে গেল। এমনিতেই বদর যুদ্ধে হেরে গিয়ে মক্কার মুশরিকরা ক্রোধের আগুনে ফুঁসছে। আর সেই আগুনে ঘি ঢালছে মদীনার ইহুদিরা। যার ফলে, বদর যুদ্ধের এক বছর পেরোতে-না-পেরোতেই, তিন হাজার সৈন্যের বহর নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে মক্কার মুশরিকরা হাজির! যুদ্ধ সংঘটিত হলো উহুদ পাহাড়ের গোড়ায়। নবিজি এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেও, পথে তিনশ মুনাফিক কেটে পড়ে। বাকি সাতশ জনের মধ্যেও ছিল কিছু দুর্বল ঈমানের অধিকারী। নানা বিশৃঙ্খলায় যুদ্ধে মুসলিমদের ওপর বিপর্যয় নেমে এল। এর পেছনে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের দায় ছিল যেমন সত্য। তেমনি সত্য যে—মুমিনদেরও কিছু দুর্বলতা ছিল। আবার এটাও ঠিক যে—মাত্র-তৈরি-হওয়া একটি বাহিনী—যাদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেই বললেই চলে, তাদের একটু-আধটু ভুল-ভ্রান্তি হওয়াটাও স্বাভাবিক। এ বিপর্যয়ের কারণে মুসলিমরা যখন চিন্তিত, আল্লাহ তখন নাযিল করলেন সূরা আলে ইমরান। উহুদ যুদ্ধ নিয়ে তিনি চুল-চেরা বিশ্লেষণ করলেন। ধরিয়ে দিলেন মুমিনদের ভুলগুলো। আর জানিয়ে দিলেন বিজয়ের সুসংবাদ।

(দেখুন—বুখারি ৪০৫০; মুসলিম ২৭৭৬; ইবনু হিশাম ২/৬০-৬৪)

সেগমেন্ট

মজবুত ঈমান

পয়লা অংশে আল্লাহ মুমিনদের বিশ্বাসকে পাকাপোক্ত করেছেন। আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণাকে উচ্চকিত করেছেন।

পরীক্ষা

এবার পরীক্ষার পালা। খাঁটি ঈমানদারের বৈশিষ্ট্যই হলো–সে পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ে-পড়া পরীক্ষার বড় উদাহরণ।

আসমানি সাহায্য ও বিজয়

শেষ-ভাগে এসে আল্লাহ মুমিনদের বিজয়ের সুখবর দিয়েছেন। ঈমানের ওপর অটল থাকলে, আল্লাহর সাহায্য আসবেই।

ফজিলত

নবি ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ, তা কিয়ামাতের দিন কুরআন-পাঠকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসেবে হাজির হবে। তোমরা উজ্জ্বল সূরা-দুটো পড়ো : সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান। কেননা, কিয়ামাতের দিন এ-দুটো সূরা মেঘের মতো, অথবা ছায়ার মতো, অথবা সারি-বাঁধা দুই ঝাঁক পাখির মতো হাজির হয়ে, এ-দুটো-সূরা-পাঠকারীর পক্ষে যুক্তি হাজির করবে।" (মুসলিম, ৮০৪)

নবি ﷺ আরও বলেছেন, "যে-ব্যক্তি কুরআনের প্রথম সাতটি সূরা আঁকড়ে ধরে, সে জ্ঞানী।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৪৪৪৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

একজন মা তার চরিত্রকে যত বেশি শুদ্ধ ও পবিত্র রাখবে: → তার নেক সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে (উদাহরণ: মারইয়াম ﷺ)

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
শত বাধা-বিপত্তি ও কঠিন সময়েও ঈমানের ওপর অটল থাকা

১. ভূমিকা
সূরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহর ওপর অবিচল ঈমান ও হিদায়াতের আলোচনা দিয়ে।

২. ঐতিহাসিক উদাহরণ
আগের নবিগণ ও তাঁদের অনুসারীদের দেখে শেখা। যেমন: ইমরান-পরিবার ও হাওয়ারি তথা ঈসা ﷺ-এর নির্ভেজাল অনুসারীরা।

৩. বাস্তব প্রশিক্ষণ
কেবল ইতিহাস থেকে শেখা যায় না, হাতে-কলমেও শিখতে হয়। শিখে আবার পরীক্ষাও দিতে হয়। তাই উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের মাধ্যমে, আল্লাহ মুমিনদেরকে ঈমানের ওপর অটল থাকার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিলেন।

৪. অধ্যবসায় ও ত্যাগ-তিতিক্ষার আহ্বান
আল্লাহর রাস্তায় চলতে গেলে বাধা-বিপত্তি আসবেই। শুনতে হবে অনেক কটু কথা। তবে সেসবের পরোয়া না করে, অবিচল থাকতে হবে দ্বীনের পথে।

কেইস-স্টাডি

ঈসা ﷺ যখন তাওহীদের দিকে ডাকতে লাগলেন, বেশিরভাগ মানুষই তাঁর বিরোধিতা করল। তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল অল্প কয়েকজন নির্ভেজাল ঈমানের মানুষ। কুরআন তাদের পরিচয় করিয়েছে 'হাওয়ারি' হিসেবে। হাওয়ারি মানে, পরিচ্ছন্ন ভেজালমুক্ত ও খাঁটি-মনের অনুসারী—যারা সমস্ত বিপদের কথা ভুলে দ্বীনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ঈসা ﷺ যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন: কে কে আল্লাহর সাহায্যে এগিয়ে আসবে? তখন হাওয়ারিরা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিল: 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যে এগিয়ে আসব'। তো, কুরআনে এই হাওয়ারিদেরকে আল্লাহ আমাদের জন্য উদাহরণ হিসেবে হাজির করেছেন—যাতে আমরা তাদেরকে নিয়ে কেইস-স্টাডি করি। তাদের দিকে তাকালে আমরা একজন সত্যিকার মুমিনের গুণাবলি কেমন হবে, সেই খোঁজ পাই। সত্যিকার মুমিনরা ঈমানের ওপর অটল থাকে, সত্যকে সমর্থন দিতে সব সময় তৈরি থাকে। নিজেকে এখন প্রশ্ন করা প্রয়োজন: আমরাও কি কঠিন সময়ে দ্বীনের সহযোগিতায় ওভাবে পাশে থাকব? বার্তাটা স্পষ্ট—দ্বীনের সহযোগিতায় আমাদেরকেও হয়ে উঠতে হবে একেকজন 'হাওয়ারি'।

(দেখুন—বুখারি, ১৬, ১৪৬৯; মুসলিম, ৪৩)

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআন—মানব-জাতির জন্য হিদায়াত ও পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষায় ব্যর্থদের জন্য আছে ভয়ংকর শাস্তি।	১-১৮	উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি ও মুনাফিকদের বিশৃঙ্খলা।	১২১-১৩৮
ইসলাম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠান নয়। কে নবি হওয়ার যোগ্য তা আল্লাহই ভালো জানেন, তাই রাসূলকে হিংসা করা অনুচিত।	১৯-৪৪	যুদ্ধে পরাজয় এলে হতাশা নয়, বরং শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও, কাফিরদের কথায় পাত্তা না দেওয়া।	১৩৯-১৫৮
ঈসা ﷺ-এর জন্ম ছিল বিস্ময়কর। কিন্তু তিনি আল্লাহর একজন রাসূল ও গোলাম ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।	৪৫-৬৩	সামষ্টিক কাজের আগে পরামর্শ করে নিতে হবে। আর ভরসা করতে হবে আল্লাহর ওপর।	১৫৯-১৬৪
ইবরাহীম ﷺ সম্পর্কে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধাপ্পাবাজি ফাঁস। তিনি ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান নন, বরং ছিলেন সাচ্চা মুসলমান।	৬৪-৯৯	উহুদের মাধ্যমে আল্লাহ মুনাফিকদের মুখোশ খুলেছেন। দানের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা যাবে না। জানমালের পরীক্ষা দিতেই হবে।	১৬৫-১৮৬
অতীত-জাতিগুলোর মতো অবাধ্য হলে, পেতে হবে ভয়ানক শাস্তি। তিনটি গুণের কারণে মুসলিম উম্মাহ পেয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব।	১০০-১২০	বুদ্ধিমানেরা আল্লাহর একত্ববাদ নিয়ে কোনো সন্দেহে ভোগে না। তাদের জন্য আছে জান্নাত। আর কাফিরদের জন্য আগুন।	১৮৭-২০০

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরায় অনেকগুলো আয়াতে মারইয়াম ﷺ-এর আলোচনা জায়গা পেয়েছে। মারইয়াম ﷺ যখন মায়ের-পেটে, তখন তাঁর মা দুআ করেছিলেন: 'রব আমার, আমার পেটে যে-সন্তান আছে, তাকে তোমার জন্য পুরোপুরি উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার পক্ষ থেকে তাকে কবুল করো, তুমি তো সব শোনো, জানো।' এরপর মারইয়াম ﷺ যখন জন্ম নিলেন, মায়ের দুআর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাকে কবুল করলেন, আর তার দেখভালের দায়িত্ব দিলেন যাকারিয়া ﷺ-কে। পরবর্তী সময়ে মারইয়ামের গর্ভেই জন্ম নেন নবি ঈসা ﷺ। এভাবেই মারইয়াম হয়ে গেলেন একজন সম্মানিত নবির মা। পুরো ঘটনায় শুরুতেই যেটা নজরে পড়ে তা হলো—খাঁটি নিয়ত। সুবহানাল্লাহ! দুনিয়ার ক'জন মা মারইয়াম ﷺ-এর মায়ের মতন চিন্তা করতে পারেন? আর এর বিনিময়টা দেখুন—শুধু একটা নিয়তের বিনিময়ে আল্লাহ তার মেয়েকে এভাবে কবুল করলেন

যে—নবির মা বানিয়ে দিলেন। কাজেই, সন্তান জন্ম নেবার আগেই নিয়তটাকে বিশুদ্ধ করুন। সন্তানকে দিয়ে প্রচুর দুনিয়াবি কামাই-অর্জন করাবেন, এমন স্বপ্ন দেখবেন না।

আরেকটি বিষয় দেখুন, মারইয়াম عليها السلام-কে খুব ছোট বয়সে একজন নবির তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে একদিকে মারইয়াম عليها السلام যেমন প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার শিক্ষা পেয়েছেন, অন্যদিকে চারিত্রিকভাবেও একজন পবিত্র নারী হিসেবে বেড়ে উঠেছেন। এসবের ফলাফল—ঈসা عليه السلام-এর জন্মের পর লোকজন অপবাদ দিলে, চমৎকার নিপুণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন। কুরআনের বহু জায়গায় তাকে মুসলিম নারীদের জন্য অনুসরণীয় উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম, সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই আদব-তরবিয়ত ও বিচক্ষণতা শেখাবার জন্য, জ্ঞানী-গুণী মানুষের সান্নিধ্যে রাখতে হবে।

(দেখুন—তিরমিযি, ১৯৫২; আবু দাউদ, ৪৯৫; সুয়ূতি, জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ১২৬৪)

'হাকীম' অর্থ: প্রজ্ঞাময়, বিচক্ষণ। হাকীম কথাটি এসেছে 'হিকমাহ' থেকে। ইমাম ঝাজ্জাজ رحمه الله বলেন: ঘোড়ার লাগামকে বলা হয় হিকমাহ। কেননা, ঘোড়ার লাগাম ঘোড়াকে বেপরোয়া ছোটা থেকে বাধা দেয়; ঘোড়ার গতিকে নিয়ন্ত্রণের ভেতর রাখে; ঘোড়াকে দিকভ্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। এর ফলে ঘোড়াটি তার মালিকের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে ঠিকঠাক পৌঁছুতে পারে। সেখান থেকেই হাকীম শব্দের অর্থ: যিনি হিকমাহ ও প্রজ্ঞার সাথে বিশ্ব পরিচালনা করেন। তার মানে, আমরা বুঝতে পারলাম, আল্লাহ যখন আমাদেরকে কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন, তখন এর পেছনে অবশ্যই কোনো-না-কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। আমাদের যখন কোনো 'ক্ষতি' হয়, বা স্বজন হারায়, তখন আমরা কষ্ট পেলেও, এর পেছনে কোনো একটা রহস্য থাকে। কেননা, পথের শেষটা আমরা দেখতে পাই না, চূড়ান্ত গন্তব্য জানি না। ঘোড়ার মালিক যেমন পথের শেষটা জানেন বলেই লাগাম টেনে রাখেন, ঘোড়াকে এদিক-ওদিক ছুটতে দেন না, আল্লাহ তাআলাও তাঁর হিকমাহ ও কৌশল দিয়ে দুনিয়াবি কর্মকাণ্ডের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রাখেন।



(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ৪৩)

'ওয়াহ্হাব' অর্থ: মহান দাতা। ওয়াহ্হাব নামটি এসেছে হিবা (هِبَةٌ) থেকে। হিবা মানে কাউকে কিছু দেওয়া; তবে এমনভাবে দেওয়া যে, তার থেকে কোনো বিনিময় আশা করা হয় না। এ কারণেই উপহারকে বলা হয় 'হিবা'। বিনিময় হতে পারে দু-রকমের। ১. টাকা-কড়ি, অর্থবিত্ত ২. সম্মান, ভালোবাসা বা পক্ষপাত। তো, আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাকে তাঁর অগণিত নিয়ামাত দেন, তখন তিনি বান্দার কাছে কোনো বিনিময় চান না। শর্তহীন-ভাবেই দেন। এমনকি লোকটি যদি আল্লাহর বিরোধিতাও করে, তাঁর হুকুম অমান্যও করে, তবু তিনি দেওয়া থামিয়ে দেন না। তা ছাড়া, আল্লাহকে বিনিময় দেবার মতো সামর্থ্য তো বান্দার নেই-ও। এ-কারণেই তাঁর নাম আল-ওয়াহ্হাব।

(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ৩৮)

সূরা নিসা

سُوْرَةُ النِّسَآءِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯২-তম সূরা। এর আগে সূরা মুমতাহিনা ও পরে সূরা যিলযাল নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪র্থ সূরা। এর আগে আছে সূরা আলে ইমরান ও পরে সূরা মাইদা।

এক নজরে নিসা

- ৪র্থ হিজরিতে নাযিল
- সূরা নং: ০৪
- আয়াত: ১৭৬
- মাদানি

নামের রহস্য

'নিসা' মানে 'নারী'। এই সূরার অনেকগুলো আয়াতে নারীর অধিকার নিয়ে আলাপ করা হয়েছে। যেমন : বিয়ে, মোহরানা, ভরণ-পোষণ, ওয়ারিশি সম্পদে তাদের ভাগ, এতিম-নারীর সাথে আচরণ ইত্যাদি। সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে নিসা। এ-সূরায় নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কুরআনে গোটা একটা সূরার নামই যেখানে দেওয়া হয়েছে 'নারী', সেখানে ইসলামে নারীর আলোচনা কতটা ব্যাপক, নারীকে কতটা গুরুত্বের চোখে দেখা হয়—তা আর বুঝবার বাকি থাকার কথা নয়।

মেজর থিম

০১ নারী ও এতিমের অধিকার। বিয়ে ও পারিবারিক জীবন।

০২ ওয়ারিশি সম্পদ বণ্টন-নীতি। বাবা-মা ও আত্মীয়দের হক।

০৩ সমাজে নারী-পুরুষের দায়িত্ব বণ্টন। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায় ও শাস্তি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরু হয়েছে ন্যায়-বিচারের আহ্বান জানাবার মাধ্যমে। বলা হয়েছে—মানুষ, তোমরা তো একই আত্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছ। তাই একে অন্যকে ঠকিয়ো না। দায়িত্ববোধ শেখো। আর সূরার একেবারে শেষে এসে ওয়ারিশি সম্পদের বণ্টন-নীতি আলোচনা করা হয়েছে। তার মানে, সূরার শুরুতে মানুষকে দেওয়া হয়েছে ন্যায্যতার শিক্ষা, আর শেষ অংশে এসেছে সম্পত্তি ভাগাভাগির সময় সেই শিক্ষা বাস্তবায়নের আদেশ।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরাটি হলো—সূরা আলে ইমরান; যার শেষ আয়াতে মুমিনদের উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখো—যাতে তোমরা সফল হতে পারো।" সূরা নিসার প্রথম আয়াতেও শোনা যায় একই সাবধানবাণী: "ও মানুষ, তোমাদের রবের অবাধ্যতার পরিণতির ব্যাপারে সাবধান হও।"

শানে নুযুল

মাদানি যুগের তৃতীয় বছর থেকে নিয়ে পঞ্চম বছরের শুরুর সময়টাতে নাযিল। উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি শহীদ হলেন। তখন তাদের ওয়ারিশি সম্পদ কীভাবে ভাগ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলো। আল্লাহ তখন সূরা নিসাতে উত্তরাধিকার সম্পদের বণ্টন-নীতি জানিয়ে দিলেন। এদিকে, ওই ৭০ জন সাহাবি শহীদ হওয়ায় তাদের সন্তানরা এতিম হয়ে পড়ল। তখন এতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ হবে কীভাবে, সে বিধানও এ-সূরাতে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন। সালাতুল খাওফ—তথা যুদ্ধের সময় নামাজ কীভাবে পড়তে হবে—সেই বিধানটি আসে যাতুর-রিকা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় হিজরতের চতুর্থ বছরে। অন্যদিকে পঞ্চম হিজরির বনুল মুস্তালিক যুদ্ধে পানির অভাব দেখা দিলে তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়। এই গেল সময়ের প্রেক্ষাপট। এবার আসা যাক নাযিলের প্রেক্ষাপটে। নবিজির হাতে তখন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১. ইসলামি রাষ্ট্র মদীনার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। এ ছাড়াও নাগরিকদের সামাজিক আচরণ ঠিক করা। তাদেরকে নৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া। ২. মক্কার মুশরিকদের আক্রমণ এবং মদীনার ইহুদি ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা। ৩. ব্যাপক উদ্যমের সঙ্গে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যাওয়া। নতুন যারা মুসলিম হয়েছে, তাদের আত্মিক পরিশুদ্ধি করা। এ কারণেই সূরা নিসার আলোচনাগুলো মোটাদাগে এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে এগিয়েছে। সূরা বাকারাতে দেওয়া হয়েছে সামাজিক ও পারিবারিক আইনের রূপরেখা। আর এ-সূরায় সেসব আইনের আরও বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নাযিল করা হয়েছে। (দেখুন—বুখারি, ৩৩৪, ৪১২৯; মুসলিম, ৩৬৭, ৮৪২)

সেগমেন্ট

অধিকারের নতুন সংজ্ঞা

জাহিলি যুগে সুযোগ-সুবিধা সবটা ছিল পুরুষ ও নেতা-গোছের লোকদের জন্য। আল্লাহ সেটা ভেঙে দিলেন। নারী, শিশু, এতিম—এরকম বঞ্চিতদেরকে অধিকারের আলাপে যুক্ত করলেন।

ক্ষমতার নতুন বিন্যাস

এতদিন ক্ষমতা মানে ছিল শোষণ। আল্লাহ বললেন, ক্ষমতা মানে শোষণ নয়, বরং আমানত। ক্ষমতাবানদের অবশ্যই ন্যায্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে; এমনকি সেটা নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও।

যুদ্ধবন্দি ও অমুসলিমদের অধিকার

মানুষের প্রতি ভালোবাসা—এ সবক জাতিসংঘ নয়, ইসলামই সবার আগে আমাদেরকে শিখিয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নারী-শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি আচরণ কেমন হবে, যুদ্ধবন্দিদের সাথে আচরণ কেমন হবে—সূরার শেষ ভাগে এসেছে সেসব আলোচনা।

ফজিলত

নবি ﷺ বলেছেন: "যে-ব্যক্তি কুরআনের প্রথম সাতটি সূরা আঁকড়ে ধরে, সে জ্ঞানী।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৪৪৪৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সমাজে শান্তি ফেরাবার পয়লা শর্ত—আগে পরিবারে শান্তি ফেরানো। পারিবারিক সম্পর্ক তেতো হলে;

মুসলিম-সমাজ তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়বে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
ঐক্য ও সংহতির এক সমাজ বিনির্মাণ করা—যার ভিত্তি হবে তাওহীদ

১. আদর্শ সমাজ
একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার মূলনীতি। মানুষ হিসেবে মানুষের যে দায়িত্ব, তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. তাওহীদের প্রতি দাওয়াত
ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে সঠিক দ্বীন—ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। সেই সাথে মানব-জাতিকে বোঝানো হয়েছে—মানুষ হিসেবে তোমাদের কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। রয়েছে অধিকারও।

৩. নিফাক থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি
মুনাফিকি ও জিহাদ কখনো একইসাথে চলতে পারে না। মুনাফিক চেনার উপায়ও বাতলে দেওয়া হয়েছে এখানে।

৪. ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কর্ম-পদ্ধতি ও তার জবাব
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মনগড়া বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে করা হয়েছে ইতিহাস পর্যালোচনা।

কেইস-স্টাডি

সহীহ মুসলিম-এর একটি হাদীসে এসেছে। একবার নবিজি দীর্ঘ সময় ধরে দুআ করলেন। তারপর সাহাবিদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি আমার রবের কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। তিনি আমাকে দুটো দিয়েছেন, বাকি একটি দেননি। আমি আমার রবের কাছে দুআ করেছি: আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস না-করেন। তিনি আমার দুআ কবুল করেছেন। আমি আমার রবের কাছে দুআ করেছি: আমার উম্মতকে (বন্যায়) ডুবিয়ে যেন ধ্বংস না-করেন। তিনি আমার এ দুআটিও কবুল করেছেন। আমি আমার রবের কাছে আরও দুআ করলাম: আমার উম্মত যেন নিজেরা নিজেরা ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ও খুনোখুনিতে না-জড়ায়। তিনি আমার এ দুআটি কবুল করেননি। নবিজির এ দুআটি আল্লাহ কবুল না করার কারণ, তিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। এ-সূরায় আল্লাহ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছেন বহুবার। এমনকি উহুদ যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না-থাকার পরিণাম কী হয়েছে, হাতে-কলমে তা ধরিয়ে দিয়েছেন। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

(দেখুন—মুসলিম, ২৮৯০)

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
সকল মানুষের সৃষ্টি একটিমাত্র আত্মা থেকে। এতিমদেরকে ঠকানো যাবে না। মোহরানা দিয়ে একাধিক বিয়ে বৈধ।	১-৬	যুদ্ধের নির্দেশনা আসার পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র। এদেরকে চিনতে ভুল করা যাবে না। হত্যার বিধান নাযিল হলো।	৭১-৯৩
সম্পদের উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষ উভয়েরই দাবি আছে। তবে তাদের হিস্যা সমান নয়। এটাই আল্লাহর ফায়সালা।	৭-১৮	মুজাহিদ ও বসে-থাকা-ব্যক্তি সমান নয়। সফরে বা জিহাদে নামাজ সংক্ষেপ করার অনুমতি। সর্বত্র ইনসাফ ও সমতা কায়েমের নির্দেশ।	৯৪-১১৩
মোহরানার টাকা নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ। যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম, তাদের তালিকা। সকল ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি-দমন জরুরি।	১৯-২৮	চিন্তা ও আমলের পরিশুদ্ধি। শির্কের ব্যাপারে সতর্কতা; কেননা এই গুনাহের কোনো ক্ষমা নেই। আর বিশুদ্ধ ঈমানের পুরস্কার জান্নাত।	১১৪-১৩৬
নারী-পুরুষের দায়িত্ব আলাদা। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে সভ্য সমাজ। কিন্তু ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তা হতে দিতে চায় না।	২৯-৫৭	মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ। কুফরের জঘন্য ফলাফল ও ইহুদিদের কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা।	১৩৭-১৬২
শাসক যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী শাসন করবে, গণমানুষ ততক্ষণ তাকে মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।	৫৮-৭০	জানানো হলো নবি-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য। দেওয়া হলো আহলে-কিতাবসহ সমগ্র মানব-জাতির প্রতি উপদেশ।	১৬৩-১৭৬

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

নারীর অধিকার, নারীর নিরাপত্তা, নারীর প্রতি সহনশীলতা—এই শব্দগুলো অন্য কারও নয়; আমাদের, মুসলিমদের। একটা সময়ে ইউরোপে নারীদের প্রাণী হিসেবেও বিবেচনা করা হতো না। তারও বহু আগেই নারীকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে ইসলাম। কিন্তু দুঃখের কথা, এই শব্দগুলো আজ বেহাত হয়ে গেছে। এগুলো এখন তথাকথিত বাম সংগঠন, ধান্দাবাজ বুদ্ধিজীবী আর বেহায়া নারীবাদীদের অস্ত্র। এই অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে ওরা আমাদেরকে রীতিমতো ঘায়েল করে। কিন্তু এর পেছনে আমাদের দায় কি কোনো অংশে কম? সমাজের শতকরা ৯৫ ভাগ পুরুষ এখনও নিজের বোনকে ঠকায়। আর এই ঠকানোর কায়দা-কৌশল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। বাবা মারা গেছে কম করে হলেও বছর বিশেক হবে। অথচ ওয়ারিশি সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারার নাম-গন্ধও নেই। বোনদের জমিতে দিব্যি হালচাষ করে খাচ্ছে ভাইয়েরা। একসময় চাপে পড়ে ভাগ-বাটোয়ারার আয়োজন করে বটে। কিন্তু এবার আরেক দফা জুলুম। বাড়ির জমিতে বোনদের ভাগ নেই, ভালো জমিতে ভাগ নেই,

রাস্তার পাশের জমিতে ভাগ নেই—এরকম আজগুবি সব নিয়ম-কানুন! শেষমেশ বোনদের অংশ দেওয়া হয় ডোবায় আর জঙ্গলে। নামকাওয়াস্তের ভাগ-বাটোয়ারা শেষ। এখন বোনরা যখন সেসব সম্পদ বেচতে আসে, শুরু হয় তৃতীয় দফার জুলুম। যে জমিটার বাজার দর আছে বিশ লাখ টাকা, সেখানে মোটের ওপর দু-লাখ ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করে। আর ঠিক এই সুযোগটাই কাজে লাগায় আমাদের শত্রুরা। নামধারী মুসলিমদের কুকর্মের দায় চাপায় কুরআনের ওপর।

সুতরাং, বোনদের ওপর একরত্তি জুলুমও যদি আপনি করেন, মনে রাখবেন—পেটে উত্তপ্ত আগুন ঢুকবে। আল্লাহকে ভয় করুন। নারী কেবল নারী নয়, নারী একজন মা—যার কোলে-কাঁখে বেড়ে ওঠে গোটা উম্মাহ।

(দেখুন—বুখারি, ২৪৫৪, ৫৯৭১, ৭১৮১; মুসলিম, ১৬১০; তিরমিযি, ৩৮৯৫)

কিছু শব্দ জানতেই হয়

আর-রকীব الرَّقِيْبُ

'রকীব' মানে তত্ত্বাবধায়ক, সদা প্রহরী। আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। কে কী করছে, মহাবিশ্বের কোথায় কী ঘটছে, সবটাই তাঁর নজরে। কোনোকিছু থেকে একমুহূর্তের জন্যও তাঁর দৃষ্টি সরে না। তবে এই সব সময় পর্যবেক্ষণে রাখাটা কেবল-যে বান্দার বিচার করার জন্য, তা নয়। বরং তীব্র ভালোবাসা আর যত্ন থেকেও।

অন্যকে নিজের আমল-টামল দেখাতে মানুষ খুব ভালোবাসে। ছোট্ট একটা ভালো কাজ করেও সে অস্থির হয়ে পড়ে—কতক্ষণে অন্যকে দেখাবে। আর এভাবেই সে তার আমলটিকে চিটা-ধানের মতোই ফেলনা বানিয়ে ফেলে। হায়! সে যদি আল্লাহর 'আর-রকীব' নামের অর্থটা বুঝত! ছোট থেকে ছোট কোনো আমলও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। গভীর রাত্তিরে ভরা আঁধারে সামান্য একটা পয়সা দুখিনীর হাতে তুলে দিলেও, তিনি তা দেখেন। খুশি হন। তাঁর এই দেখাটা বুঝি যথেষ্ট নয়? তাঁকে ডিঙিয়ে কাউকে-না-কাউকে দেখাতেই হবে? জানান দিতে হবে সোশ্যাল মিডিয়ায়?

(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ৩১; মুসলিম, ২৫৬৪)

আল-হাসীব الْحَسِيْبُ

'হাসীব' শব্দটি দুটো অর্থে আসতে পারে। ১. হিসাব-গ্রহণকারী ২. যথেষ্ট। আমরা যে 'হিসাব' কথাটা বলি না? হাসীব শব্দটিও অনেকটা ওরকম। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকটা কাজকর্ম হিসেব করে রাখেন। কিয়ামাতের দিন আবার গুনে গুনে সেসবের প্রতিদান দেবেন। তার মানে, আল্লাহর হাসীব নামটি আমাদেরকে শেখায়—কাজ করবার আগে ভেবে-চিন্তে করা উচিত। ছোট্ট একটা খারাপ কাজ করার সময়ও ভাবুন—আল্লাহ কাজটি গুনে রাখছেন। আবার ছোট্ট একটি ভালো কাজ ছেড়ে দেবার আগেও ভাবুন—কাজটি ছোট হলেও আল্লাহ তো খবর রাখছেন। তাঁর হিসেবের খাতায় তো ছোট-বড় সবই যোগ হয়, তা হলে কাজটি কেন ছেড়ে দেবো? এবার আসা যাক পরের অর্থটিতে। হাসীব মানে—আল্লাহ যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট। খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করার জন্য যথেষ্ট। আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য যথেষ্ট। জীবনের সব ক্ষেত্রে যদি আমরা এই ছোট্ট কথাটি মনে রাখতে পারি, তা হলে আমাদের জীবনটা হয়ে উঠবে অনেক বেশি সুন্দর। এজন্য সব সময় আমরা একটি দুআ পড়তে পারি, যে দুআটি আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার পর ইবরাহীম (আ) করেছিলেন: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ "আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই-না চমৎকার অভিভাবক।" (দেখুন—বুখারি, ৪৫৬৩)

সূরা মাইদা

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১১২-তম সূরা। এর আগে সূরা ফাতহ ও পরে সূরা তাওবা নাযিল হয়।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫ম সূরা। এর আগে আছে সূরা নিসা ও পরে সূরা আনআম।

এক নজরে মাইদা

- ১০ম হিজরিতে নাযিল
- সূরা নং: ০৫
- আয়াত: ১২০
- মাদানি

নামের রহস্য

'মাইদা' অর্থ 'খাবার'। ঈসা ﷺ-এর সাহাবিরা তাঁর কাছে আসমানি খাবার চেয়েছিল। এ-সূরার ১১২-১১৩ নং আয়াতে সেই আলোচনাই জায়গা পেয়েছে। সেখান থেকেই এই সূরার নাম হয়েছে 'মাইদা'।

মেজর থিম

০১ চুক্তি ও ওয়াদা পুরা করা। হারাম খাবারের তালিকা।

০২ শরিয়া আইনের বিস্তারিত আলোচনা। হাবিল ও কাবিলের ঘটনা।

০৩ ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব। সবর ও প্রতিদান।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার একদম প্রথমেই আল্লাহ তাআলা মানব-জাতিকে চুক্তি পুরা করার আদেশ দিয়েছেন। আর এ-বিষয়টা তো পরিষ্কার—যে মিথ্যা বলে, তার চুক্তি কিংবা ওয়াদা মূল্যহীন। তাই সূরার শেষ অংশে আল্লাহ সত্যবাদিতার গুরুত্ব বোঝালেন। সেই সাথে ঘোষণা করলেন সত্যবাদীদের পুরস্কার।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা নিসা; যাতে অনেক ধরনের চুক্তির বিষয়ে দিকনির্দেশনা এসেছে। যেমন: বিয়ে, ঈমান, ওয়াদা, অসিয়ত ইত্যাদি। তো সূরা মাইদার শুরুতেই আদেশ দেওয়া হলো—"যারা ঈমান এনেছ, তোমরা চুক্তিগুলো পুরা করো।"

শানে নুযুল

সূরা আলে ইমরান ও নিসার তুলনায়, সূরা মাইদা নাযিল হবার প্রেক্ষাপট অনেকটাই আলাদা। উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে, মুসলিমরা এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াল যে, ততদিনে গোটা আরব দুনিয়ায়, ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। মদীনার সীমানা বাড়তে বাড়তে একদিকে নজদ, বিপরীতে লোহিত সাগর, আরেকদিকে সিরিয়া, বিপরীতে ইয়ামান সীমান্ত অবধি ঠেকল। উহুদে যে আঘাত মুসলিমরা পেয়েছিল, তা তাদেরকে পঙ্গু বানাতে তো পারেইনি, উলটো তাদের হৃদয়ে বিজয়ের বারুদকে জাগিয়ে তুলেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এর শুরুটা হয় ষষ্ঠ হিজরির শেষ থেকে। তখন উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হয়েছিলেন নবিজি। সাথে ১৪০০ জন সাহাবি। খবর পেয়ে হন্তদন্ত ছুটে এল কুরাইশদের প্রতিনিধি। সাফ সাফ জানিয়ে দিলো—এ বছর আপনারা মক্কায় ঢুকতে পারবেন না। আগামী বছর আসুন। সেই সাথে চলুন একটা চুক্তি করে ফেলি। তার মধ্যে অন্যতম একটি ধারা এই যে, আগামী ১০ বছর আমাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকবে। ব্যস! এসে গেল মওকা। নির্বিঘ্নে মুসলিমরা আরবের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সাথে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ইসলাম। ইসলামের সীমা-পরিসীমা বাড়তে লাগল। শরিয়া, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন দরকার বাড়তি নির্দেশনা। তা ছাড়া হুদাইবিয়া চুক্তির পরের বছর উমরা করতে গেলে, মুসলিমরা কি সেই জাহিলি রীতির অনুসরণেই উমরা পালন করবে? না, চাই স্বতন্ত্র নিয়ম-কানুন। মুমিনদের এসব চাহিদা পূরণ করতেই ধরার বুকে নেমে আসে সূরা মাইদা। সেই সাথে ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকেও ইসলাম মেনে জীবন সাজাতে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয় এ-সূরাতে।

(দেখুন—বুখারি ৩১৮২; মুসলিম ১৭৮৫; আবু দাউদ, ২৭৩৬; তাবারি, তাফসীর ২৬/৭১)

সেগমেন্ট

আসমানি বিধি-বিধান

প্রথম অংশে বেশ কিছু শারঈ আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিহাসের শিক্ষা ও সতর্কতা

মাঝের অংশে এসেছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ইতিহাস। ওরা যেভাবে নিজেরা নিজেরা আইন তৈরি করেছিল, আমরা যেন তেমন না করি। আইন জারি করবার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

পরকালের পথে যাত্রা

যারা দুনিয়াতে কেবল আল্লাহর শাসন কায়েম হোক, মনে-প্রাণে তা চেয়েছে—তারাই সত্যিকারের মুসলিম। আর তাদের পরকালের পথে যাত্রা হবে ভীষণ সুন্দর।

ফজিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে-ব্যক্তি কুরআনের প্রথম সাতটি সূরা আঁকড়ে ধরে, সে জ্ঞানী।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৪৪৪৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দ্বীনের কোনো বিধানের ক্ষেত্রে খটকা লাগলে, বিশ্বস্ত কোনো আলিমের কাছ থেকে তার সমাধান নিতে হবে;

এর ফলে পথভ্রষ্টতা থেকে দূরে থাকা যাবে, ইন শা আল্লাহ।

গতিপথ

১. ওয়াদা পূরণ
ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে বান্দা আল্লাহর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। সেই চুক্তি হলো—সে তার মনিবের সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। সূরার শুরুতেই এসেছে সেই ওয়াদা পূরণের তাগিদ। একইসাথে সেই চুক্তি পুরা করবার রাস্তাও দেখানো হয়েছে।

সেন্ট্রাল থিম
আল্লাহর-সঙ্গে-করা চুক্তি পূরণ ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

২. ন্যায়বিচার
একটি আদর্শ সমাজের ভিত্তি হবে ন্যায়বিচার। ইনসাফ ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা ছাড়া একটি সমাজ কখনো সঠিক পথে চলতে পারে না।

৩. আহলে কিতাবদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা
ইহুদি-খ্রিষ্টানরা কখনোই আল্লাহর ওয়াদার ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। তাই সব সময়ই তারা আল্লাহর-সঙ্গে-করা চুক্তি ভেঙে ফেলেছে। ফলে লাঞ্ছনা কখনো তাদের পিছু ছাড়েনি।

৪. আরও কিছু করণীয়-বর্জনীয়
সূরার শেষভাগে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য কিছু হালাল-হারাম নির্ধারণ করে দেন। মদ, জুয়া-সহ সকল ধরনের হারাম ছেড়ে, ধরতে বলেন তাকওয়ার পথ।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর সঙ্গে মুমিনদের চুক্তিসমূহ যথাযথভাবে পালনের গুরুত্ব। চুক্তিভঙ্গ করে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ভীষণ অন্যায় করেছে।	১-১৬	ইহুদিরা বরাবরই আল্লাহ ও নবিগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আর নবিকে সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তো আল্লাহর।	৬৪-৬৯
আহলে কিতাবদের ভ্রান্তি ও চরম বেয়াদবি। তুলে ধরা হলো আদম ﷺ-এর দুই ছেলে: হাবিল-কাবিলের ঘটনা।	১৭-৩১	প্রকৃত সত্য হলো, ইহুদি ও মুশরিকরা জাতিগতভাবে মুসলিম-বিদ্বেষী। তবে খ্রিষ্টানদের মাঝে কিছু ভালো লোক আছে।	৭০-৮৬
হত্যা ও অরাজকতা সৃষ্টি করা নিষেধ। চুরির শাস্তি হাত কাটা। আর জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারাই প্রকৃত সফলতা।	৩২-৪০	হালাল-হারাম ও শপথের ব্যাপারে এসেছে দিকনির্দেশনা। তুলে ধরা হয়েছে মানুষের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ।	৮৭-১০০
আসমানি কিতাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিকৃতি। যারা ওহির বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা কাফির, জালিম ও ফাসিক।	৪১-৪৭	অযথা প্রশ্ন জটিলতা বাড়ায়। মৃত্যুকালীন অসিয়তের বিধান। ঈসা ﷺ-এর নিদর্শন, দুআ ও পরকালীন জবাবদিহিতার চিত্র।	১০১-১১৮
তবে তাওরাত-ইনজীলের অবিকৃত অংশকে কুরআন সত্যায়ন করে। বিধর্মী ও অবাধ্যদের কাউকে বন্ধু বানানো নিষেধ।	৪৮-৬৩	ঈমানের দাবিতে সত্যবাদীরা কিয়ামাতের দিন ভীষণ উপকৃত হবে। আল্লাহর ক্ষমতার আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরাটির সমাপ্তি।	১১৯-১২০

কেইস-স্টাডি

পৃথিবীর প্রথম খুন ছিল হিংসা ও লোভের ফসল। কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করল। কারণ হচ্ছে, হাবিলকে আল্লাহ উত্তম হিসেবে বাছাই করেছেন। তার কুরবানি কবুল করেছেন। কাবিল এই ব্যাপারটা মানতে পারল না। বলল, 'আমি তোমাকে হত্যা করব।' তখন হাবিলের চমৎকার উত্তরটা দেখুন—'তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়ালেও, আমি তোমার দিকে হাত বাড়াব না। আমি জগতের রব আল্লাহকে ভয় পাই।' এই ঘটনা নিয়ে ভেবে দেখলে মোটাদাগে দুটো বিরাট শিক্ষা আমরা পাই: **এক.** দুনিয়ার বেশিরভাগ যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে হিংসা ও লোভের কারণে। তাই লোভ থেকে দূরে থাকা জরুরি। **দুই.** কাবিল তার ভাইকে যখন হত্যার হুমকি দিলো, তখন তার ভাই বলেছিল, তুমি আমাকে আঘাত করলেও, আমি তোমাকে আঘাত করব না। ফলে হাবিলকে আল্লাহ সম্মানিত করলেন, আর কাবিলকে বানালেন অভিশপ্ত। এখান থেকে মুসলিমদের জন্য শিক্ষা—নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে হাত তোলা যাবে না। প্রতিবেশী লোকটা আপনাকে অহেতুক গালি-গালাজ করলে, ধৈর্য ধারণ করুন। আল্লাহ আপনাকে হাবিলের মতোই সম্মানিত করবেন। (দেখুন—বুখারি, ৬৪৩৬; মুসলিম, ২৫৬৪; আবু দাউদ, ৪৯০৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৩ নং আয়াতে, আল্লাহ আমাদের সামনে হালাল ও হারাম খাবারের বিস্তারিত তালিকা তুলে ধরেছেন। তারপর তালিকার একেবারে শেষে গিয়ে বলেছেন, কেবল তাঁকেই ভয় করে চলতে। এখান থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, হালাল-হারাম বাছবিচার করে চলতে হবে। নবি ﷺ বলেছেন, "ওই দেহ জান্নাতে যাবে না, যা হারাম খাবার দিয়ে পুষ্ট। জাহান্নামই এর উপযোগী স্থান।" অর্থাৎ, খাবার যদি হারাম হয়, তবে সব আমল অর্থহীন হয়ে যাবে। এমন হৃদয় কখনো ইবাদাতের স্বাদ পাবে না। দুআ কবুল হবে না এবং জান্নাতেও যাওয়া যাবে না।

(দেখুন—মুসলিম, ১০১৫; তিরমিযি, ২৯৮৯; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২৭৭২)

'ওয়াদা' ও 'চুক্তি'—অত্যন্ত পবিত্র দুটো শব্দ, ভীষণ ওজনদার। ইসলাম এ দুটো জিনিসকে সীমাহীন গুরুত্বের চোখে দেখে। যে-কোনো রকমের চুক্তি বা ওয়াদা—হোক সেটা আল্লাহর সাথে, অপরের সাথে, কিংবা সমাজের সাথে; তা পূরণ করা জরুরি। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, আজকাল আমরা যেন 'প্রমিস' ব্যাপারটাকে খুব হেঁয়ালি বানিয়ে ফেলেছি। সবচেয়ে বড় তামাশা এটাই যে—মানুষ এখন ওয়াদা করে কেবল তা ভেঙে ফেলার জন্যই। অথচ ওয়াদার পবিত্রতা রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। তাই দ্বীনি চুক্তি ও সামাজিক চুক্তি মেনে চলা আবশ্যক।

(দেখুন—বুখারি, ৩৩; মুসলিম, ৫৯)

সূরা আনআম

سُوْرَةُ الْأَنْعَام

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫৫-তম সূরা। এর আগে সূরা হিজর ও পরে সূরা সাফফাত নাযিল হয়।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬ষ্ঠ সূরা। এর আগে আছে সূরা মাইদা ও পরে সূরা আ'রাফ।

এক নজরে আনআম

- হিজরতের আগের বছর নাযিল
- সূরা নং: ০৬
- আয়াত: ১৬৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

'আনআম' শব্দের অর্থ 'গবাদিপশু'। আল্লাহর-দেওয়া গবাদিপশুকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষ কীভাবে শির্‌কে লিপ্ত হয়, তা এই সূরার ১৩৬ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৩৮-১৩৯ নং আয়াতে দেখানো হয়েছে—মুশরিকরা এই পশুগুলোকে কীভাবে হালাল-হারাম হিসেবে ভাগ-বাটোয়ারা করে। বর্ণনা করা হয়েছে ওদের আজগুবি সব নিয়ম-নীতি। আল্লাহ এই সূরাটির মাধ্যমে কুসংস্কারে-ভরা সেসব কাল্পনিক-নীতি ভেঙে দিয়েছেন। সেখান থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'আনআম'।

মেজর থিম

০১. মুশরিকদের প্রতি সতর্কবার্তা। কিয়ামাতের দিন মুশরিকদের অবস্থা।

০২. শির্‌ক থেকে দূরে থাকার আদেশ। ইবরাহীম ﷺ-এর উদাহরণ।

০৩. আল্লাহর-দেওয়া নিয়ামাতসমূহ। যেভাবে হয় শির্‌কের চর্চা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরু: "প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন...তবুও অকৃতজ্ঞ লোকেরা তাদের রবের সঙ্গে শির্ক করছে।" আর সূরার শেষের দিকে বলা হলো: "বলো, 'আমার নামাজ, আমার সকল ভালো কাজ, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই মহাবিশ্বের অধিপতি আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই।'" অর্থাৎ শুরু-শেষ মিলিয়ে এই সূরায় আল্লাহর একত্ববাদের নির্দেশ ও তাঁর সাথে শির্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মাইদা; যার শেষে বলা হয়েছে: "মহাকাশ, পৃথিবী ও সেসবের মাঝে যা আছে—সবকিছু আল্লাহর রাজত্বের অধীন, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" অনুরূপ আলোচনা করা হয়েছে এই সূরার শুরুতেও: "প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন...তবুও অকৃতজ্ঞ লোকেরা তাদের রবের সঙ্গে শির্ক করছে।"

শানে নুযুল

নুবুওয়াত-প্রাপ্তির পর থেকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হওয়ার জোগাড়। দিন-রাত মক্কাবাসীদের দাওয়াত দিতে থাকলেন। কিন্তু মুশরিকরা কি আর সোজা পথ দেখতে পায়? তারা নবিজিকে নানাভাবে হেয় করতে লাগল। কখনো 'কবি', কখনো 'জাদুকর', আবার কখনো-বা 'মিথ্যাবাদী'—রটিয়ে দিলো এরকম নানান কিসিমের গুজব। উপরন্তু, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলেই, তার ওপর শুরু হয়ে যেত কুরাইশদের রকমারি জুলুম। দিন দিন এই অত্যাচারের মাত্রা বাড়তেই লাগল। ফলস্বরূপ একসময় দেশ ছাড়তে বাধ্য হন বেশ ক'জন সাহাবি। আর ওই সময়টাতে আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য-সহযোগিতা করার মতনও কেউ ছিল না। আল্লাহ তাঁকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিলেন। ধৈর্যের বিনিময়ে তিনি অন্যান্য নবিকে বিজয় দিয়েছিলেন, মনে করিয়ে দিলেন সে-কথা। আর এর অল্পকিছু সময় পরই আশার আলো জ্বলে ওঠে মদীনায়। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতারা এলেন। নবিজিকে মদীনায় সাদরে বরণ করে নিলেন। আর ধীরে ধীরে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে সেখানে। তৈরি হয় একটি মুসলিম রাষ্ট্র। নবিজি ওখান থেকে অনেকগুলো যুদ্ধ পরিচালনা করেন। একসময় মক্কা বিজয় হয়। আল্লাহ তাঁর নবিকে-দেওয়া ওয়াদা পূরণ করলেন। আল্লাহ এ-সূরাটি নাযিল করে ওই সময়কার মুশরিকদের হালচাল তুলে ধরেন। ফুটিয়ে তোলেন ওদের নানান বিকৃতি ও অসারতা। শির্ক বন্ধ করে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেন। আর তা না করলে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। সেই সাথে মুসলিমদের দিয়েছেন আসন্ন বিজয়ের সুসংবাদ।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৪৭২; ইবনু মাজাহ, ১৫১)

সেগমেন্ট

সকল নবি-রাসূলের আহ্বান: তাওহীদ

সকল নবি-রাসূলকেই আল্লাহ্ তাআলা সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আর সে-পথ হলো তাওহীদের পথ।

আইন তৈরির কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর

আল্লাহর সত্য ও ইনসাফ-পূর্ণ বাণী পালটে দেবার ক্ষমতা কারও নেই। নতুন করে আইন বানানোর ক্ষমতাও আর কাউকে দেওয়া হয়নি।

তাওহীদ-শির্ক দ্বন্দ্বের সারকথা

'আমার নামাজ, আমার যাবতীয় ভালো কাজ, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই আল্লাহর জন্য।'

ফজিলত

কুরআনের অল্প কিছু সূরা শুরু হয়েছে 'আলহামদুলিল্লাহ' দিয়ে। মানে, আল্লাহর প্রশংসা করার মাধ্যমে। সূরা আনআম সেগুলোর একটি। বাকিগুলো হলো সূরা ফাতিহা, সূরা কাহফ, সূরা ফাতির, সূরা সাবা।

নবি ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কুরআনের) প্রথম সাতটি সূরা আঁকড়ে ধরে, সে জ্ঞানী।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৪৪৪৩)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে নিলে; → আল্লাহ মানুষের অন্তরকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত ও উদার করে দেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

তাওহীদের আলোকে নীতি-নির্ধারণ; মুশরিকদের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের অসারতা ও পরিণতি

১. তাওহীদ

মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা-কিছু আছে, আল্লাহ সে-সবকিছুর একমাত্র মালিক। আর নিয়ম তো এটাই—মালিকের আদেশ অনুযায়ী গোলামরা চলবে।

২. রিসালাত

রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ আগে মানুষকে সতর্ক করেন। বারবার তাগিদ দেন এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার। এরপরও ঈমান না আনলে, তখন আযাব পাঠান।

৩. মুশরিকদের কর্মকাণ্ড

মুশরিকরা নিজেদের মনগড়া নিয়ম-নীতি তৈরি করে। হালালকে হারাম করে। আর এসব মনগড়া-রীতিকে 'আল্লাহর আইন' বলে চালিয়ে দেয়।

৪. পরিণতি

কিয়ামাতের দিন মুশরিকদেরকে শক্ত করে ধরা হবে। তখন তারা বলবে—আল্লাহর কসম, আমরা কখনো শির্ক করিনি! এভাবে মিথ্যা বলে তারা পার পাবে না। পাবে কঠিন শাস্তি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
দুনিয়ার সবকিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। তাই ইবাদাত পাবার যোগ্যও কেবল তিনিই।	১-১৬	মৃত্যুর পর আল্লাহর সামনে মানুষ একাকী হাজির হবে—যেভাবে জন্মের সময় সে একা এসেছিল।	৮৪-৯৯
লাগাতার অবাধ্যতার শাস্তি। জাহান্নাম দেখে কাফিরদের আকুতি।	১৭-৩২	কুরআন না মানলে ক্ষতি মানুষেরই। মুশরিকদের উপাস্যদের গালি দেওয়া যাবে না। কারণ জবাবে তারাও আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে।	১০০-১১৭
ইসলাম গ্রহণ করতে আল্লাহ কাউকে জোর করেন না। গুনাহ সত্ত্বেও দুনিয়ায় প্রাচুর্য হলো বিপদের সংকেত।	৩৩-৫০	ধ্বংসের আগে জালিমদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। আর নবিদের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেন। সতর্ক না-করে আল্লাহ শাস্তি দেন না।	১১৮-১৩৪
আন্তরিকভাবে তাওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেন। সবরকম বিপদ থেকে তিনিই রক্ষা করেন।	৫১-৬৭	নিজেদের মনগড়া আইনে কোনটা হালাল, আর কোনটা হারাম—মুশরিকরা সেসব ঠিক করে।	১৩৫-১৪৭
উপকার কিংবা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা মূর্তির নেই। তাই ওগুলোকে ভয় পাওয়া নিরেট বোকামি।	৬৮-৮৩	মুমিন কখনো কাফিরদেরকে অনুসরণ করতে পারে না। আর শুধু ঈমান আনলেই চলবে না, সাথে করতে হবে ভালো আমলও।	১৪৮-১৬৫

কেইস-স্টাডি

মানুষ যখন দিনের-পর-দিন আল্লাহ ও তাঁর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন তার ফলাফল হয় খুবই ভয়াবহ। এদের অন্তরের ওপর তখন আল্লাহ পর্দা টেনে দেন। ফলে এদের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এরা সত্যকে সত্য, আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে ধরতে পারে না। ফলে এরা হয়ে ওঠে আরও বেপরোয়া, আরও উদ্ধত। খেয়াল করলে দেখবেন—দুনিয়াতে বাতিলদের গলার আওয়াজই বেশি চড়া হয়। অহংকারে এদের ঘাড়ের রগ ফুলে ওঠে। ভুল করার পর এরা কোনোভাবেই সেখান থেকে ফিরে আসে না। নিজেদের ভুলও কখনো স্বীকার করে না। তাই আমাদের নিজেদের সাবধান হওয়া ভীষণ প্রয়োজন। কোনো ভুল হয়ে গেলে সেটা স্বীকার করে নিতে যেন আমরা সংকোচ না করি। অহংকারের বশে সত্যকে যেন অস্বীকার করে না বসি।

(দেখুন—মুসলিম, ১৫৯৯; তিরমিযি, ৩৩৩৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এই সূরার ১১৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে বলেছেন, “তুমি যদি দুনিয়ার বেশিরভাগ লোকের কথামতো চলো, তা হলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাবে; তারা কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে, আর কেবল ধারণা করে কথা বলে।” হাল-আমলে দুনিয়ার প্রায় সব দেশই গণতন্ত্র মানে। আর গণতন্ত্রের মোদ্দাকথা মোটামুটি সবারই জানা। দেশের বেশিরভাগ লোক যেটার পক্ষে মত দেবে, সেটাই বাস্তবায়ন হবে। সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫১ জন কোনো বিষয়ে একমত হয়েছে, তো ব্যস! আইন বানিয়ে ফেলো! অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট করে বলছেন—বেশিরভাগ লোক আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে। তাই অধিকাংশের মতামত কখনো ঠিক-বেঠিকের মাপকাঠি হতে পারে না। মূর্খরা সব একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত একটা নিয়ে ফেলবে, তারপর চাপিয়ে দেবে বাকি সবার ওপর। তা হলে সমাধান কী? পথের দিশা রয়েছে কুরআন এবং সুন্নাহর মাঝে। কুরআনের আলোকে আমাদের প্রিয় নবি ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ যেভাবে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, আমাদেরকেও সেভাবেই এগুতে হবে। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন—ইসলামি-শাসনব্যবস্থা যদি এতই ভালো হয় বা শ্রেষ্ঠ হয়, তা হলে সেই ব্যবস্থা ধসে পড়ল কেন? এর উত্তরটাও সহজ। ইসলামি-ব্যবস্থা ধসে পড়বার পেছনে কিন্তু ইসলামি আইন বা সিস্টেম দায়ী নয়। দায়িত্বশীলদের উদাসীনতা আর নৈতিক অবক্ষয়ই এর প্রধান কারণ। কিন্তু গণতন্ত্র এমনই এক জঞ্জাল, এখানে আপনি যত ভালো মানুষকেই ক্ষমতায় বসান না-কেন, দিনশেষে সে স্বৈরাচারী হিসেবে বেরিয়ে আসবে। কারণ, এই গণতন্ত্রই হলো স্বৈরাচার তৈরির মেশিন।

(দেখুন—বুখারি, ৫৯; মুসলিম, ১৮৩৯; তিরমিযি, ১৭০৭)

সূরা আ'রাফ

سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা অর্থাৎ এই সূরাটি কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—সেই বিবেচনায় এটি ৩৯-তম সূরা। এর আগে সূরা সোয়াদ এবং এরপরে সূরা জিন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭ম সূরা। এর আগে রয়েছে সূরা আনআম ও পরে সূরা আনফাল।

এক নজরে আ'রাফ

- মাক্কি যুগের শেষ বছরে নাযিল
- সূরা নং: ০৭
- আয়াত: ২০৬
- মাক্কি

নামের রহস্য

اَلْأَعْرَافُ (আ'রাফ) শব্দটি عُرْفٌ (উরফ)-এর বহুবচন, যার অর্থ উঁচু জায়গা। জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি একটা উঁচু জায়গা থাকবে, ওটাকে বলা হয় আ'রাফ। এই সূরার ৪৬–৪৯ নং আয়াতে আ'রাফবাসীদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে সূরার নাম হয়েছে 'আ'রাফ'।

মেজর থিম

০১. মানুষ-সৃষ্টির ইতিহাস: আদম ও ইবলিস। অতীত জাতির ঘটনা থেকে শিক্ষা।

০২. আল্লাহর সৃষ্টি ও নিয়ামাত নিয়ে ভাবা। সমকামিতার পরিণাম।

০৩. মুমিন কখনো হতাশ হয় না। নেতৃত্ব দিতে হলে নৈতিকতা জরুরি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক।

সূরার প্রথমদিকে বর্ণিত হয়েছে 'নিকৃষ্ট আচরণ', অর্থাৎ ইবলিসের কর্মকাণ্ড। এসেছে অহংকারের ভারে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কথা। আল্লাহ তাআলা সূরাটির শেষে উত্তম বৈশিষ্ট্য হিসেবে ফেরেশতাদের উদাহরণ টানলেন। অর্থাৎ কোন আচরণ হতে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত, আর কেমন আচরণ মুমিনদের জন্য মানানসই—শুরু-শেষের এই আলোচনায় সূরাটি পূর্ণতা পেয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আনআম; যার শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তিনিই (আগের লোকদেরকে সরিয়ে দিয়ে) তোমাদেরকে দুনিয়ার ওয়ারিশ বানিয়েছেন"। আর এই সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তাআলা 'ওয়ারিশ'-এর ব্যাখ্যায় বলেন: "আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় রাজত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছি, আর তাতে সৃষ্টি করেছি তোমাদের বেঁচে থাকার উপকরণ।"

শানে নুযুল

সূরা আ'রাফ ও সূরা আনআম মাক্কি যুগের প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ একটি আগে, আরেকটি পরে। আর দুটি সূরা নাযিলের হেতু-ও প্রায় একই—মানুষকে রিসালাতের ওপর ঈমান আনতে উৎসাহিত করা। তবে দুটো সূরার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সূরা আনআম-এর অধিকাংশ বার্তা-ই মক্কার মুশরিকদের লক্ষ করে বলা হয়েছিল। আর সূরা আ'রাফ-এ শুধু মুশরিক নয়, আহলে কিতাব—অর্থাৎ ইহুদিদেরকেও উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কারণটা পরিষ্কার। কিছুদিন বাদেই নবিজি মদীনায় হিজরত করবেন। আর সেখানকার বড় একটা অংশ ছিল ইহুদি। তারা নিজেদেরকে আসমানি কিতাবের অনুসারী বলে দাবি করে। আর সত্যিই যদি তারা আসমানি কিতাবের অনুসারী হয়, তা হলে তো কুরআনের বাণী শুনেই বুঝতে পারবে—এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এজন্য তাদেরকে আগে থেকেই সম্বোধন করে বলা হচ্ছে—রাসূল আসছেন, তৈরি থাকো। তিনি দাওয়াত দিলেই তা কবুল করে নেবে, তাঁর ওপর ঈমান আনবে।

ওদিকে মুশরিকরা যে গোঁয়ার্তুমি করেই যাচ্ছিল—এর জন্যও এই সূরাতে বারবার তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে কঠিন আযাবের কথা। সর্বোপরি, সকল মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার জন্য তাগিদ দিতেই এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে। (দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ৭/১৬০)

সেগমেন্ট

সৃষ্টি

শুরুর অংশে বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টির ইতিহাস।

হিদায়াত ও চুক্তি

বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টির পেছনে উদ্দেশ্য: একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে—এই চুক্তি।

পরিণাম

সেই চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার দুনিয়াবি ও পরিকালীন পরিণতি।

ফজিলত

নবি ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি কুরআনের প্রথম সাতটি সূরা আঁকড়ে ধরে, সে জ্ঞানী।" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৪৪৪৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

জালিমের হাতে-বন্দি-মুমিনদেরকে মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

এতে করে আল্লাহ ওই জাতিকে বিজয়ীর আসনে বসাবেন, যেভাবে মুসা ﷺ-এর উদ্যোগের কারণে বনী ইসরাঈল বিজয়ী হয়েছিল।

গতিপথ

১. দ্বন্দ্বের শুরু
সত্য ও মিথ্যার লড়াইটা শুরু হয়েছে আসমানে। এ-সূরার শুরুতেই আল্লাহ সেই দৃশ্যপটটা সামনে এনেছেন।

সেন্ট্রাল থিম

সত্য-মিথ্যার চিরন্তন লড়াই

২. দ্বন্দ্বের ইতিহাস
সত্য-মিথ্যার এই লড়াই যুগ যুগ ধরে অব্যাহত আছে। কিয়ামাত পর্যন্ত তা চলতেই থাকবে। নবি নূহ, হূদ, সালিহ, লূত ও মুসা ﷺ-সহ সব নবি-রাসূলই মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

৩. দ্বন্দ্বের ফলাফল
মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবারই সত্যের বিজয় হয়েছে। হয় মিথ্যাবাদীরা সত্য মেনে নিয়েছে, অথবা ধ্বংস করা হয়েছে ওদের।

৪. শিক্ষা
এই ফলাফল থেকে হাল-জামানার মানুষকে শিক্ষা নিতে হবে—তারা সত্যকে বেছে নিয়ে জয়ী হবে, নাকি মিথ্যা আঁকড়ে ধরে অপমানিত হবে?

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআন অনুসরণের গুরুত্ব। আদম-সৃষ্টির ঘটনা এবং ইবলিসের অবাধ্যতার ইতিহাস।	১-২৫	নবি মুসা ﷺ-কে হত্যার জন্য তাড়া করল ফিরআউন আর তার দলবল। পরিণতিতে সমুদ্র তাদের গ্রাস করে নিয়েছিল।	১০৩-১৭১
শয়তানের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি। আরও বলা হয়েছে—রাসূলের অনুসরণ করলে ভয় নেই, আর অবাধ্যদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।	২৬-৪৫	রূহের জগতে থাকতেই মানুষ আল্লাহকে রব মেনে নিয়েছে। তাই দুনিয়ায় অস্বীকার করলে, আখিরাতে কোনো অজুহাত খাটবে না।	১৭২-১৭৪
জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝামাঝি একটা উঁচু জায়গার নাম 'আ'রাফ'। আরাফবাসীরা জান্নাতে যাওয়ার আবেদন জানাবে।	৪৬-৫৮	সত্য না জানার অজুহাত আল্লাহ মেনে নেবেন না। এ ছাড়া অবাধ্য ও যারা আল্লাহর নাম বিকৃত করে, তাদের জন্য আছে জাহান্নাম।	১৭৫-১৮৬
নূহ ও হূদ ﷺ-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে উভয় নবির জাতির ওপর আল্লাহ গযব প্রেরণ করেছিলেন।	৫৯-৭২	কিয়ামাতের জ্ঞান আছে কেবল রবের কাছে। সময়-মতো তিনি কিয়ামাত ঘটাবেন।	১৮৭
আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া কয়েকটি জাতির বিবরণ।	৭৩-১০২	সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে ডাকতে হবে। তাঁকে ডাকতে হবে মনে মনে, নরম দিলে, ভয় নিয়ে, আর নিচু আওয়াজে।	১৮৮-২০৬

কেইস-স্টাডি

এ-সূরায় লূত ﷺ-এর জাতির ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তার জাতি সমকামিতার মতো ভয়ানক খারাপ কাজে লিপ্ত ছিল। এই জঘন্য কাজকর্ম দেখে লূত ﷺ তাদেরকে বললেন: 'তোমরা এমন এক কাজ করছো, যা এর আগে জগতের কেউ করেনি। তোমরা নারীদের রেখে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করছো? এ তো চরম সীমালঙ্ঘন।' তখন তার জাতির লোকেরা জবাব দিয়েছিল: 'লূত ও তার অনুসারীদেরকে এই এলাকা থেকে বের করে দাও। এরা বেশি পবিত্র থাকতে চায়।' কোনো জাতি যখন সমকামিতা বরদাশত করে, তখন আল্লাহ ওই জাতির বিবেক-বুদ্ধি উঠিয়ে নেন। আচরণের পাশাপাশি তাদের চিন্তাও হয়ে উঠে নোংরা পশুর মতো; এটা সমকামিতার কুফল। তাই, সমকামিতার পক্ষে যেকোনো প্রচারণা, রাষ্ট্রীয় ওকালতি কিংবা আইনি খসড়া দেখলে—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতে হবে। কারণ, হাদীসে এসেছে, সমকামিতার শাস্তি হলো—দুজনকেই হত্যা করা। সুতরাং স্কুল-মাদরাসার পাঠ্যবইয়ে সমকামিতার ছিটেফোঁটাও যদি থাকে, তা হলে আর রক্ষা নেই। আল্লাহর গযব নেমে আসবে নিশ্চিত।

(দেখুন—আবু দাউদ, ৪৪৬২; তিরমিযি, ১৪৫৬; ইবনু মাজাহ, ২৫৬১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটা উঁচু জায়গা থাকবে। ওটাকে বলা হয় 'আ'রাফ'। জায়গাটা উঁচু হওয়াতে ওখান থেকে জান্নাতের ভেতরের দৃশ্য যেমন দেখা যাবে, তেমনি জাহান্নামের ভেতরের দৃশ্যও দেখা যাবে। যেসব লোকের ভালো কাজ ও গুনাহের কাজ সমান সমান হয়ে যাবে, তাদের ঠাঁই হবে আ'রাফের ওই উঁচু ভিটায়। প্রতিবার যখন জান্নাতিদের দেখবে, তারা তখন বলবে—'সালামুন আলাইকুম' (তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। আর প্রতিবার তারা যখন জাহান্নামিদের দিকে তাকাবে, ভয়ে আঁতকে উঠে কেঁদে কেঁদে বলবে, 'রব আমাদের, আমাদেরকে ওসব হতভাগা গুনাহগারদের মধ্যে ফেলবেন না। আমাদেরকে ক্ষমা করুন।' এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন—اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِفَضْلِيْ وَمَغْفِرَتِيْ، لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ "আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমার বরকতে জান্নাতে প্রবেশ করো। আজকের পর থেকে তোমাদের আর কোনো ভয় নেই। তোমরা আর কখনো হতাশও হবে না।" এরপর তাদেরকে 'হায়াত' নামক একটি নদীর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। নদীটির দুই তীর হবে মণি-মুক্তা খচিত। সেই নদীতে তাদেরকে গোসল করতে বলা হবে। একেকবার তারা নদীতে ডুব দেবে, আর গুনাহের কালি তাদের শরীর থেকে মুছে যেতে থাকবে। এভাবে একসময় জান্নাতিদের মতোই উজ্জ্বল ঝলমলে হয়ে উঠবে তাদের চেহারা। তারা প্রবেশ করবে চিরসুখের জান্নাতে। সুতরাং, হতাশ না হয়ে বরং ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন। জীবনটা সাজাতে শুরু করুন নতুনভাবে, আল্লাহর রঙে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১০/২১২; বুখারি, ২২; মুসলিম, ১৮৩)

সূরা আনফাল سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮৮ নং সূরা। এর আগে সূরা বাকারা ও পরে সূরা আলে ইমরান নাযিল হয়।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮ম সূরা। এর আগে আছে সূরা আ'রাফ ও পরে আছে সূরা তাওবা।

এক নজরে আনফাল

- ২য় হিজরিতে বদর যুদ্ধের পর নাযিল
- সূরা নং: ০৮
- আয়াত: ৭৫
- মাদানি

নামের রহস্য

'আনফাল' শব্দটি 'নফল' শব্দের বহুবচন। নফল মানে 'পুরস্কার, বাড়তি-পাওনা'। আর আনফাল মানে 'যুদ্ধে-লাভ-করা সম্পদ'। যুদ্ধে-লাভ-করা সম্পদ মুমিনের জন্য একরকম বাড়তি-পাওনাই বলা যায়। কেননা, সে তো সম্পদের আশায় যুদ্ধ করে না, করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। বদর যুদ্ধে জয়-লাভ করার পর, গনিমতের সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে মুসলিমদের ভেতর কিছুটা তর্কবিতর্ক শুরু হয়—যেটা কোনোভাবেই তাদের ঈমানি স্পিরিটের সঙ্গে যায় না। এ কারণে সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাকওয়া ও ইখলাসের এক অনবদ্য রিমাইন্ডার শুনিয়ে দিলেন। আর সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে 'আনফাল'।

মেজর থিম

০১. বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা। গনিমত বণ্টন।

০২. কাফিরদের পরিণতি। যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ।

০৩. যুদ্ধ-বন্দিদের সাথে আচরণবিধি। জিহাদ ও হিজরতের পুরস্কার।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুর দিকে মুমিনদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর সূরাটির শেষও করা হয়েছে মুমিনদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার মাধ্যমে। এতে আলোচনাটি পূর্ণতা পেয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আ'রাফ। তার শেষদিকে আল্লাহর গোলাম হিসেবে ফেরেশতাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আর এ-সূরাটি শুরু হয়েছে মুমিন—অর্থাৎ, আল্লাহর আরেক গোলাম—এর বৈশিষ্ট্য দিয়ে।

শানে নুযুল

মদীনাতে মুসলিমরা এসে আশ্রয় নিয়েছেন। দু'বছরও তখন পেরোয়নি। এতটুকু সময়ের মধ্যে মক্কার মুশরিকদের সাথে বেশকিছু ঝটিকা লড়াই হয়ে গেছে। হতাহতের কোনো ঘটনা অবশ্য ঘটেনি। তবে ওই সময়টাতে কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরছিল। মদীনার ধার ঘেঁষেই চলেছে সে-পথ। কাফেলার নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। মুসলিমরা চাইল—মুশরিকদের এই কাফেলাকে তারা জব্দ করবে। ওদিকে আবু সুফিয়ান মক্কায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছে—'মুসলমানরা আমাদেরকে আক্রমণ করতে এল বলে। জলদি করে সাহায্য নিয়ে আসো।' গোটা মক্কায় হইহই-রইরই পড়ে গেল। আবু জাহলের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে এল বড় বড় নেতা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। আল্লাহ ও তাঁর নবির ইশারায় মুসলিমরা তখন মত বদলালেন। কাফেলা নয়, বরং জব্দ করা হবে কুরাইশদেরই। আল্লাহর শত্রুদের সাথে ময়দানেই বোঝাপড়া হবে। আল্লাহও তাদেরকে সাহায্য করলেন। কুরাইশদের অহংকার মরুভূমির তপ্ত বালিতে মিইয়ে গেল। তবে এরপর উদ্ভূত হয় এক নতুন পরিস্থিতি—যুদ্ধে-অর্জন-করা সম্পদ ভাগাভাগির প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হলো মতবিরোধ। এইসব ব্যাপার নিয়ে এই সূরা বিস্তারিত আলাপ করেছে। নিয়ে এসেছে সমস্যার সমাধান। যুদ্ধে মুমিনদের করণীয় কী, যুদ্ধে জয় পেতে হলে মন-মানসিকতা কেমন থাকা চাই, শান্তি-চুক্তির ব্যাপারে কোনো ঝামেলা হলে কীই-বা করবে—এ-সব আলোচনা উঠে এসেছে এ-সূরাতে। মোটাদাগে, বদরের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই এই সূরাটি নাযিল হয়।

(দেখুন—ইবনু হিশাম, সীরাত, ২/৬০৬-৬০৭; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৩/৩১-৩৫)

সেগমেন্ট

প্রকৃত মুমিনের পরিচয়

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনদের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সাথে ঘোষণা করেছেন তাদের পুরস্কার।

মুমিনদের জন্য আল্লাহর পরিকল্পনা

মুমিনের জন্য আল্লাহর পরিকল্পনার চেয়ে ভালো কিছু আর নেই। মানুষ প্ল্যান করে বর্তমান দেখে। আর রবের পরিকল্পনা হয় সবকিছু সামনে রেখে।

কাফিরদের চক্রান্ত নস্যাৎ

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের চক্রান্ত চিরকালের। কিন্তু মুসলিমরা যদি সঠিক পথে থাকে, তা হলে আল্লাহই সেই চক্রান্ত থেকে তাদের রক্ষা করবেন।

ফজিলত

বিশুদ্ধ বর্ণনায় এ-সূরার ফজিলতের কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি। তবে সূরাটিতে জিহাদের বিধি-বিধান বিশেষভাবে জায়গা পাওয়ায়, তাফসীরবিদদের কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন 'সূরাতুল জিহাদ'। শত্রু-পক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য মুসলিমদের উচিত, এ-সূরার পঠন-পাঠন পুরোদমে জারি রাখা। সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা এমন দুটো সূরা—যা অনেকটা এসিড-টেস্টের মতো। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের আকীদা ঝালিয়ে নিতে পারি। তার মানে, এ-দুটো সূরার সঙ্গে যদি কারও ধ্যান-ধারণা মিল না-খায়, পদে পদে কন্ট্রাডিকশন তৈরি করে, তবে বুঝে নিতে হবে তার আকীদায় গলদ আছে। মনে রাখবেন, আমাদের শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করার স্পষ্ট এক মানদণ্ড হলো—সূরা আনফাল ও তাওবা।

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মানুষ যখন তাকওয়া অবলম্বন করবে, অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে চলবে;

তখন সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক অনবদ্য যোগ্যতা সে অর্জন করবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

যুদ্ধ-জয়ের মূলমন্ত্র: আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস বা ঈমান

১. আল্লাহর ওপর ভরসা: বিজয়ের শ্রেষ্ঠ কৌশল
সূরার শুরুতেই মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজয় আসে কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই ভরসাও করতে হবে তাঁর ওপরই।

২. কেইস-স্টাডি
ঈমানের জোরেই যে বিজয় অর্জন সম্ভব, বদর যুদ্ধ তার চাক্ষুষ প্রমাণ। মুসলিমদের ছোট্ট একটা দল জয়ী হয়েছে কাফিরদের এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে।

৩. যুদ্ধনীতি নির্ধারণ
আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান রাখবার পাশাপাশি মুমিনদের আরও কিছু করণীয় আছে। আছে কিছু বর্জনীয় বিষয়। সে-সবকিছু আল্লাহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে ধরলেন এখানে। নির্ধারণ করে দিলেন যুদ্ধনীতি।

৪. আসমানি সাহায্য
সামরিক প্রস্তুতি যতটুকুই থাকুক না কেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যদি খাঁটি সংকল্প থাকে, তবে কাতারে কাতারে ফেরেশতা নেমে আসবে। ফলে বিজয় অনিবার্য হয়ে উঠবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআনের বার্তা শুনলে মুমিনদের ঈমান বাড়ে। মুমিনরা নামাজ কায়েম রাখে, আর আল্লাহর-দেওয়া জীবিকা থেকে খরচ করে।	১-৪	গনিমতে-পাওয়া-সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ—আল্লাহ, তাঁর রাসূল, রাসূলের নিকট-আত্মীয়, এতিম আর মুসাফিরদের জন্য।	৪১
আল্লাহ চেয়েছেন মুসলিমরা বদরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক। যেন সত্য প্রতিষ্ঠা পায়, আর কাফিররা ধ্বংস হয়।	৫-১৪	যুদ্ধে বিজয় চাইলে—১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথামতো চলতে হবে; ২. ঝগড়া-বিবাদ করা যাবে না; ৩. ধৈর্য ধরতে হবে।	৪২-৪৭
যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালানো জঘন্য কাজ—এতে আল্লাহ তাআলা রেগে যান। আর যুদ্ধে বিজয় আসে কেবল আল্লাহর সাহায্য থাকলে।	১৫-১৯	কাফিরদের জান কবজের সময় ফেরেশতারা ওদের চেহারা আর শরীরের পেছনের দিকে আঘাত করে।	৪৮-৫৫
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করা যাবে না।	২০-২৯	কাফিররা শান্তি-চুক্তি ভেঙে ফেলার পাঁয়তারা করলে, যুদ্ধক্ষেত্রে ওদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।	৫৬-৬৪
রাসূলের বিরুদ্ধে কাফিররা ষড়যন্ত্র করে। ইসলামের বিরোধিতা বন্ধ না করলে, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।	৩০-৪০	আল্লাহ চাইলে বিশাল শত্রুর বিরুদ্ধেও বিজয় আসবে। শত্রুকে পুরোপুরি পরাজিত করার আগে যুদ্ধবন্দি গ্রহণ করা যাবে না।	৬৫-৭৫

কেইস-স্টাডি

মানুষকে দ্বীন থেকে সরাতে কাফিররা প্রচুর অর্থ-সম্পদ খরচ করে। পাঠ্যপুস্তক, মিডিয়া, এনজিও—এরকম শত খাতে দেদারসে টাকা ঢালে। আল্লাহ্ বলছেন, ওরা অবশ্যই এই খরচের জন্য একদিন আফসোস করবে। ওদের চেষ্টা কোনোদিন সফল হবে না। তাই প্রত্যেক মিডিয়া-কর্মী, পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ব্যক্তিদের জন্য কুরআনের এ আয়াত নিয়ে কেইস-স্টাডি করা জরুরি। ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের চেষ্টাগুলো খরচ করে শেষকালে আফসোস করতে না চাইলে, নিজেকে শুধরে নিন এখনই।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/১৯৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে: শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমরা শক্তি সঞ্চয় করো; যুদ্ধ করার জন্য আগে থেকেই ঘোড়াগুলো প্রস্তুত রাখো। ফায়দা হলো—শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার আগে একটু হলেও ভাববে। আর গোপন কোনো শত্রু থেকে থাকলে, তারাও ভয়ে চুপসে যাবে। তাফসীরবিদদের মত হলো, আল্লাহর এ আদেশটি সকল জামানার সকল মুসলিমের বেলায় প্রযোজ্য। প্রত্যেককে তার সামর্থ্য ও দায়িত্ব অনুযায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে হবে। এমনকি শত্রু যদি আপাতত না-ও থাকে, তবুও প্রস্তুতিতে কোনো ফাঁক রাখা যাবে না। সে-বিবেচনায় আয়াতটিকে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন বলা যায়।

দুঃখের কথা হলো, মুসলিমরা আজ আল্লাহর-শিখিয়ে-দেওয়া এই স্ট্র্যাটেজি রীতিমতো ভুলতে বসেছে। লড়াইয়ের সমস্ত ব্যাপারে আমাদের চরম উদাসীনতা। কেবল একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। পরাশক্তি দেশগুলো তো বটেই, ছোট ছোট দেশগুলোও দু-দিন বাদে বাদে সামরিক মহড়া আয়োজন করে। এর পেছনে হেতু একটাই—আশপাশের দেশগুলোকে এই বার্তা দেওয়া যে, অস্ত্র-শস্ত্র কিন্তু আমাদেরও আছে। তাই সাবধান! আমার স্বাধীনতায় আঘাত করার কোনোরকম ফন্দি আঁটলে—জেনে রেখো—আমিও পালটা জবাব দেবার হিম্মত রাখি।

তো, আধুনিক বিশ্বের অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো আল্লাহর এই কৌশল ঠিকই রপ্ত করেছে। আর করাটাই বাস্তবসম্মত। নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, প্রস্তুতি নেওয়া মোটেও ক্রাইম নয়। অথচ মুসলিমদের প্রস্তুতির আগাগোড়া পুরোটাই শুধু অবহেলা—কাজের কাজ কিছু নেই, হুংকার ছোড়ায় ওস্তাদ। হ্যাঁ, এতটুকু জেনে রাখা যেতে পারে—সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে ইসলামি কর্তৃপক্ষ বা ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে। কিন্তু শারীরিক প্রস্তুতির দায়িত্বটুকু তো আমাদেরই কাঁধে, তাই নয় কি? সেই সাথে কুরআন-হাদীস পঠন-পাঠন ও শত্রুদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন থাকার মাধ্যমে নেওয়া চাই মানসিক প্রস্তুতিও।

(দেখুন—মুসলিম, ১৯১৭; তিরমিযি, ৩০৮৩; ইবনু মাজাহ, ২৮১৩)

সূরা তাওবা

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১১৩-তম সূরা। এর আগে সূরা মাইদা ও পরে সূরা নাসর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯ম সূরা। এর আগে আছে সূরা আনফাল ও পরে সূরা ইউনুস।

এক নজরে তাওবা

- ৯ম হিজরিতে, তাবুক অভিযানের সময় নাযিল
- সূরা নং: ০৯
- আয়াত: ১২৯
- মাদানি

নামের রহস্য

আত-তাওবা | আল-বারাআত

এ-সূরার দুটো নাম আছে—তাওবা ও বারাআত। 'তাওবা' মানে 'গুনাহের পর অনুশোচনা করে ফিরে আসা।' তাবুক অভিযানের সময় কিছু মুসলিম নবিজির সাথে না গিয়ে, বাড়িতে বসে থাকেন। অথচ—যুদ্ধের ডাক এলে ঘরে বসে থাকা মহা-অন্যায়। পরে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে, গভীরভাবে অনুশোচনা করে। সেখান থেকেই সূরার একটি নাম হয়েছে 'তাওবা'। আর 'বারাআত' শব্দের অর্থ হলো: 'সম্পর্ক ছিন্ন করা'। এ-সূরার শুরুতেই মুশরিকদের সাথে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

মেজর থিম

০১ মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক-ছিন্ন ঘোষণা। তাওবার প্রতি উৎসাহিত করা।

০২ চুক্তি ভঙ্গ করার শাস্তি। অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের মূলনীতি।

০৩ বস্তুবাদ বা দুনিয়া-কেন্দ্রিক চিন্তার পরিণতি। ধোঁকা ও চুক্তিভঙ্গের শাস্তি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

"আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে জেনে রাখো—তোমরা আল্লাহর নাগালের বাইরে যেতে পারবে না।" মুশরিকদের প্রতি এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণের মাধ্যমে সূরাটি শুরু হয়েছে। আর শেষ হয়েছে ওদের ব্যাপারে মুমিনদেরকে আশ্বস্ত করে, "তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বলে দাও—'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা আনফাল শেষ হয়েছে কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মাধ্যমে—"আর যদি তারা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা হলে (মনে রাখবে,) তারা এর আগে আল্লাহর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" আর তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সাথে সকল চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা তাওবা।

শানে নুযুল

সূরা তাওবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ-পর্যায়ে নাযিল হয়। মক্কা বিজয়ের পর থেকেই সমগ্র আরব-জুড়ে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল একটি শক্তিশালী অবস্থানে। কিন্তু এর তোয়াক্কা না করে কিছু মুশরিক গোত্র নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে মুসলমানদের সাথে-করা-চুক্তি লঙ্ঘন করছিল। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহ এ-সূরার মাধ্যমে ঘোষণা দেন যে, মুশরিকদের সাথে আর কোনো চুক্তি বহাল থাকবে না। তবে কিছু চুক্তি, যেগুলো মুশরিকদের পক্ষ থেকে লঙ্ঘিত হয়নি, সেগুলোর প্রতি সম্মান দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া তাবুক যুদ্ধও ছিল সূরাটি নাযিল হওয়ার অন্যতম প্রেক্ষাপট। রোমান সাম্রাজ্যের আক্রমণের আশঙ্কায় মুসলমানরা 'তাবুক' নামক স্থানে একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়। যদিও সরাসরি কোনো যুদ্ধ হয়নি, তবে সামরিক শক্তির এই প্রদর্শন মুসলিম-শাসনের ভিত পোক্ত করেছিল। এ সময়ে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার জন্য মুনাফিকদের মুখে শোনা যায় নানান রকম অজুহাত। তাদের সেই ষড়যন্ত্র ও দুর্বল ঈমানের ব্যাপারে এ-সূরায় কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। অপরদিকে সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে কয়েকজন খাঁটি মুমিনের তাওবা কবুলের ঘটনাও।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/২৪৪; বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ৮/৩৫০)

সেগমেন্ট

চুক্তি-ভঙ্গ ও যুদ্ধ

শুরুতেই মুশরিকদের চুক্তি-ভঙ্গের দরুন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

মুনাফিক ও সত্যিকার মুমিন

মুনাফিকদের দেখাদেখি কিছু মুসলিমও যুদ্ধে অংশ নিতে গড়িমসি করে। সেসব মুমিনকে পরীক্ষার মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে।

তাওবা ও ক্ষমা

সূরার শেষ অংশে পরীক্ষায় পাশ-করা সেসব মুমিনকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের বেশি, তাদেরকে বলা হয় আল-মিয়ূন। 'যাবুর' কিতাবের পরিবর্তে, আল-মিয়ূন সূরাগুলো আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা তাওবা।

(দেখুন : আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২; তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, ১১০৫)

উমর ﵁ বলেন—'তোমরা (পুরুষরা) সূরা বারাআত শিখবে। আর তোমাদের স্ত্রীদের শেখাবে সূরা নূর...।" (সুয়ুতি, জামিউল আহাদীস, ২৯৭১৪)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

অভাব থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি হারাম পথে না যায়;

তা হলে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে, তার অভাব দূর করে দেবেন।

গতিপথ

১. নিজের ভুল নিয়ে চিন্তাভাবনা করা
তাওবার প্রথম ধাপ হলো, নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। কেননা, আপনার কাছে যদি 'দোষ'কে দোষই মনে না হয়, তা হলে আপনি তো ক্ষমা চাইবেন না।

২. দোষ স্বীকার করা
আপনি ভুল করেছেন, এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নিন। যত বেশি অজুহাত খাটাবেন, ক্ষমা পাবার সুযোগ ততই হারাবেন।

সেন্ট্রাল থিম
খাঁটি তাওবা

৩. খাঁটি দিলে তাওবা করা
এবার রবের দরবারে কেঁদে-কেটে বলুন, আল্লাহ, আপনি তো ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৪. তাওবার ওপর অটল থাকা
একই ভুল বারবার করা মুমিনের স্বভাব নয়। তাই অতীতে যে ভুল করেছেন, তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। তাওবার ওপর নিজেকে অটল রাখুন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
চুক্তি ভাঙার কারণে মুশরিকদের সাথে 'সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন' করার ঘোষণা। তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আদেশ।	১-১৬	মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অন্যের সহযোগী। তারা এমন জান্নাতে থাকবে—যার নিচ দিয়ে ঝরনা বয়ে চলে।	৬৯-৭৮
মসজিদে হারাম দেখাশোনা করার উপযুক্ত কেবল মুমিনরা। আর মুমিনদের কাছে আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদই সবচেয়ে প্রিয়।	১৭-২৭	শারীরিকভাবে যারা দুর্বল বা অক্ষম—যেমন : বৃদ্ধ, শিশু কিংবা প্রতিবন্ধী; তাদের জন্য যুদ্ধে যাওয়া আবশ্যক নয়।	৭৯-৯৩
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না, আল্লাহর হুকুম মানে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।	২৮-৩৭	যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাকে জরিমানা মনে করে, সময়ের নিষ্ঠুর পালাবদল একদিন তাদেরকে ঘায়েল করবে।	৯৪-১০৬
মুনাফিকরাই জিহাদে না-যাওয়ার অজুহাত খোঁজে। আর সত্যিকার মুমিনরা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে।	৩৮-৫২	মুশরিকরা নিশ্চিত জাহান্নামি—এটা জানার পরও মুমিনরা কখনো কোনো মুশরিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারে না।	১০৭-১১৯
মুনাফিক ও কাফিরদের চাকচিক্য, সম্পদ আর লোকবলের গরিমা দেখে ঘাবড়ানো যাবে না। এগুলো তাদের পরীক্ষার অংশ।	৫৩-৬৮	প্রতিটি দল থেকে একটা অংশ যুদ্ধে যাবে, বাকিদের দায়িত্ব দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা।	১২০-১২৯

কেইস-স্টাডি

তাবুক যুদ্ধ ছিল মুমিনদের জন্য ভীষণ কঠিন এক পরীক্ষা। একদিকে প্রচণ্ড গরম—মরুতাপে শরীরের চামড়া পুড়ে যাবার দশা। অন্যদিকে মদীনা থেকে তাবুক ছিল অনেক দূরের পথ। আবার, তখন ছিল খেজুর ঘরে তোলার মওসুম। তা সত্ত্বেও মুসলিমরা ঘোষণা শোনা-মাত্র রওনা হয়ে গেছে। বিপরীতে পিছে রয়ে গিয়েছিল মুনাফিকরা। ওরা বলেছিল: অসহনীয় গরম, আবার পথটাও অনেক দূরের। মোটেও পারব না আমরা। অথচ ঈমানদাররা যুদ্ধে কেবল শরিকই হননি, বরং সেখানে গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করে ফিরেও এসেছিলেন। আসলে মুনাফিকরা যেমনটা বলেছিল—প্রচণ্ড গরম, পা ঝলসে যাবে—এরকম কথা কিন্তু এখনো শোনা যায় আমাদের আশপাশে। কোনো কোনো বোনকে বোরকা-নিকাব পরতে বললে জবাব দেয়: 'ইশ্, গরমটা যা পড়ছে! গা একেবারে জ্বালাপোড়া করবে।' আপনার বোনটিকে সুন্দরভাবে বোঝাবেন—বোরকার সাথে গরমের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং বোরকার সাথে সম্পর্কটা ঈমানের। আপনার ঈমান মজবুত থাকলে গরম আপনার কাছে-পিঠেও ঘেঁষবে না। যেমনটা ঘেঁষতে পারেনি সাহাবিদের কাছে। আর ঈমান যদি রোগাপাতলা হয়, অন্তরে যদি মুনাফিকির ছাঁট থাকে, তা হলে দুনিয়ার সব গরম আপনার জন্যই বরাদ্দ। এমনকি জাহান্নামের গরমটাও।

(দেখুন—বুখারি, ৩৬১২; তিরমিযি, ২৩৯৮; ইবনু মাজাহ, ৪০২৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন নবিজি। সাহাবিরা ছুটে চললেন যুদ্ধের ময়দানে। কিন্তু পিছে রয়ে গেল মুনাফিকরা। অগোচরে পেছনে রয়ে গেল আরও তিনজন সাহাবি। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার পর, নবিজি ডাকলেন মুনাফিকদের। সাথে ওই তিন সাহাবিকেও। তারপর তাদেরকে যুদ্ধে না-যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মুনাফিকরা তখন মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করাল। বলল, আমাদের এই সমস্যা ছিল, ওই সমস্যা ছিল। নবিজি সেসব কথা শুনে ওদেরকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ওই তিনজন সাহাবি মিথ্যার আশ্রয় নিলেন না। নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। সিদ্ধান্ত হলো, এই তিন-সাহাবিকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। এদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা আসার আগ-পর্যন্ত কেউ এদের সাথে ওঠাবসা করবে না। তারপর দিনের-পর-দিন কেটে যায়। শেষমেশ পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাআলা ওহি নাযিল করলেন। ওই তিন সাহাবিকে দিলেন ক্ষমার সুখবর। আর যেসব মুনাফিক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের জন্য ভয়াবহ আযাবের ধমকি। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, এ ঘটনায় আমাদের জন্য ভাবনার খোরাক আছে। আমরা অনেক-সময় একটা অপরাধ করি। তারপর সেই অপরাধের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে আরও অনেকগুলো অপরাধ করে বসি। এটা আসলে মুনাফিকদের স্বভাব। মুনাফিকরা মিথ্যা বলবে, তারপর ওই মিথ্যাটা ঢাকতে গিয়ে আরও অনেকগুলো মিথ্যা বলবে—যেটা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। আপনি কি আপনার ভুলটা শুরুতেই মেনে নিতে রাজি? মিথ্যা অজুহাত দাঁড় না-করিয়ে দোষ স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত? তা হলে সুখবর শুনে রাখুন। আপনার সেই দোষটা আল্লাহ ঢেকে দেবেন। ওই তিন সাহাবিকে নিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল করে যেভাবে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, সেভাবে আপনার সম্মানকেও বাড়িয়ে দেবেন।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৩০; তিরমিযি, ৩৫৪০, ১৯৮৭)

সূরা ইউনুস

سُوْرَةُ يُوْنُس

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫১-তম সূরা। এর আগে সূরা বনী ইসরাঈল ও পরে সূরা হূদ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০ম সূরা। এর আগে আছে সূরা তাওবা ও পরে সূরা হূদ।

এক নজরে ইউনুস

- মাক্কি যুগের শেষদিকে নাযিল
- সূরা নং: ১০
- আয়াত: ১০৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

এ-সূরার ৯৮ নং আয়াতে ইউনুস ﷺ-এর ঘটনা জায়গা পেয়েছে। সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে 'ইউনুস'। ইউনুস ﷺ বাস করতেন ইরাকের নিনাওয়া শহরে। তাঁকে 'যুন-নূন' বলে ডাকা হতো। যুন-নূন মানে—মাছওয়ালা। কারণ, কয়েক দিন তিনি মাছের পেটে ছিলেন।

মেজর থিম

০১ আল্লাহ তাআলার পরিচয়। তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ।

০২ আল্লাহ তাআলার শাস্তি-নীতি। দুনিয়ার বাস্তবতা।

০৩ আল্লাহর ওলি কারা—তাদের পরিচয়। অতীত নবিদের ঘটনা ও শিক্ষা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু হয়েছে ওহির আলোচনা দিয়ে—"এটা কি লোকদের কাছে একটা আশ্চর্যের বিষয় যে—আমি তাদেরই একজনের কাছে এ-নির্দেশনা দিয়ে ওহি পাঠিয়েছি।" আর শেষও হয়েছে ওহি সম্পর্কিত আলোচনা দিয়েই—"তোমার কাছে যে ওহি পাঠানো হয়, তুমি সেটা অনুসরণ করো আর ধৈর্য ধরো, যতক্ষণ-না আল্লাহ ফায়সালা করে দিচ্ছেন, তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগে রয়েছে সূরা তাওবা, যা শেষ হয়েছে রাসূল সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে—"তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন।" আর এই সূরাটিও শুরু হয়েছে রাসূল প্রসঙ্গেই, "এটা কি লোকদের কাছে একটা আশ্চর্যের বিষয় যে—আমি তাদেরই একজনের কাছে এ-নির্দেশনা দিয়ে ওহি পাঠিয়েছি।"

শানে নুযুল

এই সূরাটি মাক্কি যুগের শেষের দিকে নাযিল হয়। তখন কাফিরদের বিরোধিতার মাত্রা ভীষণ-রকম বেড়ে গেছে। রাসূলের নামে ওরা নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা চালাতে লাগল। সূরাটি শুরুই হয়েছে মুশরিকদের অবাক-হওয়াকে কটাক্ষ করে। মানুষকে রাসূল হিসেবে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন—এতে তারা ভারি অবাক! এ ছাড়া তারা নবিজিকে 'জাদুকর' বলে। এর আগে তো আরও কতকিছু বলেছে। অর্থাৎ কোনোভাবেই তারা নবিজির রিসালাতের ওপর ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাআলা এই সূরার মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দিলেন। তাদের বোঝার সুবিধার্থে নানা যুক্তি তুলে ধরলেন। দিলেন মুশরিকদের বিস্ময়ের জবাব—আগেও যারা নবি বা রাসূল হিসেবে এসেছেন, তারা সবাই মানুষ-ই ছিলেন। দুনিয়ার বুকে মানুষ ছাড়া আর কাউকে নবি হিসেবে পাঠানো হয়নি। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিলেন। দাওয়াত চালিয়ে যেতে বললেন। উৎসাহ দিলেন ওদেরকে ক্রমাগত বুঝিয়ে যাওয়ার কাজে। আর এতকিছুর পরও যারা রিসালাতের ওপর ঈমান আনবে না, তাদেরকে দিতে বললেন কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি।

(দেখুন—বুহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ৯/৬১)

সেগমেন্ট

ওহি
Revelation

শুরুর অংশে আল্লাহ শুনিয়েছেন মানুষকে তাঁর ওহির শাশ্বত বাণী।

চিন্তাবোধ
Reflection

ওহির বৈশিষ্ট্যই হলো—মানুষের ভেতর চিন্তাবোধকে জাগ্রত করা। সূরার মাঝের অংশে সেটারই প্রতিফলন দেখা যায়।

দায়িত্ববোধ
Responsibility

চিন্তা-মাত্রই সংক্রামক। মানে, মানুষ তার চিন্তা-ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চায় অন্যের মাঝে। তাই শেষ ভাগে আল্লাহ মানুষকে তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের বেশি, সেগুলোকে বলা হয় আল-মিয়ূন। 'যাবুর' কিতাবের পরিবর্তে, আল-মিয়ূন সূরাগুলো আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা ইউনুস।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২; তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, ১১০৫)

এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শেখান'। নবিজি বললেন, "যে সূরাগুলোর শুরুতে আলিফ-লাম-রা আছে, সেরকম তিনটি সূরা পড়ো।" (আবু দাউদ, ১৩৯৯; ইবনু হিব্বান, ৬১৮৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

নূহ ﷺ-এর ঘটনা নিজের পরিবার, প্রতিবেশী ও আশেপাশের লোকদের মাঝে বেশি করে ছড়িয়ে দিন;

যেন সবার মাঝে এই ধারণার বীজ বুনে দেওয়া যায় যে—সম্পর্ক করতে হবে কেবল ঈমানের ভিত্তিতে। ঈমান ছাড়া কেউ কারও নয়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
হিদায়াত ও মানুষের প্রতিক্রিয়া

প্রথম ধাপ: ডিনায়াল
ভালোর দিকে ডাকলে প্রথম দিকে মানুষ মানতে চায় না। গোঁয়ার্তুমি করে। কারণ, বেশিরভাগ মানুষ নফসের দাস, খারাপ কাজে তাদের মন আটকে গেছে।

দ্বিতীয় ধাপ: অ্যাটাক/ দোষারোপ
এই ধাপে এসে দাঈকে দোষারোপ করবে। এ ধাপটা একজন দাঈর জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। তবে ধৈর্য ধরে এই ধাপটা পার করতে পারলেই সফলতা।

তৃতীয় ধাপ: অনুশোচনা
এই ধাপে এসে তার মনটা একটু নরম হয়। ভাবে, 'আহ্বানকারীরা তো আমার ভালোর জন্যই বলে কথাগুলো।' এই সিম্পটমগুলো দেখা-মাত্র দাঈকে আরও অমায়িক হয়ে যেতে হবে।

চতুর্থ ধাপ: মেনে নেওয়া
এই ধাপে এসে সে মেনে নেয়। বুঝতে পারে, এতদিন যে-পথে ছিলাম, তা ছিল খারাপ পথ, গুনাহের পথ। আন্তরিকভাবে তাওবা করার কারণে, তার দিলটাও তখন ভরে ওঠে শুদ্ধতায়।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মুশরিকরা আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করে। অথচ সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আল্লাহর নিদর্শনগুলোই যথেষ্ট।	১-৬	কোনোকিছুকে বৈধ বা অবৈধ বলার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। আর আখিরাতে তিনি সবার কাজের ঠিকঠাক প্রতিদান দেবেন।	৫৭-৭০
ঈমানদার ও বেঈমানদের জন্য আছে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিদান। তবে বেঈমানদেরকে আল্লাহ সাথে সাথে ধ্বংস করেন না।	৭-১৪	নিজ জাতির প্রতি নূহ ﷺ-এর চ্যালেঞ্জ। সত্য-মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্ব হিসেবে, মুসা ﷺ আর ফিরআউনের লড়াইকেও তুলে ধরা হয়েছে।	৭১-৭৮
মুশরিকরা কুরআনে পরিবর্তন আনার বায়না ধরে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি মানুষের ভীষণ আসক্তি এমন বায়নার কারণ।	১৫-২৪	মুসা ﷺ-এর বিপক্ষে ফিরআউনের জাদুকরের দল। এ ছাড়া সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করার ফায়দাও বর্ণিত হয়েছে।	৭৯-৮৭
আল্লাহর আনুগত্য ও পরকালে বিশ্বাস হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।	২৫-৩৬	মুসা ﷺ-এর দুআ ও জালিম ফিরআউনের কবল থেকে বনী ইসরাঈলের মুক্তি।	৮৮-৯৩
কুরআনের বিরুদ্ধে মুশরিকদের অভিযোগ খণ্ডন ও তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ। তারা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	৩৭-৫৬	তাওবা করায় ইউনুস ﷺ-এর জাতি ক্ষমা পেয়েছিল; বাকি সব অবাধ্য জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং ওহির অনুসরণ করতে হবে।	৯৪-১০৯

কেইস-স্টাডি

ইউনুস ﷺ তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু লোকজন তাঁর কথায় সাড়া দিলো না। তা দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হলেন ইউনুস ﷺ। সিদ্ধান্ত নিলেন অহংকারী জাতিটিকে ত্যাগ করার। তারপর চড়লেন এক জাহাজে—একেবারে ভিন্ন কোনো দেশে চলে যাবেন। আল্লাহ ব্যাপারটা পছন্দ করলেন না। তাঁর ইচ্ছাতে এক বিরাট মাছ গিলে ফেলল ইউনুস ﷺ -কে। নবি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। মাছের পেটে নিকষ অন্ধকারে বসে দুআ করলেন: 'রব আমার, আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। তুমি যদি ক্ষমা না করো, তা হলে আমার আর কোনো উপায় নেই।' আল্লাহ তখন তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। ইউনুস ﷺ-এর এই ঘটনা প্রত্যেক দাঈ তো বটেই, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য একটা রিমাইন্ডার। সেটা হলো: দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে আশা হারানো যাবে না। শুরুতে মানতে না চাইলেও, বারবার বোঝাতে থাকলে, মানুষ একটা সময়ে সঠিক পথ চিনতে পারে।

(দেখুন—বুখারি, ১৪৬৯; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৯৭১৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

ইউনুস ﷺ-এর জাতির নাম ছিল 'নিনাওয়া'। কুরআনে অতীতের যতগুলো জাতির ঘটনা এসেছে, তার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম এই নিনাওয়া জাতি। কেননা, তারা শাস্তি আসার আগ-মুহূর্তে ঈমান এনেছিল। ঘটনাটা এরকম: ইউনুস ﷺ তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিলেন। এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে বললেন। কিন্তু তাঁর জাতি সেই ডাকে সাড়া দিলো না প্রথমটায়। গুরুত্বহীন কাজ নিয়ে তারা ব্যস্ত রইল। ইউনুস ﷺ তখন মনের অভিমানে তাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি যখন চলে গেলেন, তখনই তাদের হুঁশ ফিরল। ভীষণ ভয় জেঁকে বসল তাদের মনে। তারা বুঝতে পারল, আল্লাহর শাস্তি আসতে আর বাকি নেই। সমাজের ওপর মহল থেকে নিচু মহল—সবাই একসাথে জড়ো হয়ে জাতিগতভাবে তাওবা করার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের এই নজিরবিহীন ঐক্যবদ্ধ তাওবা দেখে, আল্লাহ খুশি হলেন। শাস্তি উঠিয়ে নিলেন। আর ইউনুস ﷺ-কে বললেন জাতির লোকদের কাছে ফিরে আসতে। এখান থেকে আমরা অত্যন্ত গভীর একটি শিক্ষা পাই। তা হচ্ছে: পাপটা যত বড়ই হোক না কেন, তবু শাস্তি থেকে বাঁচা যাবে, যদি তাওবা হয় খাঁটি, আর সিদ্ধান্ত হয় সামষ্টিক। তার মানে, আমাদেরকে 'কালেকটিভ' অর্থাৎ সবাই-মিলে-তাওবা করতে হবে। 'কালেকটিভ তাওবা' শব্দটিকে সবার কাছে পরিচিত করানো প্রয়োজন। গোটা সমাজকে তাওবার দিকে ফিরে আসতে হবে। গুনাহকে সমাজ থেকে বিদায় দিতে হবে চিরতরে। তবেই আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচা সম্ভব।

(দেখুন—তিরমিযি, ৩৫৪০; সূরা ফুরকান, ২৫:৭০)

সূরা হূদ

سُوْرَةُ هُوْدٍ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা--তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে--তা বিবেচনায় এটি ৫২-তম সূরা। এর আগে সূরা ইউনুস ও পরে সূরা ইউসুফ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ইউনুস ও পরে সূরা ইউসুফ।

এক নজরে হূদ

- মাক্কি যুগের শেষ বছর নাযিল
- সূরা নং: ১১
- আয়াত: ১২৩
- মাদানি

নামের রহস্য

হূদ ﷺ ছিলেন একজন নবি। আল্লাহ তাআলা তাকে ইয়ামানের 'আহকাফ' নামক অঞ্চলে পাঠিয়েছেন—আদ জাতির কাছে। এ-সূরায় ৫০-৬০ নং আয়াতে হূদ ﷺ-এর দাওয়াত ও আদ জাতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে 'হূদ'।

মেজর থিম

০১. ঈমান নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগার পরিণাম। অহংকারের পরিণতি।

০২. প্রত্যেক আত্মাকে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

০৩. আদ ও সামুদ জাতির ইতিহাস ও শিক্ষা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই মহান আল্লাহ তাআলার দুটো গুণবাচক নাম এসেছে—“মহাজ্ঞানী, সব-বিষয়ে সচেতন।” অর্থাৎ মানুষ কোথায় কী করছে, আল্লাহ ছাড়া আর কার দাসত্ব করছে, এসব বিষয়ে তিনি একটুও উদাসীন নন। আর সূরার শেষেও এই বিষয়টির ওপরই ফোকাস করা হলো— “সুতরাং তোমরা তাঁর দাসত্ব করো আর তাঁর ওপরই ভরসা করো; তোমরা যা করছো, সে-সম্পর্কে তোমার রব উদাসীন নন।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ইউনুস। যা শেষ হয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী দিয়ে—“তোমার কাছে যে ওহি পাঠানো হয়, তুমি সেটা অনুসরণ করো।” আর সেই ওহি কী, কার পক্ষ থেকে কীভাবে এসেছে—এসব বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে সূরা হূদ।

শানে নুযুল

সূরা হূদ ও সূরা ইউনুস কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়েছে। সূরা ইউনুস-এ মুশরিকদেরকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন উপদেশ। নানা যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন—তোমরা যা করছো, তা সঠিক নয়। তবু মুশরিকরা বিরোধিতা করতেই লাগল। কোনোভাবেই তারা ইসলামের দিকে ঝুঁকছে না। তখন সূরা হূদ-এ আল্লাহ ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ ভঙ্গিতে কথা বললেন। ‘তোমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাও, তাওবা করে তাঁর দিকে ফিরে আসো’ ইত্যাদি। অর্থাৎ সরাসরি হুকুম দিয়েছেন এই সূরাতে। কোনো ধরনের নমনীয়তা ছিল না শাস্তি ঘোষণার ক্ষেত্রেও। তুমি যে-ই হও না কেন, যার সন্তান-ই হও না কেন, আল্লাহর অবাধ্য হলে কেউ-ই বাঁচাতে পারবে না। যেমন করে শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি নূহের স্ত্রী-সন্তান ও লূতের স্ত্রী। আবার এই নবিরাও যখন বুঝতে পারলেন, তাদের পরিবার-পরিজন কিছুতেই তাদের দলে শামিল হবে না, তখন তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ওদের থেকে। এই সূরাতে আল্লাহ এই শিক্ষা দিলেন যে—ঈমান ও কুফর কখনো একসাথে থাকতে পারে না। ঠিক বদরের ময়দানেও এই দৃশ্যই আমরা দেখতে পাই। যেখানে বাবা-ছেলে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে। আর এরপরও যারা কুফরের পথে পড়ে থাকবে, তাদেরকে ভীষণ আযাবের ভয় দেখিয়ে সূরাটি নাযিল করা হয়েছে। শাস্তির কথা এসেছে অন্যান্য সূরাতেও। তবে সূরা হূদ-এ তা এসেছে আরও শক্ত ও স্পষ্ট রূপে।

(দেখুন—বুখারি, ২৭৫৩; মুসলিম, ২০৬)

সেগমেন্ট

সত্য-পথ অনুসরণ

যত কঠিন সময়ই আসুক, হিদায়াতের ওপর টিকে থাকতে হবে।

অতীত মানুষদের দেখে শেখা

হিদায়াতের পথ ছেড়ে দিলে পরিণতি কেমন হয়, অতীত জাতিগুলোর কাছ থেকে সেই শিক্ষা নিতে হবে।

রবের করুণা

রবের ক্ষমার দরজা সব সময় খোলা। তাই ভুল করে ফেললে, হতাশ না-হয়ে দ্রুত তাওবা করতে হবে।

ফজিলত

আবু বকর ﷺ একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার তো চুল পেকে গিয়েছে!' রাসূল ﷺ জবাবে বললেন: 'হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকভীর—এই সূরাগুলো আমার চুল পাকিয়ে দিয়েছে'। (তিরমিযি, ৩২৯৭, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ আসে, আবার তাঁর পক্ষ থেকেই কখনো তা উঠিয়ে নেওয়া হয়;

তাই উভয় অবস্থাতেই বান্দার উচিত—আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করা।

গতিপথ

১. ঈমান আনার আহ্বান
ঈমান আনতে হবে এক আল্লাহর ওপর। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না। মানতে হবে তাঁর কুরআন ও রাসূলকেও।

২. কয়েকজন নবি ও তাঁদের জাতির ঘটনাপ্রবাহ
বেশ ক'জন নবির ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের জাতির লোকেরা কীভাবে তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তুলে ধরা হয়েছে সে-ইতিহাসও।

সেন্ট্রাল থিম
নবি-জীবনে পরীক্ষা ও মানুষের পরিণতি

৩. বাধা ও পরীক্ষার মুখে তাঁদের অবিচলতা
তবে নবিরা সকল বাধার দেয়াল ডিঙিয়েছেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁরা আল্লাহর ওপর ভরসা রেখেছেন।

৪. জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করানো
গোটা সূরাতেই আল্লাহ বারবার পরকালের প্রসঙ্গ টেনেছেন। মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছেন শেষ বিচার-দিনের কথা, নিজ নিজ কর্মের প্রতিদানের কথা।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মুশরিকদের জন্য রাখা আছে ভীষণ শাস্তি। আর ঈমানদারদের জন্য আছে বিরাট পুরস্কার। এই দু-দলের পরিণতি এক হবে না।	১-১১	ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে সুসংবাদ নিয়ে এল ফেরেশতারা। ওদিকে লূত ﷺ-এর জাতি মজে রইল জঘন্য পাপে।	৬৯-৮৩
আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের অবস্থান বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।	১২-২৪	শুআইব ﷺ নিজ জাতিকে আল্লাহর দিকে ডেকেছিলেন। কিন্তু অবাধ্যতায় ওদের ওপর নেমে এসেছিল আল্লাহর গযব।	৮৪-১০১
নূহ ﷺ-এর জাতি আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়নি। তাদের যত সন্দেহ ছিল, তা যুক্তির মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।	২৫-৩১	নিজেদের কাজ-কর্মের দরুন মানুষ দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়—(১) আল্লাহর অবাধ্য, (২) আল্লাহর অনুগত।	১০২-১০৯
আল্লাহর আদেশে একটি জাহাজ বানিয়ে, ঈমানদারদের নিয়ে তাতে নূহ ﷺ-এর উঠে পড়ার কাহিনি।	৩২-৪৯	ইহুদিদের সীমা লঙ্ঘনের প্রবণতা চিরন্তন। অন্যায় দেখে চুপ থাকলে, প্রশ্রয় পেয়ে সেই অন্যায় আরও বেড়ে যায়।	১১০-১১৯
হূদ ও সালিহ ﷺ-এর সাথে তাঁদের জাতির লোকদের মধ্যকার ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	৫০-৬৮	এ-সকল নবিদের ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য—যাতে রাসূলের হৃদয় তরতাজা হয়, আর তিনি খুঁজে পান সান্ত্বনা।	১২০-১২৩

কেইস-স্টাডি

আদ জাতির ঘটনা নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করা উচিত। তারা হূদ ﷺ-কে বলল—আমাদের কত ক্ষমতা জানো না? বল-শক্তিতে আমরা দুনিয়ার অন্যসব জাতির চেয়ে আলাদা। আমাদেরকে কেন অন্য কারও কথা-মতো চলতে হবে? পরিণতিতে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করলেন। আমরাও কথায় কথায় 'উন্নয়ন' শব্দটা খুব প্রচার করি। দালান-কোঠা, ব্রিজ, রাস্তাঘাট, মেগা প্রজেক্ট—এগুলো নিয়ে আমাদের গালভরা বুলি ও অহংকারের শেষ নেই। অনেকটা যেন আদ জাতির মতোই। অথচ বাস্তবতা হলো, এসব বস্তুগত উন্নতি অধিকাংশ সময়ই মানুষকে অহংকারী বানিয়ে তোলে—ফলে সে আস্তে আস্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। যেহেতু এসব দুনিয়াবি উন্নতির বদৌলতে তার প্রয়োজন অনেকটাই মিটে যায়, অভাব দূর হয়, ফলে সে তার জীবনযাপনে আল্লাহর প্রয়োজনীয়তার কথাও ভুলতে বসে। তাই, অবকাঠামোগত উন্নয়নকে অত গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। ইউরোপীয়রা ধর্ম থেকে দূরে সরে যাবার পেছনে প্রধান কারণ—তাদের দুনিয়াবি জীবনযাপন খুব উন্নত। মনে রাখবেন, আল্লাহকে ভুলে গিয়ে ধনী হবার চাইতে আল্লাহওয়ালা হয়ে গরিব থাকাও ঢের ভালো। চূড়ান্ত সফলতা ওটাই। (দেখুন—মুসলিম, ২৫৬৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরায় নবি নূহ ﷺ-এর ঘটনা খুব বিস্তারিত কলেবরে এসেছে। নূহ ﷺ ৯৫০ বছর তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা ঈমান আনল না। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার—সাড়া-না-দেওয়া লোকেদের মাঝে ছিল নবির নিজের ছেলেও। বোঝাবার কোনো কমতি তিনি করেননি, তবু সেই পুত্র ঈমান আনবে না। শেষকালে প্লাবন যখন একেবারে ঘনিয়ে এল, নূহ ﷺ শেষবারের মতো ছেলেকে সাবধান করলেন। কিন্তু ছেলে তখনো গোঁ ধরে রইল। ঈমান সে আনল না। বেঈমান অবস্থায় ডুবে মরল প্লাবনে। এ ঘটনা আমাদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা। হিদায়াত খুব দামি বিষয়—তাই নিজের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন। কোনো ওলি-আউলিয়া চাইলেই যদি কেউ হিদায়াত পেয়ে যেত, তবে আর নূহ ﷺ-এর ছেলেকে বেঈমান হয়ে মরতে হতো না। তাই সব সময় নিজের হিদায়াতের ওপর টিকে থাকার জন্য নিজেকেই চেষ্টা-ফিকির করতে হবে। আরেকটা শিক্ষা হচ্ছে—সন্তানদের পেছনে সব সময় লেগে থাকা চাই। দেখুন, নূহ ﷺ নবি হয়েও কিন্তু বসে থাকেননি। বরং তিনি ছেলের সংশোধনের জন্য চেষ্টা জারি রেখেছেন। আমাদের অনেক বাবা-মা মনে করেন—তার ছেলে বা মেয়েটা একেবারে সহজ-সরল। ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। কথায় কথায় বলে—'আমাদের মেয়ে ওরকম না। ও আর সব ছেলে-মেয়ের চেয়ে আলাদা।' সন্তানের ব্যাপারে এরকম ভাবাটা আত্মঘাতী। বরং সব সময় ওর হিদায়াত নিয়ে ভাবতে হবে। চাল-চলন ও স্বভাব-চরিত্রের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। ভালো কাজে উৎসাহ দিতে হবে। আর দু-হাত তুলে দুআ করতে হবে রবের দরবারে।

(দেখুন—বুখারি, ৫২০০; মুসলিম, ১৮২৯; তিরমিযি, ১৯৫২)

সূরা ইউসুফ

سُوْرَةُ يُوْسُفَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫৩ নং সূরা। এর আগে সূরা হূদ ও পরে সূরা হিজর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১২-তম সূরা। এর আগে আছে সূরা হূদ ও পরে আছে সূরা রা'দ।

এক নজরে ইউসুফ

- মাক্কি যুগের শেষ বছরে নাযিল
- সূরা নং: ১২
- আয়াত: ১১১
- মাক্কি

নামের রহস্য

এই সূরার প্রায় পুরোটা জুড়ে জায়গা পেয়েছে নবি ইউসুফ ﷺ-এর ঘটনা। কুরআনের আর কোথাও এমনটা দেখা যায় না যে, গোটা একটি সূরাই বিশেষ একটি ঘটনা বর্ণনার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নবি ইউসুফ ﷺ-এর জীবনী বেশ ঘটনাবহুল ও শিক্ষণীয়। ভীষণ পরীক্ষা ও চড়াই-উতরাই পার হয়ে তিনি পেয়েছেন নুবুওয়াত ও রাষ্ট্রক্ষমতা। তো, এ-সূরায় যেহেতু বিশেষভাবে ইউসুফ ﷺ-এর একার ঘটনা জায়গা পেয়েছে, তাই সূরার নামও হয়ে যায় 'সূরা ইউসুফ'।

মেজর থিম

০১ ইউসুফ ﷺ-এর স্বপ্ন। ভাইদের হিংসা ও ষড়যন্ত্র।

০২ নতুন জায়গায় আশ্রয়। আসন্ন বিপদ ও কারাবাস।

০৩ আল্লাহর সাহায্য ও কারামুক্তি। রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন ও স্বপ্ন সত্যে পরিণত।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন: "অতীত নবি-রাসূলদের ঘটনাগুলো আমি তোমাকে সঠিকভাবে জানাচ্ছি।" আর সেইসব ঘটনার শেষে তিনি জানালেন, "নবি-রাসূলের ঘটনাগুলোতে বুদ্ধিমানদের জন্য পরম শিক্ষা আছে।" এই আয়াতটির মাধ্যমে শুরু-শেষের আলোচনায় সূরাটি পূর্ণতা পেয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা হূদ। তার শেষদিকে বলা হয়েছে, "রাসূলদের ঘটনাগুলোর দরকারি অংশ আমি তোমাকে শোনাই। এর মাধ্যমে তোমার ঈমান বাড়িয়ে দিই।" আর এ-সূরার শুরুতে বলা হয়েছে, "অতীতের ঘটনাগুলো আমি তোমাকে সঠিকভাবে জানাচ্ছি। তুমি কিন্তু আগে এগুলো জানতে না।"

শানে নুযুল

নবিজির মাক্কি জীবনের শেষ-দিনগুলোতে নাযিল হয় এ-সূরা। ততদিনে মক্কার মুশরিকরা ওদের ষড়যন্ত্র অনেকটাই পাকাপাকি করে ফেলেছে যে, নবিজিকে ওরা হত্যা করবে, অথবা দেশ-ছাড়া করবে, আর না-হয় জেলে বন্দি করে রাখবে। সেই সময় ফন্দি করে কয়েকজন মুশরিক এল নবিজির কাছে। নবিজিকে আটকাতে ওরা জিজ্ঞেস করল: 'তুমি যদি সত্যিকার নবি হয়ে থাকো, তা হলে বলো তো, ইয়াকুব নবির সন্তানরা কী করে ফিলিস্তিন ছেড়ে মিশরে গেল? ঘটনাটা কী?' ওরা ভেবেছিল, নবিজি ওদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হিমশিম খাবেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য প্রমাণ করলেন। নাযিল করলেন গোটা একটি সূরা। আল্লাহ শুধু মুশরিকদের জিজ্ঞাসার জবাব দেননি, বরং ঘটনার ধারা-বিবরণীটাও মুশরিকদের সাথে কেমন খাপ খাইয়ে দিলেন—'মুশরিকরা, ইউসুফের ভাইরা মিলে যেমন ইউসুফকে হত্যা অথবা দেশ-ছাড়া করার প্ল্যান করেছিল, তোমরাও আমার নবির বিরুদ্ধে সেই একই ষড়যন্ত্র করছো!' এভাবে একদিকে যেমন ওদের জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন, অপরদিকে ওদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়ে, ওদেরকে বড়সড় একটা ধাক্কাও দিলেন।

তবে এ-সূরার অন্য একটি শানে নুযুলও এসেছে তাফসীরের কিতাবে। কুরআন নাযিল শুরু হওয়ার পর প্রায় ১২ বছর কেটে গেল। একদিন কিছু সাহাবি বললেন—'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদেরকে যদি দু-একটি ঘটনা শোনাতেন!' সাহাবিদের ঘটনা শুনবার এই তৃষ্ণা মেটাতেই নাযিল হয় সূরা ইউসুফ।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ৯/১১৮; বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১০/২)

সেগমেন্ট

পরীক্ষা

একের-পর-এক পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন নবি ইউসুফ ও তাঁর বাবা ইয়াকুব ﷺ।

আল্লাহর পরিকল্পনায় ভরসা

প্রতিবারই তাঁরা নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে—'নিশ্চয় আল্লাহর পরিকল্পনা সর্বোত্তম।'

সম্মান ও মুক্তি

আল্লাহর ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখায়, আল্লাহ তাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন।

ফজিলত

একবার এক লোক এল নবিজির কাছে। এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন পড়িয়ে দিন'। নবিজি তখন তাকে বললেন, 'যে সূরাগুলোর শুরুতে আলিফ-লাম-রা আছে, সেগুলো থেকে তিনটা পড়ো।' (আবু দাউদ, ১৩৯৯; ইবনু হিব্বান, ৬১৮৮, সহীহ)। তো সেরকম একটি সূরাই হলো সূরা ইউসুফ। এটি একটি পরিপূর্ণ—তথা কমপ্রিহেনসিভ—সূরা। এতে একদিকে যেমন আল্লাহর ওপর পুরোপুরি ভরসা করার নানান উদাহরণ উঠে এসেছে, অপরদিকে এতে আছে তাওহীদ—তথা অসংখ্য 'রবের' গোলামি বাদ দিয়ে এক আল্লাহর গোলামি করার ঘোষণা।

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

যেকোনো আপদ-বিপদে যদি কোনো অভিযোগ-অনুযোগ ছাড়া উত্তমভাবে ধৈর্য ধরা যায়;

তবে আশা করা যায়—আল্লাহ সম্মানের সাথে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার রাস্তা করে দেবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর নিখুঁত প্ল্যান (অন্ধকার-কূপ থেকে রাজ-সিংহাসনে)।

১. স্বপ্ন
আল্লাহ তাআলা ইউসুফ ﷺ-কে একটি স্বপ্ন দেখালেন। সেই স্বপ্নের মাঝে ছিল নবি ইউসুফ ও ইয়াকুব ﷺ-এর জন্য বিশেষ ইঙ্গিত।

২. আল্লাহর পরিকল্পনা বোঝা
প্রত্যেকটি কঠিন পরীক্ষায় তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন। কেননা, তিনি বুঝতে পারছিলেন—যা কিছু চোখে ঘটতে দেখছেন, তার আড়ালেও কিছু ঘটছে।

৩. ক্ষমার মাহাত্ম্য
আল্লাহর পরিকল্পনায় ভরসা রাখবার একটা আলামত হলো—প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া।

৪. সময় বা টাইমিং
ইয়াকুব ﷺ তীব্র মানসিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও, আসমানি ফায়সালার অপেক্ষায় ছিলেন। তাড়াহুড়ো করেননি। তিনি জানতেন, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগে কিছুই ঘটবে না।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
পবিত্র কুরআন হলো সঠিক ইতিহাস জানার সর্বোত্তম উপায়।	১-৩	ইউসুফ ﷺ-এর সাথে তাঁর ভাইদের সাক্ষাৎ। ভাইয়েরা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ইউসুফ ﷺ ভাইদের ক্ষমা করে দেন।	৫৮-৯৮
ছেলেবেলায় ইউসুফ ﷺ-এর দেখা স্বপ্ন, তাঁকে নিয়ে তাঁর ভাইদের চক্রান্ত ও তাঁকে কুয়ায় নিক্ষেপ।	৪-১৮	সবশেষ তিনি তাঁর পুরো পরিবারকে মিশরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। এভাবেই বনী ইসরাঈল মিশরে বসতি গড়ে।	৯৯-১০১
ঘটনাক্রমে মিশরের ক্ষমতাসীনের পরিবারে আশ্রয় লাভ। তবে তার স্ত্রীর ছলনা ও চক্রান্তের কারণে ভীষণ পরীক্ষার মুখোমুখি।	১৯-৩৪	ইউসুফ ﷺ-এর এই বিস্ময়কর ঘটনা নবি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতের জন্য বিরাট এক দৃষ্টান্ত।	১০২-১০৪
নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও ইউসুফ ﷺ-কে পাঠানো হয় কারাগারে। সেখানে দুজন যুবককে তাওহীদের দাওয়াত।	৩৫-৪২	মুশরিকদের নানান অযৌক্তিক কথা-বার্তা খণ্ডন করা হয়েছে।	১০৫-১১০
কারাগারে বসে ইউসুফ ﷺ সম্রাটের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর জেল-মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।	৪৩-৫৭	কুরআনে-বর্ণিত ঘটনাসমূহ হলো মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। আর সে-কথা বলবার মাধ্যমে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।	১১১

কেইস-স্টাডি

ইউসুফ ﷺ-এর ভাইদের মনে হলো, বাবা তাদের ছোট ভাই ইউসুফকে বেশি আদর করেন। তা ছাড়া ইউসুফ ﷺ মার্জিত চরিত্রের অধিকারী ও পরিপাটি ছিলেন। এসব দেখে অন্য ভাইদের খুব হিংসে হতো। তারা সিদ্ধান্ত নিল—ইউসুফকে হত্যা করবে অথবা কুয়ায় ফেলে দেবে। চিন্তা করুন—নিজের ভাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র! তার মানে—হিংসা মানুষকে অনেক নিচে নামিয়ে আনে। ভালো-মন্দের বুঝ নষ্ট করে দেয়। তাই হিংসা থেকে দূরে থাকুন। একটি সমাজ আগা-গোড়া ধ্বংস করার জন্য আর কিছু দরকার নেই, কয়েক ফোঁটা হিংসার বিষই যথেষ্ট।

(দেখুন—আবু দাউদ, ৪৯০৩; তিরমিযি, ২৩৭৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

ইউসুফ ﷺ-এর ঠাঁই হলো মিশরের রাজ-প্রাসাদে। বছর-কয়েক যেতেই তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল মিশরের ক্ষমতাধর ব্যক্তির স্ত্রী। তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য একের-পর-এক অপচেষ্টা চালাতে লাগল। ইউসুফ ﷺ কিন্তু এই মহিলার খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। শেষে আল্লাহর করুণায় বেঁচেও গেলেন। এই ঘটনা থেকে আমরা ইঙ্গিত পাই—চাহিদার সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়া মোটেও মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয়। মুমিনরা আল্লাহর ভয়ে নিজের কামনা-বাসনা দমিয়ে রাখে। আর এই উত্তম চরিত্রের কারণেই ইউসুফ ﷺ গোটা একটি জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছিলেন। তাঁর সম্মানও অনেক অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই, মুসলিমরা যদি বিজয়ের স্বপ্ন দেখে—তবে তাদেরকেও প্রতিনিয়ত চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের চেষ্টা করে যেতে হবে।

(দেখুন—বুখারি, ৬৬০, ১৪২৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৮৯৫২)

কুরআন কোনো সাধারণ বই নয়। কুরআন তার পাঠকদের সাথে কথা বলে। কখনো কাঁদায়, কখনো ভাবায় ভীষণভাবে। এটি ইতিহাসের বিশুদ্ধতম দলিল। তবে এর ইতিহাস যেনতেন ইতিহাস নয়। বরং প্রতিটি বাক্যের পরতে পরতে আছে শিক্ষা। এই গোটা সূরাতে আল্লাহ তুলে ধরলেন নবি ইউসুফ ﷺ-এর ইতিহাস। তবে এমনভাবে তুলে ধরলেন—যাতে কোথাও অস্পষ্টতা না থাকে। বরং পাঠক এর থেকে খুঁজে পায় চমৎকার নৈতিক শিক্ষা। আবার, এখানে এত বেশি গল্প করা হলো না—যাতে পাঠকের মনোযোগে ঘাটতি আসে, বা পরে সে ভুলে যায়। কুরআনের স্টাইলই এটা। এখানে অযথা ইনফরমেশনের ভিড় থাকে না। আবার মূল ম্যাসেজটা পৌঁছুবার ক্ষেত্রেও কোনো জটিলতা তৈরি হয় না। কুরআনের এই স্টাইলটা আমাদের জন্য রপ্ত করা জরুরি—বিশেষ করে যারা ইতিহাস নিয়ে রাতদিন কাটান।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৯০৬)

সূরা রা'দ

سُوْرَةُ الرَّعْدِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯৬-তম সূরা। এর আগে সূরা মুহাম্মাদ ও পরে সূরা আর-রহমান নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ইউসুফ ও পরে সূরা ইবরাহীম।

এক নজরে রা'দ

- মাক্কি যুগে নাযিল, কিছু আয়াত মাদানি যুগে।
- সূরা নং: ১৩
- আয়াত: ৪৩
- মাক্কি মাদানি

নামের রহস্য

'রা'দ' অর্থ 'বজ্রধ্বনি'। এ-সূরার ১২ ও ১৩ নং আয়াতে বজ্রধ্বনি নিয়ে আলোচনা জায়গা পেয়েছে। বলা হয়েছে: 'তিনিই তোমাদেরকে বিজলি চমক দেখান, ভয় ও আশা জাগাবার জন্য। তারপর নিয়ে আসেন ভারী মেঘমালা। তাঁর ভয়ে ভীষণ ভীত হয়ে বজ্রধ্বনি ও ফেরেশতারা তাঁর প্রশংসা জানায়, সাথে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে।' তো এখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে 'রা'দ'।

মেজর থিম

০১. বিশ্ব-জগতের প্রতি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। কুরআনের বিস্ময়কর শক্তি।

০২. দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবার গুরুত্ব।

০৩. গুনাহের পরও বান্দাকে ছাড় দেওয়ার কারণ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়—"তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা নাযিল করা হয়েছে, তা সত্য; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ একে সত্য বলে মানছে না।" তবে তারা না মানলেও, স্বয়ং আল্লাহ এ-ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে আছেন। এ ছাড়া যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে, তারাও সাক্ষী। সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ এ-বিষয়টিই জানালেন আমাদেরকে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ইউসুফ। যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "মহাকাশ ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন আছে, যেগুলোর পাশ দিয়ে তারা চলাফেরা করে, অথচ সেগুলোর ব্যাপারে তারা উদাসীন।" অতঃপর এই সূরায় এসে সেই নিদর্শনগুলোর মধ্যে থেকে কিছু নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করলেন তিনি।

শানে নুযুল

মক্কায় দিন যতই যাচ্ছে, মুমিনদের অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা একের-পর-এক বার্তা পাঠাচ্ছেন। তাঁর রাসূল ﷺ মুশরিকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন। কিন্তু মুশরিকরা বারবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মুমিনরা সে-সময় ভাবতে লাগল—এমন অলৌকিক কিছু যদি ঘটত, যা দেখে এরা ঈমানদার হয়ে যেত। তখন আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, এখন আর এই রীতি কার্যকর না। আর কার্যকর থাকলেও, কোনো লাভ হতো না। কবর থেকে মরা মানুষ উঠে এসে এদের সাথে কথা বললেও, এরা ঈমান আনবে না। জাদু বা অন্যকিছু বলে পাশ কাটিয়ে যাবে। তবুও এই সূরা নাযিল হয় মুশরিকদেরকে নসিহত করতে, বোঝাতে, ঈমানের পথে উঠে আসার আহ্বান জানাতে। মুহাম্মাদ ﷺ যে সত্য নবি, আল্লাহ এ-কথা তুলে ধরেছেন। তাদেরকে পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। আর এই বোঝানোর ফাঁকে ফাঁকে দিয়েছেন কিছু সতর্কবাণী। মোটকথা, তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা দিতেই এ-সূরাটি নাযিল হয়। এভাবে বোঝানোর পরও কেউ যদি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা হলে তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের দাউদাউ করা আগুন। আল্লাহ আরও জানালেন—অনেকগুলো বছর মুসলিমরা যে কষ্ট স্বীকার করেছে, তাদেরকে এর পুরস্কার তিনি পরকালে দেবেন। এই আশ্বাস মুমিনদের প্রশান্তি দেয়।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১০/২৬২)

সেগমেন্ট

আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

এই যে মহাবিশ্ব, তাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর অগণিত সৃষ্টি—তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা।

ঈমানের মজবুতি

আল্লাহর এসব সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ফলে—ঈমান তাজা আর মজবুত হয়।

ধৈর্য ও পুরস্কার

ঈমান যত মজবুত হবে, কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরাও তত সহজ হবে। আর ধৈর্যের পুরস্কার তো বিশাল।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, তাদেরকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা রা'দ। (দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শেখান।' নবিজি বললেন, 'যে সূরাগুলোর শুরুতে আলিফ-লাম-রা আছে, সেরকম তিনটি সূরা পড়ো।' সূরা রা'দ এমন সূরাগুলোর মাঝে অন্যতম।

(আবু দাউদ, ১৩৯৯; ইবনু হিব্বান, ৬১৮৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

যে আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে, আপনি তার সাথে সুন্দর আচরণ করুন;

এতে আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করবেন, পরকালে আপনার জন্য থাকবে চমৎকার বাসস্থান।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
কুরআনের বার্তা

১. ওহির ভূমিকা
ওহি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে শেখায়।

২. সতর্কবার্তা
না-দেখা যে জগৎ—তথা পরকাল আর জান্নাত-জাহান্নাম—এর ব্যাপারে সাবধান করে।

৩. ঈমানি শক্তির উৎস
কুরআন মানুষের মনোবল ও ঈমানি শক্তির উৎস। যত বেশি কুরআন পড়া যাবে, জালিমের ভয় ততই ঠুনকো মনে হবে।

৪. প্রজ্ঞার একমাত্র উৎস
দুনিয়ার অন্য কোনো জ্ঞান মানুষকে প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ বানাতে পারে না। এটা শুধুমাত্র কুরআনের দ্বারাই সম্ভব।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআনের সত্যতা ও আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে।	১-৪	মুমিনের পুরস্কার, রাসূল ﷺ-এর মিশন ও কুরআন-সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে।	২৯-৩০
পরকালের ব্যাপারে মুশরিকদের অবিশ্বাসের ব্যাপারটিকে তুলে ধরা হয়েছে।	৫-৭	কাফিরদের আচরণের ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিক্রিয়া ও তাদের পরিণতি জানানো হয়েছে।	৩১-৩৪
আল্লাহর জ্ঞান চারিদিকে বিস্তৃত। তাঁর ক্ষমতাও অসীম। সবকিছু তাঁরই বেঁধে-দেওয়া নিয়মের অধীন।	৮-১৬	জান্নাতের বর্ণনা, মুমিনদের পরিণতি, অবিশ্বাসীদের অবস্থা ও রাসূলের প্রতি সতর্কবাণী আলোচিত হয়েছে।	৩৫-৩৭
মুমিন আর কাফির—উভয় শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি আলোচনা করা হয়েছে।	১৭-২৫	যেকোনো আসমানি কিতাবের যেকোনো আয়াত বাতিল করা বা চালু রাখার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর।	৩৮-৩৯
মহামহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান ও নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।	২৬-২৮	রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর অন্তরে সাহস জোগানো হয়েছে।	৪০-৪৩

কেইস-স্টাডি

এ-সূরায় বলা হয়েছে: 'কেবল তাঁর কাছেই সত্যিকার অর্থে সাহায্য-প্রার্থনা করা যায়।' অর্থাৎ মানুষ আন্তরিকভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে পারে। এরপর বলা হয়েছে: 'কাফিরদের দুআ বা সাহায্য চাওয়া পুরোপুরি নষ্ট ও বাতিল।' কেননা, ওরা মন থেকে আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেয় না। সাহায্য-প্রার্থনা করে বাতিল ইলাহদের কাছে। কাফিরদের এই কার্যকলাপ নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এটা আমাদের জন্য ইঙ্গিত যে—আমাদের ইবাদাত ও আত্মসমর্পণ খাঁটি করে নেওয়া দরকার। নিজেকে প্রশ্ন করি চলুন—আমার যতটুকুই ইবাদাত, সবটুকু কি আল্লাহর জন্য? আমি কি নামাজ পড়ি কেবল আল্লাহর জন্য? আমার দান-সাদাকা কি কেবল আল্লাহর কাছে ভালো হওয়ার জন্য? আমার ওয়াজ-নসিহত কি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য? যদি উত্তর হয় 'হ্যাঁ'—তবে আল্লাহ আমাদরকে অবিচল রাখুন। আর যদি উত্তর হয় 'না', তা হলে এই মুহূর্তে নিজেকে বদলে ফেলা জরুরি। নিজের আমলটুকু ভেজালমুক্ত করে নেওয়া জরুরি।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৩৬৩৬; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ৪১৩৫)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে: জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়গুলো প্রশান্ত হয়, স্থিরতা লাভ করে। এই একটি আয়াত নিয়ে ভাবলে একজন মানুষের গোটা জিন্দেগি বদলে যেতে পারে। আমাদের মন খারাপ হলে আমরা কত রকমের সমাধান খুঁজি। কিন্তু কোনো সমাধানই কাজ করে না। দু-চারদিন হয়তো মন খারাপটা একপাশে থাকে, কিন্তু তারপরই আবার জেগে ওঠে। এমনটাই হবার কথা। আল্লাহ নিজেই যেখানে বলে দিয়েছেন—হৃদয়গুলো কেবল আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্ত হয়, সেখানে অন্য কোনো চিকিৎসা কাজ করবে না, তা-ই তো স্বাভাবিক। সুতরাং, যখনই আপনার মনটা অকারণ অস্থির হয়ে পড়ে, তখনই কুরআন তিলাওয়াত করুন বা নামাজে দাঁড়িয়ে যান। দেখবেন—জীবনটাকে মনে হবে, শিশির-ভেজা এক সতেজ সকাল।

(দেখুন—বুখারি, ৬৪০৭; মুসলিম, ৭৭৯)

সূরার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ যাকে চান, তার জীবিকায় প্রশস্ততা দেন, আবার (যাকে চান) সংকুচিত করে দেন।" এই একটি আয়াত আপনার পুরো মাইন্ডসেট বদলে দিতে পারে। রিযিকের পেছনে আমরা কেবল ছুটেই চলেছি। কীভাবে আরও দুটো পয়সা ইনকাম করা যায়, সেই চিন্তা আমাদের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে সব সময়। এদিকে আমল নেই, যিকির নেই। কিন্তু, এমন কর্মকাণ্ড তো মুসলিমের শোভা পায় না। আমরা অবশ্যই রিযিকের তালাশ করব। কারণ আল্লাহই আমাদেরকে এমনটা আদেশ করেছেন। আর, রিযিকের প্রশস্ততাও তো আল্লাহর হাতেই। তিনি যাকে চান, তার জীবিকায় প্রশস্ততা দেন। তাই আমলের ওপর জোর দেওয়া জরুরি।

(দেখুন—বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ৪১৪২; তিরমিযি, ২৪৬৫)

সূরা ইবরাহীম

سُوْرَةُ إِبْرٰهِيْمَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭২-তম সূরা। এর আগে সূরা নূহ ও পরে সূরা আম্বিয়া নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১৪ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা রা'দ ও পরে সূরা হিজর।

এক নজরে ইবরাহীম

- মাক্কি যুগের শেষদিকে নাযিল
- আয়াত: ৫২
- সূরা নং: ১৪
- মাক্কি

নামের রহস্য

ইবরাহীম ﷺ যখন তার স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে মক্কার ধু-ধু মরুভূমিতে রেখে এলেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে এক হৃদয়গ্রাহী দুআ করেছিলেন। ইবরাহীম ﷺ-এর দুআটি বিস্তারিত জায়গা পেয়েছে এ-সূরার ৩৫-৪১ নং আয়াতে। সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে 'ইবরাহীম'।

মেজর থিম

০১. ওহি নাযিলের উদ্দেশ্য।

০২. কিয়ামাতের দিন শয়তানের কর্মকাণ্ড।

০৩. আল্লাহর-দেওয়া অগণিত জীবিকা ও নিয়ামাত।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা কুরআনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। যেখানে দেখানো হয়েছে—আঁধার থেকে মানব-জাতিকে আলোতে নিয়ে আসার উপকরণ হলো কুরআন। আর শেষ আয়াতে কুরআনের সাথে মানব-জাতির সম্পর্ক বর্ণনার মাধ্যমে সূরাটি সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের আলোচনা দিয়ে শুরু, কুরআনের আলোচনা দিয়েই শেষ।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা রা'দ। যার শেষে বলা হয়েছে, "সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ ও যাদের কাছে আসমানি কিতাবের জ্ঞান আছে, তারাই যথেষ্ট।" আর সূরা ইবরাহীমও শুরু হলো ওই কিতাবের আলোচনা দিয়েই। আল্লাহ যেখানে কুরআনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

শানে নুযুল

মাক্কি যুগের শেষদিককার সূরাগুলোর মতো এই সূরাটিও একই সুতোয় গাঁথা। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানানোই এসব সূরার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলাদি পেশ করা তো আছেই। সেই সাথে তুলে ধরা হয় আগেকার জাতিগুলোর ইতিহাস। সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলা হয়—আগেকার জাতির লোকেরা তাদের নবিকে সত্য বলে মেনে নেয়নি। ফলে তারা পুরো জাতি-সহ ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন তোমরাও যদি সেই একই কাজ করো, তোমাদের পরিণতিও তাদের মতোই হবে। তাই রাসূলকে মেনে নাও। রাসূলের ওপর ঈমান আনলে, আল্লাহর ওপর ঈমান আনা হবে। কিন্তু যদি তা না করো, তবে ভয়ংকর শাস্তি তোমাদের অপেক্ষায়। মূলত বেঈমানদেরকে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দেবার জন্যই আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১০/৩৬৯)

সেগমেন্ট

সঠিক পথ ও জ্ঞানের উৎস

সঠিক পথ হলো ইসলাম। আর সঠিক জ্ঞানের উৎস—আল-কুরআন, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে।

সকল নবির এক দাওয়াত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

মানুষকে আলোর পথে টেনে তুলতে প্রত্যেক নবি-রাসূল একই দাওয়াত দিয়েছেন—বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; তোমরা সফল হয়ে যাবে।

আল্লাহর ব্যাপারে যা ভাবা যাবে না

আল্লাহর ব্যাপারে এই কথা চিন্তা করা যাবে না—অবাধ্যরা যা করছে, আল্লাহ সে-সম্পর্কে বেখবর, আর তিনি তাঁর রাসূলদের সাথে-করা ওয়াদা ভেঙে ফেলবেন।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, তাদেরকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা ইবরাহীম।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শেখান।' নবিজি বললেন, 'যে সূরাগুলোর শুরুতে আলিফ-লাম-রা আছে, সেরকম তিনটি সূরা পড়ো।' সূরা ইবরাহীম এমন সূরাগুলোর মাঝে অন্যতম।

(আবু দাউদ, ১৩৯৯; ইবনু হিব্বান, ৬১৮৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

অর্থ বুঝে বুঝে নিয়মিত কুরআন পাঠ করুন,

এতে আল্লাহ আপনাকে আলোর পথ দেখাবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

কৃতজ্ঞতা বনাম অকৃতজ্ঞতা

১. কৃতজ্ঞতার সবক শেখায় আসমানি কিতাব
কুরআন-সহ সকল আসমানি কিতাবই মানুষকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে।

২. কৃতজ্ঞতায় পুরস্কার, অকৃতজ্ঞতায় শাস্তি
যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তাদের জন্য আছে বিরাট পুরস্কার। অপরদিকে অকৃতজ্ঞদের জন্য আছে মহা-শাস্তি।

৩. সকল নবির মিশন ও অবিশ্বাসীদের আচরণ
পৃথিবীতে যত নবি-রাসূল এসেছেন, সবাই এক মিশন নিয়েই এসেছেন। আর তা হলো—এক আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা। কিন্তু অকৃতজ্ঞ-কাফিররা নবিদের মুখের ওপর সেই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৪. কিয়ামাতের কিছু দৃশ্য ও শেষ পরিণতি
কিয়ামাতের দিন শাস্তির দৃশ্য দেখে বেঈমানদের চোখগুলো স্থির হয়ে যাবে। সেদিন প্রত্যেকের পাওনা আল্লাহ যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআন ও রাসূলের উদ্দেশ্য মানুষকে ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে হিদায়াতের আলোতে নিয়ে আসা।	১	জান্নাতে মুমিনদের ও জাহান্নামে কাফিরদের অবস্থার তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।	১৯-৩১
আল্লাহ সমস্ত পয়গম্বরকেই নিজ জাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন। ভুল পথে চলতে চাইলে, আল্লাহ সুযোগ দেন।	২-৪	মহাবিশ্বের ওপর আল্লাহর ক্ষমতা সীমাহীন। সেই সাথে সৃষ্টিজগতের ওপর তাঁর দয়াও অসীম।	৩২-৩৪
মানুষ কৃতজ্ঞতা আদায় করলে, তার নিয়ামাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর অকৃতজ্ঞতায় রয়েছে শাস্তি।	৫-৮	আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম ﷺ নিজ জাতিকে সকল শিরক ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেছিলেন।	৩৫-৪১
শত্রুর ব্যাপারে সমস্ত নবিই আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। তাই প্রতিটি যুগের দ্বীনের দাঈদেরও তা অনুসরণ করা উচিত।	৯-১৮	কিয়ামাত-দিবসের বিভীষিকার বর্ণনা। আল্লাহর বিরুদ্ধে চক্রান্তের চেষ্টা হবে নিষ্ফল ও অর্থহীন।	৪২-৫২

কেইস-স্টাডি

ইবরাহীম ﷺ-এর হৃদয়-কাড়া দুআটি আমাদের জন্য বিরাট বড় নিদর্শন। আল্লাহর প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ও বিনয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে তাঁর ভাবনা—প্রতিটিই আলাদা আলাদা ডাইমেনশন তৈরি করে। এই দুআ আমাদেরকে আমাদের নিজেদের দিকে ফিরে তাকাতে শেখায়। আমাদের দুআগুলোও কি এমন? আমরা কি আমাদের ও আমাদের সন্তানদের আত্মিক উন্নতি নিয়ে দুআ করি? নাকি আমাদের চাওয়াগুলো সব দুনিয়া-কেন্দ্রিক? ইবরাহীম ﷺ-এর দুআ আমাদেরকে দুনিয়া ও পরকাল—উভয় জগতের কল্যাণ চাওয়ার শিক্ষা দেয়। আমরা আমাদের সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কী নীতি-আদর্শ রেখে গেলাম, তা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শেখায়। আমরা কি তাদের অন্তর-আত্মার বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করি? তাদের হৃদয়ে ঈমানি বীজ বুনে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি? শুধু নিজেদের কথা মাথায় রাখলেই চলবে না, ছেলে-মেয়ে ও পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়েও ভাবা চাই।

(দেখুন—ইবনু মাজাহ, ৪২৬০; তিরমিযি, ২৪৫৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা এ-সূরার ২৪ থেকে ২৬ নং আয়াতে চমৎকার একটি উপমা হাজির করেছেন। তিনি বলেন: ‘তুমি কি ভেবে দেখোনি—আল্লাহ কীভাবে ভালো কথার উদাহরণ দেন? ভালো কথার উদাহরণ যেন একটি ভালো গাছ। গাছটির শেকড় মাটির অনেক গভীরে গাঁথা, এর ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। আর তার রবের আদেশে গাছটি সব-সময় ফল দিয়ে যাচ্ছে! আল্লাহ মানুষের সামনে এসব উদাহরণ তুলে ধরেছেন, যাতে তারা এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। আর খারাপ কথার উদাহরণ যেন একটা খারাপ গাছ, যেটাকে মাটি থেকে শেকড়-সহ উপড়ে ফেলা হয়েছে। ফলে ওটা কোনোভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।’ আল্লাহ নিজেই বলে দিলেন—মানুষ যাতে এই উদাহরণটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তাই এখন থেকে কিছু বলবার আগে চিন্তা করুন—আপনার কথাটি কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে, ভালো কথা নাকি খারাপ কথা? কথাটির শেকড় কি গভীরে গাঁথা? মানে, কথাটি কি সত্যিই কোনো অর্থ বহন করে, নাকি ফালতু আলাপ। এর ডালপালা কি আকাশে ছড়ানো? মানে, কথাগুলো কি আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? জান্নাতের ঠিকানা জানায়? আরও ভাবুন—কথাটি কি ভালো ফল বয়ে আনবে? মানুষকে কি কোনোভাবে উপকার করবে? যদি এই সবগুলোর উত্তর হয় ‘হ্যাঁ’, তবেই কথাটি বলুন। অন্যথায় নীরব থাকাটাই শ্রেয়।

(দেখুন—বুখারি, ৬১৩৮; মুসলিম, ৪৭)

কিছু শব্দ জানতেই হয়

আল-ক্বহ্হার
اَلْقَهَّارُ

‘ক্বহ্হার’ নামটির অর্থ: যিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। ক্বহ্হার নামটি এসেছে ক্বহর (قَهْرٌ) থেকে। আরবিতে ক্বহর বলতে কোনো প্রাণীকে পোষ মানানো বোঝায় (اَلرِّيَاضَةُ وَالتَّذْلِيْلُ)। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটা উটকে পোষ মানালেন, এখন সে পুরোপুরি আপনার নিয়ন্ত্রণে। আপনি বসতে বললে বসে, উঠতে বললে ওঠে। এমনকি, আপনি যদি উটটিকে কুরবানি করবার জন্য ছুরি হাতে নেন, সে আপনার দিকে গলা উঁচু করে দেবে। তো, কোনোকিছুর ওপর এরকম শতভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকেই বলে ক্বহর। আর সেখান থেকেই আল্লাহর ক্বহ্হার নামটি এসেছে। তার মানে—আসমান-জমিনের সবকিছু তাঁর নিয়মের অধীন। যত শক্তিশালী জিনিসই হোক না কেন—সূর্যের মতো সুবিশাল নক্ষত্র কিংবা সাগরের উত্তাল তরঙ্গ—সবই তাঁর হুকুমের সামনে নত। দুনিয়ার যত বড় ক্ষমতাধর শাসকই হোক, আর হোক যত বড় স্বৈরশাসক—আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে সে পারবে না। হয় সে নিশ্চিত ক্ষমতা হারাবে একদিন। অথবা মরণ এসে তার ঘাড় চেপে ধরবে। এভাবে কোনোকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে না।

(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ৩৮)

সূরা হিজর

سُوْرَةُ الْحِجْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫৪-তম সূরা। এর আগে সূরা ইউসুফ ও পরে সূরা আনআম নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ইবরাহীম ও পরে সূরা নাহল।

এক নজরে হিজর

- হিজরতের আগে নাযিল
- সূরা নং: ১৫
- আয়াত: ৯৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘হিজর’ একটি অঞ্চলের নাম। সেখানে বাস করত সামুদ জাতি। তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল নবি সালিহ ﷺ-কে। এই সূরার ৮০–৮৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে: হিজর অঞ্চলের লোকজন স্থাপত্য-বিদ্যায় নিপুণ কারিগর ছিল। কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য করায় তাদেরকে এক ভয়ানক শাস্তি এসে পাকড়াও করে। আল্লাহর সেই পাকড়াওয়ের সময়, তাদের এতসব বিদ্যা-বুদ্ধি কোনো কাজে আসেনি। সেখান থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘হিজর’।

মেজর থিম

০১ কুরআনের হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ। মানুষ ও জিন তাঁর সৃষ্টি।

০২ ইবলিসের অভিশপ্ত হবার ইতিহাস। মানুষকে ভুলপথে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা।

০৩ জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষা। হিজর জাতির ঘটনা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—যারা আল্লাহর বাণী অস্বীকার করে, তারা শীঘ্রই আফসোসে ডুবে যাবে। আর তারা যতই হাসি-তামাশা করুক, স্পষ্টভাবে সেই বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে—এমন আদেশ দেবার মধ্য দিয়ে আল্লাহ সূরাটি শেষ করেছেন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ইবরাহীম। যার শেষে কিয়ামাতের দিন কাফিরদের অবস্থা ও শাস্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর এই শাস্তি দেখে তাদের উপলব্ধি কী হবে, তা জানানো হলো সূরা হিজরের শুরুতে—"কাফিররা একসময় মন থেকে চাইবে যে, তারা যদি (সময় থাকতে) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করত।"

শানে নুযুল

আদম ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা প্রথম মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করলেন। এরপর সকল ফেরেশতাকে আদমের সামনে নত হবার আদেশ দিলেন। সবাই নত হলেও, বাদ থাকল কেবল ইবলিস। অহংকার করে বলল, 'ঠনঠনে শুকনো মাটি দিয়ে যে মানুষ আপনি বানিয়েছেন, তার সামনে আমি নত হতে পারব না।' এভাবে আল্লাহর আদেশকে সরাসরি অমান্য করল ইবলিস! ফলে সে হলো অভিশপ্ত, বিতাড়িত শয়তান। এই সূরাটির শেষের দিকে এই ঘটনা বলে মুশরিকদেরকে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন—আমার কথা অমান্য করে ইবলিস অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়েছে। তোমরাও যদি অবাধ্য হও, তা হলে তোমরাও কিন্তু অভিশপ্ত হবে। আমার রহমত থেকে তোমাদেরকে বিতাড়িত করা হবে। ওই সময়টাতে কাফিরদের লাগাতার অবাধ্যতা ও বিরোধিতায় আল্লাহর রাসূল ﷺ নিদারুণ যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাই রাসূলকেও সান্ত্বনা দিলেন এ-সূরাতে। কাফিরদেরকে উপেক্ষা করে নিজের কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। মোটাদাগে বিভিন্ন নবি-রাসূলের সাথে তাঁদের জাতির লোকদের আচরণ তুলে ধরতে, সেই জাতির পরিণতি জানিয়ে দিতে এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে। আর এর মাধ্যমে মক্কার কাফিরদেরকে ঈমান গ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

(দেখুন—জালালুদ্দীন সুয়ুতি, লুবাবুন নুকুল ফী আসবাবিন নুযুল, ১২৮)

সেগমেন্ট

প্রত্যাখ্যান ও পরিণতি

কুরআনের বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, ধ্বংস ঠেকানো যাবে না। যেমনটা ঠেকাতে পারেনি সামুদ জাতি।

সৃষ্টির শুরুর কথা ও ইবলিসের অবাধ্যতা

অহংকার ও অবাধ্যতা বিনাশ ডেকে আনে, বিনয় ও আনুগত্য নিয়ে আসে সফলতা।

ধৈর্য ও আনুগত্য

আল্লাহর নিরাপত্তা সব সময় ঘিরে রাখে মুমিনদের। তাই কঠিন সময়ে হতাশ না হয়ে ধৈর্য ও ইবাদাত জারি রাখতে হবে।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, তাদেরকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। সেরকমই একটি সূরা হলো সূরা হিজর। (দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল: ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শেখান।’ নবিজি বললেন, “যে সূরাগুলোর শুরুতে আলিফ-লাম-রা আছে, সেরকম তিনটি সূরা পড়ো।” সূরা হিজর এমন সূরাগুলোর মাঝে অন্যতম।

(আবু দাউদ, ১৩৯৯; ইবনু হিব্বান, ৬১৮৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

শয়তান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল—সে আল্লাহর নিখাদ গোলামদের বাদে বাকি সবাইকে বিপথে নিয়ে যাবে;

তাই আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে—হে আল্লাহ, বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দিন, আপনার নিখাদ গোলাম হিসেবে কবুল করে নিন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর-দেওয়া নিরাপত্তা

১. কুরআনের সুরক্ষা
কুরআন হেফাজত করার দায়িত্ব আল্লাহর। বাতিলরা শত চেষ্টা করেও, শত অপব্যাখ্যা করেও এর একটি বিধান বদলাতে পারবে না।

২. মহাবিশ্বের সুরক্ষা
জগতের সমস্ত কিছু তাঁরই আজ্ঞাধীন। চাঁদ, সূর্য বা অন্যান্য গ্রহ—কেউ কারও কাজে বিঘ্ন ঘটায় না।

৩. নবিদের সুরক্ষা
নবিদেরকেও তিনিই সুরক্ষা দেন। লূত ও ইবরাহীম ﷺ-এর ঘটনার মাধ্যমে ইঙ্গিত: তাঁর নিরাপত্তার কারণেই নবিরা তাঁদের মিশন সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

৪. ঈমানদারদের সুরক্ষা
সূরার শেষ দিকে এসে জানিয়ে দেওয়া হলো, এই সবকিছুর সুরক্ষা যদি তিনি দিতে পারেন, তা হলে ঈমানদারদের কেন নয়? তাই মুমিনদের উচিত তাঁর ওপর ভরসা করা।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ তাআলা যে রীতি অনুসরণ করে দুনিয়ার বুকে রাসূলদের পাঠিয়ে থাকেন, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।	১-১৫	আগেকার সকল সীমালঙ্ঘনকারী বা আল্লাহর অবাধ্যদের পতন ঘটেছে। ওরা ভোগ করেছে ভীষণ শাস্তি।	৪৯-৮৪
আল্লাহর ক্ষমতা ও জগতের সমস্ত কিছুই কীভাবে শুধুমাত্র তাঁর হুকুম মেনে চলছে, তার বিবরণ।	১৬-২৫	রাসূল ﷺ-কে সূরা ফাতিহা উপহার দিয়ে আল্লাহ তাঁর ওপর অনুগ্রহ করেছেন। একইসাথে তাঁকে দিয়েছেন কিছু নির্দেশনা।	৮৫-৯৯
আদম ﷺ-এর সামনে নত হওয়ার ক্ষেত্রে ইবলিসের অবাধ্যতা—সেই ঘটনাটি উঠে এসেছে।	২৬-৪৮		

কেইস-স্টাডি

'কুরআন নাযিল করেছি আমি, আর আমিই তা হেফাজত করব।' আল্লাহ এ-সূরার ৯ নং আয়াতে এ কথা জানিয়েছেন। অন্য সব আসমানি কিতাবই বিকৃত করা হয়েছে—কিন্তু কুরআনে হাত দেওয়ার দুঃসাহস কারও নেই। কুরআনের নিরাপত্তা যে কতটা শক্তিশালী, নবিজির অগণিত হাদীসে তার ইঙ্গিত মেলে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময়,

নিরাপত্তা হিসেবে, কখনো কখনো সত্তর হাজার ফেরেশতাও নেমে আসতেন। সামনে পেছনে পাহারা দিয়ে নামিয়ে আনতেন কুরআন। অথচ আফসোসের কথা—সেই কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ কেমন? দু-চারপাতা বইপত্তর পড়েই আমরা একেকজন মুফাসসির বনে যাই। তারপর ইচ্ছে মতো রং মিশিয়ে কুরআন ব্যাখ্যা করা শুরু করি মাঠে-ময়দানে, মিম্বারে, খানকায়। একবারও কি ভাবি আমরা—জ্ঞানের কমতি থাকার কারণে, যদি কুরআনের একটি হরফও আমাকে দিয়ে অপব্যাখ্যা হয়, তার ফলাফল কত ভয়াবহ? যে-কুরআনকে হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন, সেই কুরআন আমি ভুল ব্যাখ্যা করলাম—এর চেয়ে অভিশাপের বিষয় আমার জন্য আর কী হতে পারে?

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/৭৮; তিরমিযি, ২৯৫১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আশা ও ভয়—মুমিন-হৃদয়ের দুটো ভিন্ন দরজা; যেখান দিয়ে ঈমানের শীতলতা ঢোকে হৃদয়ে। খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য একইসাথে দুটো দরজাই খোলা রাখা জরুরি। তার মানে, আল্লাহর করুণার ব্যাপারে যেমন আশাবাদী থাকতে হবে, তেমনি তাঁকে ভয়ও করতে হবে। কেউ যদি ভাবে—'আল্লাহ তো বান্দার প্রতি পরম দয়াবান। ফলে আমি যা-ই করি না কেন, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেবেন।' তা হলে সে নিশ্চিত বিপথগামী। কেননা, তখন তার গুনাহ করতে আর একটুও বাধবে না। যত অপরাধই করুক, সে ভাববে—আল্লাহ তো ক্ষমা করে দেবেনই। এভাবে আস্তে আস্তে সে চরম বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এ কারণেই, যতবারই মাথায় আসবে আল্লাহ তো পরম দয়ালু, ততবারই ভাবতে হবে—তিনি চরম শাস্তি-দাতাও। আজকাল দেখবেন, আধুনিক শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের কেউ কেউ—কোনো অমুসলিম মারা গেলেও—'তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি' লিখে পোস্ট দেয়। অথচ কোনো অমুসলিমের জন্য ক্ষমা চাওয়া জায়েয নয়। হ্যাঁ, জীবিত থাকতে তার হিদায়াতের জন্য দুআ করা যাবে। কিন্তু মারা যাওয়ার পরে তার ব্যাপারে আর কোনো দুআ নয়। এভাবে ভুল শুধরে দিতে গেলে অনেকেই রেগে যায়। বলে বসে—'আল্লাহ তোমার মতো অত নিষ্ঠুর না যে, অ-মুসলিম বলে তাকে শাস্তি দেবেন। আল্লাহর দয়ার কোনো সীমারেখা নেই।' তার মানে, এরা আসলে ঈমানের মৌলিক বিষয়টাই বোঝে না। 'আল্লাহ অত কঠোর নন, আল্লাহ অত রাগী নন'—এই কথাগুলো বলার মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা হচ্ছে না আসলে। বরং তাঁর আল-আসমাউল হুসনাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। এরকম চিন্তা থেকে বের হয়ে আসা জরুরি। আল্লাহ একইসাথে পরম দয়ালু ও চরম শাস্তিদাতা।

(দেখুন—মুসলিম, ৯৭৬, ২৭৫৫)

সূরা নাহল

سُوْرَةُ النَّحْلِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭০-তম সূরা। এর আগে সূরা কাহফ ও পরে সূরা নূহ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা হিজর ও পরে সূরা বনী ইসরাঈল।

এক নজরে নাহল

- হিজরতের ক'মাস আগে নাযিল
- সূরা নং: ১৬
- আয়াত: ১২৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

'নাহল' মানে মৌমাছি। এই সূরার ৬৮–৬৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—মৌমাছির মতো ছোট্ট একটি প্রাণীও আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয়ে চলে। সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে 'নাহল'।

মেজর থিম

০১. আল্লাহ তাআলার একত্ব ও ক্ষমতা। কুরআনের ব্যাপারে অহংকারকারীদের বিরূপ মন্তব্য।

০২. কুরআনের ব্যাপারে মুত্তাকীদের মূল্যায়ন। কাফিরদের চিন্তা-বিভ্রাট।

০৩. হিজরতের পুরস্কার। আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করার আদেশ দিয়ে সূরাটি শুরু হয়। সেই সাথে জোর দেওয়া হয় আল্লাহর একত্ববাদের ওপর—"আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকো!" আর শেষে ঘোষণা করা হলো তাকওয়ার পুরস্কার—"যারা আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলে এবং সুন্দরভাবে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা হিজর। যার শেষে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আর তোমার রবের দাসত্ব করে যাও, যতক্ষণ-না তোমার কাছে পরম সত্য (মৃত্যু) হাজির হচ্ছে।" সূরা নাহলেও এক আল্লাহর ইবাদাত করতে বলা হয়েছে। তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ মুশরিকদের বারবার সতর্ক করছিলেন। আল্লাহর অবাধ্য হলে শাস্তি আসবে, জাহান্নামের ভয়ংকর আগুনে পুড়তে হবে—এসব বিষয় বারংবার বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গোঁয়ার্তুমি যাদের রক্তে মিশে আছে, তারা কি আর এসব শুনে সতর্ক হয়! বরং আরও দুঃসাহস দেখিয়ে বলল, তুমি মিথ্যাবাদী। নাহলে এতদিন ধরে আমরা তোমার কথা শুনছি না, তোমাকে নবি বলে মেনে নিচ্ছি না, কই শাস্তি তো এল না! সত্যি সত্যিই তুমি যদি নবি হয়ে থাকো, তা হলে যে শাস্তির ভয় দেখাও, সেটি হাজির করো। তাদের এই বিচ্ছিরি দাবির জবাবে এই সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে—আল্লাহর ওয়াদা শিগগিরই পুরা হবে। তাই তাঁর আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করো না। বরং যে ক'দিন সময় পাও উপভোগ করে নাও। আর যদি পারো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্যতা বোঝার চেষ্টা করো।

শির্ক ছেড়ে তাওহীদের পথে আসার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেছেন। এ ছাড়া তাঁর নবির ডাকে সাড়া না দেওয়ার পরিণাম, সত্যের বিরোধিতা করার পরিণতি কী হবে, তা-ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/৬৬৭)

সেগমেন্ট

বিশ্ব-জগৎ: সেরা শিক্ষক

প্রকৃতি নেহাত কোনো সৃষ্টি নয়—বরং শিক্ষকও। বৃষ্টি পড়া থেকে নিয়ে বৃক্ষের বেড়ে ওঠা—সবকিছু নীরবে আল্লাহর প্রজ্ঞার কথা জানান দেয়।

আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার পরিণাম

জগতে এত এত নিদর্শন দেখবার পরও, কেউ যদি রবকে চিনতে না-পারে, শাস্তি ছাড়া আর কীই-বা পাওনা থাকে তার!

উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন

রবের নিপুণ সৃষ্টি, তাঁর পাঠানো ওহি আর অতীত ইতিহাস—এই তিনটি আমাদেরকে শেখায়, মানুষের জীবনটা অর্থহীন নয়। অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য দিয়েই পাঠানো হয়েছে মানুষকে।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের বেশি, তাদেরকে বলা হয় আল-মিয়ূন। 'যাবুর' কিতাবের পরিবর্তে, আল-মিয়ূন সূরাগুলো আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা নাহল।

(দেখুন : আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২; তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, ১১০৫)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কিয়ামাতের কিছু ছোট-বড় আলামত রয়েছে, সেগুলো জানতে হবে;

তা হলে মানুষ কিয়ামাতের ব্যাপারে এত তাড়াহুড়ো না করে বরং প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
রবের-দেওয়া নিয়ামাত ও কৃতজ্ঞতা

১. আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামাতের আলোচনা দিয়ে শুরু
'তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামাত গুনতে চাও, তা হলে গুনে শেষ করতে পারবে না।'

২. কৃতজ্ঞ বান্দা
কৃতজ্ঞ বান্দারা নিয়ামাতের কথা ভেবে বিনয়ে মাথা নোয়ায়। আল্লাহর সামনে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে।

৩. অকৃতজ্ঞ বান্দা
আর অকৃতজ্ঞ যারা, তারা আল্লাহর নিয়ামাতকে অধিকার মনে করে। মানে, সবকিছু এমনি এমনি পাওয়াটাই যেন স্বাভাবিক। ফলে তারা উগ্র হয়ে ওঠে। আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়।

৪. পরিণতি
কৃতজ্ঞতার পুরস্কার: হিদায়াত ও নিয়ামাত—দুটোই বাড়িয়ে দেওয়া হবে।
অকৃতজ্ঞতার পরিণতি: নিয়ামাত কেড়ে নেওয়া হবে, হিদায়াত থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ এক। এই মহা-সত্যের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে তুলে ধরা হয়েছে এই ঘোষণার সত্যতার প্রমাণ।	১-১৬	কিয়ামাতের ভয়াবহ চিত্র। আর তখনকার কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে—আল্লাহর-দেওয়া নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।	৮৪-৯৭
আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের উপাসনা করা হয়, তাদের অক্ষমতার নমুনা তুলে ধরা হলো।	১৭-৩৫	কুরআনের প্রতি যথাযথ আদব আলোচিত হয়েছে। আর কাফিরদের ভ্রান্ত দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।	৯৮-১১১
যারা রাসূল ﷺ ও পরকালকে অবিশ্বাস করে, তাদের শাস্তি এবং নেককারদের পুরস্কারের কথা এসেছে।	৩৬-৫০	আল্লাহর নিয়ামাতের প্রতি অকৃতজ্ঞ—এমন এক লোকের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।	১১২-১১৩
একমাত্র আল্লাহই ইবাদাত পাবার যোগ্য—এই ঘোষণার পেছনে রয়েছে শক্তিশালী যুক্তি।	৫১-৭৩	কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। কোনো মানুষকে এই অধিকার দেওয়া হয়নি।	১১৪-১১৯
আল্লাহ যে এক, তার প্রমাণস্বরূপ কিছু উদাহরণ। সেই সাথে দেওয়া হয়েছে আরও কিছু নিয়ামাতের বর্ণনা।	৭৪-৮৩	সত্যের দিকে মানুষকে ডাকার গুরুত্ব ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।	১২০-১২৮

কেইস-স্টাডি

এ-সূরার ১১২ নং আয়াতে আল্লাহ একটি জনপদের উদাহরণ তুলে ধরেন। সেই জনপদটি ছিল খুবই নিরাপদ ও প্রশান্ত। তাদের প্রয়োজনীয় সকল পণ্য আসত আশপাশের এলাকাগুলো থেকে। কিন্তু এটা যে একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ, তারা তা মানতে চাইল না। তাই শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে ভীষণ ক্ষুধা ও আতঙ্কজনক অবস্থার মজা ভোগ করতে দিলেন। এই হলো অকৃতজ্ঞতার ফল। তবে আল্লাহর শাস্তি আসার পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ—মানুষের কীর্তিকলাপ। একটা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যখন অন্যায়, অবিচার, জুলুম আর দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ-ধরনের শাস্তি এসে থাকে। আমরা টের পাই—সারাদিন গাধার মতো খেটে মরি, অথচ চাল-ডাল কেনার পয়সা জোগাড় করতে হিমশিম খাই। এমনটা কেন হয় কখনো ভেবে দেখেছেন কি? এটা তখনই হয়, যখন গোটা সমাজ এভাবে অন্যায়ে লিপ্ত হয়। মানুষের জীবন থেকে বরকত উঠে যায়। তাই এই আয়াতটি আমাদের কেইস-স্টাডির জুতসই এক টপিক। সমাজের বর্তমান চিত্রের সাথে কুরআনের উদাহরণ মিলিয়ে দেখা ভীষণ জরুরি।

(দেখুন—ইবনু মাজাহ, ৩৮১৯, ৪০২২; আবু দাউদ, ১৫১৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরায় আল্লাহ তাঁর নিয়ামাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে, মৌমাছির কথা তুলে ধরেছেন এক জায়গায়। তিনি বলেছেন—"তোমার রব মৌমাছির কাছে এই নির্দেশনা পাঠান: 'পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ও মানুষের বানানো স্থাপনাগুলোতে ঘর বানাও। তারপর সব রকমের ফল থেকে খাও। আর তোমার রবের পথে অনুগত হয়ে চলো। মৌমাছির পেট থেকে বেরিয়ে আসে নানা রঙের পানীয়, যাতে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির উপশম। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে।'" শুরুতেই একটা বিষয়ে খেয়াল করব আমরা। আল্লাহ তাআলা এখানে মৌমাছির জীবনের একটা উদ্দেশ্য ঠিক করে দিলেন। তার কাজ মধু আহরণ করা এবং সে তা-ই করে। সে কখনো মধু আহরণ ছেড়ে পিঁপড়ার গর্তে ঢুকে পিঁপড়া খেতে শুরু করে না। তার মানে, অত ছোট্ট একটা প্রাণীর জীবনেও যদি সুনির্দিষ্ট লক্ষ-উদ্দেশ্য থাকে, তবে মানুষের জীবন কী করে উদ্দেশ্যহীন হতে পারে?

পরের যে বিষয়টিতে আমরা নজর দিব তা হলো: ফলের রস কুড়োতে গিয়ে মৌমাছি ভীষণ খাটা-খাটনি করে। চাক বানানো থেকে শুরু করে দূর-দূরান্ত ঘুরে মধু জোগাড়—কী যে এক অসাধ্য কাজ! সেই অসাধ্য কাজটিই সে খুব যতনে, শিল্পীর মতো করে আঞ্জাম দেয়। এখান থেকে ইঙ্গিত মেলে—দ্বীনের ওপর অটল থাকতে হলে মৌমাছির মতোই পরিশ্রমী হতে হবে। একবার যখন জন্মেছিই, তখন আর অলস বসে থাকবার সুযোগ নেই। নিজের সময়গুলোকে ব্যয় করতে হবে প্রোডাক্টিভ কাজে। এর পাশাপাশি লক্ষ রাখতে হবে ঈমান ও আমলের ওপর। কেননা, শুধু নিজের খেয়ে-পরে বাঁচা—মানব জনমের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই এতটা তুচ্ছ হতে পারে না। সেটা হলে মানুষ আর হাতি-ভেড়ার মাঝে কোনো তফাতই থাকত না।

(দেখুন—সূরা আলে ইমরান, ৩:১১০; মুসলিম, ২৬৯৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৭৭০১)

সূরা বনী ইসরাঈল

سُوْرَةُ بَنِيٓ إِسْرَآءِيْلَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫০-তম সূরা। এর আগে সূরা কাসাস ও পরে সূরা ইউনুস নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা নাহল ও পরে সূরা কাহফ।

এক-নজরে বনী ইসরাঈল

- মাক্কি যুগের শেষ বছর, মি'রাজের পর নাযিল
- সূরা নং: ১৭
- আয়াত: ১১১
- মাক্কি

নামের রহস্য

বনী ইসরাঈল | ইসরা

'বনী ইসরাঈল' মানে 'ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়াকুব ﷺ-এর বংশধর'। সূরার ৪–৮ নং আয়াতে বনী ইসরাঈলের উত্থান-পতনের ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। সেখান থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'বনী ইসরাঈল'। এই সূরার অপর নাম 'ইসরা', যার অর্থ 'রাতের সফর'। ১ নং আয়াতে মি'রাজের রাতের সফরের কথা উল্লেখ থাকায় এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ইসরা'।

মেজর থিম

০১ নবিজির মি'রাজ। তাওরাত ও বনী ইসরাঈল।

০২ বাবা-মা'র প্রতি সম্মান। রোগের উপশম কুরআন।

০৩ অকৃতজ্ঞতার শাস্তি। অবৈধ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

তাসবীহ বা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার আলোচনা দিয়ে সূরাটি শুরু হয়েছে। আর শেষ হয়েছে তাহমীদ বা আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে। এই দুটি বিষয় পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত। এমনকি যিকির করার সময়ও আমরা বলি—সুবহানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহী—প্রশংসা-সহ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা নাহল। যার শেষে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলে এবং সুন্দরভাবে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন।" আর আল্লাহ এই সূরার শুরুতেই তেমন একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। যেখানে তিনি তাঁর নবিকে মি'রাজ করিয়েছেন এবং মনোবল বাড়িয়েছেন।

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে তাওহীদের বাণী প্রথম বের হবার পর কেটে গেছে বারোটি বছর। এই ১২ বছরে হাজারো ঝড়-ঝঞ্ঝাট বয়ে গেছে। শুরুতে ঝড়ের মাত্রা মৃদু হলেও, সময় যত গড়িয়েছে, ঝড়ের গতিও তত বেড়েছে। একটা সময় মনে হয়েছিল, কাফিরদের প্রলয়ংকারী এই ঝড়ের সামনে তাওহীদের চারা গাছটি বুঝি শেকড়সুদ্ধ উড়ে যাবে। নবিজি ও তাঁর সঙ্গী-সাথিরা বুঝি চিরতরে হারিয়ে যাবেন দুনিয়ার বুক থেকে। তবে না, তেমনটা হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাওহীদের বাণীকে স্থিরভাবে টিকিয়ে রেখেছেন। কাফিরদের শত অত্যাচারের মুখেও রাসূল ও সাহাবিরা এক মুহূর্তের জন্যও তাওহীদের দাওয়াত থামিয়ে রাখেননি। গোটা আরবের এমন কোনো গোত্র অবশিষ্ট ছিল না—যাদের মধ্যে দু-চারজন ইসলাম গ্রহণ করেননি। এমনকি মদীনার শক্তিশালী দুটো গোত্র—আওস ও খাযরাজ নবিজির হাতে বাইআত নেন। নবিজিকে মদীনায় আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তখন এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে, মুসলিমরা নিজেদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেই পারে। তবে এটাও সত্য যে, কাফিরদের লাগাতার অত্যাচারে নবিজি শারীরিক-মানসিকভাবে ভীষণ কষ্টের মধ্যে ছিলেন। সব মিলিয়ে এই যখন অবস্থা—তখন আল্লাহ তাঁর হাবিবকে মি'রাজ করান। আর এই সূরা নাযিল করে মি'রাজের ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেন। এতে করে পুরো মুসলিম উম্মাহ চাঙা হয়ে ওঠে।

(দেখুন—মুসলিম ১৬২, ১৬৪, ১৬৮; বুখারি ৩৮৮৭)

সেগমেন্ট

আল্লাহর অনুগ্রহ

যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা যত রাসূলকে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন, তাঁদের ও তাঁদের জাতির ওপর তিনিই অনুগ্রহ করেছেন।

শাস্তি

নবি-রাসূলদের সাথে সাথে তাঁদের অনুসারীদের ওপরও আল্লাহর অনুগ্রহ অফুরান। তবে অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে, আল্লাহর শাস্তি বড়ই ভয়ানক।

অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা-বোধ

আল্লাহর এই অনুগ্রহের ওপর কৃতজ্ঞতা আদায় করা জরুরি। আর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার মাধ্যমে।

ফজিলত

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার না পড়ে ঘুমাতেন না।

(তিরমিযি, ২৯২০, হাসান; নাসাঈ, ২৩৪৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

চরম বিলাসিতার ক্ষতির ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করতে হবে; → তা হলে সমাজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

গতিপথ

১. ইসরা ও বনী ইসরাঈলের থেকে শিক্ষা
মি'রাজের রাতের ঘটনা আমাদেরকে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ করে। সেই সাথে বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও তার বিপরীতে আল্লাহর শাস্তির বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

২. আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ
আল্লাহর হক পুরোপুরিভাবে আদায় করতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর বেঁধে-দেওয়া নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

সেন্ট্রাল থিম
মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ওহির ভূমিকা ও বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন

৩. কুরআন ও কুফর
কুরআন মানুষের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। কিন্তু কাফিররা মুখ ফিরিয়ে মৃতের মতোই পড়ে থাকে। কুরআন তাদেরকে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দেয়।

৪. এগিয়ে চলা
কুরআনের সতর্কবাণী ও বনী ইসরাঈলিদের থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে চলতে হবে। পরকালের ব্যাপারে নিতে হবে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল-ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা। মুসা ﷺ-কে দেওয়া বিশেষ সম্মান এবং বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে আলোচনা।	১-৫	আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করার দাবি পুরোপুরি নাকচ। সেই সাথে মুশরিকদের গোঁয়ার্তুমির গোপন কারণও উঠে এসেছে।	৪০-৪৮
অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে চরম অপদস্থ হওয়ার পর একসময় বনী ইসরাঈলের বিজয় ও নিজেদের রাজ্য পুনরায় দখল।	৬-৮	মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ব্যাপারে মুশরিকদের অবিশ্বাস ও নানা রকম ভ্রান্ত-বিশ্বাস দূর করতে তাদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা।	৪৯-৬০
পবিত্র কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসেছে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কিছু উদাহরণ।	৯-১৭	সকল শয়তানি পাপের গোড়ায় আছে অহংকার। মানুষের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং পরকালের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।	৬১-৭২
বাবা-মা'র সাথে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।	১৮-২৫	নবি ﷺ-কে মুশরিকদের প্রলোভন ও তাঁর প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা। মুশরিকদের অলৌকিক নিদর্শন দেখার আবদারের জবাব।	৭৩-৯৩
নিকট-আত্মীয়, দরিদ্র ও মুসাফিরদের অধিকার ও ইসলামি সমাজের মৌলিক কিছু নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে।	২৬-৩৯	মুসা ﷺ-কে দেওয়া কিছু নিদর্শনের আলাপ। আল্লাহর পবিত্র নামগুলো উচ্চারণ করে করে তাঁর কাছে দুআ করার আহ্বান।	৯৪-১১১

কেইস-স্টাডি

“তোমার রব যাকে চান, তাকে জীবিকা বাড়িয়ে দেন, আবার কখনো কমিয়ে দেন। তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে তিনি সব জানেন, দেখেন।” এ আয়াত নিয়ে ইমাম ইবনু কাসীর ﷺ-এর একটি কেইস-স্টাডি আমরা তুলে ধরব। তিনি লিখেছেন: ‘আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন ও বোঝেন—কার ধন-দৌলত দরকার, আর কার গরিব থাকাই ভালো। কোনো কোনো বান্দার জন্য দরিদ্রতাই উত্তম। কেননা, সে যদি ধনী হতো, তা হলে তার দ্বীন ক্ষতির মুখে পড়ত। আবার কোনো কোনো বান্দার ক্ষেত্রে টাকা-পয়সাওয়ালা হওয়াই ভালো। কেননা, সে গরিব হলে তার দ্বীন ঝুঁকিতে পড়ত। এর বাইরেও আরেকটা দিক আছে। ধন-দৌলত কারও কারও জন্য হতে পারে মারাত্মক পরীক্ষা। আবার দরিদ্রতা হতে পারে ভীষণ কোনো শাস্তি।’ কাজেই, আমরা জানি না—প্রাচুর্য বা দরিদ্রতা আমাদের কার জন্য কী হিসেবে আসবে। তাই সব সময় আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চাইতে হবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৩/৩৭)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরায় বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন: “তোমরা অবাধ্যতার পুনরাবৃত্তি করলে আমিও শাস্তির পুনরাবৃত্তি করব; আমি জাহান্নামকে চরম অবাধ্য লোকদের জন্য কারাগার বানিয়ে রেখেছি।” ইমাম সা’দি ﷺ এ আয়াতের চমৎকার একটি রিফ্লেকশন তুলে এনেছেন। তিনি বলেন: ‘এখানে মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি সতর্কবার্তা আছে। তারা যদি লাগাতার গুনাহে জড়ায়, তবে বনী ইসরাঈলের মতো তাদেরকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর সুন্নাহ তথা রীতি কখনো বদলায় না। কাজেই, যদি কখনো দেখেন কাফির বা জালিমরা মুসলিমদের ওপর খবরদারি করছে, তখন বুঝে নেবেন ওটা মুসলিমদের পাপের ফল। মুসলিমদের কৃতকর্মের কারণেই আল্লাহ তাদের ঘাড়ে শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছেন। মুসলিমরা যদি আল্লাহর কুরআন আঁকড়ে ধরে, আর নবিজির সুন্নাহ অনুসরণ করে, তা হলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় ফের প্রতিষ্ঠিত করবেন, আর শত্রুদের ওপর তাদেরকে বিজয় দেবেন।’

(দেখুন—সা’দি, তাফসীর, ৪৫৩)

সূরা কাহফ

سُوْرَةُ الْكَهْفِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬৯-তম সূরা। এর আগে সূরা গাশিয়া ও পরে সূরা নাহল নাযিল হয়।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা বনী ইসরাঈল ও পরে আছে সূরা মারইয়াম।

এক নজরে কাহফ

- মাক্কি যুগের শেষের দিকে নাযিল
- সূরা নং: ১৮
- আয়াত: ১১০
- মাক্কি

নামের রহস্য

'কাহফ' মানে 'গুহা'। এই সূরায় গুহায় ঠাঁই-নেওয়া কয়েকজন যুবকের গল্প উঠে এসেছে। তখনকার এক রোমান শাসক মূর্তিপূজা করার জন্য বেজায় চাপ দিচ্ছিল ওই যুবকদের। মানে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে 'ইলাহ' ও 'রব' মানতে হবে! কিন্তু যুবকরা কোনোভাবেই মাথা নোয়ায়নি। শেষমেশ চাপের মুখে টিকতে না পেরে, তারা লোকালয় ছেড়ে গিয়ে ঠাঁই নেয় নির্জন গুহায়। সেখান থেকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'কাহফ'। ধারণা করা হয়—এ-সূরাতে নবিজিকে হিজরতের আগাম ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মেজর থিম

০১. কুরআনের বৈশিষ্ট্য। গুহাবাসী যুবকদের ঘটনা।

০২. দুজন জমি-মালিকের ঘটনা। মুসা ও খিযির ﷺ-এর ঘটনা।

০৩. যুল-কারনাইনের ঘটনা। কিয়ামাত প্রসঙ্গ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে মুমিনদের জন্য সুন্দর প্রতিদানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে—“যেসব মুমিন ভালো কাজগুলো করতে থাকে, তাদেরকে (আল্লাহ) এ-মর্মে সুসংবাদ দেন যে, তাদের জন্য আছে সুন্দর প্রতিদান।” আর এর শেষে এই সুন্দর প্রতিদান কী, তার বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা বনী ইসরাঈল, যা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা-বর্ণনা দিয়ে শেষ হয়েছে। আর সূরা কাহফ-ও শুরু হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা দিয়েই।

শানে নুযুল

মক্কার কুরাইশদের মাথায় ফন্দি চাপল—মুহাম্মাদ ﷺ-কে ওরা ভুয়া প্রমাণ করবে। ভুয়া মানে, তিনি আল্লাহর নবি নন—তা ‘প্রমাণ’ করবে। কিন্তু মুশকিল হলো, ওরা তো নিরক্ষর জাতি। আসমানি কিতাব-পত্র পড়া তো দূরে থাক, কোনোদিন ছুঁয়েও দেখেনি। তা হলে নবিজিকে আটকাবে কেমন করে? সলা-পরামর্শ সেরে ওরা দেখেশুনে দুজন চালাক-চতুর লোককে মদীনায় পাঠাল। একজনের নাম নাদর ইবনু হারিস, আরেকজন উকবা ইবনু আবী মুআইত। মদীনায় পাঠানোর কারণ—সেখানে ইহুদিরা বসবাস করে, যাদের ভান্ডারে আছে তাওরাত। তাদের থেকেই শিখে আসবে কী কী জিজ্ঞেস করে নবিজিকে ধাঁধায় ফেলা যায়। হাল-বৃত্তান্ত জেনে মদীনার ইহুদিরা শিখিয়ে দিলো তিনটি প্রশ্ন। এগুলোর জুতসই জওয়াব দিতে পারলেই তবে সে নবি, নইলে না। প্রথম প্রশ্ন: গুহাবাসী যুবকদের ঘটনাটা কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন: যুল-কারনাইনের গল্পটাই-বা কেমন? আর তৃতীয় প্রশ্ন: রূহ কী জিনিস? নবিজিকে এই তিন জিজ্ঞাসার উত্তর জানাতেই আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেন।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১৫/১৪৩-১৪৪)

সেগমেন্ট

কুরআন

এই কুরআনের মধ্যে কোনো অসংগতি নেই। একে নাযিল করা হয়েছে পাপীদের জন্য সতর্কবার্তা, আর মুমিনদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে।

আসহাবে কাহফের ঘটনা

ঈমান বাঁচাতে কয়েকজন যুবক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুহায় আশ্রয় নেন। তাদের সামনে ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। আল্লাহ তাদেরকেই যুব-শ্রেণির জন্য রোল-মডেল বানিয়ে দিলেন।

দুনিয়ার চাকচিক্য

দুনিয়ার সম্পদের জোরে মানুষ 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করে। অথচ এই সম্পদ তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখে না।

ফজিলত

দিনগুলো বানাবে আলো-ঝলমলে : আবু সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহফ পড়বে, তার দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়টা আলোয় আলোকিত হয়ে থাকবে।' (ইবনু হিব্বান, ৩৪৩৬, সহীহ)

সুরক্ষা দেবে দাজ্জালের ফিতনা থেকে : আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'যে-ব্যক্তি সূরা কাহফ-এর প্রথম দশ আয়াত স্মরণ রাখবে, তাকে দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে সুরক্ষিত রাখা হবে।' (মুসলিম, ৮০৯)

সূরা কাহফে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। দাজ্জাল আসলে চারটি পরীক্ষায় ফেলে মানুষের ঈমান কেড়ে নেবে—বিশ্বাসের পরীক্ষা, সম্পদের পরীক্ষা, জ্ঞানের পরীক্ষা এবং ক্ষমতার পরীক্ষা। আর এই সূরার পুরোটা-জুড়ে সেই চারটি বিষয়ের ওপরই আলোচনা করা হয়েছে।

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

যেকোনো নিয়ামাত বা সৌন্দর্য দেখে বলতে হবে—'মা শা আল্লাহ',	তা হলে আল্লাহ বরকত দান করবেন এবং ক্ষতি থেকে বাঁচাবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

দুনিয়াবি উপকরণ দিয়ে আখিরাতের পরীক্ষা

১. দুনিয়ার জীবনের উদ্দেশ্য
মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে পরীক্ষা করা।

২. সম্পদের মাধ্যমে পরীক্ষা
মানুষকে পরীক্ষা করার বড় একটি উপকরণ হলো সম্পদ। সম্পদের প্রাচুর্যে অধিকাংশ মানুষই অহংকারী হয়ে ওঠে।

৩. গভীর জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে পরীক্ষা
বিপুল জ্ঞান দান করেও আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। গভীর জ্ঞান পেয়ে মানুষ নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে কি-না, আবার ক্ষমতার দাপটে সে দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বসে কি-না—সেটাই আল্লাহ দেখতে চান।

৪. ফলাফল
এবার ফলাফল দেবার পালা। এই পরীক্ষায় যারা পাশ করবে, তাদের জন্য আছে বিরাট পুরস্কার। আর যারা নিজেদের হারিয়ে ফেলবে, তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন অপেক্ষা করছে ভীষণ লাঞ্ছনা।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
একটি ভারসাম্যপূর্ণ কিতাব হিসেবে কুরআনের পরিচয়। সেই সাথে দুনিয়াবি চাকচিক্যের ব্যাপারে মানুষকে সতর্কও করা হয়েছে।	১-৮	ঈমান আনতে হবে শাস্তি আসার আগেই। আর আঁকড়ে ধরতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ।	৫৪-৫৯
আসহাবে কাহফের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। আর এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে—ঈমানের পরীক্ষায় কীভাবে পাশ করতে হয়।	৯-৩১	খিযির ﷺ-এর সাথে মুসা ﷺ-এর সাক্ষাৎ। ঘটনাটির শিক্ষা—জ্ঞান দু-রকমের: বাহ্যিক আর অন্তর্নিহিত।	৬০-৮২
দুজন বাগান মালিকের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে—সম্পদ দিয়ে কীভাবে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলা হয়।	৩২-৪৬	যুল-কারনাইনের অভিযান ও ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা। ক্ষমতাবানের উচিত ন্যায়-অন্যায় বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া।	৮৩-১০১
আমলের খাতায় ছোট-বড় সবকিছু লেখা আছে দেখে, অপরাধীরা কিয়ামাতের দিন ভীষণ আফসোস করবে।	৪৭-৪৯	সমস্ত আয়োজন শেষে সবার ঠিকানা—পরকাল।	১০২-১১০
ইবলিস সব সময় মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ধান্দায় থাকে। মানুষের জন্য সে এক বিরাট পরীক্ষা। তাকে কিছুতেই অনুসরণ করা যাবে না।	৫০-৫৩		

কেইস-স্টাডি

খিযির ﷺ একটার-পর-একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন, আর মুসা ﷺ-এর খটকা একটু একটু করে বেড়ে চলছিল। ভালো একটি নৌকো ফুটো করে দেওয়া, একটি বালককে হত্যা করা, বিনা-পয়সায় ভাঙা-দেয়াল মেরামত করে দেওয়া—এর কোনোটিই মুসা ﷺ-এর বোঝা-পড়ার সঙ্গে যাচ্ছিল না। কেননা, তিনি ঘটনাগুলো দেখছিলেন বাহ্যিক দিক বিবেচনায়। অপরদিকে খিযির ﷺ ঘটনাগুলো দেখছিলেন অন্তরের চোখ দিয়ে, আল্লাহর-জানানো জ্ঞানের আলোকে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাপনেও আমরা এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী হই—যেগুলোর ভেতরের ব্যাপারটা আমাদের অজানা। আল্লাহর পরিকল্পনা মোটেও ধরতে পারি না। তাই আমরা চটে যাই। 'আমার সাথেই কেন এমন হচ্ছে? কেন এটা, কেন ওটা' ইত্যাদি। আল্লাহ আমাদেরকে মুসা ﷺ-এর মাধ্যমে শেখালেন যে—ঘটনা পুরোটা ঘটবার আগেই প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত নয়। আবার এটাও শেখালেন—দুনিয়াবি জ্ঞান কোনো জ্ঞান নয়। অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন কিংবা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—এগুলোর কোনোটিই সুন্দর সিদ্ধান্ত নেবার রসদ নয়। কুরআনের ভাষায় এগুলোকে বলা হয় 'যন্ন'—তথা 'আন্দাজ-অনুমান (হাইপোথেসিস)'। এ জন্যই অনেক সময় একজন আলিমের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের সাথে কথিত বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা খাপ খায় না। কেননা, একজন আলিম চিন্তা করেন ওহির জ্ঞানের আলোকে, আর বুদ্ধিজীবী তো চিন্তা করে হাইপোথিসিসের ভিত্তিতে। আসলে মানুষের বুদ্ধি বা ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটি যেখানে শেষ, ওহির হাকীকত ঠিক ওখান থেকেই শুরু হয়।

(দেখুন—সূরা আলে ইমরান, ৩:৬৬; সূরা ইসরা, ১৭:৮৫; সূরা রূম, ৩০:৬-৭)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

যুবকদের জন্য প্রকৃতির নিয়ম বদলে গিয়েছিল। তাদের ঘুম ভেঙে যাবে, বা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে—এটা আল্লাহ চাননি। হায়াত যেখানে কমবেশ একশ বছর—সেখানে ঘুমের রাজ্যেই কেটে গেল তিন শতাব্দী। ঘুমন্ত অবস্থায় বারবার তাদের পাশ ফিরিয়ে দিতেন—যাতে এই লম্বা সময়ে তারা মাটির মধ্যে ডেবে না যায়। তার মানে, আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে মেনে চললে, আল্লাহ আপনার জন্য অসম্ভব জিনিসও সম্ভব করে দেবেন। বিপদের মুখে আপনাকে সুরক্ষা দেবেন। মজার ব্যাপার হলো—হিজরতের সময় আমাদের নবিজিও কিন্তু একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি গুহায় ঢোকার পরপরই একটি মাকড়সা তরতর করে জাল বুনে ফেলে। মাকড়সার সেই জাল দেখেই কাফিররা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং, আল্লাহ যাদের সঙ্গী হয়, তাদের আর কীসের ভয়!

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৫১৮; ইবনু মাজাহ, ৩৮১৯)

মুসা ও খিযির ﷺ-এর ঘটনা তাদাব্বুর করলে পাওয়া যায়—জ্ঞানার্জনের জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য: বিনয়, সফর ও সবর। দেখুন, মুসা ﷺ বনী ইসরাঈলের এত বড় নবি হবার পরও ইলম শেখার জন্য খিযির ﷺ -এর কাছে গিয়েছেন, বিনয়ী হয়েছেন। দূর-দূরান্ত সফর করেছেন পায়ে হেঁটে। এ-পথে যত কষ্টের মুখোমুখি হয়েছেন, সব সহ্য করেছেন। তাই ওহির ইলম পেতে হলে আমাদেরকেও এই তিনটি গুণ হাসিল করতে হবে: বিনয়, সফর ও সবর। জীবন-পথে আল্লাহর বিধান অনুসারে চলতে যতটুকু ইলম প্রয়োজন, তা শেখা একজন মুসলিমের জন্য ফরজ। তাই ইলম শিখতে অবহেলা বা গড়িমসি করার কোনো সুযোগ নেই।

(দেখুন—খতীব বাগদাদি, আর-রিহলাহ ফী তলাবিল হাদীস, ১০৬)

رَشَدٌ শব্দটির মানে সত্যপথ, সুবুদ্ধি, সততা। আসহাবে কাহ্ফ/গুহাবাসী যুবকরা তখন ভীষণ বিপদে। অত্যাচারী শাসকের কবলে পড়ে তাদের ঈমান যায়-যায়। অসম্ভব! জীবন যাবে, ঈমানে তবু একচিমটি আঁচড় লাগতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু তাদের যে মোকাবিলা করার শক্তি নাই, অস্ত্র নাই, জনবল নাই! এমন দিশেহারা-বিপদে তারা আশ্রয় খুঁজলেন আল্লাহর কাছে। দুআ করলেন—রব আমাদের, তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর করুণা করো আর আমাদের সকল বিষয় সঠিক পথে পরিচালিত করো! দুআতে তারা رَشَدًا শব্দটা নিয়ে এলেন। এরপরের ঘটনা সবার জানা—আল্লাহ সঠিক পথ দেখিয়ে তাদেরকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দিলেন সব বিপদ থেকে। আল্লাহ তাআলার একটি নাম 'আর-রশীদ'/ اَلرَّشِيْدُ—সঠিক পথে পরিচালনাকারী। তাই সঠিক পথ পাবার জন্য আমরাও গুহাবাসী যুবকদের মতো আল্লাহর কাছে সেই দুআটি করতে করতে পারি : رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا



(দেখুন—সূরা কাহফ, ১৮:১০; সূরা তালাক, ৬৫:২-৩)

মানে কালি; আর مَدَّادٌ মানে কলম, ফাউন্টেনপেন। জমিনের সব সমুদ্র যদি কালি হয়, আর গাছপালা যদি কলম হয়, পৃথিবীর তাবৎ মানুষ লিখে তা কি এক-জীবনে শেষ করতে পারবে? না, কক্ষনো পারবে না। হয়তো একসময় লেখার মতো আর কোনো কথা থাকবে না। কিন্তু কালি-কলম থেকে যাবে ঢের বেশি। অথচ এগুলোর সাথে আরও কোটি কোটি সমুদ্র-সমান কালি নিয়ে এলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথামালা ফুরোবে না। এত ব্যাপক আল্লাহ তাআলার বাণী। আল্লাহর কথামালার সাথে আমাদের পরিচয় কম কিংবা না-থাকার কারণে আমরা আসলে তা উপলব্ধি করতে পারি না।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ৮/৩৮১)

সূরা মারইয়াম سُوْرَةُ مَرْيَمَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪৪-তম সূরা। এর আগে সূরা ফাতির ও পরে সূরা ত্ব-হা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কাহফ আর পরে সূরা ত্ব-হা।

এক নজরে মারইয়াম

- নুবুওয়াতের ৫ম বছর নাযিল
- সূরা নং: ১৯
- আয়াত: ৯৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

ঈসা ﷺ-এর মায়ের নাম মারইয়াম। ঈসা ﷺ ও তাঁর মা মারইয়াম ﷺ-এর ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা চরম বাড়াবাড়িতে লিপ্ত। একদিকে ইহুদিরা তাঁদের ব্যাপারে অত্যন্ত বাজে কথা বলে, অন্যদিকে খ্রিষ্টানরা তাঁদের ওপর ইলাহের মর্যাদা আরোপ করে। এই সূরার ১৬-৩৮ এবং ৮৮-৯৫ নং আয়াতে মারইয়াম ও ঈসা ﷺ-এর প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। সেখান থেকে এই সূরার নাম হয়েছে 'মারইয়াম'।

মেজর থিম

০১ যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া ﷺ-এর দুআ কবুলের গল্প।

০২ মারইয়াম ﷺ-এর পরীক্ষা; ঈসা ﷺ-এর বিস্ময়কর জন্ম ও মু'জিযা।

০৩ কাফিরদের লাগাতার সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অহংকার।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

নবি যাকারিয়া ﷺ-কে সুসংবাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে সূরাটির সূচনা করা হয়। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে মুমিনদেরকেও সুসংবাদ দেন। আবার সূরার শেষে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "...যাতে সেসব লোককে হুঁশিয়ার করতে পারো—যারা সত্য গ্রহণ না করে ভ্রান্ত যুক্তি দিয়ে তর্কবাজি করে।" সূরার শুরু-শেষ মিলিয়ে পুরো কুরআনের বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে—একইসাথে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা—সূরা কাহফ। যেখানে আসহাবে কাহফের বিস্ময়কর কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনি এই সূরা অর্থাৎ সূরা মারইয়ামেও এসেছে দুজন নবি—ইয়াহ্‌ইয়া ও ঈসা ﷺ-এর জন্মের বিস্ময়কর কাহিনি।

শানে নুযুল

সূরাটি কোন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে তা দেখতে গেলে—এর নাযিলের পরের সময়টা দেখতে হবে। মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা তখন ভীষণ তীব্র। নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য নবিজি কিছু মুসলিমকে হাবশায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে কুরাইশদের দুজন নেতা সেখানে হাজির। সেখানকার বাদশাহ নাজাশি তখন খ্রিষ্টান ছিলেন। তার কাছে ওই দুজন গিয়ে কানপড়া দিতে লাগল। মুসলিমরা ঈসা ﷺ-কে নিয়ে বদ ধারণা পোষণ করে—এমন মিথ্যে অভিযোগও করল তারা। নাজাশি তাদেরকে তলব করে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। মুসলিমদের পক্ষ থেকে জাফর ﷺ কথা বললেন। এসব ব্যাপারে সূরা মারইয়ামে যেমন বিবরণ এসেছে আর নবিজি যা শিখিয়েছেন, তার সবটা বললেন তিনি। সবকিছু শুনে নাজাশি বুঝতে পারলেন—এটি অবশ্যই আল্লাহর কালাম। আর ঈসা ﷺ-এর ব্যাপারে কুরআন যা বলেছে, তা-ই সম্পূর্ণ ঠিক। তখন তিনি মুসলিমদেরকে নিরাপত্তা দিলেন, কাফিররা ফিরল খালি হাতে। এ ছাড়া এই সূরার আরেক অংশে দেখানো হয়—নিজ গোত্রের অত্যাচার থেকে বাঁচতে ইবরাহীম ﷺ নিজের ঘর ছেড়েছিলেন। এই দুটো ঘটনাকে এক সুতোয় গাঁথলে বোঝা যায়—ইবরাহীম ﷺ-এর মতো মুসলিমদেরও ঘর ছাড়বার ইঙ্গিত দেওয়া, এবং ঘর ছাড়বার পর নাজাশির সামনে কী জবাব দিতে হবে, তা শেখাতেই যেন কুরআনের এ-সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

(দেখুন—ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/৩৪৪; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১১৫)

সেগমেন্ট

সৎকর্মশীল বান্দা

যাকারিয়া-ইয়াহ্ইয়া, মারইয়াম-ঈসা, ইবরাহীম, মুসা ও হারুন, ইসমাঈল, ইদরীস ﷺ—আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

সঠিক-পথ থেকে বিচ্যুত বান্দা

পৃথিবী থেকে কোনো নবি বিদায় নেওয়ার পরই তাঁর জাতির মধ্যে তৈরি হয় নানা বিভাজন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর সাথে ভয়ানক শির্কে জড়ায়।

পরিণতি

নেককার ও বদকার—এই দুই শ্রেণির পরিণতিও দুরকম। এক পক্ষ থাকবে সম্মানিত অতিথির আসনে। আরেক পক্ষকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে।

ফজিলত

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেছেন, 'সূরা বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম ও আম্বিয়া প্রথম-দিকে-নাযিল-হওয়া অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরানো রক্ষিত সম্পদ।'

(বুখারি, ৪৭০৮, ৪৭৩৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

নেককার ও আল্লাহর-সন্তোষভাজন সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে;

কারণ, যাকারিয়া ﷺ-এর এরকম দুআর বরকতেই আল্লাহ তাঁকে ইয়াহইয়া ﷺ-এর মতো সন্তান দান করেছিলেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
আল্লাহর ক্ষমতা

১. যাকারিয়া ﷺ-এর দুআ
নবি যাকারিয়া ﷺ আল্লাহর কাছে একটি পুত্র-সন্তান চেয়ে দুআ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। এমন অবস্থাতে আল্লাহ করুণা করে তাঁদেরকে সন্তান দান করেন।

২. ঈসা ﷺ-এর বিস্ময়কর জন্ম
বাবা ছাড়াই জন্ম নেন ঈসা ﷺ। তবে তাঁর মা মারইয়াম ছিলেন নির্মল চরিত্রের অধিকারী। ঈসা ﷺ-এর জন্ম ছিল আল্লাহর একটি মু'জিযা। আল্লাহ যা চান, তা-ই করতে পারেন।

৩. নবিদের আগমন ও ওহির ভূমিকা
আদম ﷺ থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত বহু নবিকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন আসমানি পয়গাম।

৪. কাফিরদের প্রতি সতর্কবার্তা
সূরার শেষ ভাগে পরকালের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে করা হয়েছে হুঁশিয়ার।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
বৃদ্ধ বয়সে যাকারিয়া ﷺ-কে আল্লাহ সন্তান দান করেছেন। তাঁর নাম রেখেছেন ইয়াহ্ইয়া। পরে তিনিও নবি হন।	১-১৫	পরকালে অবাধ্যদের ও শয়তানদের একসাথে জাহান্নামের কিনারে হাজির করা হবে হাঁটু-মোড়া অবস্থায়।	৬৬-৭৫
মারইয়াম ﷺ-এর চরিত্র ছিল উত্তম। তাঁর ছেলে ঈসা ﷺ-এর জন্ম ছিল বিস্ময়কর।	১৬-৩৩	সঠিক পথে চললে, ভালো কাজ করার সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর ভ্রান্ত-চিন্তার দরুন শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।	৭৬-৮০
ঈসা ﷺ-কে খ্রিষ্টানরা বানিয়েছে আল্লাহর সন্তান! এ ছাড়াও তাঁকে ঘিরে জড়িয়েছে জঘন্য শির্‌কে।	৩৪-৪০	যারা কুফরের পথে চলে, তাদের জন্য শয়তান নিয়োগ করা হয়। আল্লাহ সন্তান নিয়েছেন—এমন ধারণা অত্যন্ত জঘন্য।	৮১-৯৫
শির্‌কের বিরোধিতা করায়, নবি ইবরাহীম ﷺ-কে তাঁর জন্মদাতা পিতা দেশ ছাড়তে বাধ্য করে।	৪১-৫০	আল্লাহ তাআলা ঈমান ও ভালো কাজের প্রতিদান হিসেবে মুমিনদের একে অপরের ভেতর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।	৯৬
মুসা, হারুন, ইসমাঈল ও ইদরীস ﷺ-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।	৫১-৬৫	কুরআন সহজ ভাষায় নাযিল হয়েছে। যাতে এর মাধ্যমে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দেওয়া ও ভ্রান্তদের হুঁশিয়ার করা যায়।	৯৭-৯৮

কেইস-স্টাডি

আল্লাহর হুকুমে গর্ভধারণ করলেন মারইয়াম ﷺ। কিন্তু, পাড়া-প্রতিবেশী যদি টের পায়—স্বামী নেই, অথচ মারইয়াম গর্ভবতী, তা হলে কেমন হবে ব্যাপারটা!। বিচ্ছিরি কথা-বার্তা শোনাবে, চরিত্রে কালো দাগ বসাবে। তিনি তখন লোকালয় ছেড়ে চলে গেলেন দূরের এক জায়গায়—উঁচু কোনো পাহাড়ে। একটা খেজুর গাছের গুঁড়িতে বসে পড়লেন। বিড়বিড় করে বললেন: 'হায়, আমি যদি মরে গিয়ে স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতাম!' তখন পাহাড়ের নিচ থেকে এক ফেরেশতা ডাকলেন তাকে। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: 'মারইয়াম, একদম দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার রব আপনার জন্য একটা নদী বানিয়ে দিয়েছেন। ওটা আপনার আওতায় থাকবে—আপনি বয়ে চলতে বললে বয়ে চলবে। থামতে বললে থেমে যাবে। আর এই যে খেজুর গাছ, ওটার ডাল ধরে ঝাঁকি দিন, টুপটাপ পাকা খেজুর পড়বে। সুতরাং সেসব খেজুর খান, নদী থেকে পান করুন, আর চোখ জুড়ান।' এখান থেকে কোনো কোনো তাফসীর বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন যে—গর্ভবতী কিংবা সদ্য-মা-হওয়া নারীদের জন্য, খেজুর অত্যন্ত উপকারী খাবার। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, ডাক্তাররাও গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত খেজুর খেতে বলেন। খেজুর একদিকে মায়ের পুষ্টি ও শক্তি জোগান দেয়, তার শারীরিক দুর্বলতা ও মুড-সুইং কাটাতে ভালো ভূমিকা রাখে, অন্যদিকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পথ পিচ্ছিল রাখে। ফলে নরম্যাল ডেলিভারির সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যায়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কুরআনকে মানুষের জন্য শিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৫/২২৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরায় ইয়াহ্‌ইয়া ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন: "সে ছোটো থাকতেই তাকে দিয়েছিলাম আসমানি কিতাবের মর্ম বোঝার ক্ষমতা। আমার পক্ষ থেকে কোমলতা ও পরিশুদ্ধি। আর সে ছিল আল্লাহর ভয়ে ভীত ও পিতামাতার অনুগত। সে অহংকারী অবাধ্য ছিল না। শান্তি তার ওপর—যেদিন তার জন্ম হয়েছে, যেদিন সে মারা যাবে, আর যেদিন তাকে জীবিত করে ওঠানো হবে।" সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা ﷺ বলেন: একজন মানুষ তিন অবস্থায় নিজেকে সবচেয়ে অসহায় ও একলা অনুভব করে। ১. যেদিন সে জন্ম নেয়। কেননা, মায়ের গর্ভে যে-জগৎটা এতদিন সে দেখেছে, এখন পুরোপুরি ভিন্ন একটা জগতে তার আগমন হলো। ২. যেদিন সে মারা যাবে। কারণ, কবরের জগৎটা তার বড্ড অপরিচিত। আর ৩. যেদিন তাকে কবর থেকে পুনরায় ওঠানো হবে। সেদিন নিজেকে সে আবিষ্কার করবে কোটি কোটি জনতার ভেতর। কিন্তু হায়! কেউ কারও সাথে কথা বলছে না, তাকাচ্ছেও না। তো, এই তিনটি করুণ মুহূর্তের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইয়াহ্‌ইয়া ﷺ-কে অভয় দিয়েছেন। সুতরাং, দু-চোখ বুজে একটু গভীর ভাবনায় ডুব দিন তো—আপনার সামনে-পড়ে-থাকা বাকি দুটি সময়ের একাকিত্ব টের পাচ্ছেন কি? যদি পেয়ে থাকেন, তবে এখনই নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টায় নেমে পড়ুন। তা হলে আপনার জন্যও থাকবে এই সুসংবাদ : 'শান্তি আপনার ওপর—যেদিন আপনার জন্ম হয়েছে, যেদিন আপনি মারা যাবেন, আর যেদিন আপনাকে জীবিত করে ওঠানো হবে।'

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১৫/৪৮২)

সূরা ত্ব-হা

سُوْرَةُ طٰهٰ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪৫-তম সূরা। এর আগে সূরা মারইয়াম ও পরে সূরা ওয়াকিয়া নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মারইয়াম আর পরে সূরা আম্বিয়া।

এক নজরে ত্ব-হা

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ২০
- আয়াত: ১৩৫
- মাক্কি

সূরা ত্ব-হা | সূরা মুসা | সূরাতুল কালীম

নামের রহস্য

এ-সূরার তিনটি নাম পাওয়া যায়। **(১) ত্ব-হা**—সূরাটি শুরুই হয়েছে 'ত্ব-হা' শব্দ দিয়ে। **(২) সূরা মুসা**—এতে মুসা ﷺ-এর ঘটনা জায়গা পেয়েছে। **(৩) সূরাতুল কালীম**। মুসা ﷺ-কে 'কালীম' বলা হয়। কেননা, তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলি।

০২ মুসা ﷺ-এর ঘটনা।

০৩ নবিজির প্রতি উপদেশ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির একদম শুরুতেই আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কুরআন কোনো বোঝা নয়; উপহার—“তোমাকে দুরবস্থায় ফেলার জন্য তোমার কাছে কুরআন নাযিল করিনি।” তবে দুরবস্থা আসলে কাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তা জানিয়েছেন সূরার শেষের দিকে—“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে সংকীর্ণ, আর কিয়ামাতের দিন তাকে ওঠাব অন্ধ করে।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এই সূরার আগের সূরাটি হলো সূরা মারইয়াম। যার শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবিজির জন্য কুরআন প্রচারের কাজটি সহজ করে দেওয়ার কথা বলেছেন। সেই সহজীকরণের ধারাবাহিকতায়, এই সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ আবারও স্মরণ করিয়ে দিলেন, “তোমাকে দুরবস্থায় ফেলার জন্য তোমার কাছে কুরআন নাযিল করিনি।”

শানে নুযুল

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন—তোমাকে দুরবস্থায় ফেলার জন্য তোমার কাছে এই কুরআন নাযিল করিনি। ওদেরকে যেকোনো মূল্যে ঈমান আনানোর প্রয়োজন নেই। তুমি শুধু কুরআনের মাধ্যমে ওদেরকে সতর্ক করে দাও। মানা, না-মানা তাদের ব্যাপার। এরপরেই আল্লাহ প্রসঙ্গ পালটে মুসা ﷺ-এর কাহিনি বর্ণনা করতে শুরু করেন। এটি গতানুগতিক কাহিনি বর্ণনা নয়। বরং এই কাহিনির মধ্য দিয়ে মুসা ﷺ-এর সময়কার কিছু বিষয়ের সাথে মক্কার মানুষদের চাল-চরিত্র মিলিয়ে দেখান তিনি। এর একটা কারণ আছে। আরবে মুশরিকদের পাশাপাশি অনেক ইহুদি থাকত। তা ছাড়া আরবের পাশে রোমানীয় ও হাবশীদের সাম্রাজ্য। এরা ছিল খ্রিষ্টান। এই তিন পক্ষই মুসা ﷺ-কে আল্লাহর নবি হিসেবে স্বীকার করত। আর মুশরিকরা ছিল মূর্তিপূজারি। তবু বাকি সবার প্রভাবে তাদের অবচেতন মন মুসা ﷺ-কে আল্লাহর নবি বলে মেনে নিয়েছিল। তো সবার কাছেই যিনি গ্রহণযোগ্য, তাঁকে দিয়ে উদাহরণ দিলেই তো সবাই সহজে বুঝতে পারবে। তাই আল্লাহ তাআলা এই সূরা নাযিল করে মুসা ﷺ-এর কাহিনি উপস্থাপন করলেন। আর এর মাধ্যমে মুশরিকদের কিছু ভ্রান্ত যুক্তির জবাব দিলেন।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১১/১৬৩)

সেগমেন্ট

কুরআন ও আল্লাহ

কুরআন নাযিলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন যিনি নাযিল করেছেন, তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

হিদায়াত

কুরআনের মতোই পথ-নির্দেশনা নিয়ে এসেছিলেন নবি মুসা। তখন ফিরআউন প্রত্যাখ্যান করেছিল। বনী ইসরাঈলও অবাধ্য হয়েছিল।

ইবাদাত ও আত্মসমর্পণ

মুশরিকদের ভ্রান্তি খণ্ডন করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর সামনে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ফজিলত

এ-সূরায় আল্লাহ প্রথমবারের মতো নিজের পরিচয় নিজের জবানিতে দিয়েছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ তার বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনু যাইদ ﷺ-এর নিকট সূরা ত্ব-হা'র শুরুর অংশ শুনেই ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলেন।

(দেখুন—বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ২/২১৯-২২০)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মনের মাঝে সব সময় সত্যকে ধারণ করলে; → খারাপ বিষয়াদি দূরে রেখে, ভালো বিষয়গুলো অর্জন করা সম্ভব হবে।

গতিপথ

১. কুরআন ও আল্লাহ
কুরআন বোঝা হিসেবে নয়, বরং হিদায়াত ও ক্ষমার বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে এসেছে। এটি আল্লাহর বিশাল এক নিয়ামাত—যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর পথে অবিচলতা ও তাঁর ওয়াদার ওপর পূর্ণ আস্থা

২. মুসা ﷺ-এর কাহিনি
সূরার বড় একটি অংশে মুসা ﷺ-এর নবি-জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অহংকারী ফিরআউনের সামনে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ আজও যেন বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

৩. অহংকারী ও অবাধ্যদের পরিণতি
ফিরআউন অহংকার দেখিয়েছিল। স্পষ্ট সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বনী ইসরাঈলও বাছুর-পূজার মাধ্যমে নবির অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছিল। এদের সবার জন্যই ছিল কঠিন শাস্তি।

৪. থাকতে হবে অবিচল
দ্বীনের পথে অটল-অবিচল থাকতে হবে। তা হলে মিলবে অফুরন্ত পুরস্কার।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআন একটি মিশন নিয়ে এ ধরার বুকে এসেছে। আর যিনি একে নাযিল করেছেন, সকল প্রশংসা তাঁরই।	১-৮	তাওরাত আনতে তূর পাহাড়ে গেলেন মুসা ﷺ। তিনি উপস্থিত না থাকায়, তাঁর জাতির লোকেরা পথভ্রষ্টতার দিকে পা বাড়ায়।	৮৩-৯৮
শৈশব ও যৌবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে নবি হলেন মুসা ﷺ। নুবুওয়াত পেয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর বিশেষ দুআ।	৯-৪৪	যারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।	৯৯-১০৪
আল্লাহ তাআলা তাঁকে কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই সাথে অভয় দিয়ে নিশ্চিন্তও করেছেন।	৪৫-৪৮	বিচার দিবসের একটি চিত্র দেখানো হয়েছে।	১০৫-১১২
মুসা ﷺ গেলেন ফিরআউনকে দাওয়াত দিতে। ফিরআউনের চ্যালেঞ্জ ও সেই চ্যালেঞ্জে মুসা ﷺ-এর বিজয়।	৪৯-৭৬	আদম ﷺ ও তাঁর বংশধরদের সাথে ইবলিসের চির-শত্রুতার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।	১১৩-১২৭
বনী ইসরাঈলিদের নিয়ে মুসা ﷺ-এর মিশর ত্যাগ। ওদিকে ফিরআউন ও তার দলবল ভয়াবহ পরিণতির দিকে পা বাড়াল।	৭৭-৮২	আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে আপাতত ছাড় দেওয়ার কারণ পরিষ্কার করলেন। পাশাপাশি নবি ﷺ-এর জন্য কিছু উপদেশ।	১২৮-১৩৫

কেইস-স্টাডি

মুসা ও হারুন عليهما السلام ফিরআউনকে গিয়ে বললেন: 'আমরা তোমার কাছে তোমার রবের পয়গাম নিয়ে এসেছি। শান্তি তার ওপরেই বর্ষিত হবে, যে সঠিক পথনির্দেশনা অনুসরণ করবে।' কিন্তু ফিরআউন সঠিক পথ অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন মুসা عليه السلام ফিরআউনকে তাঁর মু'জিযাগুলো দেখালেন এক-এক করে। সেসব দেখে ফিরআউন মুখ বাঁকিয়ে বলল, এগুলো সব জাদু। মুসা, তুমি দিন-তারিখ ঠিক করো, সেদিন আমার জাদুকররা তোমার জাদুর মোকাবিলা করবে। ফিরআউনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, মুসা عليه السلام বছরের একটি উৎসবের দিন বেছে নিলেন। ওই উৎসব ঘিরে প্রতি-বছর প্রচুর লোকজন জড়ো হয়। এটাই বড় সুযোগ। বহু মানুষের সামনে আল্লাহর দ্বীনের সত্যতা প্রমাণ হবে, আর মিথ্যার অনুসারীদের ভাঁওতাবাজি ফাঁস হবে। অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে তাওহীদের দাওয়াত। মুসা عليه السلام ঠিক এই সুযোগটিই কাজে লাগালেন। ধরা যাক, কোনো পাবলিক-ইভেন্টে আপনি কথা বলবার সুযোগ পেলেন। আপনিও কিন্তু চাইলেই কথার ফাঁকে ফাঁকে—উদাহরণ হিসেবে—মানুষকে ভালো কাজের নসিহত করতে পারেন। আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে পারেন।

(দেখুন—মুসলিম, ২৬৬৪; ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ৮/৩১৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা সিনাই পাহাড়ে মুসা عليه السلام-এর সাথে কথা বললেন। তাঁকে নুবুওয়াতের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আদেশ দিলেন: মুসা, ফিরআউনের কাছে যাও। তাকে বলো আমার ওপর ঈমান আনতে। একটু চিন্তা করুন, ফিরআউন যেখানে মুসা عليه السلام-কে হন্যে হয়ে খুঁজছে—পেলেই হত্যা করবে—সেখানে ফিরআউনের কাছেই পাঠানো হচ্ছে তাঁকে! তবু মুসা عليه السلام শোনা-মাত্র মেনে নিলেন। আর দুআ করলেন: "রব আমার, আমার বুকটা প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও, আর আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও—যাতে তারা আমার কথার মর্ম বুঝতে পারে।" শুরুতেই তিনি বুক প্রসারিত করে দিতে বললেন। কেন? তিনি আসলে নিজেকেই একটা রিমাইন্ডার দিলেন: তাঁর হৃদয় যেন এই সত্য সব সময় মনে রাখে, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে গিয়ে জগতের কেউই তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এই বিশ্বাসই তাঁকে সাহস জোগাবে। (দেখুন—তিরমিযি, ২৫১৬)

মুসা عليه السلام যখন ছোট ছিলেন, তখন না-বুঝে একবার জ্বলন্ত কয়লার টুকরো মুখে দিয়ে ফেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জিভ পুড়ে যায়। সে-কারণে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারতেন না। তিনি কিন্তু আল্লাহর কাছে জিহ্বার জড়তা পুরোপুরি সারিয়ে দেওয়ার জন্য দুআ করেননি। বরং অল্প সময়ের জন্য জড়তাটুকু দূর করে দিতে বললেন। অথচ তিনি দুআ করলে, আল্লাহ তাঁকে পুরোপুরিই সুস্থ করে দিতেন। এখান থেকে বোঝা গেল—নবিরা নিজের চেয়ে দ্বীনের স্বার্থকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। অথচ আমরা! আমাদের প্রায়োরিটি লিস্টগুলো কেবলই যেন দুনিয়া আর দুনিয়ার চাকচিক্য দিয়ে বোঝাই!

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১৫/৫৩; ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, ৭/৪২১)

সূরা আম্বিয়া

سُورَةُ الأَنۢبِيَآءِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭৩-তম সূরা। এর আগে সূরা ইবরাহীম ও পরে সূরা মুমিনুন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ত্ব-হা আর পরে সূরা হাজ্জ।

এক নজরে আম্বিয়া

- মাক্কি যুগের শেষদিকে নাযিল
- সূরা নং: ২১
- আয়াত: ১১২
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘আম্বিয়া’ শব্দটি ‘নাবি’ শব্দের বহুবচন, যার অর্থ সংবাদদাতা; বার্তাবাহক; নবি। এই সূরার ৫১–৯১ নং আয়াত পর্যন্ত অতীতের নবি-রাসূল ও তাঁদের উম্মতদের কর্মপন্থা পর্যালোচনা করার পর ৯২–৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ মূলত একই উম্মাহ, সুতরাং তাদের উচিত সেই ঐক্য ধরে রাখা; অর্থাৎ, সকল নবি-রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করা এবং আল্লাহকে একমাত্র রব মেনে কেবল তাঁর গোলামি করা। সেখান থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে ‘আম্বিয়া’ (নবিগণ)।

মেজর থিম

০১. কিয়ামাত ঘটার সময় খুব নিকটে।

০২. আগের জাতিগুলো থেকে শিক্ষা।

০৩. কিয়ামাত ও রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

এই সূরার শুরুতে আল্লাহ বলেন, "মানুষের হিসাব দেওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।" অর্থাৎ কিয়ামাতের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক থাকতে ও প্রস্তুতি নিতে বলা হলো। আর এর শেষে বলা হয়েছে কিয়ামাত বাস্তবায়িত হওয়ার কথা—"সত্য ওয়াদা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ত্ব-হা। যার শেষ দিকে বিচার-দিবস সম্পর্কে কাফিরদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে; শোনানো হয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারি: "তুমি বলে দাও, 'সবাই অপেক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও অপেক্ষা করো।'" আর সূরা আম্বিয়া শুরু করা হয়েছে সেই বিচার-দিবস ঘনিয়ে আসার বিষয়ে আলোচনার মধ্য দিয়েই।

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়া শুরু করলেন। আর মুশরিক নেতারা শুরু করল রাসূলের বিরোধিতা। এই দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের কথা উঠে এসেছে এই সূরাতে। মুশরিকরা রাসূলের বিরোধিতা করতে গিয়ে নানা অমূলক কথা বলত। সেই সাথে তুলে ধরত নানা সংশয়-সন্দেহ ও আপত্তি। আর সেগুলো দিয়ে অন্যান্য মানুষকে রাসূলের থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। এই সূরাতে তাদের ওসব ভ্রান্ত যুক্তির জবাব দেওয়া হয়। তারা রাসূলের ব্যাপারে যে চক্রান্ত করছে, সে-সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়। তার বিরোধিতা করলে ফল যে সুন্দর হবে না, এ-বিষয়টিকে আল্লাহ জোর দিয়ে বুঝিয়ে দেন। আগেকার জাতিগুলোর ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। তাদের নবিরাও যে বাকি সকলের মতো মানুষ ছিলেন, সেটি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। তাই তোমাদের নবির মধ্যেও মানবীয় বৈশিষ্ট্য থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। পরিশেষে কাফিরদেরকে আল্লাহ মনে করিয়ে দেন—যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের জন্য বিপদের কারণ ভাবছো, তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ। সবমিলিয়ে, তাওহীদ, আখিরাত ও রিসালাত—ইসলামের এই মৌলিক তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত রূপ তুলে ধরতেই এই সূরাটি নাযিল করা হয়।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ৯/৩)

সেগমেন্ট

বিভ্রান্তি খণ্ডন

মুশরিকদের বিভিন্ন অপপ্রচারের যুক্তিসংগত জবাব দেওয়া হয়েছে প্রথম অংশে।

খণ্ডনের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক দলিল

শেষ অংশে অতীত জাতিগুলোর ইতিহাস টেনে, সেসব যুক্তি-প্রমাণকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

এখান থেকে বোঝা যায়, দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। যুক্তি-আলাপের পরে যদি ইতিহাস থেকে একটা রেফারেন্স শেয়ার করা যায়, তা হলে বক্তব্যের ওজন অনেক বেড়ে যায়। বক্তব্যটি আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

ফজিলত

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه বলেছেন,

'সূরা বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম ও আম্বিয়া প্রথমে-নাযিল-হওয়া অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরানো রক্ষিত সম্পদ।' (বুখারি, ৪৭০৮, ৪৭৩৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগ-মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকুন; → তা হলে দিন হবে প্রাণবন্ত আর মন থাকবে প্রফুল্ল।

গতিপথ

১. কিয়ামাতের ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতা

সকল নবি-রাসূলই পৃথিবীতে এসে মানুষকে কিয়ামাতের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুরু থেকেই গোঁয়ার্তুমি করেছে। ভুলে গেছে আল্লাহর বাণী। উদাসীনতা দেখিয়েছে কিয়ামাতের ব্যাপারে।

সেন্ট্রাল থিম

সভ্যতা নির্মাণে নবি-রাসূলদের ভূমিকা

২. বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ

যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। সত্য-সুন্দর সমাজ গড়তে প্রত্যেক নবি-ই তাঁর জাতির লোকদেরকে তাগিদ দিয়েছেন।

৩. নবিদের মিশন ও মানব-জাতির জন্য শিক্ষা

দ্বীনকে সমুন্নত করতে সকল নবি-রাসূলই ভীষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাঁদের থেকে সব বিপদ সরিয়ে দেন। এতে মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

৪. চূড়ান্ত হিসাব ও জবাবদিহিতা

প্রত্যেকটি রূহ হিসেবের কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। তবে চমৎকার পরিণতি তো তাদের জন্য, যারা নবি-রাসূলের দেখানো পথ দুনিয়ার বুকে অনুসরণ করে গেছেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মানুষের সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে, অথচ এ নিয়ে তারা কিছুতেই মাথা ঘামায় না। উলটো কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে।	১-৬	ইবরাহীম ﷺ-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।	৫১-৭৩
ওহির মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করা সকল নবি-রাসূলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।	৭-১৫	নবি লূত, নূহ, দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইসমাঈল, ইদরীস, যুল-কিফ্ল, ইউনুস, যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া ﷺ সম্পর্কে আলোচনা।	৭৪-৯০
আল্লাহ এক এবং তাঁর ক্ষমতাও বিপুল; আল্লাহ কোনো কাজ অনর্থক করেন না—এই ঘোষণাগুলো দেওয়া হয়েছে।	১৬-৩৩	মারইয়াম ও তাঁর ছেলে ঈসা ﷺ-এর ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	৯১
তাকদীর আগে থেকেই ফিক্সড়। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভীষণ দয়ালু।	৩৪-৪৭	এই উম্মাহ একই সুতোয় গাঁথা। আর কিয়ামাতের দিন বিচার হবে ন্যায়সংগত—একেবারে ঝকঝকে বিচার।	৯২-১০৬
মুসা ও হারুন ﷺ-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং তাওরাতের সাথে কুরআনের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।	৪৮-৫০	নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিবরণ, তাঁর মিশন, এবং যারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাদের পরিণতি আলোচনা করা হয়েছে।	১০৭-১১২

কেইস-স্টাডি

‘خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ মানুষকে যেন তাড়াহুড়া দিয়ে বানানো হয়েছে।’এ-সূরার ৩৭ নং আয়াত। মানুষ খুব তাড়াহুড়ো-প্রবণ। এই কথাটি কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ নানানভাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শানকিতি ﷺ বলেন—মানুষ যদিও স্বভাবগতভাবেই তাড়াহুড়ো-প্রবণ, তবু চেষ্টা করলে সে নিজেকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। নিজেকে স্থিরতা ও ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দিতে পারে। যেমনটা নফসের চাহিদা ও কামনা-বাসনার বেলায় দেখা যায়। কামনা-বাসনার প্রতি মানুষের স্বভাবগত ঝোঁক আছে সত্য, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতাও তার আছে। হিসেব করলে দেখা যাবে, মানুষ তার জীবনে যত ভুল করে, তার বেশিরভাগই তাড়াহুড়ো করার কারণে। এজন্য যতটা সম্ভব মনকে স্থিরতা শেখাতে হবে। এমনিতেই আমরা বাস করি এক অস্থির দুনিয়ায়—যেখানে প্রতিনিয়ত ইস্যুর-পর-ইস্যু তৈরি হচ্ছে—সেখানে নিজেকে স্থির না-রাখতে পারলে বিপদের শেষ নেই। অস্থিরতার স্রোতে কচুরিপানার মতোই ভেসে যেতে হবে।

(দেখুন—শানকিতি, তাফসীর, ৪/১৫২)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ তোমরা যদি না জানো, তা হলে যারা জ্ঞানী, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। ইমাম সা'দি (রহ) বলেন—এ আয়াতের মাধ্যমে দুটো বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। (১) মূর্খ লোকদের কাছে কোনোভাবেই দ্বীনের কোনো বিষয়ে জানতে চাওয়া যাবে না। আর (২) মূর্খদের জন্য উচিত নয় আলিম সেজে লোকজনকে ভুলভাল জ্ঞান দেওয়া। তো, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, হুজুর দেখলেই গলে যাওয়া যাবে না। আগে যাচাই-বাছাই করতে হবে সে আসলেই যোগ্য কি না। একজন সমঝদার আলিম হওয়ার জন্য যতটুকু পড়াশোনা দরকার, তা তার আছে কি না। এখন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বা জেনারেল শিক্ষিত হয়ে আমি কীভাবে বুঝব—অমুক হুজুরের পর্যাপ্ত পড়াশোনা আছে, কি নেই? আসলে মানুষের শিক্ষাদীক্ষা তার চালচলন ও আচরণের মধ্যেই ফুটে ওঠে। বক্তৃতায়, লেখনীতে তিনি যে বিষয়গুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করছেন, এর কতটুকু তার নিজের জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে—তা দেখলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ ছাড়া ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে যদি কারও আকীদা-বিশ্বাসে গড়মিল থাকে, তবে তাদের ব্যাপারেও হতে হবে সাবধান।

একইভাবে যেসব লোকজন দু-কলম পড়েই ছ-কলম লিখতে বসে যান, তাদেরও সাবধান হতে হবে। ওহির জ্ঞান এত সস্তা নয় যে, সাধ জাগলেই কথা বলা শুরু করে দেবেন। মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর আগে নিজেকে সঠিক পথে চালানো আরও বেশি জরুরি।

(দেখুন—সা'দি, তাফসীর, ৫১৯)

সূরা হাজ্জ

سُوْرَةُ الْحَجِّ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০৩-তম সূরা। এর আগে সূরা নূর ও পরে সূরা মুনাফিকুন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আম্বিয়া আর পরে সূরা মুমিনুন।

এক নজরে হাজ্জ

- মাদানি ও মাক্কি উভয় যুগে নাযিল
- সূরা নং: ২২
- আয়াত: ৭৮
- মাদানি মাক্কি

নামের রহস্য

‘হাজ্জ’ শব্দের অর্থ ‘সম্মানিত কারও কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করা’। লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য কা’বা-ঘরের দিকে ডাকতে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম ﷺ-কে আদেশ দেন। এই সূরার ২৬–৩৭ নং আয়াতে উঠে এসেছে সে-বিবরণ। সেই সাথে উঠে এসেছে হজ্জ ও পশু কুরবানির তাৎপর্য। সেখান থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে ‘হাজ্জ’।

মেজর থিম

০১ কিয়ামাতের বিভীষিকা।

০২ ইবরাহীম ﷺ ও আল্লাহর ঘর কা’বা।

০৩ কাফিরদের অবাধ্যতা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে মানব-জাতিকে তার রবের পাকড়াওয়ের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। আর শেষ অংশে বলা হয়েছে, সেইদিন রাসূল হবেন সমগ্র মানব-জাতির সাক্ষী। ওই দিনটিই হলো সেই দিন, যেদিন মানব-জাতিকে পাকড়াও করা হবে। এভাবে শেষ-বিচার দিনের ব্যাপারে শুরু-শেষের আলোচনা সূরাটিকে এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আম্বিয়া; যা শেষ হয়েছে সত্য ওয়াদা, অর্থাৎ কিয়ামাতের আলোচনা দিয়ে—"সত্য ওয়াদা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে।" আর সূরা হাজ্জের শুরুতেই এসেছে কিয়ামাতের ভয়াবহ বর্ণনা।

শানে নুযুল

আল্লাহ তাআলা পুরো সূরাটিতে তিন ক্যাটাগরির মানুষের ব্যাপারে কথা বলেছেন—কাফির, দোদুল্যমান মুসলিম ও সাচ্চা ঈমানদার। আর তাদের কার কী করণীয়, সেই নির্দেশনাও দিয়েছেন। প্রথম ক্যাটাগরিতে থাকা মক্কার কাফির-মুশরিকদের সাবধান করা হয়েছে—যাতে তারা হঠকারিতা বন্ধ করে এবং জাহিলি চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসে। তারা যাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বাদ দিয়ে নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচায়। কারণ, এই বিপদ থেকে কেউ-ই ওদেরকে বাঁচাতে পারবে না। এমনকি ওরা যেগুলোর উপাসনা করে, সেগুলোও কোনো উপকারে আসবে না। দ্বিতীয় ক্যাটাগরি—দোটানায় পড়ে থাকা মুসলিমরা। এরা যতক্ষণ মুশরিকদের হাত থেকে নিরাপদ থাকে, ততক্ষণ আল্লাহর সাথে থাকে। আর ওদের কাছ থেকে যেই-না কোনো জুলুম-নির্যাতন আসে, অমনি আল্লাহকে ভুলে বসে। তাই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো বিপদে ফেলতে চান, তবে কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। আবার আল্লাহ তোমাদের উপকার করতে চাইলে, কেউ-ই তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তৃতীয় ক্যাটাগরিতে আছেন সাচ্চা ঈমানদাররা। কুরাইশদের জুলুমের জবাব দিতে, আল্লাহ এই ক্যাটাগরির মানুষদেরকে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার অনুমতি দেন। অর্থাৎ সবার আগে এই সূরাটি নাযিল করে জিহাদের অনুমতি বা আদেশ দেওয়া হয়। যাতে করে কাফিররা ধ্বংস হয়। আর আল্লাহর জমিনে পুরোপুরি কায়েম হয় আল্লাহর দ্বীন।

(দেখুন—সা'দি, তাফসীর, ৫৩২)

সেগমেন্ট

দৃশ্যপট-১ মানুষ

সূরার সূচনা অংশে মানুষকে নিজের দিকে তাকাতে বলা হয়েছে। দেখো—কতখানি দুর্বল করে বানানো হয়েছে তোমাকে!

দৃশ্যপট-২ আল্লাহ

এবার আল্লাহর বড়ত্বের দিকে তাকাতে বলা হয়েছে। দেখো—দুর্বল মানুষের তুলনায় আল্লাহর সৃষ্টি কত বিশাল!

আত্মসমর্পণ

মানুষের নগণ্যতা, আর রবের সৃষ্টির বিশালতার দিকে তাকিয়ে বিবেকবান মানুষের সিদ্ধান্ত হবে একটাই—'আমি আমার রবের সামনে আত্মসমর্পণ করলাম।'

ফজিলত

উকবা ইবনু আমির ﵁ বলেন,

'আমি বললাম, "আল্লাহর রাসূল, সূরা হাজ্জ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, কারণ তাতে দুটি সাজদা আছে।" আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, যে ওই সাজদা-দুটি আদায় করবে না, সে যেন তা না পড়ে।'

(তিরমিযি, ৫৭৮, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

যথেষ্ট জ্ঞান ছাড়া দ্বীন নিয়ে কারও সাথে বিতর্কে জড়ানো যাবে না; → এতে নিজেরই পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে।

গতিপথ

১. কা'বার প্রকৃত কেয়ার-টেকার

মুশরিকদের অপরাধ অগণিত। তারা কোন মুখে কা'বা দেখভালের দায়িত্ব নিতে চায়! বরং এই দায়িত্ব লাভের একমাত্র হকদার মুমিনরা।

২. জিহাদ ও মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র

মুশরিকরা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের ওপর হামলা করে তাদেরকে ঘরছাড়া করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, মুসলিমরা পেল জিহাদের বৈধতা। এ ছাড়া তাদেরকে আলাদা রাষ্ট্রের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হলো।

সেন্ট্রাল থিম

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের বৈধতা

৩. আগেকার জাতিগুলোর পরিণতি ও তাওহীদ

তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণে আগেকার বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। সংশোধনের জন্য সময় দেওয়ার পরও, তারা যখন ফিরে আসেনি, তখন তাদেরকে ধ্বংস করার পথে আর কোনো বাধাও থাকেনি।

৪. মুমিনদের প্রতি দিক-নির্দেশনা

সূরা শেষ হয়েছে মুমিনদের প্রতি কিছু দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে। যেখানে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, জিহাদ ও মানব-জাতির কাছে দাওয়াত পৌঁছাবার বিষয়ে কথা বলা হয়েছে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাত মানুষের মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি করবে।	১-৭	আগেকার ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া জাতিগুলোর মধ্যে আছে শিক্ষা নেওয়ার রসদ।	৪২-৪৮
আল্লাহর ব্যাপারে মুশরিকদের তর্ক এবং মুনাফিকদের ইবাদাতের ধরন নিয়ে আলাপ করা হয়েছে।	৮-১৬	রাসূল ﷺ-এর প্রতি ওহির বিধানসমূহ নিয়ে আলোচনা।	৪৯-৬০
কাফির ও মুমিনদের মাঝে থাকবে স্পষ্ট ব্যবধান। আর দুনিয়াতে কাফিরদের পরিণতি থেকে মুমিনরা শিক্ষা নেবে।	১৭-২৪	সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার কিছু নিদর্শন-সংক্রান্ত আলোচনা।	৬১-৬৬
আল্লাহর পথে আসতে ও পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দেওয়ার শাস্তি নিয়ে আলোচনা এসেছে।	২৫-৩৭	মুশরিকদের বানানো আইন ও কর্মপদ্ধতির অসারতা নিয়ে আলাপ।	৬৭-৭৬
কাফিরদের জুলুমের বিরুদ্ধে মুমিনদেরকে জিহাদ করার ও নিজেদের আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।	৩৮-৪১	মুমিনদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে সূরাটি শেষ হয়েছে।	৭৭-৭৮

কেইস-স্টাডি

ভালো-মন্দ মিলিয়েই মানুষের জীবন। মানুষের জীবনে দুঃখ আসে আঁধার হয়ে। আবার সে-আঁধার কেটে ঝলমলে দিন আসে সুখ নিয়ে। চারিদিকে সুদিনের হাওয়া বয়। জীবনটা এভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। সুখ-দুঃখ কারও জীবনেই স্থায়ী হয় না। তবে যে-বিষয়টি জীবনে স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন সেটি হলো—এই সকল অবস্থাতে আল্লাহর আনুগত্যে লেগে থাকা। আল্লাহ আমাকে সুস্বাস্থ্য দিলেন, সম্পদ দিলেন, সন্তানাদিতে বরকত দিলেন—তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম, তাঁর ইবাদাতে মন লাগালাম। আবার যখন এই সুখের সময়ে ভাটা পড়ল, একে-একে সব নিয়ামাত হারাতে বসলাম, তখন আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হলাম, তাঁর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম! এ তো এক বিরাট অন্যায়! একজন সত্যিকারের মুমিন কখনোই এমনটি করতে পারে না। বরং তার তো উচিত—নিয়ামাত পেলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, আর নিয়ামাত ফিরিয়ে নিয়ে পরীক্ষায় ফেললে সবর করা। সবর করতে না পারলে, দুনিয়া তো যাবেই, সেই সাথে হারাতে হবে আখিরাতের প্রতিদানও।

(দেখুন—মুসলিম, ২৯৯৯; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ২৮৯৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক করে; তার কাছে না আছে কোনো জ্ঞান, না আছে কোনো পথ-নির্দেশনা, আর না আছে আলো ছড়ানোর কোনো কিতাব।" এ থেকে বোঝা গেল, যাদের কাছে জ্ঞান বা পথ-নির্দেশনা আছে, তারা কখনো আল্লাহর ব্যাপারে তর্কে জড়ায় না। যারা আল্লাহর ব্যাপারে অযথা তর্কে জড়ায়, দেখবেন এদের মধ্যে জ্ঞানের ঘাটতি আছে। কোনো কারণ ছাড়াই এরা অস্পষ্ট বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে। তো এই আয়াত থেকে আমাদের শিক্ষা হলো: কোনো বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট জানাশোনা না থাকলে, আমরা সে-বিষয় নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনায় নামব না। এতে করে আমাদের জ্ঞানগত দীনতাই শুধু ফুটে উঠবে না, সেই সাথে আমাদের ব্যক্তিত্বও পড়বে হুমকির মুখে। ওই বিষয়ে আগে আগাগোড়া জেনে নেব, এরপরে দরকার হলে কোনো মত দেবো, তার আগে নয়। আর সেই জ্ঞানটা হতে হবে ওহির আলোকে। এর বাইরে যত জ্ঞান আছে, সবই ঠুনকো। ওহি বা কুরআনের জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, এমন কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

(দেখুন—বুখারি, ২৪৫৭; আবু দাউদ, ৪৮০০; ইবনু মাজাহ, ৫১)

জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই ভ্রমণে বেড়িয়েছি। কিন্তু এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কখনো ভেবে দেখেছি কি? আসুন কুরআনের কাছ থেকে শুনে নিই—"তারা কি দুনিয়ায় ঘুরে দেখেনি, তা হলে তো তারা অনুধাবন করার মতো হৃদয় পেতে পারত, কিংবা (সত্যের) আওয়াজ শুনবার মতো কান লাভ করতে পারত!" এই সূরার ৪৬ নং আয়াত এটি। অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে, আমাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য হতে হবে—আল্লাহর নিদর্শন দেখা, সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া। অযথা ঘুরতে যাওয়ার ট্রেন্ড ফলো করা, খাওয়া-দাওয়া আর হই-হুল্লোড় করার জন্য যেন ট্যুর না হয়। (দেখুন—বুখারি, ৬৯৫৩)

সূরা মুমিনুন

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭৪-তম সূরা। এর আগে সূরা আম্বিয়া ও পরে সূরা সাজদা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা হাজ্জ আর পরে সূরা নূর।

এক নজরে মুমিনুন

- মাক্কি যুগের শেষ-দিকটায় নাযিল
- সূরা নং: ২৩
- আয়াত: ১১৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘মুমিনুন’ শব্দটি ‘মুমিন’ শব্দের বহুবচন—যার অর্থ ‘(আল্লাহর বাণীকে) সত্যায়নকারী; সত্য-বলে-মেনে-নেওয়া ব্যক্তি; ঈমানদার’। এই সূরার বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে মুমিনদের আলোচনা। যেখানে তাদের বৈশিষ্ট্য, করণীয় ও পুরস্কারের আলাপ তোলা হয়েছে। তো এসব কিছু বিবেচনায় এই সূরার নাম রাখা হয়েছে ‘মুমিনুন’।

মেজর থিম

- ০১ ঈমানদার হওয়ার আলামত।
- ০২ কাফিরদের আলামত।
- ০৩ শেষ পরিণতি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক।

সূরাটির প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা সফল ব্যক্তিদের পরিচয় দিয়েছেন, "মুমিনরা সফল।" আর শেষে দিলেন ব্যর্থ লোকদের পরিচয়—"অবাধ্যতার-পথ-বেছে-নেওয়া লোকেরা কখনো সফল হবে না।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা হাজ্জ; যার শেষে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা ঈমান এনেছ, তোমরা রুকু-সাজদা করো, আনুগত্যের মাধ্যমে তোমাদের রবের সামনে নতি-স্বীকার করো, কল্যাণমূলক কাজ করো—যাতে সফল হতে পারো।" আর এই সফলতা ও নামাজের আলোচনা দিয়েই সূরা মুমিনুন আরম্ভ হয়েছে।

শানে নুযুল

এই সূরার শুরুতেই আল্লাহ মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আর এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে মুমিনরা যে সফল—এই ঘোষণাও দিয়েছেন। আর যারা মুমিন নয়, তাদেরকে নানাভাবে বোঝানো হয়েছে। মানুষের জন্ম, আসমান-জমিন ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে অনেক নিদর্শন আছে। যেগুলো দেখে আল্লাহর ওপর ঈমান আনা অনেক সহজ হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাওহীদের যে বাণী নিয়ে এসেছেন, তা সত্য বলে মানা যায়। পরকালের ব্যাপারে যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস আনা যায়। আর এগুলো দেখে যদি কেউ বিশ্বাস না আনে—তা হলে এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। বরং এটা আগেকার লোকদের রীতি। তারাও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। রাসূলদের অবাধ্য হতো। পরিণতিতে তাদের কপালে জুটেছে ভয়াবহ শাস্তি। সুতরাং তোমরাও যদি ওই একই কাজ করো, তা হলে ফলাফলও তেমনই পাবে। তখনকার মুশরিকদের আরেকটি বাতিক ছিল। তারা মনে করত, তারাই সঠিক পথে আছে। তাই আল্লাহ ও তাদের দেবতাদের নেক-নজরে তাদের এই ভরপুর প্রাচুর্য! আর মুসলিমরা নেহাত ভুলের মধ্যে পড়ে আছে। নইলে কি আর এমন দুর্দশায় পড়ে থাকে! আল্লাহ তাআলা এই সূরা নাযিল করার মাধ্যমে তাদের এই ভুলও ভাঙিয়ে দিলেন যে, প্রাচুর্য কখনো আল্লাহর কাছে দামি হওয়ার মাপকাঠি নয়। বরং মাপকাঠি হলো আল্লাহভীতি। যেটা তোমাদের মুশরিকদের মধ্যে নেই। মোটকথা, আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সুসংবাদ ও কাফিরদেরকে সতর্কবার্তা দেওয়ার জন্যই এই সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ২৩/২৫৮)

সেগমেন্ট

ঈমানের পথে উৎসাহ জোগানো

সফলতা মুমিনদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—এই সূরাতে আল্লাহ পুরো মানব-জাতিকে তেমন ইঙ্গিত দিলেন।

বেঈমানদের প্রতি হুমকি

আল্লাহ তাআলার এত এত নিদর্শন দেখেও যদি কেউ ঈমান না আনে, তা হলে তার মতো হতভাগা আর কে হতে পারে?

ক্ষমা ও করুণা প্রার্থনা

সকলকেই তাঁর দিকে ফিরে আসতে হবে। তাঁর কাছে চাইতে হবে ক্ষমা ও করুণা। কারণ তিনি সর্বোত্তম করুণাকারী।

ফজিলত

জান্নাতে যাওয়ার পথ : নবি ﷺ বলেন, 'আমার ওপর দশটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে, যে তা ঠিকঠাক-মতো আমল করবে, সে জান্নাতে যাবে।' এরপর তিনি সূরা মুমিনুনের প্রথম দশটি আয়াত পাঠ করে শোনান।

(তিরমিযি, ৩১৭৩)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মুসলিমদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখা খুবই জরুরি; → ঐক্য না থাকলে জাতি হিসেবে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়বে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

প্রকৃত ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি

১. সত্যিকারের মুমিন

মুমিনদের আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে—যা দুনিয়ার বাকি সবার থেকে তাদেরকে আলাদা করে। এরাই জান্নাতের উত্তরাধিকারী।

২. বেঈমান ও তাদের পরিণতি

আদ-সামুদ জাতি, নূহ-শুআইব-লূত ﷺ-এর জাতি, ফিরআউন ও তার দলবল—এরা সবাই আল্লাহর অবাধ্য ছিল। পরিণতি হিসেবে দুনিয়াতেই এরা ধ্বংস হয়েছে, আখিরাতেও আছে কঠিন শাস্তি।

৩. মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়

রাসূল ﷺ নুবুওয়াত নিয়ে আসার পর থেকেই মক্কার মুশরিকদের বাহানার শেষ নেই। নানা ওজর-আপত্তি ও অভিযোগের ফিরিস্তি আছে তাদের কাছে। সেসব অভিযোগ খণ্ডন করে তাদেরকে দ্বীন গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

৪. তাওহীদ ও আখিরাতের সত্যতা

আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ থাকলে তো প্রত্যেকে নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিত। দুনিয়াতে দেখা দিত চরম বিশৃঙ্খলা। যেহেতু সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, তাই বুঝে নিতে হবে, আল্লাহ এক—এই দাবি শতভাগ সত্য। আর আখিরাতের ব্যাপারে তাঁর ওয়াদাও সত্য।

ওভারভিউ	আয়াত
মুমিনদের কতিপয় গুণাবলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	১-১১
আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।	১২-২২
নবিদের প্রতি বিশ্বাস ও যুগে যুগে তাঁদের প্রতি বিভিন্ন জাতির প্রতিক্রিয়া কী ছিল—সেসব বিষয়ের আলোচনা।	২৩-৫২

ওভারভিউ	আয়াত
রাসূলদের বিদায়ের পর প্রতিটি জাতিই নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।	৫৩-৭৮
আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর অপার ক্ষমতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	৭৯-৯৮
কিয়ামাত দিবসের কিছু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে।	৯৯-১১৮

কেইস-স্টাডি

আল্লাহ তাআলা এই সূরার ৫১ নং আয়াতে তাঁর সকল রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমরা হালাল খাবার খাও আর ভালো কাজ করো...।" এখানে আল্লাহ শুধু রাসূলদেরকে আদেশ দেননি। বরং এই আদেশ আমাদের সকলের জন্য। আমরা যখন কোনো কাজে শ্রমিক বা সাহায্যকারী নিয়োগ করি, তখন কিন্তু আগে কিছুটা কাজ করিয়ে নিই, এরপর খাবার খাওয়ার সময় দিই। কিন্তু আল্লাহ বললেন—না, আগে হালাল খাও, এরপর ভালো

কাজ করো। এর কারণ হলো, হালাল খাবারের সাথে আমাদের বিরাট এক মনোসংযোগের ব্যাপার রয়েছে। হালাল খাবার খেলে ইবাদাতে যেই স্বাদ আপনি পাবেন, তা আর কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আগে হালাল খেতে হবে, এরপর ভালো কাজ করতে হবে। নইলে যতই ভালো কাজ করি না কেন, কোনো আমলই আল্লাহর কাছে পৌঁছবে না। পেরুবে না আসমানের দরজা। সুতরাং আমাদের ইনকাম সোর্সের দিকে কঠোর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমার কামাইয়ের একটি পয়সাও যেন হারামের ছোঁয়া না পায়। দরকার হলে একটু কম খাব, কম আয়েশ করব, তবু জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাব।

(দেখুন—বুখারি, ১৪১৭, ৬০২৩, ৬৫৩৯; মুসলিম, ১০১৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

দিন-রাত মিলিয়ে আমাদের হাতে সময় ২৪ ঘণ্টা। কিন্তু এই ঘণ্টাগুলো সবার জন্যই কি সমান? নাকি ব্যক্তিভেদে এটার তফাত হয়? দুনিয়ার সফল ব্যক্তিদের কাছে কিন্তু এই সময়টা আরও বড়। তারা প্রতিটি ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড হিসেব কষে তারপর দিন শুরু করেন। ক'মিনিট ব্যায়াম করবেন, ক'মিনিটে নাস্তা সারবেন, অফিসে কার কার সাথে কখন কোথায় কী-জন্য মিট করবেন, সবকিছুর পূর্ণ তালিকা থাকে। যাতে একটি সেকেন্ডও অযথা নষ্ট না হয়। এবার দেখা যাক, আল্লাহর চোখে সফল কারা। এই সূরার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ বললেন, "মুমিনরা সফল।" দ্বিতীয় আয়াতে বললেন, "যারা তাদের নামাজে বিনয়ী।" তৃতীয় আয়াতে বললেন, "যারা খেল-তামাশা ও যাবতীয় ফালতু কাজ থেকে দূরে থাকে।" ওপরের আলাপগুলোর কারণটা এতক্ষণে ধরতে পেরেছেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ, মুমিনের বৈশিষ্ট্য হবে এটাই যে, সে কোনোভাবেই কোনো ধরনের ফালতু কাজের সাথে নিজেকে জড়াবে না। অথচ আমাদের দিনগুলো কী হেলায় কেটে যাচ্ছে! দ্বীন-দুনিয়া সকল ক্ষেত্রেই আমাদের উদাসীনতা চোখে পড়বার মতো। সবকিছু কেমন যেন খাপছাড়া। আমাদের মধ্যে বহু যুবকের রাত কাটে হাতের স্মার্টফোনটির দিকে অবাক নয়নে তাকিয়ে থেকে। রাতভর অযথা বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি, সোশ্যাল-মিডিয়ার সস্তা শর্টস্ বা রিলস্ তো আছেই। 'এত কাজ' শেষে ক্লান্তিতে চোখটা আপনা-আপনিই বুজে আসে। ফজর কোথা দিয়ে এল, আর কোথা দিয়ে গেল, তা দেখবার সুযোগ কই! মুসলিম যুবকের জন্য আফসোস! একটিবার চিন্তা করা দরকার—কানে হেডফোন লাগানো, নানা দেশের নানা ভাষায় সুরের ঝংকার বয়ে চলেছে কানে-মনে-মগজে; আর সে-সময়টাতেই মৃত্যুর ফেরেশতা আমার সামনে হাজির! তখন কী অবস্থা হবে আমার? ঠিক কীভাবে মৃত্যুর পর আমি জেগে উঠব! আল্লাহর সামনে কোন মুখে দাঁড়াব? ভাববার সময় আমাদের হাতে আছে কি?

(দেখুন—তিরমিযি, ২৩১৭; ইবনু মাজাহ, ৩৯৭৬)

সূরা নূর

سُوْرَةُ النُّوْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০২-তম সূরা। এর আগে সূরা হাশর ও পরে সূরা হাজ্জ নাযিল হয়।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২৪-তম সূরা। এর আগে আছে সূরা মুমিনুন ও পরে সূরা ফুরকান।

এক নজরে নূর

- ৫ম হিজরির শেষদিকে নাযিল
- সূরা নং: ২৪
- আয়াত: ৬৪
- মাদানি

নামের রহস্য

'নূর' মানে 'আলো'। এ-সূরার ৩৫ নং আয়াতে, আলো নিয়ে ভীষণ সুন্দর একটি উপমা এসেছে। সেখানে আল্লাহ তাআলা নিজেকে বিশ্ব-জগতের আলো হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এ ছাড়াও সূরাটিতে সাতবার 'নূর' কথাটি এসেছে। সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে 'নূর'।

মেজর থিম

০১ ব্যভিচারের শাস্তি, অপবাদ রটানোর পরিণতি।

০২ আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক-নির্দেশনা।

০৩ ঈমানের আলামত। নৈতিকতা ও আচরণবিধি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ স্পষ্ট করে তাঁর বিধি-বিধান জানিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। আর তাঁর বান্দাদের মাঝে কে এসকল নিয়ম-কানুন মেনে চলে আর কে বিরোধিতা করে, সে-ব্যাপারেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এর সাথে রিলেইট করে সূরার শেষ দিকে আল্লাহ বলেন, "সুতরাং যারা রাসূলের আদেশের বিরোধিতা করে, তাদের সাবধান হওয়া উচিত—তাদেরকে কঠিন পরীক্ষা স্পর্শ করবে, অথবা তাদেরকে স্পর্শ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এই সূরাটির আগের সূরা হলো সূরা মুমিনুন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও করুণা চাইবার উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে সূরাটির ইতি টানা হয়েছে। আর সূরা নূর শুরু হয়েছে শাস্তির আলোচনা দিয়ে। সমাজ থেকে অশ্লীলতা দূর করতে শাস্তির বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে আমাদেরকে বার্তা দেওয়া হলো—আল্লাহর রহমত চাওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর বিধানও কার্যকর করা জরুরি।

শানে নুযুল

সামরিক সক্ষমতায় কাফিররা সব সময় মুসলিমদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। তবুও আল্লাহর ইচ্ছায় বারবারই তারা মুসলিমদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে। তারা বুঝতে পারল—অস্ত্র দিয়ে মুসলিমদের দমানো যাবে না। তাই নতুন কৌশল হাতে নিল—মুমিনদের চরিত্রের ওপর আঘাত হানতে হবে। আর এই কাজে ব্যবহার করা হবে মুনাফিকদের। কারণ তারা সব সময় মুসলিমদের দলে মিশে থাকে। বনুল মুস্তালিক যুদ্ধ শেষে তেমনই এক মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেল তারা। সেই সফরে আয়িশা ﵂ নবিজির সাথে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরবে। যাত্রা-বিরতিতে ঘুমিয়েছিল সবাই। ঘুম থেকে উঠেই রওনা হলো সকলে। পেছনে পড়ে গেলেন আয়িশা ﵂ ও আরেকজন সাহাবি সাফওয়ান ﵁। সাফওয়ান তার উটের ওপর আয়িশা ﵂-কে বসিয়ে নিজে উটের রশি ধরে হাঁটতে লাগলেন। কিছুটা সময় পর তারা কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। আর এই ঘটনায় মুনাফিকরা ফেঁদে বসে এক মুখরোচক গল্প। তাঁদের দুজনের ওপর চাপিয়ে দেয় ভয়ংকর এক অপবাদ। আর এতে করে মুসলিমদের মধ্যে দেখা দেয় ভীষণ বিভ্রান্তি। সেখান থেকে আল্লাহ তাদের হেফাজত করেন। সেই সাথে নাযিল করেন সূরা নূর। যেখানে আয়িশা ﵂-কে সচ্চরিত্রের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আর যারা এই ন্যাক্কারজনক কাজে জড়িয়েছিল, তাদেরকে দেওয়া হয় বিরাট ধমকি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ-ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দিয়েছেন বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১২/১৫৮; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ১৪/১১৯)

সেগমেন্ট

বিধান প্রণয়ন ও শাসন

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা বেশ কিছু বিধান জারি করেছেন। এ ছাড়া কিছু সামাজিক আচরণবিধি বা শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ—সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী

আকাশ ও পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর হুকুমই কার্যকর।

আনুগত্যের চর্চা অব্যাহত রাখা

এই অংশে মুমিন ও মুনাফিকদের লক্ষ্য করে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে মুমিনদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে—তারা যেন ঈমানের পথে অটল থাকে।

ফজিলত

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন, “তোমরা সূরা বারাআ (সূরা তাওবা) শেখো। আর তোমাদের স্ত্রীদেরকে শেখাও সূরা নূর...।”

(সুয়ূতি, জামিউল আহাদীস, ২৯৭১৪)

সূরা নূরে পর্দার ব্যাপারে বেশ সতর্ক করা হয়েছে। দিক-নির্দেশনা দিয়ে বোঝানো হয়েছে—ঘরের নারীরা পর্দার বিধান মেনে চললে ঘরে আসবে শান্তির স্নিগ্ধ আলো। তাই উমর ﷺ বাড়ির মহিলাদেরকে তা শেখানোর ওপর জোর দিয়েছেন।

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কোনোভাবেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না; → কারণ, এতে শাস্তির পাশাপাশি খোয়াতে হবে নিজের মান-সম্মানও।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মুসলিম সম্প্রদায়কে পারিবারিক ও সামাজিক বিধান শেখানো

১. কিছু বিধি-বিধান

সতী নারীর ওপর অপবাদ দেওয়া ও এর শাস্তির ব্যাপারে আলাপ এসেছে। এ ছাড়া কারও ঘরে ঢুকবার নিয়ম, অসংলগ্ন দৃষ্টিপাত, পোশাক ও অলংকার এবং বিয়ে-সংক্রান্ত কিছু বিধানের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

২. মুসলিমদের সামাজিক দায়বদ্ধতা

অন্য কোনো মুমিনের ব্যাপারে বদনাম শোনা গেলে, তা সাথে সাথেই বিশ্বাস করা যাবে না। বরং পরস্পরের প্রতি রাখতে হবে সুধারণা।

৩. মুনাফিক ও মুমিনের বৈশিষ্ট্য

মুনাফিকরা কখনো কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখতে পারে না। তারা মুখে বলে এক, আর তাদের অন্তরে থাকে আরেক। তবে মুমিন কখনো এমন হতে পারে না। তার কথা-কাজে মিল থাকে শতভাগ।

৪. আরও কিছু সামাজিক বিধি-বিধান

ঘরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেসব মহিলা খুবই বৃদ্ধ, পর্দার ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রাসূলের সাথে মুমিনদের সম্পর্কের ধরন কেমন হবে, সেটিও জানানো হয়েছে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
ব্যভিচার ও এ-সংক্রান্ত বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১-৩	চরিত্র ঠিক রাখতে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বিয়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।	৩০-৩৪
কুৎসা বা অপবাদ রটানোর শাস্তি—আশিটি বেতের বাড়ি। ভবিষ্যতে কখনো তার সাক্ষ্য আর গ্রহণ করা যাবে না।	৪-৫	ঈমান ছড়ায় আলো, আর কুফর আনে অন্ধকার। আল্লাহর ক্ষমতা ও মহত্ত্বের কিছু নিদর্শন নিয়ে আলাপ করা হয়েছে।	৩৫-৪৬
নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষী হাজির করতে না পারলে, 'অভিশাপ'-এর বিধান কার্যকর করতে হবে।	৬-১০	তবে এসব নিদর্শন মুনাফিকদের কোনো কাজে আসে না। পূর্ণ আনুগত্যের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতেই আছে পুরস্কার।	৪৭-৫৭
আয়িশা ﵂-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অপবাদ রটানো বিরাট অপরাধ।	১১-২৬	কারও ঘরে প্রবেশ করতে হলেও অনুমতি নিতে হবে। এমনকি প্রাপ্ত-বয়স্ক সন্তান যদি নিজ বাবা-মা'র ঘরে ঢুকতে চায়, তবুও।	৫৮-৬১
কারও ঘরে ঢুকবার ক্ষেত্রে সাধারণ শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে।	২৭-২৯	রাসূল ﷺ-এর সাথে মুমিনদের যথাযথ আচার-ব্যবহার-সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।	৬২-৬৪

কেইস-স্টাডি

বিয়ে মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবন সম্পূর্ণ নতুন বাঁক নেয় বিয়ের মোহনায়। তবে দুঃখের বিষয় হলো—আমাদের সমাজে এই বিয়েটাকে এক অগ্নিপরীক্ষা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। যে পরীক্ষায় পাশ করতে হলে চাই সরকারি চাকরি, কাড়ি-কাড়ি টাকা, সামাজিক স্ট্যাটাস ইত্যাদি। সচ্চরিত্র, উত্তম আচার-আচরণ, দ্বীনদারিতা—এসব আজকাল খুব কমই দেখা হয়। অথচ টাকা-পয়সা কামাতে গিয়ে একটা ছেলের জীবন-যৌবন কলুষিত হয়। চরিত্র নষ্ট হয়! এই সূরার ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা নিঃসঙ্গ, তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দাও; তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন; আল্লাহ অনুগ্রহকারী, মহাজ্ঞানী।' অথচ আল্লাহর এই ওয়াদার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারছি না। আফসোস! একটু গভীরভাবে ভেবে দেখবার সময় পাব কি?

(দেখুন—বুখারি, ৫০৬৬, ৫০৯০; মুসলিম, ১৪০০, ১৬৬৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরাটির নাম আন-নূর। নূর মানে আলো। পুরো সূরাটিতেই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঝলমলে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। আমাদের সমাজে অশ্লীলতা এখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই অন্যায়ের বিষবৃক্ষ সমাজ থেকে কোনোভাবেই উপড়ে ফেলা যাচ্ছে না। এত সেমিনার, মানব-বন্ধন কিংবা মানব-রচিত আইন—কোনোকিছু দিয়েই ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু কুরআন আমাদেরকে কী চমৎকার সমাধানটাই না দিলো দেখুন! অন্যায় করে ফেললে কঠিন শাস্তি তো আছেই। কিন্তু অন্যায় হওয়ার আগেই কত শক্ত বাঁধুনি দিয়ে দিলো ইসলাম! এই সূরার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবিকে বলছেন, "তুমি মুমিন পুরুষদেরকে বলো—তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে, আর তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে; এটা তাদেরকে অনেক বেশি পরিশুদ্ধ রাখবে।" নারীদেরকেও দেওয়া হলো একই নির্দেশনা। আসলে নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি তখনই আকর্ষণ বোধ করে, যখন তারা একে-অন্যের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়। এজন্য কুরআন বলে দিলো—তুমি দৃষ্টিকে নত রাখো। তা হলে এরপরের ধাপে যেতে আর মন টানবে না। যিনা-ব্যভিচারের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। অবিবাহিত ছেলে-মেয়েকে দিতে হবে একশটা করে বেতের বাড়ি। প্রয়োজন মনে করলে নির্বাসনেও পাঠানো যাবে।

বিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তির কথা কুরআনে সরাসরি আসেনি। তবে তা আমরা হাদীস থেকে পাই। পাথর-ছুড়ে-মেরে তাদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করতে হবে। আর এসব শাস্তি কার্যকর করতে হবে একেবারে সবার সামনে। যাতে বাকিরা ভয়ে এই অন্যায়ের পথে কোনোদিন পা না-বাড়ায়। তবে হ্যাঁ, ব্যভিচারের এই শাস্তি কার্যকর করার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোর শর্ত আছে—স্বচক্ষে ব্যভিচার ঘটতে দেখেছে, এমন চারজন সাক্ষী লাগবে। অথবা দুজন নারী-পুরুষ স্বেচ্ছায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। এরপর ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফা বা খলিফার নিয়োগ করা কাজীর মাধ্যমে শাস্তি কার্যকর করা হবে।

(দেখুন—বুখারি, ২৭২৪-২৭২৫; আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুওয়াইতিয়্যা, ২৫/১০৩-১০৫)

সূরা ফুরকান

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪২-তম সূরা। এর আগে সূরা ইয়া-সীন ও পরে সূরা ফাতির নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা নূর ও পরে সূরা শুআরা।

এক নজরে ফুরকান

- নুবুওয়াতের ৫ম বছর নাযিল
- সূরা নং: ২৫
- আয়াত: ৭৭
- মাক্কি

নামের রহস্য

'ফুরকান' শব্দের অর্থ 'সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী'। কুরআনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে এই সূরার ১ নং আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকেই এই সূরার নাম হয়েছে 'ফুরকান'।

মেজর থিম

০১ কুরআনের বৈশিষ্ট্য।

০২ কুরআনের সত্যতা নিশ্চিত করা।

০৩ কুরআন মেনে-চলা বান্দাদের গুণাবলি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলেছেন, "তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অনেকগুলো ইলাহ মেনে নিয়েছে।" আর সূরার শেষে জানিয়েছেন সেসব মুশরিকদের পরিণতি। রাসূলকে বলার আদেশ দিয়েছেন—"তুমি বলে দাও, 'তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য না করলে আমার রবের কাছে তোমাদের কোনো মূল্য থাকবে না। আর তোমরা মিথ্যা বলে (আল্লাহর পয়গাম) উড়িয়ে দিয়েছ, ফলে এর শাস্তি তোমাদের পিছু ছাড়বে না!' "

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা নূর; যা শেষ হয়েছে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিয়ে: "মনে রাখবে—মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে, সবই আল্লাহর মালিকানাধীন।" এরপর সূরা ফুরকানও শুরু হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণার মাধ্যমে—"যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী।"

শানে নুযুল

রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করতে গিয়ে মক্কার কাফিররা একটা কমন ডায়লগ ঝাড়ত, 'এ আবার কেমন রাসূল! আমাদের মতোই খায়-দায়, আবার হাট-বাজারেও চলাফেরা করে! তার সাথে কোনো ফেরেশতা পাঠানো হয়নি কেন? তার কোনো ধনভান্ডার নেই কেন? তার এমন কোনো বাগান নেই কেন—যেখান থেকে সে নিশ্চিন্তে খেতে পারত? এখন তো সে না-খেয়েও থাকে! রাসূল আবার না-খেয়ে থাকে নাকি? আর সে যেই কিতাবের কথা বলছে, সেটি আর কিছুই না, আগেকার লোকদের কিস্‌সা-কাহিনিতে ভরা!' এই ডায়লগের মাধ্যমে তারা একইসাথে কুরআন, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর-দেওয়া শিক্ষাকে মিথ্যা বলত, মেনে নেওয়া তো আরও দূরের বিষয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এই সূরাটি নাযিল হয়। কাফিরদের-তোলা প্রত্যেকটি আপত্তির জবাব আল্লাহ তাআলা এখানে দেন। বুঝিয়ে দেন 'ফুরকান' তথা 'সত্য-মিথ্যের পার্থক্যকারী'। এই কুরআন নিজেই ফুরকান। তাই একে মিথ্যে বলার কিছু নেই। এই সূরা আমাদেরকে দুটো আদর্শের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় : একটি আদর্শ—ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয়-নেওয়া চরিত্রবান মানুষদের। আর একটি আদর্শ—কুফফার ও জাহিলিয়াতের পতাকাবাহী নিকৃষ্ট লোকদের। এখন সাধারণ মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তারা কোন আদর্শকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটাবে। আরবের সে-সময়কার একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছাড়া, বাকিরা কিন্তু ধীরে ধীরে ইসলামের পতাকা-তলেই নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছিল।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৩/১)

সেগমেন্ট

সতর্কতা

অবিশ্বাসীরা বিচার দিবসের দৃশ্য দেখে পাক্কা ঈমানদার হয়ে যেতে চাইবে।

মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা

আল্লাহকে অস্বীকার করার পরও আল্লাহ তাদের খাবার, পানি, আলো, বাতাস কেড়ে নেন না। এটা দেখে তারা মনে করে—তাদেরকে আর কোনো বিপদ ছুঁতেও পারবে না।

মানুষের মূল্য

একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষ দামি হয়। এ ছাড়া মানুষের কোনো মূল্য থাকে না।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম সেগুলোকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকমই একটি সূরা হলো সূরা ফুরকান।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

'হায়! দুনিয়াতে আমি যদি তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম!'—কিয়ামাতের দিন মানুষ এ বলে আফসোস করবে;

তাই দুনিয়ার বুকে বন্ধুত্ব পাতানোর বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মানব জীবনের সবচেয়ে বড় পাথেয়—আল-কুরআন

১. রাসূল ও ওহির উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর ওপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব—কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে সতর্ক করা যায়।

২. মুশরিকদের দাবি খণ্ডন

নবি ﷺ ও কুরআনের ব্যাপারে মক্কার মুশরিকদের বিভিন্ন মিথ্যা দাবি ছিল। সেগুলোকে আল্লাহ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন।

৩. লড়াই হবে কুরআন দিয়ে

যারা আল্লাহর অবাধ্য তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো—কুরআন। কারণ কুরআনের মধ্যে যে যুক্তিগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তা খণ্ডন করার ক্ষমতা কারও নেই।

৪. মুমিন ও মুশরিকদের প্রতি আহ্বান

মুমিনদেরকে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন—তাওহীদের চেতনাকে সমুন্নত করো। আর মুশরিকদের আহ্বান জানিয়েছেন—নিজেদেরকে সংশোধন করে ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে ফিরে আসো।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
সত্যিকারের ইলাহ—আল্লাহর গুণাবলি আলোচনা করা হয়েছে। মিথ্যা ইলাহ বা মূর্তিগুলো হলো অসার।	১-৩	মানুষের আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে নবিজির নালিশ এবং তাঁকে-দেওয়া সান্ত্বনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	৩০-৪০
কুরআনের ওপর কাফিরদের কিছু সন্দেহ উল্লেখ করে সেসবের জবাব দেওয়া হয়েছে।	৪-৬	যাদের কাছে নিজেদের চিন্তা বা বিশ্বাসের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই, হাসি-ঠাট্টাই তাদের প্রধান অস্ত্র।	৪১-৪৪
রাসূলকে নিয়ে তাদের সন্দেহ ও এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রতিক্রিয়া।	৭-১০	আল্লাহর রাসূল ﷺ মহাবিশ্বের খবর জানিয়েছেন, অথচ আগে এসব বিষয়ে তাঁর কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটি রিসালাতের একটি প্রমাণ।	৪৫-৫৫
তাদের এসব টালবাহানা ও অস্বীকৃতির পেছনে আসল রহস্য ফাঁস করা হয়েছে।	১১-১৯	রাসূল ﷺ-এর মিশন এবং অবাধ্যদেরকে আল্লাহর পথে ডাকার ক্ষেত্রে তাঁর কর্মপদ্ধতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।	৫৬-৬২
রাসূল বাছাইয়ের বেলায় আল্লাহর রীতি ও অহংকারী কাফিরদের স্বভাব নিয়ে আলোচনা।	২০-২৯	আল্লাহর বাণীর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	৬৩-৭৭

কেইস-স্টাডি

জীবনে চলার পথে আয়-ব্যয়ের হিসেব মেলানোটা খুব জরুরি। এই একটি জায়গায় যদি আপনি তাল ঠিক রাখতে না পারেন, তা হলে অনেক বড় সমস্যায় পড়ে যাবেন। বারবার হোঁচট খাবেন, থমকে দাঁড়াবেন। বউয়ের আবদার, ছেলে-মেয়ের হাজার বায়না, প্রয়োজন ছাড়াই ঘনঘন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার খাওয়া-সহ টাকা ফেলার জায়গা পান না আপনি। শেষে মাস না ফুরোতেই হাত খালি। পড়ে যান বেকায়দায়। ধারকর্জও হয়তো করা লাগে কখনো-সখনো। আছে এর উলটো চিত্রও। এই আপনার কাছেই একজন ফকির এসে হাত পাতলে আপনার পকেট থেকে দশটা টাকা খসে না। তখন আপনি খুব হিসেবি-মানুষ! ইসলাম এই দুটো কাজের কোনোটিকেই সমর্থন করে না। বরং ইসলাম আপনাকে দেখায় ভারসাম্যপূর্ণ পথ। এই সূরার ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের গুণাবলি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "(পরম করুণাময়ের প্রকৃত গোলাম তো তারা,) যারা খরচ করার সময় অপচয় করে না, কৃপণতাও করে না, বরং এ-দুয়ের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ পথ অনুসরণ করে।" তাই এই আয়াতটি নিয়ে প্রতিটি মুসলিমের গভীর গবেষণা ও স্টাডি করা উচিত।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬৬৯৫; নাসাঈ, ২৫৫৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কুরআন-বিরোধীদের আচরণ তুলে ধরতে গিয়ে এই সূরার ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ বললেন, "নাকি তোমার মনে হয়—তাদের অধিকাংশ (সত্যের ডাক) শোনে, কিংবা বিবেক কাজে লাগায়? তারা তো কেবল গবাদিপশুর মতো, বরং সঠিক পথ থেকে আরও বেশি বিচ্যুত।" অর্থাৎ যারা সত্যের ডাক শোনে না, কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাদের আচরণ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। গবাদিপশুরা ঘাসের মধ্যে সারাক্ষণ মাথা গুঁজে থাকে। খায়দায়, ঘুমায়। তাদেরকে ঘাস খাওয়াতে নেওয়া হচ্ছে, নাকি কসাইয়ের হাতে তুলে দিতে নেওয়া হচ্ছে—এসব নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহ কোনো বিবেক-বুদ্ধি দেননি। তো, বোধহীন প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা বেখাপ্পা লাগে না। কিন্তু বোধশক্তি থাকার পরও মানুষ কি বুঝবে না—তাকে তার প্রবৃত্তি ও শয়তান-পূজারিরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তার সাথে তো এ-আচরণ একেবারেই বেমানান। গবাদিপশু যেমন তার পেটের ধান্দায় থাকে সারাদিন—কুরআন-বিরোধীদের অবস্থাও ঠিক তেমন। সারাদিন শুধু নিজের প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার ধান্দায় থাকে। এরা সত্য দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না। এরা এদের মনকে 'ইলাহ'-এর আসনে বসিয়ে নিয়েছে। আমাদেরকেও এখন থেকে ভীষণ সাবধানী হতে হবে। শুধুমাত্র মনের তৃপ্তি জোগানোই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান না হয়। বরং আল্লাহর আদেশ সামনে এসে পড়লে, আমরা যেন তা পালন করতে কুণ্ঠাবোধ না করি। আমরা যেন ওসব গবাদিপশুর মতো না হই। আল্লাহ আমাদেরকে সুরক্ষা দিন, আমীন।

(দেখুন—বুখারি, ৭২৮৮; মুসলিম, ১৩৩৭; ইবনু মাজাহ, ৪৩)

সূরা শুআরা سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪৭-তম সূরা। এর আগে সূরা ওয়াকিয়া ও পরে সূরা নামল নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ফুরকান ও পরে সূরা নামল।

এক নজরে শুআরা

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ২৬
- আয়াত: ২২৭
- মাক্কি

নামের রহস্য

'শুআরা' শব্দটি এসেছে 'শায়ির' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'কবি'। মক্কার কুরাইশরা কুরআনকে নিয়ে নানা মন্তব্য করত। তার মধ্যে একটি ছিল—'এই কুরআন হলো কবির কল্পনা-বিলাস'। এই সূরার ২১০-২২৭ নং আয়াতে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ কুরআন আর কবিদের উচ্ছৃঙ্খল আবোল-তাবোলের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। তো সেখান থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'শুআরা'।

মেজর থিম

০১ রাসূল ﷺ-এর ওপর কাফিরদের অবিশ্বাস।

০২ মুসা ﷺ ও ফিরআউনের ঘটনা।

০৩ কুরআনের বিশ্বাসযোগ্যতা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তাআলা কুরআনকে 'স্পষ্ট কিতাব' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, "এগুলো এমন কিতাবের বার্তা, যা (সত্যকে) স্পষ্টভাবে তুলে ধরে"। একইভাবে, সূরাটির শেষের দিকেও আল্লাহ তাআলা তাঁর বাণীর স্পষ্টতার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "কোনো সন্দেহ নেই—এ (কুরআন) মহাবিশ্বের অধিপতির পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে; বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরীল) এটি নিয়ে এসেছে তোমার অন্তরে, যাতে তুমি হুঁশিয়ার করে দিতে পারো স্পষ্ট অর্থবোধক আরবি ভাষায়।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ফুরকান; যা শেষ হয়েছে কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করে। আবার সূরা ফুরকানও তাদেরকে সতর্ক করেই শুরু হয়েছে : "আমি চাইলে আকাশ থেকে একটি অলৌকিক নিদর্শন তাদের কাছে নিয়ে আসতে পারতাম, তখন তাদের ঘাড়গুলো এর সামনে নত হয়ে যেত!"

শানে নুযুল

মুশরিকরা নবি ﷺ-এর দাওয়াত ফিরিয়ে দিতে নানান বাহানা খুঁজত। আর খুঁজে খুঁজে সেগুলো নবিজির সামনে হাজির করত। কখনো বলত—কই কোনো মু'জিযা তো দেখালে না! তা হলে কীভাবে তোমাকে নবি হিসেবে মেনে নেব? কখনো বলত, তুমি গণক/কবি/জাদুকর। আবার কখনো-বা বলত—কিছু মূর্খ ও অর্বাচীন ছেলেপেলে মুহাম্মাদের দ্বীন গ্রহণ করেছে। এই কুরআন যদি ভালো কিছুই হতো, তা হলে আমাদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তারাই সবার আগে এটি গ্রহণ করত। এ ধরনের হাবিজাবি কথা বলে কুরআনের বাণীকে এড়িয়ে যেতে চাইত শুধু। আল্লাহর রাসূল ﷺ এতে খুব কষ্ট পান। তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সান্ত্বনা দেন। সেই সাথে জানিয়ে দেন কাফিরদের পেটের খবরও। মু'জিযা দেখলেও যে তারা ঈমান আনবে না, এই সূরাতে পরিষ্কার করে আল্লাহ তা বলে দিলেন। এরা তো আসলে হঠকারী, একগুঁয়ে জাতি। শত মু'জিযা দেখালেও জাদু বলেই উড়িয়ে দেবে। আর তাই তাদের জন্য হা-হুতাশ করো না। এদের জন্য হা-হুতাশ করে কোনো লাভ নেই। এরা অবাধ্য, অবাধ্যই থেকে যাবে। আজগুবি বিভিন্ন কথা বলে এরা কেবল ঠাট্টা করে। আগেকার সাত-সাতটা জাতি অনেক-রকম মু'জিযা দেখেও ঈমান আনেনি, নিজেদের অবাধ্যতার কারণে তারা ধ্বংস হয়েছে। এখনকার মুশরিক-কাফিররাও যদি ঈমান না আনে, এদের পরিণতিও হবে সেরকম—এই সতর্কবাণী শোনাতেই আল্লাহ তাআলা এ-সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৪/১)

সেগমেন্ট

অলৌকিক নিদর্শন

কাফিররা শুধু অলৌকিক নিদর্শন দেখবার দাবি করে। আল্লাহ যদি চাইতেন, তা হলে এমন নিদর্শন দেখাতেন যে, তারা এর সামনে মাথা নিচু করে রাখত।

আগেকার নবিদের ইতিহাস

পৃথিবীতে যত নবি-রাসূল এসেছেন, তাঁদের সবার দাওয়াত ছিল একটাই—এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁর অবাধ্যতা ছেড়ে দাও।

কবিদের কথা ও কুরআন

কবিদের উচ্ছৃঙ্খল কথা আর কুরআনের স্পষ্ট বার্তা, কখনো এক হতে পারে না। তা হলে কীভাবে তোমরা একে কবির রচনা বলে মনে করো?

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের বেশি, সেসব সূরাকে বলা হয় আল-মিয়ূন। 'যাবুর' কিতাবের পরিবর্তে, আল-মিয়ূন সূরাগুলো আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকমই একটি সূরা হলো সূরা শুআরা।

(দেখুন : আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২; তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, ১১০৫)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতে গিয়ে বাধা-বিপত্তি এলে ধৈর্য ধরতে হবে;

এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অফুরন্ত পুরস্কার মিলবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

সকল নবি-রাসূলের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু—তাওহীদ

১. মুসা ﷷ

তখনকার সময়ের সুপ্রিম পাওয়ারের অধিকারী ফিরআউনের কাছে তিনি যান। তাকে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে বলেন। তিনি এমন এক লোকের কাছে তাঁর রবের পরিচয় তুলে ধরেন, যে নিজেই নিজেকে 'খোদা' বলে দাবি করত।

২. ইবরাহীম ﷷ

তাঁর সময়ে শির্ক ছিল সামাজিক প্রথা। সমাজের টপ-টু-বটম সবখানেই শির্কের চর্চা ছিল। তাঁর নিজের বাবাও ছিল বড়সড় এক মুশরিক। সে-অবস্থাতে ইবরাহীম ﷷ নিজের বাবা ও পুরো সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেন, ঘর ও সমাজ ছাড়েন।

৩. নূহ ﷷ

এক আল্লাহর দিকে ডাকবার কারণে পুরো সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। নবিকে প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেয়।

৪. হূদ ﷷ

তাঁর জাতিও আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে ফিরবার দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা মুখের ওপর জবাব দেয়, 'তুমি উপদেশ বিলাও, আর না-বিলাও, আমাদের কাছে দুই-ই সমান।'

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআন ও আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) নিয়ে আলাপ।	১-৯	সালিহ ﷷ-এর কাহিনি।	১৪১-১৫৯
মুসা ﷷ-এর কাহিনি।	১০-৬৮	লূত ﷷ-এর ঘটনা।	১৬০-১৭৫
ইবরাহীম ﷷ-এর ঘটনা।	৬৯-১০৪	শুআইব ﷷ-এর কাহিনি।	১৭৬-১৯১
নূহ ﷷ-এর কাহিনি।	১০৫-১২২	কুরআনের বিশেষত্ব ও রাসূল ﷺ-এর নুবুওয়াতের স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১৯২-২০৯
হূদ ﷷ-এর ঘটনা।	১২৩-১৪০	মুশরিকদের খটকা ও সন্দেহ দূর করা হয়েছে।	২১০-২২৭

কেইস-স্টাডি

এই সূরায় আদ জাতির সাথে তাদের নবি হূদ ﷷ-এর একটি কথোপকথন তুলে ধরা হয়। যেখানে তিনি কিছু বিষয়ে তাঁর জাতির লোকদেরকে সাবধান করেন। তার মধ্যে

একটি ছিল প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অনর্থক স্মৃতিসৌধ বানানো, আরেকটি বিষয় ছিল আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা। সূরাটির ১৩৬-১৩৭ নং আয়াত হতে অবাধ্য এই জাতির জবাব জানা যায়। তারা বলেছিল—'তুমি আমাদেরকে উপদেশ বিলাও, আর না-বিলাও, আমাদের কাছে দুই-ই সমান। এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি (আর আমরা কেবল সেই রীতিনীতি অনুসরণ করছি)।' চিন্তা করুন একবার—নবি তাদেরকে শির্‌ক ও সকল অন্যায় থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিলেন। আর তারা কীভাবে তাদের রীতিনীতিকে আঁকড়ে থাকার দৃঢ় ঘোষণা জানাল! কতটা 'ঐতিহ্য-প্রিয়' জাতি! 'ঐতিহ্য-প্রিয়' জাতির কথা বলতে গেলে আমাদের দেশের একটা গোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে যায়—যারা বিজাতীয় অপ-সংস্কৃতিকে 'হাজার-বছরের-ঐতিহ্য' বলে গলাবাজি করে। এদেরকে কিছু বলতে গেলে বলবে—দাড়ি-টুপিওয়ালা মোল্লারা হাজার বছরের সংস্কৃতির পথ রুখে দাঁড়ায়! এই আয়াতটি সেসব গলাবাজদের জন্য কেইস-স্টাডি। এরা সেই ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া আদ-জাতির মতো আমাদেরকেও ধ্বংস করতে চায়।

(দেখুন—বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ২৪৫৫)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

অর্থকড়ি কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্মানের মাপকাঠি নয়। আল্লাহর কাছে সম্মানিত তারা—যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর ওপর ঈমান এনেছে, তাঁকে ভয় করে চলছে। কার কী পেশা—কে অফিসার, কে পিওন—এগুলোর দিকে আল্লাহ ভ্রূক্ষেপ করেন না। তবে কাফিরদের কাছে পেশা বা দুনিয়াবি বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সূরার ১১১ নং আয়াতে নূহ ﷺ-এর জাতির লোকদের বক্তব্য জানতে পারি। "তারা (নূহ আ-কে) বলে উঠল, 'আমরা কি তোমার ওপর ঈমান আনব, অথচ নিচু পেশার লোকেরাই তোমার অনুসারী?" গোঁয়ার্তুমির সীমা দেখুন! নিচু পেশার মানুষরা যার অনুসরণ করবে, তার অনুসরণ তারা করবে না! তো নবি কি তাদের দাবি মেনে নিলেন? প্রশ্নই ওঠে না। চলুন নবির জবাবটাও শুনে নিই—"সে (জবাবে) বলল, 'তাদের পেশা সম্পর্কে আমি জানি না; তাদের হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব কেবল আমার রবের। তোমরা যদি বুঝতে (যে, বৈধ নিচু পেশা দ্বীনদারিতার কোনো ক্ষতি করে না)! যারা ঈমানের পথে চলে, আমি কিছুতেই তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না; আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী কেবল।" তো এখান থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি—(১) কোনো বৈধ পেশাকে আমরা নিচু করে দেখব না। (২) হালাল যে পেশাতেই আমরা থাকি না কেন, সেখান থেকেই আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকব। (৩) পেশার ভিত্তিতে আমরা মানুষের মধ্যে পার্থক্য করব না, বরং আমরা দেখব মানুষের নৈতিকতা ও আল্লাহ-ভীতি (যদিও মনের খবর একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন)।

(দেখুন—বুখারি, ২০৭২, ২০৭৪; তাবারানি, ৬৩২)

নূহ ﷺ-এর এমন বক্তব্যের জবাবে তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু এতে নবি ঘাবড়ে যাননি। বরং তাঁর মনের সকল আকুতি কেবল আল্লাহকে জানিয়েছিলেন। দ্বীনের ক্ষেত্রে এমন বাধা-বিপত্তি আসা স্বাভাবিক। তাই বলে পিছু হটা যাবে না। আল্লাহর ওপর মজবুত ভরসা রেখে সামনে এগুতে হবে।

(দেখুন—মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/২৯২; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ৯৪২)

সূরা নামল

سُوْرَةُ النَّمْلِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪৮-তম সূরা। এর আগে সূরা শুআরা ও পরে সূরা কাসাস নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা শুআরা ও পরে সূরা কাসাস।

এক নজরে নামল

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ২৭
- আয়াত: ৯৩
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘নামল’ শব্দের অর্থ ‘পিঁপড়া’। সুলাইমান ﷺ একবার তাঁর বাহিনী নিয়ে অভিযানে বের হলেন। সেই বাহিনী দেখে একটি পিঁপড়া তার দলের বাকি সব পিঁপড়াকে গর্তে ঢোকার পরামর্শ দেয়—যাতে তারা সুলাইমান-বাহিনীর পদতলে পিষ্ট না হয়। ওই পিঁপড়ার ভাষণটি স্থান পেয়েছে এ-সূরার ১৮ নং আয়াতে। সেখান থেকেই এর নাম হয়েছে ‘নামল’।

মেজর থিম

০১ কুরআন: পথনির্দেশক ও সুসংবাদদাতা।

০২ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য।

০৩ কিয়ামাতের নিদর্শন।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক।

সূরাটি শুরু হয়েছে কুরআন ও কুরআনের হিদায়াত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে। আবার শেষও হয়েছে এর মাধ্যমেই : "আর আমি কুরআন পাঠ করে শোনাই। সুতরাং যে সঠিক পথে চলে, সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিক পথে চলে; আর যে ভুল পথ বেছে নেয়, (তাকে) বলে দাও, 'আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।'"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা শুআরা। সূরাটির শেষে মুমিনদের কিছু গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে, "যারা ঈমান আনে, ভালো কাজগুলো করে, আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ রাখে...।" একইভাবে এই সূরাটির শুরুতেও আমরা মুমিনদের গুণাবলির বর্ণনা দেখতে পাই।

শানে নুযুল

কুরআন থেকে লাভবান হওয়া ও সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য তারাই হবে, যারা একে সত্য বলে মেনে নেয়। তারপর নিজেদের বাস্তব জীবনকে কুরআনের আলোকে সাজায়। তবে কাজটি খুব একটা সহজ নয়। এ-পথে চলার জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হলো: মানুষের মন আখিরাতকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। এই স্বীকৃতি শুধু মুখে মুখে বলা নয়; বরং মনের গভীর থেকে উপলব্ধি করা। আখিরাতকে স্বীকৃতি দিলে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে হারিয়ে যাওয়া যায় না। উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল হয়ে জীবনটাকে উপভোগ করা যায় না। পদে পদে দাঁড়াতে হয়, ভাবতে হয়। কোন পথে যাব—বারবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অহংকার ও আত্মগরিমায় ডুবে থাকা যায় না। যেমনটা ডুবে ছিল ফিরআউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা, আদ ও সামুদ জাতির লোকেরা। শত আহ্বানেও সত্যকে সত্য বলে মানেনি তারা। ফলে সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। অপরদিকে সুলাইমান ﷺ ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসক। শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সব প্রাণীর ওপরও তাঁর শাসন ছিল। এত ক্ষমতা পেয়েও তিনি মাথা নুইয়েছেন এক আল্লাহর সামনেই। ওদিকে আরেক ক্ষমতাধর শাসক ছিলেন সাবার রানি। তার সামনেও যখন সত্য স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি আর মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরে থাকেননি। এ-সূরাটি নাযিল করে এসব ঘটনা তুলে ধরে, মক্কার কাফিরদেরকে আল্লাহর পথে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। যাতে তারাও সত্যকে মেনে নেয়। এক আল্লাহর দাসত্ব করে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৪/১২২)

সেগমেন্ট

সুস্পষ্ট কিতাব আল-কুরআন

আল্লাহ তাআলা কুরআনকে স্পষ্ট বার্তায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে মুমিনদের দিয়েছেন সুসংবাদ। আর কাফিরদের দিয়েছেন সতর্কবার্তা।

আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা

নবি-রাসূলরা পৃথিবীতে এসে নানা বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁদের কাউকে একা ছেড়ে দেননি। বরং তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে সর্বদা তাঁদেরকে আগলে রেখেছেন।

তাওহীদ ও শির্‌ক

"তুমি বলো, প্রশংসা সবই আল্লাহর। শান্তি নেমে আসুক তাঁর সেসব গোলামের ওপর—যাদেরকে তিনি বেছে নিয়েছেন।"

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের বেশি, সেসব সূরাকে বলা হয় আল-মিয়ূন। 'যাবুর' কিতাবের পরিবর্তে, আল-মিয়ূন সূরাগুলো আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকমই একটি সূরা হলো সূরা নামল।

(দেখুন : আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২; তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, ১১০৫)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

প্রতিটি খবর যাচাই-বাছাই করে নিলে; → অনেক অপ্রীতিকর ও উটকো ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

কুরআনের ভূমিকা ও দাওয়াত

১. মূসা ﷺ

আল্লাহর-দেওয়া বিশেষ নিদর্শন নিয়ে তিনি ফিরআউনের কাছে যান। আল্লাহর ক্ষমতা ও শাসন-কর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করে ফিরআউনকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

২. দাউদ ও সুলাইমান ﷺ

দুই পিতা-পুত্র দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-কে আল্লাহ গভীর জ্ঞানের নিয়ামাত দান করেছিলেন। সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা নিজেদের রাজ্যে আল্লাহর শাসন কায়েম করেছিলেন।

৩. সালিহ্ ও লূত ﷺ

এই দুজন দুটি জাতি : 'সামুদ' ও 'সাদুম'-এর নবি ছিলেন। নবুওয়াত-প্রাপ্তির পর থেকে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন। আল্লাহর বড়ত্বের কথা তাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

৪. সকল নবির মিশন ছিল অভিন্ন

পৃথিবীতে যত নবি-রাসূল এসেছেন, তাঁরা সকলেই মানুষের কাছে আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আর এসব ঘটনা সযত্নে কুরআনের মাঝে ঠাঁই পেয়েছে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআনের বিশেষত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	১-২	সুলাইমান ﷺ-এর চিঠি পেয়ে সাবা'র রানির প্রতিক্রিয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।	২৯-৪৪
মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের পুরস্কার, আর কাফিরদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে।	৩-৬	সালিহ ও লূত ﷺ-এর কাহিনি আলোচনা করা হয়েছে।	৪৫-৫৮
'তুওয়া' উপত্যকায় মুসা ﷺ ও আল্লাহর কথোপকথনের ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।	৭-১৪	আল্লাহর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে।	৫৯-৬৬
দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-কে যে-সমস্ত নিয়ামাত দেওয়া হয়েছিল, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	১৫-১৯	কাফিররা পরকালের ধারণাকে নাকচ করে দেয়। আর এই বিষয়ে তাদের চিন্তা-ধারণাকে আল্লাহ মিথ্যা প্রমাণিত করেন।	৬৭-৭৫
সুলাইমান ﷺ ও সাবা'র রানির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।	২০-২৮	আগেকার জাতিগুলোর ব্যাপারে কুরআনিক বয়ান ও বিচার-দিবসের কিছু চিত্র দেখানো হয়েছে।	৭৬-৯৩

কেইস-স্টাডি

সাবার রানির কাছে সুলাইমান ﷺ চিঠি পাঠালেন। খুবই সংক্ষিপ্ত সেই চিঠির কথা—"পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ো না, বরং আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে চলে এসো।" ব্যস! চিঠি পেয়েই রানি তার মন্ত্রী-পরিষদ নিয়ে বৈঠকে বসে পড়লেন। সভার সদস্যরা উসকে দিতে লাগল—আমাদের কি শক্তি-সামর্থ্যে কম আছে? আত্মসমর্পণ করতে বললেই হলো! রানি কিন্তু উসকানিতে কান দিলেন না। বরং লোক পাঠিয়ে দিলেন সুলাইমান ﷺ-এর কাছে। সাথে দিলেন অনেক উপহার-উপঢৌকন। সেই উপহার পেয়ে নবি সুলাইমান কী বলেছিলেন জানেন? 'তোমরা আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের সম্পদের চেয়ে ঢের উত্তম।' সুলাইমান ﷺ-এর এই একটি কথাই আমাদের বর্তমান দাঈদের জন্য ভাবনার খোরাক জোগাবে। আমরাও আল্লাহর পথে ডাকতে গিয়ে বা কোনো অন্যায় কাজে বাধা দিতে গিয়ে 'হাদিয়া-তোহফার' লোভে যেন আপস করে না-বসি; তা হলে আল্লাহর সাহায্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২১৪১৫; বাযযার, আল-মুসনাদ, ৩৯৬৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

হুদহুদ পাখিকে সুলাইমান ﷺ একবার খুঁজে পেলেন না। ফলে ঘোষণা করলেন—'সে কি অনুপস্থিত! তা হলে তো আমি একে চরম শাস্তি দেবো, অথবা জবাই করে ফেলব, যদি-না সে আমার কাছে (তার অনুপস্থিতির) স্পষ্ট কৈফিয়ত হাজির করে।' এরপরের ঘটনা এ-সূরার ২২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: "কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই সেটি (অর্থাৎ হুদহুদ এসে) বলল, 'আমি এমন একটা বিষয় ভালোভাবে জেনে এসেছি, যা আপনার ভালোভাবে জানা নেই।" দেখুন—হুদহুদ পাখি এমন একটা বিষয় জানে, যেটা সুলাইমান ﷺ জানেন না। এখান থেকে তাদাব্বুরের বিষয় হলো, কখনো কখনো ছোট কিছুর মাধ্যমেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়, যা বড় ও শক্তিশালী কারও মাধ্যমে হয় না। তাই ছোট বলে কাউকে অবহেলা করা যাবে না। এতে অহংকার প্রকাশ পায়। সুলাইমান ﷺ কিন্তু হুদহুদের কথা শুনেছিলেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। আপনার জীবন-পথেও এমন অনেককে পাবেন, দেখতে-শুনতে ছোট হলেও তারা খুব কাজের মানুষ—তাদেরকে দূরে ঠেলে দেবেন না। তাদের থেকেও উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ, আল্লাহর সৃষ্টির কেউ-ই ছোট নয়। প্রত্যেকেরই বিশেষ গুরুত্ব আছে।

(দেখুন—মুসলিম, ২৫৬৪, ২৬২২)

সূরা কাসাস
سُوْرَةُ الْقَصَصِ

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা নামল ও পরে সূরা আনকাবুত।

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪৯-তম সূরা। এর আগে সূরা নামল ও পরে সূরা বনী ইসরাঈল নাযিল হয়েছে।

এক নজরে কাসাস

- সূরা নং: ২৮
- মাক্কি যুগের শেষে নাযিল
- মাক্কি
- আয়াত: ৮৮

নামের রহস্য

'কাসাস' অর্থ 'বিবরণ; গল্প; ঘটনা'। সূরার ২৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসা ﷺ মাদইয়ানে পৌঁছে তাঁর সাথে-ঘটে-যাওয়া প্রত্যেকটি ঘটনা—এক-এক করে—শুআইব ﷺ-কে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'কাসাস'। এর আরেকটি নাম আছে: 'সূরা মুসা'।

মেজর থিম

০১ মুসা ﷺ ও তাঁর শৈশব।

০২ ধন-সম্পদের ক্ষণস্থায়িত্ব।

০৩ রাসূল ﷺ-এর প্রতি নির্দেশনা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা ফিরআউনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদ্ধত ও বিশৃঙ্খল আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন। ফিরআউনকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের একজন বলে অভিহিত করেছেন। আর সূরাটির শেষ দিকে এমন আচরণ থেকে বিরত থাকার শেষ পরিণতি জানিয়েছেন—"যারা দুনিয়ায় দাম্ভিকতা ও বিশৃঙ্খলা কোনোটাই চায় না; শেষ পরিণতি থাকবে সেসব লোকের অনুকূলে, যারা আমার অবাধ্যতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো সূরা নামল। সূরা নামলের শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "অচিরেই তিনি তাঁর নিদর্শনগুলো তোমাদেরকে দেখাবেন, তখন তোমরা সেগুলো চিনতে পারবে।" আর এই সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ মুসা ﷺ-এর ঘটনা তুলে ধরলেন। আর সেই সাথে তাঁর বিভিন্ন নিদর্শনের কথা উল্লেখ করলেন।

শানে নুযুল

নিজেদের কামনা-বাসনা ধরে রাখতে কাফিররা একাট্টা—কোনোভাবেই নবিজির দাওয়াত কবুল করা যাবে না। কিছু একটা বলে তাঁকে থামাতে হবে। তো সবাই মিলে নবিজিকে বলতে লাগল—'মুসা তো আল্লাহর নবি ছিলেন, তাই তার কত কত মু'জিযা ছিল। তোমার কাছ থেকে তো কোনো মু'জিযা দেখলাম না।' ভাবখানা এমন—যেন নবিজি মু'জিযা দেখালেই তারা সুড়সুড় করে কুফর থেকে বেরিয়ে ঈমান এনে ফেলবে! আর দিন-রাত আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যাবে! বরং এই সূরার মাধ্যমে তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে—নবি মুসা মু'জিযা দেখিয়েছেন। সেটা তোমরা জানো। তো কজন তার ওপর ঈমান আনলে এদ্দিনে? সেই মূর্তিপূজাই তো চলছে! মুসার জাতি যেমনি গোঁয়ার্তুমি করেছে, তাঁর বিরোধিতা করেছে, তোমরাও তো তোমাদের রাসূলের সাথে সেই একই আচরণ করছো। সেই সাথে আরও কত যুক্তি তুলে ধরছো। তোমাদের নবি হুট করে নবি হয়ে গেলেন! তাতে তোমরা ভারি অবাক হচ্ছ। মুসাকেও তো হঠাৎ করেই নুবুওয়াত দেওয়া হলো। পরিবারকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে আগুন আনতে গিয়ে সে নুবুওয়াত নিয়ে এল। কই, তাতে অবাক হও না? আসলে এগুলো স্রেফ তোমাদের বাহানা। বরং আসল খবরটা হলো—তোমরা তোমাদের ঐশ্বর্য আর নেতৃত্ব হারাবে, এই ভয়ে আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দিচ্ছ না। অথচ এগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। সূরাটি মূলত আগেকার কয়েকজন নবি ও তাঁদের অবাধ্য জাতির বিভিন্ন ঘটনা ও পরিণতি তুলে ধরতেই নাযিল করা হয়েছে। যাতে বর্তমানের অবাধ্য লোকজনও সতর্ক হয়ে যায়।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৪/২৩৩)

সেগমেন্ট

মুসা ﷺ-এর কাহিনি

মুসা ﷺ-এর জন্ম থেকে যৌবন ও নুবুওয়াত পাওয়া, ফিরআউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া, ফিরআউনের অবাধ্যতা ও তার ধ্বংস—বিস্তারিত ঘটনা জায়গা পেয়েছে এ-সূরাতে।

সম্পদ

সম্পদ মানুষের যেমন কাজে আসে, ঠিক তেমনি এই সম্পদের জন্য মানুষ ধ্বংসও হয়। যেভাবে ধ্বংস হয়েছে কারুন। তাই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

রাসূল ﷺ-কে সত্যায়ন

নবি ﷺ মানব-জাতির মাঝে যে বাণী নিয়ে এসেছেন, আল্লাহ তাআলা তার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। সেই সাথে রাসূলের লক্ষ্য কী—সেটিও জানিয়ে দিয়েছেন।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম সেগুলোকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকমই একটি সূরা হলো সূরা কাসাস।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দুআ করতে হবে: নিজের স্ত্রী-সন্তানরা যেন চক্ষু শীতলতার কারণ হয়;

কেননা এই দুআ কবুল হলে দুনিয়ার জীবনটা শান্তিতে ভরে উঠবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

ধরার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করলে চরম শাস্তির হুঁশিয়ারি

১. ফিরআউনের অবাধ্যতা

আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-কে নুবুওয়াত দিয়ে অবাধ্য ফিরআউনকে দাওয়াত দিতে পাঠালেন। দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় ফিরআউনকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়।

২. কুরাইশদের বিশৃঙ্খলা

মক্কার কুরাইশরাও আল্লাহকে অস্বীকার করে ও নিজেদের মধ্যে অরাজকতা করতে লাগল। তাদের মাঝে পাঠানো হলো রাসূল ﷺ-কে। কিন্তু তারা তাদের আগের অবাধ্যতায় অটল রইল।

৩. কারুন: স্বৈরাচারের দোসর

মুসা ﷺ-এর জাতির লোক হয়েও কারুন হাত মেলায় ফিরআউনের সাথে। সে ছিল বড় মাপের সুযোগ-সন্ধানী ও পুঁজিবাদী এক লোক। শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তার সব সম্পদ-সহ তাকে জমিনে ধসিয়ে দেন।

৪. আসল রাজত্ব ও সফলতা

সত্যিকারের সফল তারাই, যারা আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে মেনে নিয়েছে। জান্নাত তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর এসব মানুষকে দুনিয়ার বুকেও দেওয়া হবে রাজত্ব।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
ফিরআউনের অত্যাচার-অবিচার নিয়ে আলোচনা। দুর্বলকে সহায়তা ও অত্যাচারীকে শাস্তি দিতে আল্লাহর অঙ্গীকার।	১-৬	মুসা ﷺ-কে তাওরাত আর নবি ﷺ-কে দেওয়া হয় কুরআন। এখানে মিল হলো: তাদের দুজনের জাতিই কিতাবকে অস্বীকার করেছে।	৪৩-৫০
মুসা ﷺ-এর জন্ম হলো। তখন ফিরআউনের দলবলের হাতে খুন হওয়া থেকে আল্লাহ তাঁকে অলৌকিকভাবে বাঁচালেন।	৭-১৪	আহলে কিতাবের লোকদের কথা। আর কুরআনকে অস্বীকার করা ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থাকায় কুরাইশদের প্রতি সতর্কবার্তা।	৫১-৬১
অনিচ্ছাকৃতভাবে মুসা ﷺ-এর হাতে এক লোকের মৃত্যু। পালিয়ে মাদইয়ান গিয়ে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ।	১৫-২৮	কিয়ামাতের দিন মুশরিকদের দশা হবে এমন—তারা তাওবা করতে চাইবে, আর শাস্তি দেখে আল্লাহকে একক ইলাহ বলে স্বীকারও করবে।	৬২-৭৫
মুসা ও হারুন ﷺ-এর মিশন ও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সহযোগিতার কথা বর্ণিত হয়েছে।	২৯-৩৫	কারুনের কাহিনি ও অহংকারী-বেঈমানদের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।	৭৬-৮৪
ফিরআউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলে সে ও তার পুরো বাহিনী তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি।	৩৬-৪২	মক্কায় রাসূলকে আবার ফিরিয়ে আনার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত হয়েছে।	৮৫-৮৮

কেইস-স্টাডি

কোনো দেশের শাসক হলো সেই দেশের প্রধান ব্যক্তি। দেশ ও জাতির মাথা। তো এই মাথা যদি অচল হয় বা উলটো পথে চলে, তখন গণমানুষের যাবার কোনো জায়গা থাকে না। আবার সেই শাসক যদি নিজেকেই 'রব' দাবি করে বসে! তা হলে তো কোনো কথাই নেই। ফিরআউন ছিল তেমনই এক শাসক। মুসা ﷺ তার কাছে দাওয়াত নিয়ে যান। এক আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করে নিতে বলেন। কিন্তু সে অহংকার দেখিয়ে হামানকে নির্দেশ দেয়—'হামান, তুমি আমার জন্য একটা সুউচ্চ প্রাসাদ বানাও। যাতে সেখানে উঠে আমি মুসার খোদাকে দেখে নিতে পারি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে মিথ্যাবাদী।' ক্ষমতার দম্ভে মানুষ কতটা অন্ধ হতে পারে! আজকাল যে দেশে-দেশে বিভিন্ন জাতির মাঝে এমন ফিরআউন নেই, এমনটি বলা কিন্তু অসম্ভব। এদেরকেও দেখবেন—ক্ষমতার জোশে স্থির থাকতে পারে না। কাকে কী করবে, কী বলবে—কোনো হুঁশ থাকে না। ফিরআউনের অহংকার ও তার পরিণতি সারা দুনিয়ার শাসকদের জন্য কেইস-স্টাডি।

(দেখুন—বুখারি, ৩৪৮৫; মুসলিম, ৯১, ২০৮৫)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এই সূরার প্রথম ১৩টি আয়াত পড়লে চমকে উঠতে হয়। সদ্য জন্ম-নেওয়া একটা শিশু। চারিদিকে তার বিপদের হাতছানি। সেই সময়ে তার মায়ের কাছে আদেশ এল—ওকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। আর আল্লাহর আদেশে মা-ও সঙ্গে সঙ্গে তা-ই করলেন। ছেলের জীবন নিয়ে শঙ্কিত হলেন না। শিশুটি ভাসতে ভাসতে গিয়ে উপস্থিত হলো ফিরআউনের ঘাটলায়, যে কিনা এই ধরনের ছেলে শিশু জন্ম নেওয়া-মাত্রই হত্যার হুকুম জারি করেছে। অথচ আল্লাহর ইচ্ছায় এই শিশুটির কোনো ক্ষতি সে করতে পারল না। বরং তার ঘরেই শিশুটিকে লালন-পালনের জন্য রেখে দিতে হলো। ওদিকে এই শিশুটি কোনো ধাত্রীর দুধ গ্রহণ করছে না। বাধ্য হয়ে তার মাকেই দুধ মা হিসেবে নিয়োগ দিতে হলো। অথচ ফিরআউন জানতেই পারল না, কোথা দিয়ে কী হতে চলেছে। এই শিশুটি কে ছিল, নিশ্চয় ধরতে পেরেছেন! হ্যাঁ, মুসা ﷺ। ভেবে দেখুন, কতটা নিঁখুত পরিকল্পনা আমার রবের! কতগুলো ধাপ পার হয়ে মুসা ﷺ-কে নবি হিসেবে গড়ে উঠতে হয়েছে। আর সেই ধাপগুলো আল্লাহ তাঁর জন্য কতটা সহজ করে দিলেন। তাই, জীবনের যেকোনো কঠিন সময়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে। মুসা ﷺ-এর এই ঘটনাটি হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। এতে করে জীবনের প্রতি কখনো হতাশা কাজ করবে না। আজকাল তো হতাশা আমাদের পিছু ছাড়ে না কিছুতেই। কিন্তু আপনি যদি একটিবার আল্লাহর ওপর পুরোপুরিভাবে তাওয়াক্কুল করতে পারেন, তা হলে তিনিই আপনাকে পথ দেখাবেন—তা যতটা আঁধারেই ছেঁয়ে থাকুক সে-পথ।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৩৪৪; ইবনু মাজাহ, ৪১৬৪)

সূরা আনকাবুত

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮৫-তম সূরা। এর আগে সূরা রূম ও পরে সূরা মুতাফফিফীন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ২৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কাসাস ও পরে সূরা রূম।

এক নজরে আনকাবুত

- মাক্কি যুগের শেষে নাযিল
- সূরা নং: ২৯
- আয়াত: ৬৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

'আনকাবুত' শব্দের অর্থ 'মাকড়সা'। এই সূরার ৪১ নং আয়াতে শির্ককে মাকড়সার ঘরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ভারী বর্ষণের মুখে মাকড়সার ঘর টিকে থাকতে পারে না। মাকড়সাকেও রাখতে পারে না নিরাপদ। ঠিক তেমনি যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক মানে, আল্লাহর পাকড়াওয়ের সময় সেসব তথাকথিত অভিভাবক তাদের কোনো কাজে আসবে না। সেখান থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আনকাবুত'।

মেজর থিম

০১ পৃথিবীতে মানুষের আগমনের কারণ।

০২ বাবা-মা'র প্রতি করণীয়।

০৩ নবিদের কাহিনি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরা আনকাবুতের শুরুতেই আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াবি-জীবনের-পরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, "মানুষ কি মনে করেছে—'আমরা ঈমান এনেছি' বললে তাদেরকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেওয়া হবে?" আর সূরাটির শেষে এই পরীক্ষার ব্যাপারে মুমিনদের জন্য এসেছে সাহায্যের সুসংবাদ—"যারা আমার (দ্বীনের) পথে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়, আমি অবশ্যই আমার রাস্তাগুলো তাদেরকে দেখিয়ে দেবো। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন...।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা কাসাস; যাতে দ্বীনের পথে বিভিন্ন পরীক্ষার কথা উঠে এসেছে। সূরা কাসাসে এই আলোচনার সূত্র ধরেই সূরা আনকাবুত শুরু করা হয়েছে যে, মানুষকে পরীক্ষা করা আল্লাহ তাআলার রীতি: "মানুষ কি মনে করেছে—'আমরা ঈমান এনেছি' বললে তাদেরকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেওয়া হবে?"

শানে নুযুল

কাফিরদের মাথার মধ্যে খালি শয়তানি বুদ্ধি এসে ভিড় করে। আর না করেই-বা উপায় কী! স্বয়ং ইবলিস যাদের গুরু, তারা তো এমন হবেই। মাক্কি যুগে কাফিররা যখন দেখল—লোভ বা ভয় দেখিয়ে, কঠিন মারধোর করেও যুবকদেরকে ইসলাম থেকে ফেরানো যাচ্ছে না, তখন তারা 'ইমোশনের ডালা' নিয়ে হাজির! 'তোমাদের কুরআনেই তো বলেছে—বাপ-মায়ের কথা শুনতে। কখনোই তাদের অবাধ্য না-হতে। আমি তোমার মা বলছি, আমি তোমার বাবা বলছি—ঈমান ছেড়ে দাও বাবা। কথা না-শুনলে তোমার কাজটা ঈমান-বিরোধী হবে।' নেতারাও তখন চুপ করে বসে নেই। তারা যুবকদের বলতে লাগল—'বাবারা! ঈমান ছাড়লে তোমরা শাস্তির ভয় করো তো? ঠিক আছে, তোমাদের দায়-দায়িত্ব আমরা নিলাম। আল্লাহ যদি তোমাদেরকে ধরেন, তা হলে আমরা বলব—খোদা, ওদের কোনো দোষ নেই। আমরাই ওদেরকে বাধ্য করেছি। ওদের যা শাস্তি তা আমাদেরকে দিন।' কুরআনের এ-সূরাতে এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু আয়াত নাযিল করা হয়েছে। ওদের এসব হঠকারিতা ও গোপন ফন্দির ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। তা ছাড়া অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন যখন প্রবল হচ্ছে, তখন মুমিনদেরকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর একেবারেই না পারলে, দেশ ছেড়ে হিজরত করতে বলা হয়েছে; তবুও কোনোভাবে ঈমান ছাড়া যাবে না। কারণ এর যে শাস্তি, তা বহন করার ক্ষমতা কারোর-ই নেই।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৪/৩৮৪; তাফহীমুল কুরআন, ১১/১)

সেগমেন্ট

বিচার

মানুষের আমল ও বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পরকালে তার বিচার হবে।

কিছু উপদেশ

কীভাবে মানুষ এই বিচারে ভালো কিছু পেতে পারে, শাস্তি এড়িয়ে জান্নাতের প্রশস্ত পথে উঠতে পারে—সেই বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃতি

মানুষ এই দুনিয়ার জীবনকে বড়-বেশি ভালোবাসে। অথচ এই জীবনটা খুবই অল্প সময়ের। স্থায়ী জীবন তো পরকাল। যদি মানুষ জানত!

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, সেসব সূরাকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকমই একটি সূরা হলো সূরা আনকাবুত।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দুনিয়াবি বিপদাপদ আল্লাহর পরীক্ষা। পরীক্ষায় পড়েও তাই সত্যের পথে অটল থাকতে হবে;

ধৈর্য হারিয়ে বিগড়ে গেলে, নিজের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মুমিন বান্দা পরীক্ষার মুখোমুখি হবেই

১. পরীক্ষা আসবেই, তবে খেই হারানো যাবে না

মুমিনদের জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঈমানের পরীক্ষা আসবেই। হয়তো নিজ পরিবার থেকে অথবা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। কিন্তু শত বাধা-বিপত্তির মুখেও ঈমান ছাড়া যাবে না।

২. বিভিন্ন পরীক্ষার ইতিহাস

নবি নূহ ﷺ ৯৫০ ধরে পরীক্ষা দিয়েছেন। পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন ইবরাহীম, লূত ও শুআইব ﷺ। তাঁরা সবাই পাশ করেছেন। আর পরীক্ষায় ফেইল করেছে আদ ও সামুদ জাতি, ফিরআউন, হামান ও কারূনরা।

৩. প্রয়োজনে হিজরত করা যাবে

ইসলাম-বিদ্বেষীদের অত্যাচারে টিকতে না পারলে, ঈমান ছাড়া যাবে না। তবে সেই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া যাবে। যেমন করে জন্মভূমি ছেড়েছিলেন ইবরাহীম ﷺ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ।

৪. পরীক্ষায় সফল হবার মূলমন্ত্র

পরীক্ষায় সফল হতে হলে সকল অবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। যত বিপদই আসুক না-কেন ধৈর্য ধরতে হবে। আর আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। আর এই পরীক্ষার ওপর নির্ভর করছে শাস্তি অথবা পুরস্কার।	১-৭	শুআইব, হূদ, সালিহ ও মুসা ﷺ-এর জাতির অবাধ্যতার ইতিহাস ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।	৩৬-৪৩
বাবা-মা'র সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। তবে তারা শিরকের আদেশ দিলে, সেই আদেশ মানা যাবে না।	৮-১৩	মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে যথাযথ উদ্দেশ্য সামনে রেখে। কুরআন তিলাওয়াত ও নামাজ কায়েমের মধ্যে আছে নানান সুফল।	৪৪-৪৫
নূহ ﷺ-এর কাহিনি খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে আনা হয়েছে।	১৪-১৫	ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক। রাসূলের কাছে অলৌকিক নিদর্শনের দাবি; যদিও নিদর্শন হিসেবে কুরআনই যথেষ্ট।	৪৬-৫৫
ইবরাহীম ﷺ তাঁর জাতিকে এক আল্লাহর দিকে ডাকেন। কিন্তু তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	১৬-২৭	কাফিররা জুলুম-অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেলে, মুমিনদেরকে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।	৫৬-৬০
লূত ﷺ-এর জাতি সমকামিতা ও প্রকাশ্যে অশ্লীলতার মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল। পরিণামে তারা ধ্বংস হয়েছে।	২৮-৩৫	দুনিয়া ও আখিরাতের অবস্থাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। সেই সাথে বর্ণিত হয়েছে মুশরিকদের ভণ্ডামি।	৬১-৬৯

কেইস-স্টাডি

বাবা-মা। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কী দারুণ নিয়ামাত! সন্তানকে জন্ম দেওয়া, স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে তাকে আগলে রাখা, সকল ধরনের বিপদাপদ থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা—কী না করেন তারা! তাই তো এই বাবা-মা'কে আল্লাহ দিলেন বিশেষ মর্যাদা। সন্তানকে আদেশ দিলেন—'খবরদার! কখনো বাবা-মা'র অবাধ্য হবে না। তাদের খেদমত করতে একটুও কমতি করবে না। তাদের সাথে অবশ্যই সুন্দর ব্যবহার করবে। কিন্তু তারা যদি তোমাকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বলে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করতে বলে, তা হলে আর তাদের কথা শোনা যাবে না। আল্লাহর হুকুমের বাইরে তারা কোনো হুকুম দিলে, সেই হুকুম পালন করার প্রয়োজন নেই।' দাড়ি ছাটানোর জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে? এই ক্ষেত্রে তাদেরকে বিনয়ের সাথে বুঝিয়ে বলুন, বাবা, এই কাজ করলে আল্লাহ আমার ওপর রাগ করবেন। দয়া করে এটা করতে বলবেন না। আমি এটা করতে পারব না। এভাবে সুন্দর করে তাদেরকে বুঝিয়ে বলে আল্লাহর পথে অবিচল থাকুন। এক সময় আল্লাহ তাদের মনও পরিবর্তন করে দেবেন চাইলে। এ-সূরার ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরকমই আদেশ দিয়েছেন। তাই এই আয়াতের দিকে আমাদের ফোকাস বাড়ানো উচিত।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৯৯০৪; বাযযার, আল-মুসনাদ, ৩৫১১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে জীবিকা তালাশ করো।" ১৭ নং আয়াতের 'জীবিকা তালাশ করো' আদেশ থেকে স্পষ্ট হয় যে, জীবিকা আপনা-আপনিই চলে আসবে না। এর তালাশে নামতে হবে। আল্লাহ তাআলার ভান্ডার থেকে জীবিকা পাওয়ার উপায় হলো—চেষ্টা-পরিশ্রম; তাঁর কাছে চাওয়া এবং তাঁর ইবাদাত-বন্দেগি ঠিকমতো আদায় করা। এ ছাড়া দুনিয়াবি উপায়-উপকরণকে কাজে লাগাতে হবে। কেউ অলসতা ও গড়িমসি করে দিন পার করবে। আর ভাববে, 'আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলাম। তিনিই আমাকে দেবেন।' এমন লোককে দান করা আল্লাহর নিয়ম নয়। কারণ, তিনি জীবিকা তালাশ করার হুকুম দিয়েছেন। তাই বসে থাকার সুযোগ নেই।

(দেখুন—বুখারি, ১৪৮০, ৬৩৬৭; মুসলিম, ১০৪২, ২৬৬৪)

"তোমরা (তাঁর) নাগালের বাইরে যেতে পারবে না—না জমিনে, আর না আকাশে।" মানুষের দৌড় কতটুকু, আর আল্লাহর ক্ষমতার পরিধি কত বিশাল; ২২ নং আয়াতটি থেকে তা টের পাওয়া যায়। আল্লাহর আদেশে জমিন ধসে যায়, আকাশ থেকে শিল পড়ে, বজ্র নামে। মানুষ কি এমন কোথাও পালিয়ে যাবার সক্ষমতা রাখে, যেখানে তার পায়ের নিচে জমিন থাকবে না, কিংবা মাথার ওপর বিশাল আকাশটা থাকবে না? উত্তর সবার-ই জানা—না, কস্মিনকালেও নয়। তা হলে মানুষ কেন আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করবে না! মানুষ তো অন্যান্য প্রাণীর মতো নয় যে, শুধু খাওয়া আর ঘুম ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। মানুষ সৃষ্টির সেরা। তাই তার কাজও হওয়া উচিত সবচেয়ে সেরা। আল্লাহ থেকে পালিয়ে বাঁচার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে তাঁর সামনে মাথা নুইয়ে দেওয়াই হবে—সেরা সৃষ্টির সেরা কাজ।

(দেখুন—সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৬; বুখারি, ১৩৯৬, ১৩৯৭; তাবারানি, ৫০০)

সূরা রূম

سُوْرَةُ الرُّوْمِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮৪-তম সূরা। এর আগে সূরা ইনশিকাক ও পরে সূরা আনকাবুত নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আনকাবুত ও পরে সূরা লুকমান।

এক নজরে রূম

- নুবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে নাযিল
- সূরা নং: ৩০
- আয়াত: ৬০
- মাক্কি

নামের রহস্য

'রূম' মানে 'রোমান সাম্রাজ্য'। খ্রিষ্টপূর্ব ২৭ সালে রোম শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে রোমান সাম্রাজ্য। এই সূরার ১-৭ নং আয়াতে রূম তথা বাইজান্টাইনদের সাথে পারসিকদের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। সেখান থেকে এই সূরার নাম দেওয়া হয়েছে 'রূম'।

মেজর থিম

- ০১ রোমানদের জয়-পরাজয়।
- ০২ আল্লাহর আদেশ।
- ০৩ আল্লাহর অনুগ্রহ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

এই সূরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী দিয়ে : "(এটা) আল্লাহর ওয়াদা! আল্লাহ ওয়াদা লঙ্ঘন করেন না; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই তা জানে না।" আর শেষ হয়েছে এই বাণী দিয়ে: "সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো; নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। (আল্লাহর কথার ওপর) যাদের দৃঢ়বিশ্বাস নেই, তারা যেন কিছুতেই তোমাকে ভুল পথে চলার জন্য প্ররোচিত করতে না পারে!"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আনকাবুত; যা শেষ হয়েছে জিহাদ বা চেষ্টা-সংগ্রামের আলোচনা দিয়ে। আর সূরা রূম শুরু করা হয়েছে আহলে কিতাবদের বিজয় ও মুমিনদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা-সংগ্রাম অব্যাহত রাখলে, তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবেই। আর তখন মুমিনরা আনন্দিত হবে।

শানে নুযুল

অগ্নিপূজারি পারসিক রাজা পারভেজ খসরু পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সট্যান্টিনোপল আক্রমণ করে। লড়াইয়ে প্রাণ হারায় শহরটির প্রায় ৯০ হাজার খ্রিষ্টান অধিবাসী। রোমান শাসক হিরাক্লিয়াসকে আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে অগ্নিপূজা করার আহ্বানও জানিয়েছিল পারস্যের এই মুশরিক রাজা। ইরানের মুশরিকদের এই বিজয়ে মক্কার মুশরিকরা ভীষণ খুশি হয়। কারণ আগুন আর মূর্তিতেই শুধু তফাত। বিশ্বাসে তো আর তফাত নেই। দু'দল-ই তো আল্লাহর জায়গায় অন্যকিছুর উপাসনা করে। তাই মক্কার মুশরিকরা খুব খুশি হয়েছিল। এ ঘটনাটি কুরআনে স্থান পেয়েছে; এসেছে এই সূরার একদম প্রথমেই—'বাইজান্টাইনরা হেরে গিয়েছে। কিন্তু অচিরেই তারা আবার বিজয়ী হবে। আর তখন মুমিনরা খুশি হয়ে যাবে।' এখানে একইসাথে আল্লাহ দুটি বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। (১) পার্সিয়ান অগ্নিপূজারিদের বিরুদ্ধে রোমের বিজয়, আর (২) মক্কার মূর্তিপূজারিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়। কুরআনের এই ঘোষণা শুনে কাফিররা আবারো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অগ্নিপূজারিরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, খ্রিষ্টানদের কচুকাটা করছে, সেখানে অল্পকিছু বছরের মধ্যে তাদের বিজয় আশা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে বাস্তব হলো সেটাই, যা আল্লাহ জানিয়েছিলেন। হিরাক্লিয়াস ঘুরে দাঁড়িয়ে পার্সিয়ানদের উলটো আক্রমণ করে। মুশরিকদের দেশছাড়া করে। এদিকে মুমিনরাও বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের দম্ভ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। আর এই ঘটনা দুটিকে লক্ষ্য করেই এ-সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১৮/৪৪৯)

সেগমেন্ট

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহ--
সবকিছুর স্রষ্টা।
গায়েব বা অদৃশ্যের
খবর একমাত্র
তিনিই জানেন।
সূরার শুরুতেই এই
ঘোষণা শুনিয়ে
দেওয়া হয়েছে।

তাওহীদ ও পরকালকে মেনে নেওয়ার আহ্বান

কাফিরদের প্রতি
আহ্বান জানানো
হয়েছে—তারা যাতে
তাওহীদ ও
আখিরাতের ওপর
ঈমান আনে।

কিয়ামাতের নিশ্চয়তা

তিনিই সবকিছুর
স্রষ্টা, তিনিই
আবার সবকিছু
ধ্বংস করে দেবেন।
আর যিনি প্রথমবার
সৃষ্টি করতে পারেন,
তিনি ওই একই
জিনিস দ্বিতীয়বার
কেন গড়তে
পারবেন না?

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, সেসব সূরাকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকমই একটি সূরা হলো সূরা রূম।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সুদ-সহ অন্যান্য সকল সামাজিক অপরাধকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করলে, → পৃথিবীতে আল্লাহর আযাব-গযব থেকে মুক্তি মিলবে।

গতিপথ

১. রোমান ও মুমিনদের প্রতি সুসংবাদ

অগ্নিপূজারিদের সাথে রোমানরা, আর মূর্তিপূজারি মুশরিকদের সাথে মুসলিমরা যুদ্ধে বিজয়ী হবে। এই ঘোষণা দিয়েই আল্লাহ সূরাটি শুরু করেন।

২. আখিরাত ও তাওহীদের প্রমাণ

বিভিন্ন যুক্তি ও উপমা ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা মানব-জাতির সামনে আখিরাত ও তাওহীদের সত্যতাকে তুলে ধরেন। এই সত্যকে মেনে না নিলে, পরাজয় কাঁধে চেপে বসবে—এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সেন্ট্রাল থিম

বদর যুদ্ধে মুমিনদের বিজয়ের আগাম সুসংবাদ

৩. মুমিনদের প্রতি নির্দেশনা ও কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

বিজয়ী হতে হলে মুমিনদেরকে কিছু কাজ ধারাবাহিকভাবে করে যেতে হবে। কিছু কাজ করা যাবে না কোনোভাবেই। একইসাথে রিযিক ও জীবন-মরণের ব্যাপারে কাফিরদেরকে জানানো হয়েছে চ্যালেঞ্জ।

৪. ধৈর্য ধারণ ও সংশয়বাদীদের ব্যাপারে সতর্কতা

মুমিনদের কাছে বিজয় ধরা দেবেই। তবে ধরতে হবে একটু ধৈর্য। আর যারা সংশয়ের জালে বন্দি, তাদের ব্যাপারে থাকতে হবে সর্বোচ্চ সতর্ক।

ওভারভিউ	আয়াত
অজানা ভবিষ্যতের ব্যাপারে আগাম সংবাদ এবং ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের ওয়াদা।	১-৭
আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে একটুখানি ভাবনায় ডুব দিলেই, তাঁকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিতে কোনো কষ্ট হবে না।	৮-১৬
আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করা হয়েছে। আর দেওয়া হয়েছে তাঁর একক অস্তিত্ব ও প্রভুত্বের প্রমাণ।	১৭-২৭
আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি, মুশরিকদের মিথ্যাচার ফাঁস ও সত্যিকারের ধর্ম বা জীবনাদর্শকে আঁকড়ে ধরার আদেশ।	২৮-৩২
মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকে। আর বিপদটা সরিয়ে নিলেই তারা আবার আল্লাহর থেকে দূরে সরে পড়ে।	৩৩-৩৭

ওভারভিউ	আয়াত
নিকট-আত্মীয়দের ওপর খরচ করতে ইসলাম উৎসাহ দেয়। আবার হারাম উপায়ে অর্থ-সম্পদ আয় করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারিও দেয়।	৩৮-৪০
অন্যায়কারীদের সাজা ও ঈমানদারদের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা।	৪১-৪৫
আল্লাহর ক্ষমতার দুটি নিদর্শন হলো—বাতাস আর বৃষ্টি। কাফিরদেরকে মৃত মানুষের সাথে তুলনা করা হয়েছে।	৪৬-৫৩
মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ। সেই সাথে পরকালে অপরাধীদের পরিণতির ব্যাপারেও কথা বলা হয়েছে।	৫৪-৫৭
কুরআনে আছে ভাবনার খোরাক। কষ্টের মুখোমুখি হলে রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়েছেন।	৫৮-৬০

কেইস-স্টাডি

প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ 'ফিতরাত' দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। 'ফিতরাত' হলো 'সহজাত বৈশিষ্ট্য'। এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমরা দুনিয়াতে আসি। মানুষের ফিতরাত হলো—ইসলামকে সে নিজের জীবনাদর্শ হিসেবে মেনে নেবে। কিন্তু তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনেক ক্ষেত্রেই সেই ফিতরাত নষ্ট করে ফেলে। ফলে সেই মানুষটা হারিয়ে ফেলে তার সত্যিকারের পরিচয়। এই সূরার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন—"সুতরাং সকল জীবনাদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহর আনুগত্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করো; আল্লাহর (কাছে আত্মসমর্পণ করার) এই বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধরো, যে-বৈশিষ্ট্য দিয়ে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টি(র এই বৈশিষ্ট্য) বদলে ফেলো না; এটাই সঠিক জীবনাদর্শ, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ (তা) জানে না।" তাই মুসলিম-অমুসলিম প্রতিটি মানুষের উচিত—এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তার দুয়ার উন্মোচিত করা। নিজেদের শেকড়ের সন্ধান করা।

(দেখুন—বুখারি, ১৩৫৮; মুসলিম, ২৬৫৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এই সূরার ৭ নং আয়াতে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে—"তারা জানে কেবল দুনিয়ার জীবনের বাইরের দিকটা, পরকাল সম্পর্কে তারা ভীষণ উদাসীন।" বিষয়টা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে খুব আশ্চর্যজনক একটা পরিস্থিতি সামনে আসে। দুনিয়ার বিষয়-আশয়ে মানুষের চমৎকার মেধা। তাদের আবিষ্কার পুরো বিশ্বকে চমকে দেয়। অথচ এই মানুষগুলোই আবার দ্বীনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বোকা, পরকাল সম্পর্কে একেবারে আলাভোলা! নিজেদের শেষ পরিণতি কী হবে, তারা যেন কিছুই বোঝে না। দুনিয়া ও আখিরাত—দুটো বিষয়ে তাদের চিন্তায় কত বৈপরীত্য! জীবন-শেষে এই তথাকথিত 'বুদ্ধিমান' মানুষগুলোই নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় মূর্খ হিসেবে খুঁজে পাবে। কারণ, পুরো পৃথিবীকে আলো ঝলমলে করে তুললেও, এরা নিজেরা পড়ে থাকে গুমোট অন্ধকারে। আপন রবকে না চেনাটাই তো সবচেয়ে বড় মূর্খতা।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৪৫৯; ইবনু মাজাহ, ৪২৬০)

সূরাটিতে বর্ণিত আল্লাহর অনেকগুলো নিদর্শনের মাঝে একটি হলো—"তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের কাছে প্রশান্তি পেতে পারো।" পুরুষ জাতির প্রশান্তির উৎস হিসেবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নারী জাতি। এটি একটি বিজ্ঞানময় প্রক্রিয়া। আর এই প্রক্রিয়ায় আজ অবধি মানব-বংশধারা, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি টিকে রয়েছে। যদি নারী-পুরুষের মধ্যে প্রশান্তি লাভের এই অস্থিরতাটুকু না থাকত, তা হলে হয়তো ছাগল-ভেড়ার মতো মানুষের বংশধারাও এগিয়ে যেত। কিন্তু সভ্যতা সৃষ্টির কোনো উপায় থাকত না। আল্লাহ নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে পুরুষ ও নারীর মাঝে এমন চাহিদা, তৃষ্ণা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে রেখেছেন যে—তারা উভয়ে একসাথে মিলেমিশে না থাকলে, সুখ-শান্তি লাভ করতে পারে না। সমগ্র প্রাণীজগতের মধ্যে কেবল মানুষই সভ্যতা-সংস্কৃতির কারিগর হতে পেরেছে শুধু এই বৈশিষ্ট্যের কারণে।

(দেখুন—মুসলিম, ১৪৬৭; ইবনু হিব্বান, ৪০৩২)

সূরা লুকমান

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫৭-তম সূরা। এর আগে সূরা সাফফাত ও পরে সূরা সাবা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা রূম ও পরে সূরা সাজদা।

এক নজরে লুকমান

- নুবুওয়াতের ৬ষ্ঠ/৭ম বছর নাযিল
- সূরা নং: ৩১
- আয়াত: ৩৪
- মাক্কি

নামের রহস্য

'লুকমান ﷺ তার ছেলেকে কিছু উপদেশ দেন। এ-সূরার ১২-১৯ নং আয়াতে তার সেই উপদেশগুলো স্থান পেয়েছে। এর ভিত্তিতে এই সূরার নাম দেওয়া হয় 'লুকমান'।

মৌলিক থিম

০১ পথ দেখানো: সঠিক পথ ও ভুল পথ।

০২ ছেলের প্রতি লুকমান ﷺ-এর উপদেশ।

০৩ সত্যিকারের পথভ্রষ্টদের পরিচয়।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞানী। কুরআনে এই জ্ঞানের সমাহার নিয়ে সূরা লুকমানের শুরুতেই আল্লাহ বলেন, "এগুলো বিচক্ষণতায়-ভরপুর আসমানি কিতাবের বার্তা, যা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণাস্বরূপ।" আর সূরাটির শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহর কাছেই আছে চূড়ান্ত সময়ক্ষণের জ্ঞান, ...আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।" অর্থাৎ কুরআন হলো জ্ঞানের ভান্ডার; আর আল্লাহ হলেন সে-ভান্ডারের একমাত্র অথোরিটি।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা রূম; যার শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি এ কুরআনে মানুষের উপকারের জন্য সব ধরনের উদাহরণ পেশ করেছি।" আর এই সূরাটিতে পুত্রের প্রতি লুকমান ﷺ-এর দেওয়া উপদেশগুলো তুলে ধরা হয়। যাতে রয়েছে মানুষের জন্য বিশদ উদাহরণ। আর এগুলো মূলত মানুষের উপকারের জন্যই তুলে ধরা হয়েছে।

শানে নুযুল

মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগই কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে সেরা। যেমন আমরা বর্তমান যুগকে বলে থাকি তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। এইতো সেদিনও আমরা বলতাম—এটা বিজ্ঞানের যুগ। ঠিক তেমনি রাসূল ﷺ-এর সময়ে আরবে চলছিল সাহিত্যের যুগ। রসে-ভরা কবিতা কিংবা ভাবে-আঁটা কাব্য—সবই ছিল তখন। এখনকার সময়ে সাহিত্যের কনটেক্সট-এ রবীন্দ্র-নজরুলের উপমা-উদাহরণ দেওয়া হয়। আর তখনকার সময়ে আরবে দেওয়া হতো অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি লুকমান-এর উপমা-উদাহরণ। সেটি এমন এক সময়, যখন কাফিররা আল্লাহর রাসূলকে বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। কোনোভাবেই তারা এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না। বরং পড়ে থাকবে নির্জীব কিছু মূর্তি নিয়ে। শির্ক তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়ানো। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ নাযিল করলেন সূরা লুকমান; টেনে আনলেন তাদের পরিচিত লুকমান হাকীমের প্রসঙ্গ। তাদের সামনে তুলে ধরলেন লুকমান হাকীমের কিছু বক্তব্য। তিনি তার পুত্রকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশমালা আল্লাহ সযত্নে বসিয়ে দিলেন এই সূরায়। আর মক্কার মুশরিকদের বোঝাতে চাইলেন—তোমরা তোমাদের কাব্যকথায় যার উক্তি তুলে আনো, দেখো তার নিজের কথা কী ছিল, সে নিজে কোন আকীদা-বিশ্বাস লালন করত, কোন নৈতিকতার শিক্ষা দিত। তা হলেই তো তোমাদের চোখ খুলে যাবে। ফলে বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে পারবে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৫/১৪০; তাফহীমুল কুরআন, ১১/১০৬)

সেগমেন্ট

কুরআন ও এর গভীর জ্ঞান

সূরার শুরুতেই কুরআনের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তুলে ধরেছেন। কুরআন এমন এক কিতাব, যা গভীর জ্ঞানে ভরপুর। মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে কুরআনের কোনো বিকল্প নেই।

কুরআনকে অবজ্ঞার ফল

অবাধ্যরা কুরআনকে মেনে নিতে চায় না। কুরআনের পরিবর্তে বরং নিজেদের গোষ্ঠী বা জাতির রীতি-নীতির অনুসরণ করতে চায়। এর ফলে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিন শাস্তির দিকে।

আল্লাহর নিয়ামাত ও ক্ষমতা

আল্লাহ মানুষের ওপর অজস্র নিয়ামাত ঢেলে দিয়েছেন। আবার তাঁর ক্ষমতাও অসীম। এই কথাগুলোই মানুষকে সূরার এ-অংশে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, সেসব সূরাকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকমই একটি সূরা হলো সূরা লুকমান।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মিউজিক বা সাময়িক বিনোদনের কৌতুক-কথার ব্যাপারে মানুষকে সাবধান হতে হবে,

কারণ এগুলো ঈমানের পথ থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় ও তাদের চিন্তাশক্তিকে নষ্ট করে ফেলে।

গতিপথ (৩)

সেন্ট্রাল থিম
রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ জেগে ওঠাই মানুষের সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞা

১. গভীর জ্ঞানে ভরপুর এক কিতাব: আল-কুরআন
কুরআনের বাণীগুলো গভীর জ্ঞান বা প্রজ্ঞায় ভরপুর। কারণ এ-কুরআন সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

২. ভুল-সঠিক
আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে অস্বীকার করাই সবচেয়ে বড় অন্যায়। আর আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁকে একমাত্র রব হিসেবে মেনে নেওয়াই সঠিক কাজ।

৩. আল্লাহর এক প্রজ্ঞাবান বান্দা—লুকমান
লুকমান ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা গভীর জ্ঞান দান করেছিলেন। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি তার ছেলেকে কিছু উপদেশ দেন। সেই উপদেশগুলো আজও অনুসরণীয়।

৪. ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর হাতে
সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞাবান তো তিনি—যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই জানেন ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে।	১-৫	গোটা দুনিয়ার মানুষ দুটি পথে চলছে—(১) ঈমানের পথ, (২) কুফরের পথ।	২২-২৬
অহংকারী ও আল্লাহর প্রতি বেপরোয়া লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে।	৬-৭	আল্লাহর কথা চিরস্থায়ী। অনন্তকাল ধরে তাঁর কথামালা লিখে চললেও, সেগুলো কভু ফুরোবে না।	২৭-২৮
গভীর জ্ঞান ও ক্ষমতার একটি নিদর্শনের কথা আলোচিত হয়েছে।	৮-১১	মানুষের উপকারের জন্য পুরো মহাবিশ্বকে আল্লাহ অনুগত করে রেখেছেন। তেমনি মানুষেরও উচিত একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা।	২৯-৩২
নিয়ামাতকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এই নিয়ামাতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার আহ্বান।	১২-১৯	কিয়ামাত ও দুনিয়ার জীবনের ধোঁকা সম্পর্কে আলোচনা উঠে এসেছে।	৩৩-৩৪
প্রাচুর্যে ডুবে থেকেও মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক করে!	২০-২১		

কেইস-স্টাডি

একটা সমাজকে আল্লাহ কখন ধ্বংস করে দেন বলতে পারবেন? গোটা সমাজটা যখন পাপে সয়লাব হয়ে যায়, সামষ্টিকভাবে পুরো সমাজের মানুষ যখন আল্লাহর অবাধ্য হয়, ঠিক তখনই ঘটে এমন ঘটনা। তো, কীভাবে পুরো সমাজ গুনাহের আঁধারে ছেয়ে যায়? সেখানে কি কোনো ভালো মানুষ থাকে না? হ্যাঁ, ভালো মানুষ থাকে। কিন্তু এই ভালো মানুষগুলো থাকে নিজ নিজ ইবাদাতে মশগুল। দিনভর রোযা রাখে, রাতভর আল্লাহর সামনে সাজদায় পড়ে থাকে। কিন্তু সমাজ যে এদিকে গোল্লায় যাচ্ছে, সেই ব্যাপারে তারা উদাসীন। সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করতে তারা কোনো ধরনের পদক্ষেপ হাতে নেয় না। আর সমাজ থেকে যখন ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ উঠে যায়, তখনই আল্লাহ সমাজটাকে ধ্বংস করে দেন। তাতে সেই এলাকায় যত বড় তাহাজ্জুদগুজার বান্দাই থাকুক না কেন। তাই ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে বাধার মুখোমুখি হলে, ধৈর্য ধরতে হবে। এতে আল্লাহর সাহায্য মিলবে।

(দেখুন—মুসলিম, ৪৯; তিরমিযি, ২১৬৮; আবু দাউদ, ৪৩৩৮; ইবনু মাজাহ, ৪০০৫)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

বর্তমানে বিনোদনের কত যে পন্থা, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ফেসবুকিং, শর্টস্, রিলস্—আজকালকার বিনোদনের উৎস! অথচ এগুলো মানুষের শুধু সময়ই নষ্ট করে না; বরং দ্বীন থেকেও দূরে সরিয়ে রাখে। আর এগুলোতে আছে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। এই ধরনের জঘন্য মানুষ রাসূল ﷺ-এর যুগেও ছিল। পয়সা খরচ করে তারা গান-বাজনা আর গায়িকা কিনে আনত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এসবের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া। আল্লাহর বিধান নিয়ে হাসি-তামাশা করা। তাদের ব্যাপারে এ-সূরার ৬ নং আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এই আয়াতটির সাথে বর্তমান স্যোশাল মিডিয়ার অবস্থাকে মেলান। খুব একটা পার্থক্য পাওয়া যাবে না। এই রসালো বিনোদনের পরিণাম কিন্তু খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সুতরাং তা থেকে বাঁচতে চাইলে আমাদেরকে অবাধ বিনোদনের মুখে লাগাম পরাতে হবে। পবিত্র ও নির্মল জীবনযাপন করতে হবে আল্লাহর বিধান মেনে।

(দেখুন—বুখারি, ৯, ৬১১৭; মুসলিম, ৩৫)

"স্মরণ করো, যখন লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'ছেলে আমার, তুমি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করো না, নিঃসন্দেহে শির্ক এক মহা অন্যায়।'" এ-সূরার ১৩ নং আয়াত। বাবাদের জন্য এই আয়াত থেকে তাদাব্বুর করার এবং শেখার বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আছে। লুকমান ﷺ তার ছেলেকে আন্তরিকভাবে উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো আল্লাহ তাআলা এত পছন্দ করেছেন যে, প্রায় ৩০০০ বছর আগের উপদেশ-মালা হুবহু কুরআনে তুলে ধরেছেন। বর্তমান সময়ে সেগুলো এখনো সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সুতরাং প্রত্যেক বাবার উচিত—লুকমান ﷺ যেভাবে তাঁর ছেলেদেরকে সুন্দর সুন্দর শব্দে ডেকেছেন, সেভাবে ডাকা, তাদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। এভাবে ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে উপদেশ দিয়ে দ্বীন মেনে চলার অনুপ্রেরণা জোগাতে হবে। তবেই তো বড় হয়ে তারা হবে সুসন্তান। অন্যথায় আল্লাহর হক যেমন নষ্ট করবে, মা-বাবাকেও কষ্ট দেবে। তাই সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার বিষয়টাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।

(দেখুন—আবু দাউদ, ৪৯৫; তিরমিযি, ১৯৫২)

সূরা সাজদা

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭৫-তম সূরা। এর আগে সূরা মুমিনুন ও পরে সূরা তূর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা লুকমান ও পরে সূরা আহযাব।

এক নজরে সাজদা

- মাক্কি যুগের শেষদিকে নাযিল
- সূরা নং: ৩২
- আয়াত: ৩০
- মাক্কি

নামের রহস্য

'সাজদা' শব্দের অর্থ 'নত হওয়া'। এখানে নত হওয়া বলতে সাধারণ নত হওয়াকে বোঝানো হয়নি। বরং কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে নামাজে যে সাজদা দেওয়া হয়, সেই নত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। এটি নতি-স্বীকারের সর্বোচ্চ ধরন। সূরার ১৫ নং আয়াতে এসেছে—আল্লাহর পয়গাম স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে, মুমিনরা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। সেখান থেকেই এই সূরার নাম হয়েছে 'সাজদা'।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর নিদর্শন ও মানুষ সৃষ্টির রহস্য।

০২ অবিশ্বাসীদের সন্দেহ ও মু'জিযা দেখবার দাবি।

০৩ মুমিন—রাতের আঁধারে সাজদায় নত।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটবে। এটি ধ্রুব সত্য এবং এটি বাস্তবায়িত হবেই। সূরার শেষেও এই বিষয়টিই উদাহরণের মাধ্যমে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করা হয়েছে—জমিন মরে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা পানির মাধ্যমে তাতে আবার যেভাবে প্রাণসঞ্চার করেন, ঠিক সেভাবেই মৃত মানুষগুলোর মাঝে আল্লাহ আবার জীবন দান করবেন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা লুকমান; যার শেষ আয়াতে আল্লাহ গায়েবের পাঁচটি জ্ঞানের কথা বলেছেন। এই পাঁচটি জ্ঞান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা আমরা সূরা সাজদার শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আয়াতসমূহে দেখতে পাই। আয়াতগুলো পর্যায়ক্রমে ৫-৬, ৭-৯, ২৭, ১৩ ও ১১।

শানে নুযুল

মানুষের মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের বিষয়ে সন্দেহ দূর করতে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত নিয়ে খুব হাসি-ঠাট্টা করত। নবিজির ব্যাপারে তারা বলত—'এই লোক অদ্ভুত সব কথা বলে। আমরা মরে গেলে মাটির সাথে আমাদের হাড়গোড় মিশে যাবার পর নাকি আমরা আবার জীবিত হব! আমাদের নাকি হিসেব-নিকেশ হবে। কখনো সে বলে জান্নাত-জাহান্নাম আছে। আবার বলে আমাদের মূর্তি-প্রতিমা নাকি কিছু নয়, বরং এক আল্লাহর উপাসনা করতে হবে! আরও বলে, সে নাকি আল্লাহর নবি, আকাশ থেকে তার কাছে ওহি আসে! কী সব অদ্ভুত কথাবার্তা!' তাদের এসব সংশয়-সন্দেহ দূর করাই এই সূরার উদ্দেশ্য। এ-সূরাতে তাদেরকে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগৎ দেখতে বলেছেন। সেগুলো নিয়ে ভাবতে বলেছেন। কারণ এগুলোর মধ্যে আছে চমৎকার সব নিদর্শন—যা দেখে একজন মানুষ আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। আল্লাহ বুঝিয়ে বললেন, আগেকার যেসব জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তাদের পোড়ো বাড়ি-ঘরগুলো তোমরা দেখতে পারো। তোমরা তো ব্যবসাপাতি করতে সেসব পথ দিয়েই যাতায়াত করো। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, কী পরিণতি হলো তাদের! তোমরাও যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হও, আখিরাতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দাও, তা হলে তোমাদের জন্যও কিন্তু ওই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে!

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৫/২২২)

সেগমেন্ট

কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর পরিচয়

সূরার শুরুর অংশেই বিস্ময়কর কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি বান্দাদের কাছে তাঁর নিজের পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

কাফিরদের যুক্তি খণ্ডন

কাফিরদের টালবাহানার অন্ত ছিল না। তারা নানা ভ্রান্ত যুক্তি তুলে ধরে কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইত। তাদের সেসব কু-যুক্তি এখানে খণ্ডন করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর প্রতি আশ্বাস

সূরার শেষ অংশে রাসূল ﷺ-কে কুরআনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

ফজিলত

জুমুআর দিন ফজরের নামাজে পড়া সুন্নাহ : আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ জুমুআর দিন ফজরের নামাজে সূরা সাজদা ও সূরা দাহ্‌র পড়তেন। (বুখারি, ৮৯১)

প্রতিদিন ঘুমের আগে পড়া সুন্নাহ : জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ সূরা সাজদা ও সূরা দাহ্‌র পড়ার আগে ঘুমাতেন না। (তিরমিযি, ২৮৯২, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

ঈমানকে মজবুত করে বেশি বেশি নেক আমল করলে: → পরকালে পাওয়া যাবে স্থায়ী শান্তির আবাস—জান্নাতুল মাওয়া।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
আল্লাহর নিদর্শন, মানুষের জবাবদিহিতা ও আল্লাহর আনুগত্য

১. কুরআন
সন্দেহাতীতভাবে এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

২. মানুষের সৃষ্টি ও তাদের জবাবদিহিতা
আল্লাহ তাআলা কাদামাটি দিয়ে মানুষ বানিয়েছেন। দিয়েছেন চমৎকার আকৃতি। মৃত্যুর পর তাদের কাছ থেকে আবার হিসেবও বুঝে নেবেন।

৩. অতীত থেকে শিক্ষা
অতীতের জাতিগুলোর ইতিহাস জানতে হবে। তাদের পরিণতির দিকে ফোকাস দিতে হবে। পরকালের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে হবে।

৪. সাজদা
আল্লাহর সামনে সাজদায় নত হওয়ার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। এটিই মানুষকে সম্মানিত করে। আর সাজদাবনত এসব মানুষকে আল্লাহ পরকালেও ভীষণ পুরস্কৃত করবেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআন মুহাম্মাদ ﷺ-এর লিখা কিতাব নয়। এটি আল্লাহই পাঠিয়েছেন—যাতে নবিজি মানুষকে সতর্ক করতে পারেন।	১-৩	মুমিনরা দুনিয়াতে ভালো ভালো কাজ করে। তাই তাদেরকে এমন পুরস্কার দেওয়া হবে, যা কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।	১৬-১৮
আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোনো অভিভাবক নেই। তিনি জ্ঞানী, পরাক্রমশালী ও দয়ালু।	৪-৬	মুমিনদের জন্য আছে জান্নাত, আর কাফিরদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম। পৃথিবীতেও তাদেরকে ছোট ছোট শাস্তি দেওয়া হয়।	১৯-২১
তিনি সামান্য একটু বীর্য থেকে মানুষকে বানিয়েছেন। দিয়েছেন শোনা ও দেখার শক্তি। তবুও মানুষ অকৃতজ্ঞ!	৭-৯	আদর্শ নেতা হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর বার্তাগুলোর ওপর সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস রাখা।	২২-২৪
কাফিররা বিশ্বাস করে—পুনরুত্থান অসম্ভব। কিন্তু মৃত্যুর পরই তাদের ভুল ভাঙবে, তখন শুধু আফসোস করবে।	১০-১২	শুকিয়ে চৌচির-হয়ে-যাওয়া জমিনকে আল্লাহ যেমন সতেজ করতে পারেন, তেমনি মরা মানুষকে জীবিত করার ক্ষমতাও তাঁর আছে।	২৫-২৭
দুনিয়ায় কাফিররা আল্লাহকে ভুলে থাকে। তাই আখিরাতে আল্লাহও ওদেরকে ভুলে থাকবেন।	১৩-১৫	হাশরের মাঠের অবস্থা দেখে সব কাফির ঈমান এনে ফেলবে। কিন্তু সেদিনের ঈমান তাদের কোনো কাজে আসবে না।	২৮-৩০

কেইস-স্টাডি

যারা আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মানে, তাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে আল্লাহ এই সূরার ১৬ নং আয়াতে বলেন, "(রাতের একপর্যায়ে) যাদের পিঠ বিছানা থেকে উঠে যায়, যারা নিজেদের রবকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকে, আর আমি যেসব জীবিকা দিয়েছি সেখান থেকে যারা দান করে।" এখান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার—আল্লাহ ও তাঁর বাণীকে সত্য হিসেবে মানলে, আমাকে তিনটি কাজ করতে হবে : (১) রাতের একটা অংশে নিজের পিঠটাকে বিছানা থেকে আলাদা করতে হবে। দাঁড়িয়ে যেতে হবে রবের সামনে। (২) এবার রবকে ডাকবার পালা। তবে সেই ডাকা সাধারণ কোনো ডাকা নয়। আল্লাহর শাস্তির ভয় আর তাঁর রহমতের আশা নিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। (৩) তিনি যেসব সম্পদ আমাকে দিয়েছেন, সেখান থেকে সাধ্যমতো দান করতে হবে। এই কাজগুলো ঈমান-আনার দাবির প্রমাণ। তাই এই বিষয়টির ওপর গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৫২৭; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ, ২১৩৭)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এ-সূরার ২১ নং আয়াতে বলেছেন, "আমি তাদেরকে বড় শাস্তির আগে ছোট শাস্তির মজা ভোগ করাব, যাতে তারা (অনুশোচনা করে) ফিরে আসে।" এই আয়াতটি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনার সুযোগ আছে। এখানে 'বড় শাস্তি' বলতে বোঝানো হয়েছে জাহান্নামের আগুন। আর 'ছোট শাস্তি' অর্থ দুনিয়ার বিবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা। কঠিন রোগ, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি এমন 'ছোট শাস্তি'-র উদাহরণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে এসব পাঠানো হয়, যাতে বড় শাস্তি ভোগ করার আগেই মানুষ সচেতন হয়ে যায়। দুনিয়ায় আল্লাহ কোনো মানুষকেই একেবারে পরম আনন্দে রাখেননি। কারণ, এতে মানুষ এ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়বে যে, তার চেয়ে বড় আর কোনো শক্তি নেই, যা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে। তাই তিনি এসব বিপদাপদের মাধ্যমে সতর্ক সংকেত পাঠান—বড় শাস্তি থেকে বাঁচতে মানুষ যেন নিজেকে শুধরে নেয়।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/১৪৮; সা'লাবি, তাফসীর, ২১/২৯৮)

আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের কয়েকজনকে নেতা বানিয়েছিলেন। কারণ হিসেবে তাদের দুইটা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। গুণ-দুটি দেখুন এই সূরার ২৪ নং আয়াতে—"তারা ধৈর্যধারণ করায় এবং আমার বার্তাগুলোর ওপর সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস রাখায়, আমি তাদের মধ্যে (আরও) কিছু লোককে আদর্শ নেতা বানিয়ে দিয়েছিলাম, যারা আমার নির্দেশ-অনুযায়ী (গণমানুষকে) পথ দেখিয়েছে।" যারা মানুষকে পথ দেখাতে চান, ওপরের আয়াতটি তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা। আয়াতে গুণ দুইটির প্রথমটি হলো ধৈর্য ধারণ—আল্লাহর বিধান মানতে গিয়ে বিভিন্ন রকমের কষ্ট সহ্য করা। আরেকটি গুণ হলো—আল্লাহর পাঠানো-বার্তা অর্থাৎ কুরআনের ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখা, সব রকম দ্বিধা-সন্দেহ থেকে দূরে থাকা। কেউ যদি এই দুটি গুণ নিজের মধ্যে ধারণ না করেই নেতৃত্বের আসনে বসে যায়, তবে সে নিজেও পথ হারাবে, অন্যকেও টেনে নেবে ভুল পথে।

(দেখুন—হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৩৬৬৬; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৯৭১৭)

সূরা আহযাব

سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯০-তম সূরা। এর আগে সূরা আলে ইমরান ও পরে সূরা মুমতাহিনা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা সাজদা ও পরে সূরা সাবা।

এক নজরে আহযাব

- ৫ম হিজরিতে নাযিল
- সূরা নং: ৩৩
- আয়াত: ৭৩
- মাদানি

নামের রহস্য

'আহযাব' শব্দটি 'হিযব' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ 'দল বা বাহিনী'। এ-সূরার ৯-২৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, খন্দক যুদ্ধের সময় কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা ঘেরাও করেছিল। সেখান থেকে এই সূরার নাম হয়েছে 'আহযাব'।

মেজর থিম

০১. কাফির ও মুনাফিকদের স্বভাব: মূর্খতার চর্চায় লেগে থাকা।

০২. রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা ও তাঁর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ।

০৩. কোনো ওজর-আপত্তি ছাড়া রাসূল ﷺ-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার গুরুত্ব।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই কাফির-মুশরিকদের কথামতো চলার বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছেন, "আল্লাহ-ভীতির ওপর অটল থাকো, কাফির ও মুনাফিকদের কথামতো চলো না—নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিচক্ষণ।" আর সূরাটির শেষে বর্ণিত হয়েছে যারা আল্লাহকে ত্যাগ করে কাফিরদের কথা শুনবে তাদের অবস্থা—"পরিণামে, আল্লাহ মুনাফিকিতে লিপ্ত পুরুষ ও নারী এবং শির্কে জড়িত পুরুষ ও নারীদেরকে শাস্তি দেবেন।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা সাজদা; যার শেষ আয়াতে আল্লাহ কাফিরদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন, "সুতরাং তুমি তাদেরকে এড়িয়ে যাও আর অপেক্ষা করো"। আর এই সূরাটির শুরুও হয়েছে কাফিরদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশের মাধ্যমে—"আল্লাহ-ভীতির ওপর অটল থাকো, কাফির ও মুনাফিকদের কথামতো চলো না—নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিচক্ষণ।"

শানে নুযুল

বেশ কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে এ-সূরাটি নাযিল হয়। প্রথমত, সে-সময়কার আরব সমাজে সন্তান দত্তক নেওয়ার প্রথা ছিল। তবে মুশকিল হলো—আপন সন্তানদের জন্য যে নিয়ম-রেওয়াজ, দত্তক সন্তানদের বেলাতেও তারা সেই একই রেওয়াজ অনুসরণ করত। আল্লাহর রাসূল হিসেবে এই প্রথা ভেঙে দেওয়া নবিজির জন্য আবশ্যক ছিল। তাই তিনি নিজের পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী—যায়নাবকে বিয়ে করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা এ-নিয়ে হাঙ্গামা করবে বা কুৎসা রটাবে, এই আশঙ্কায় সামনে আগাতে চিন্তা করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তখন এই সূরায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, পালক সন্তান আর নিজের ঔরসের সন্তান কখনো এক হতে পারে না। তাই তাদের বেলায় নিয়ম-নীতিও এক হবে না। তুমি ভয়ে বা লজ্জায় পিছিয়ে যেয়ো না। তখন এই ঘোষণার পর যায়নাব ﵂-কে নবিজি বিয়ে করেন। এতে সত্যি সত্যিই কাফির ও মুনাফিকরা হই-হই কাণ্ড বাধিয়ে বসে। আল্লাহ তাআলা এখানে তাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ ছাড়া খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধে কাফিরদের অবস্থান ও বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ এ-সূরাতে এসেছে। আরও এসেছে পর্দার মতো গুরুত্বপূর্ণ আইন। উম্মুল মুমিনীনদের জন্য কিছু দিক-নির্দেশনাও আল্লাহ এই সূরার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। মোটকথা, বিভিন্ন সময়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সূরাটি ধাপে ধাপে নাযিল হয়।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৫/২৭৩)

সেগমেন্ট

রাসূল ﷺ-এর প্রতি নির্দেশনা

সূরার শুরুটাই হয়েছে নবিজিকে সম্বোধন করে—'ও নবি,...।' এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিছু নির্দেশনা দেন।

নবিজির মর্যাদা

পরবর্তী ধাপে নবিজির জন্য স্পেশাল কিছু বিধান দেওয়া হয়েছে। যা শুধু তাঁর জন্যই প্রযোজ্য।

হুঁশিয়ারি

সূরার শেষ ধাপে মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদেরকে সাবধান করা হয়। সেই সাথে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—কিয়ামাতের সময়ক্ষণ একমাত্র তিনিই জানেন।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, সেসব সূরাকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা আহযাব।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করলে:

দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় ক্ষেত্রেই সুখময় জীবন পাওয়া যাবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মুমিনদেরকে আল্লাহর-দেওয়া কিছু বিধান ও নির্দেশনা

১. মুমিনদের প্রতি নির্দেশনা

কাফির ও মুনাফিকদের তাবেদারি করা যাবে না। সামাজিক শৃঙ্খলা অটুট রাখতে 'যিহার' ও 'দত্তক'-এর ব্যাপারে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।

২. আহযাব ও বনু কুরাইযার যুদ্ধ

আহযাব যুদ্ধে মুসলিম কাফেলা দু'খণ্ড হয়ে যায়—মুমিন ও মুনাফিক। এই দুই দলের চাল-চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া তখন ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযাও মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে তাদের সাথেও একটি যুদ্ধ বাধে।

৩. পারিবারিক ও সামাজিক আইন

মুমিন নারী-পুরুষের জন্য কিছু পারিবারিক ও সামাজিক আইন জারি করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের লক্ষ্য করে কিছু উপদেশ দেন।

৪. সামষ্টিক নীতি

মুমিনদের কোনোভাবেই উচিত নয়—তারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেবে বা কথা দিয়ে কথা রাখবে না। বরং তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে যেতে হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
নবি ﷺ-এর প্রতি কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দত্তক নেওয়া সন্তানকে নিজের সন্তান দাবি করা যাবে না।	১-৫	যাইদ ও যায়নাব ﷺ-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর পর নুবুওয়াতের ধারা বন্ধ ঘোষণা।	৩৬-৪৪
আল্লাহর কাছে করা ওয়াদা ও ইহুদি-মুশরিকদের সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে মুমিনদের পরীক্ষা স্মরণ করানো হয়েছে।	৬-১১	নবিজির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা। নবিজির জন্য বিয়ে-সংক্রান্ত একান্ত কিছু বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, যা আর কারও জন্য প্রযোজ্য নয়।	৪৫-৫২
খন্দকের যুদ্ধে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন। নবিজিই শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহাবিরাও যেন আকাশের তারা।	১২-২৪	নবিজির ঘরে প্রবেশের আদব ও পর্দার বিধান। রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা অনেক উঁচুতে। তাঁকে বা কোনো ঈমানদারকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।	৫৩-৫৮
খন্দক যুদ্ধের ফলাফল ও ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযার পরিণতি। স্ত্রীদের ব্যাপারে নবিজির স্বাধীনতা।	২৫-২৯	মুসলিম নারীদের পর্দা করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুনাফিক আর কাফিরদের শাস্তির ব্যাপারটি পরিষ্কার করা হয়েছে।	৫৯-৬৮
নবির স্ত্রীদেরকে বিশ্বের সকল নারীদের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তাই তাঁদের দায়-দায়িত্বও বেশি।	৩০-৩৫	মুমিনদের জন্য পথনির্দেশনা ও উপদেশ। আল্লাহর আনুগত্য করার দায়িত্ব মানুষের; আর এই বিশাল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা উচিত।	৬৯-৭৩

কেইস-স্টাডি

খন্দকের যুদ্ধ। আরবের যত ইহুদি-মুশরিক আছে, সবাই একযোগে মদীনার ওপর হামলে পড়ল। মুনাফিকরাও গোলমাল বাধাবার তালে আছে। কাফিরদের দল বিশাল বড়। সে-তুলনায় মুসলিমের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যেকোনো মুহূর্তে শত্রুবাহিনী ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে। তখন সবাইকে কচুকাটা করতে মোটেও সময় লাগবে না। তবে শেষ-পর্যন্ত আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করলেন মুমিনগণ। ঈমানের দৃঢ়তা নিয়ে কাফিরদের মোকাবেলা করে যাচ্ছিলেন তারা। আর সেই সময়েই আসমান থেকে নেমে এল আল্লাহর সাহায্য। কাফিরদের ওপর বইতে লাগল ভীষণ ঝোড়ো বাতাস। বাতাসের তোড়ে ঠিকমতো দাঁড়ানোই যেখানে দায়, সেখানে যুদ্ধ করবে কী! এক সময় লেজ গুটিয়ে পালাল কাফিরদের বিশাল বহর। যারা চান—ইসলাম ছড়িয়ে পড়ুক পৃথিবীর কাঁচাপাকা প্রতিটি ঘরে, তাদের জন্য এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ কেইস-স্টাডি। আল্লাহর পথে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দ্বীনের দাঈরা যদি এগিয়ে চলেন, তাদের জন্যও আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে, ইন শা আল্লাহ।

(দেখুন—মুসলিম ১৭৮৮; বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ৩/৪৪৯–৪৫৪; আবু নুআইম, দালায়িলুন নুবুওয়াহ ২/৫০০–৫০১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ "ও নবি, আল্লাহ-ভীতির ওপর অটল থাকো, কাফির ও মুনাফিকদের কথামতো চলো না।" সূরার শুরুতে 'ইয়া আইয়্যুহান নাবিয়্যু/ও নবি' এই সম্বোধনটি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—এরকম সম্বোধন শুধু রাসূল ﷺ-কেই করা হয়েছে। আর অন্যান্য নবিকে নাম ধরে ডাকা হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে কতটা সম্মানিত করেছেন। আয়াতটিতে নবিজিকে আল্লাহ-ভীতির ওপর অটল থাকা এবং কাফির-মুনাফিকদের কথামতো না চলার হুকুমও দেওয়া হয়েছে। বাহ্যিক অর্থ এমনটাই—কিন্তু এর মাধ্যমে আসলে সতর্ক করা হয়েছে মুসলিম উম্মাহকে। এ-দিয়ে বোঝানো হলো, নবির জন্যই যদি এই সুযোগ না থাকে, তা হলে সাধারণ মানুষের জন্য আর অবকাশ থাকবে কীভাবে!

(দেখুন—আবু ইয়ালা, ৮/২৪৮৬; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৭৯)

জাহিলি যুগে যারা দাসী বা নর্তকী ছিল, কেবল তারাই খোলামেলা পোশাকে বাইরে বের হতো। আর যারা সম্ভ্রান্ত ঘরের নারী ছিল, তারা নিজেদেরকে শালীনতার চাদরে আবৃত রাখত। সেসময়কার বখাটেগুলো বেছে বেছে সেসব দাসী-নর্তকীদের উত্যক্ত করত। কারণ ওরা জানত—এই যে পর্দানশীল মেয়েগুলো, এরা সম্ভ্রান্ত নারী। এদের সাথে বেয়াদবি করলে আর রক্ষে নেই! একটা সময় তথাকথিত আধুনিকতার হাওয়া লাগল সম্ভ্রান্ত নারীদের গায়েও। তারাও চাইল একটু খোলামেলা পোশাকে চলতে। আর গণ্ডগোলটা বাধল ওখানেই। বখাটেরা এখন তাদের দিকেও চোখ তুলে তাকাচ্ছে! মুসলিম সমাজে নারীরা উত্যক্তের শিকার হবে, এ-তো ভাবাও যায় না। তাই আল্লাহ এই সূরার ৫৯ নং আয়াত নাযিল করলেন। নারীদের দিলেন পর্দার বিধান। তাদের হারানো সম্মান আবার ফিরিয়ে দেওয়া হলো। তারা এখন থেকে আবারও সম্ভ্রান্ত নারীর মর্যাদা পাবে। সুতরাং, সিদ্ধান্ত এখন আপনার—আপনি কি দাসী-নর্তকীদের মতো খোলামেলা চলাফেরা করবেন, নাকি সম্ভ্রান্ত নারীদের মতো পর্দার আড়ালে নিজেকে সুরক্ষিত রাখবেন!

(দেখুন—তিরমিযি, ১১৭৩; ইবনুল আরাবি, আরিদাতুল আহওয়াযি, ৩/৯২)

সূরা সাবা

سُوْرَةُ سَبَاٍ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫৮-তম সূরা। এর আগে সূরা লুকমান ও পরে সূরা যুমার নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩৪ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আহযাব ও পরে সূরা ফাতির।

এক নজরে সাবা

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝি নাযিল
- সূরা নং: ৩৪
- আয়াত: ৫৪
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘সাবা’ প্রাচীন ইয়ামানের একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের নাম। ১৫-২১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সাবা অঞ্চলের অধিবাসীদের বিপুল প্রাচুর্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়নি। বরং তাঁর পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাঁধভাঙা প্লাবন; ফলস্বরূপ সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় তারা। তো, সেই অকৃতজ্ঞ জাতির নামানুসারেই এই সূরার নাম রাখা হয়েছে ‘সাবা’।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

০২ সাবা জাতির ইতিহাস।

০৩ কুফরের পরিণতি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে—এই আলোচনা দিয়ে সূরাটি শুরু হয়েছে। আর শেষ হয়েছে এভাবে যে, তারা পুনরুত্থানকে একদিন স্বীকার করবে; তবে তা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর। তখনকার স্বীকৃতি তাদের কোনো উপকারে আসবে না—"আর তারা বলছে, 'আমরা একে সত্য বলে মানছি!' কিন্তু এত দূর এসে তারা কীভাবে (ঈমানের উপকার) হাসিল করবে, অথচ এর আগে তারা এটা প্রত্যাখ্যান করেছে!"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আহযাব; যার শেষদিকে আল্লাহ বলেছেন, "হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ন্যায্য কথা বলো।" এই সূরাটির শুরুতে আল্লাহ আমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে দেখালেন—আসলে কী ধরনের কথা অন্যায্য, যা বলা যাবে না: "যারা কুফরে লিপ্ত, তারা বলে, 'আমাদের ওপর কিয়ামাত আসবে না।'"

শানে নুযুল

মানব-জাতির জন্য এ-সূরাতে আল্লাহ দু'পক্ষের নমুনা তুলে ধরেছেন। এই দুই পক্ষকেই দুনিয়ার বুকে দেওয়া হয়েছে বিশাল সিংহাসন, রাজত্ব ও ক্ষমতা। তবে মজার ব্যাপার হলো—এই দু'দল দুই দিকের রাস্তা ধরেছে। এখানে একপক্ষে দেখানো হয়েছে দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-কে। আর আরেক পক্ষে আছে সাবা জাতি। দাউদ ও সুলাইমানকে আল্লাহ বিশাল সাম্রাজ্য দিয়েছিলেন। বিশেষ করে সুলাইমান ﷺ তো পশুপাখির কথা পর্যন্ত বুঝতে পারতেন। তিনি চলাচল করতেন বাতাসে ভেসে। অন্য কোনো বাহনের দরকার ছিল না। বিপুল ক্ষমতার মালিক হয়েও তাঁরা অহংকার দেখাননি। দাম্ভিকতা প্রকাশ করেননি। বরং তাঁদের রবের সামনে তাঁরা ছিলেন বিনম্র গোলাম। অপরদিকে সাবা জাতিকেও আল্লাহ বিশাল সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ক্ষমতার দাপটে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আল্লাহকে রব হিসেবে কখনোই মেনে নেয়নি। ফলে একটা সময় আল্লাহ তাদেরকে সমূলে উপড়ে ফেললেন। ইতিহাসের পাতায় তাদের নামটাই এখন শুধু বাকি আছে। আর কিছু নেই। এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা মক্কার মুশরিকদের সতর্ক করার জন্যই নাযিল করেন এ-সূরাটি।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৫/৪২৮; তাফহীমুল কুরআন, ১২/১৪৯)

সেগমেন্ট

মৃত্যুর পর আবার জেগে উঠতেই হবে

সূরার শুরুর অংশেই দেখানো হয়েছে—পরকাল অবশ্যই ঘটবে। আর যারা একে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে।

নবিদের প্রত্যাখ্যান ও এর সমালোচনা

যুগে যুগে কাফিররা সকল নবি-রাসূলের বিরোধিতা করে গেছে। সূরার দ্বিতীয় অংশে সেসব কাফিরদের সমালোচনা করা হয়েছে।

মুক্তির রাস্তা বন্ধ যখন!

দুনিয়াতে থাকতে থাকতেই নবিদেরকে মেনে নিতে হবে। পরকালকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। মৃত্যু দুয়ারে কড়া নেড়ে ফেললে, মুক্তির দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, সেসব সূরাকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা সাবা।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহর রাস্তায় একটি পয়সাও ব্যয় করলে,	তিনি এর উত্তম প্রতিদান দেবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের ওজর-আপত্তি

১. আল্লাহর পরিচয় ও পরকালের বাস্তবতা

তিনিই আল্লাহ, যিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর মালিক। তিনি এক। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে মৃত্যু দেবেন। মৃত্যুর পর আবার জাগিয়ে তুলে সকলের বিচার করবেন।

২. কৃতজ্ঞতাবোধ বনাম অবাধ্যতা

দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-কে দুনিয়াতে ভীষণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তবু তারা আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। অপরদিকে, ক্ষমতার দম্ভে সাবা জাতি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

৩. অহংকারী নেতৃবৃন্দ

দুনিয়াবি ক্ষমতা মানুষকে অহংকারী করে তোলে। তাদেরকে বাদ দিয়ে মানুষ নবি-রাসূলদের কথা শুনবে—এটা তারা মেনে নিতে পারে না। তাই তারা সব সময় দ্বীনের বিরোধিতা করে। সেই সাথে তাদের অনুসারীদেরকেও দ্বীনের পথ থেকে দূরে রাখে।

৪. আপত্তির জবাব ও সতর্কতা

রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে মুশরিকদের নানা আপত্তি ছিল। সেসব আপত্তির জবাব দেওয়া হয়। শেষ নবি হিসেবে তাঁর ভূমিকা তুলে ধরা হয়। সেই সাথে যারা তাঁর বিরোধিতা করবে, কিয়ামাতের দিন তাদের পরিণতি কী হবে—সেটিও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
পরকালের সত্যতা ও এর প্রতিদান-নীতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।	১-৯	কাফিররা যেকোনো মূল্যে কুরআনের ওপর অবিশ্বাস ধরে রাখতে প্রস্তুত! বিচার-দিবসে এসব পথভ্রষ্টরা নিজেদের মধ্যে তর্কে জড়াবে।	৩১-৩৩
দাউদ ও সুলাইমান ﷺ-এর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।	১০-১৪	ধনীদের ভোগ-বিলাসিতার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহর বিধান অমান্য করার ক্ষেত্রে এরাই বেশি এগিয়ে থাকে।	৩৪-৩৯
সাবা জাতির ইতিহাস ও বাঁধভাঙা প্লাবনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।	১৫-১৯	হাশরের মাঠের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।	৪০-৪২
শয়তানের প্ররোচনার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।	২০-২১	দুনিয়াতে মুশরিকদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।	৪৩-৪৫
কিয়ামাত দিবসে মুশরিকরা ভীষণ অসহায় হয়ে পড়বে। ওদের ইলাহরা ওদেরকে বাঁচাবার ক্ষমতা রাখে না।	২২-৩০	আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে মানুষকে গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।	৪৬-৫৪

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ১৩-১৪ নং আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি, সুলাইমান ﷺ জিনদের দিয়ে নানা কাজ করাতেন। ওসব জিনকে আল্লাহ সুলাইমান ﷺ-এর অধীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে জিনরা যে মনের খুশিতে কাজ করত, তা কিন্তু না। তবে নবির ভয়ে না-করেও উপায় ছিল না। একদিন নবি নামাজে দাঁড়ালেন। এই দাঁড়ানো অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। কিন্তু জিনরা তা জানতেই পারল না। তারা কাজ করে যেতে লাগল। শেষে উইপোকা যখন লাঠির ভেতরটা খেয়ে খেয়ে ফাঁপা করে দিলো, তখন নবি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সে-সময় জিনরা বুঝতে পারল—আরে, নবি তো অনেক আগেই মারা গেছেন! এখান থেকে আমরা একটা পরিষ্কার বার্তা পাই—অদৃশ্য বা গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই জানে না। জিনরা আমাদের কাছে অদৃশ্য বটে, তাই বলে তারা কিন্তু অদৃশ্যের খবর জানে না। এজন্য যখন কাউকে দেখবেন—ব্যাটা জিন নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, হাজারো সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে, তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এসব ধান্দাবাজদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে হবে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১৯/২৪১; মুসলিম, ১৭৭; তিরমিযি, ৩০৬৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা দাউদ ﷺ-এর পরিবারকে অনেক নিয়ামাত দান করেছিলেন। তাকে দিয়েছিলেন নুবুওয়াত ও রাজত্ব। তার শারীরিক গড়নও মজবুত ও শক্তিশালী বানিয়েছিলেন। তামা-লোহা হাতের স্পর্শেই গলে যেত। পশুপাখিরাও এসে তাদের সাথে তাসবীহ পাঠ করত। এ-সূরার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ এসব নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায়ের আদেশ দিয়েছেন, "ও দাউদের পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য কাজ করো।" এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় কাজের মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতগুলোকে কেবল তাঁর আনুগত্যের কাজেই ব্যয় করতে হবে। তাঁর অবাধ্যতায় একটা পয়সাও যেন খরচ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(দেখুন—ইবনু আবিদ দুনইয়া, আত-তাওয়াযু ওয়াল খুমুল, ৯৩; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৪৩)

এই সূরার ৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটি দারুণ ওয়াদা দিয়েছেন—"তোমরা (তাঁর আদেশমতো) যা-কিছু খরচ করবে, তিনি তা পূরণ করে দেবেন; তিনিই সর্বোত্তম জীবিকা-দাতা।" আমরা তো মানুষের মোটিভেশন পেয়েই অনেক কিছু করে ফেলি। তা হলে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেখানে বলছেন, তাঁর রাস্তায় খরচ করলে, তিনি তা পূরণ করে দেবেন—সেখানে আর কীসের অপেক্ষা! দান করলে সম্পদ কমে না। বরং বাড়ে। অথচ আমরা সম্পদ বাড়ানোর আশায় দান করি না, বরং আরও সঞ্চয় করে রাখি। এই মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। চিন্তা করুন তো—আজকে যদি মৃত্যু এসে আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, কাল আপনার সম্পদ কি আর আপনার থাকবে? শুরু হবে ওয়ারিশদের টানাটানি। অথচ এর হিসেব কিন্তু দিতে হবে আপনাকেই। তাই আল্লাহর রাস্তায় দান না করে সম্পদের পাহাড় রেখে যাওয়া কোনো মুমিনের জন্য মানানসই নয়। উদার দিলে দান-সাদাকা করুন, দেখবেন—সম্পদে বারাকাহ আসবে। আলোয় আলোয় ভরে উঠবে আপনার ঘরদোর।

(দেখুন—বুখারি, ৪৬৮৪, ৭৪৯৫-৭৪৯৬; মুসলিম, ৮৫৫, ৯৯৩, ২৫৮৮)

সূরা ফাতির — سُوْرَةُ فَاطِرٍ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪৩-তম সূরা। এর আগে সূরা ফুরকান ও পরে সূরা মারইয়াম নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা সাবা ও পরে সূরা ইয়া-সীন।

এক নজরে ফাতির

- নুবুওয়াতের ৫ম/৬ষ্ঠ বছর নাযিল
- সূরা নং: ৩৫
- আয়াত: ৪৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

'ফাতির' শব্দের অর্থ 'স্রষ্টা'। প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—আল্লাহ মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। সেখান থেকে এই সূরার নাম দেওয়া হয়েছে 'ফাতির'।

মেজর থিম

০১ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

০২ মানব-জাতির দুর্বলতা।

০৩ আল্লাহর ডাকে মানুষের প্রতিক্রিয়া।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে মহান আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতা, "প্রশংসা সবই আল্লাহর—যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, যিনি বার্তা-বাহক হিসেবে দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার ডানাবিশিষ্ট ফেরেশতাদের পাঠান; যিনি সৃষ্টিতে তাঁর ইচ্ছেমতো প্রবৃদ্ধি ঘটান; আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" একই আলোচনার প্রতিধ্বনি শোনা যায় সূরাটির শেষ অংশেও, "কোনোকিছুই আল্লাহর নাগালের বাইরে যেতে পারে না—না মহাকাশে, আর না পৃথিবীতে; তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা সাবার ইতি টানা হয় কাফিরদের একটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার মাধ্যমে—"তারা পরকালের ব্যাপারে খটকা-সৃষ্টিকারী সন্দেহে পড়ে আছে।" সূরা ফাতির শুরু হলো আল্লাহর ক্ষমতার কথা জানান দিয়ে—"প্রশংসা সবই আল্লাহর, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা।" আর এমন ক্ষমতাবান রব পরকালের ওয়াদা দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ রাখা যায় কীভাবে!

শানে নুযুল

শিরকে লিপ্ত একটা জাতিকে একজন মানুষ বারবার এক আল্লাহর দিকে ডাকছেন। তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিচ্ছেন। তাদেরকে ভালো কাজ করতে বলছেন। আর খারাপ কাজ করতে নিষেধ করছেন। আর ওদিকে ওই জাতির লোকেরা নানা সলা-পরামর্শ করতে লাগল। তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে চাইল। মক্কার মুশরিকরা ঠিক এমনটাই করেছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে। তখন আল্লাহ এই সূরা নাযিল করে তাদেরকে সাবধান করে দেন। অবশ্য সাবধান করা হয়েছে খুব মোলায়েমভাবে। প্রথমদিকে উপদেশ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে। আর এ-কথাটাও জানিয়ে দিলেন—তোমরা এই যে এত চক্রান্ত করছো, এগুলো তো রাসূলের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরং সেই চক্রান্তে তোমরাই ফেঁসে যাবে। তোমরা যেমনটা ভাবছো, বাস্তবতা তেমন না। যাদের বিবেক আছে, তারা কখনো এমনটা ভাবতে পারে না। এভাবে কাফিরদেরকে আল্লাহর পথে ফিরে আসবার আহ্বান জানাতে এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৬/১-২; তাফহীমুল কুরআন, ১২/১৯৯)

সেগমেন্ট

আল্লাহর প্রশংসা

সূরাটি শুরুই হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে। সৃষ্টির ওপর আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁর অনুগ্রহের কথা তুলে ধরার মাধ্যমে।

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সতর্কতা

আল্লাহ বান্দার ওপর যেমন অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি শাস্তি দেবার ক্ষেত্রেও তিনি কঠোর। যারাই তাঁর অবাধ্য হবে, তাদের জন্যই আছে শাস্তি।

বান্দার কৃতজ্ঞতা-বোধ

এই অংশে আল্লাহর আরও কিছু নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে করে বান্দা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। আর একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের কম, সেসব সূরাকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা ফাতিহা।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দ্বীন যদি একটি লাভজনক ব্যবসা হয়, তবে কুরআন হলো তার পুঁজি;

তাই অল্প করে হলেও প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করতে হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

তাওহীদ ও আখিরাতের ওপর ঈমান

১. ঈমানের প্রতি আহ্বান
সকল প্রকার শির্ককে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে দিয়ে, আল্লাহ মানুষকে তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন।

২. স্পষ্ট ফারাক
মুমিন ও কাফির—দুটি দল দুই পথের পথিক। তাদের লক্ষ্য এক নয়। তাদের গন্তব্যও আলাদা। এক দল পথ চলছে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আরেক দল চলছে স্নিগ্ধ আলোয়।

৩. ইতিহাস থেকে শিক্ষা
অতীতে যেসকল জাতি অহংকারের চোটে আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা সকলেই ধ্বংস হয়েছে। তাদের ইতিহাস থেকে হাল-জামানার মানুষদের শিক্ষা নিতে হবে।

৪. শির্কের অসারতা ও অহংকারী নেতাদের প্রতি বার্তা
মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যেগুলোকে শরিক করে, আদতে সেগুলোর বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও নেই। এটা জানার পরও যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়, তাদের জন্য অপেক্ষায় আছে জাহান্নামের আগুন!

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর ফায়সালা বদলে ফেলার ক্ষমতা কারও নেই।	১-২	কুরআনের নিয়ামাত ও ঈমানদারদের সৌভাগ্যের নমুনা দেখানো হয়েছে।	২৯-৩৫
গণমানুষকে আল্লাহর করুণার কথা স্মরণ করানো হয়েছে। সেই সাথে রাসূলকে দেওয়া হয়েছে সান্ত্বনা।	৩-৪	কাফিরদের দুর্দশার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।	৩৬-৩৭
ধোঁকা ও বিভ্রমের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। মহাবিশ্বে আল্লাহর নিদর্শনাবলির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।	৫-১৪	আল্লাহর মহত্ত্বের নিদর্শন ও ক্ষমতার প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে।	৩৮-৪১
আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল নন। আর সৃষ্টিকুলের বিচার করার ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি ন্যায়পরায়ণ।	১৫-২৬	আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করার কারণসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।	৪২-৪৩
দুনিয়া জুড়ে আল্লাহর অপার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এগুলোতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।	২৭-২৮	আগেকার লোকদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।	৪৪-৪৫

কেইস-স্টাডি

অনলাইন জগতে তো আজকাল 'জ্ঞানী-গুণী'র অভাব নেই। ফেসবুক, ইউটিউব, ব্লগ-সহ আরও কত শত প্ল্যাটফর্ম আর কতশত জ্ঞানের বাহার। ইসলাম নিয়ে বহু ব্লগারের 'চুলকানি' যেন কোনোভাবেই থামানো যায় না। রাসূলের পবিত্র জীবনী নিয়ে নানাবিধ আপত্তি এদের। কুরআন আসমানি কিতাব নাকি অন্য কারও বানানো কিতাব, তা নিয়েও এদের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। তারা কুরআনের নানা অপব্যাখ্যা করে, রসিয়ে-কষিয়ে উপস্থাপন করে নিজেদের মনমতো। এসব বিষয়কে এমনভাবে তুলে ধরে, যেন আসলেই তাদের দাবি একেবারে সত্য! কিন্তু একটু যাচাই করে দেখুন, ইসলাম নিয়ে এদের বেসিক জ্ঞান পর্যন্ত নেই। মাথায় যতটুকু ঘিলু আছে, তা দিয়ে শুধু ইসলামের বিরোধিতা করার কাজই করে সারাদিন। নির্বোধ এই লোকদের অন্তিম পরিণতি ভেবে আফসোস হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সূরার ৮ নং আয়াত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়—এসব বিকৃতমনাদের নিয়ে আফসোস করার কিছু নেই। যারা স্বেচ্ছায় ভুল পথে চলতে চায়, আল্লাহ তাদেরকে সেই পথে চলবার সুযোগ দেন। তাই এই আয়াতটি নিয়ে আমাদের সবাইকে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতে হবে। চোখে ধাঁধা লাগানো যাবে না।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৬/৪১৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"তুমি কি ভেবে দেখোনি—আল্লাহ আকাশ থেকে পানি নামিয়ে আনেন, এরপর আমি তা দিয়ে উৎপন্ন করি রং-বেরঙের ফল? পর্বত-শ্রেণিতে রয়েছে সাদা, লাল ও কাকের মতো কুচকুচে কালো বিচিত্র রঙের পথ। মানুষ, জীবজন্তু ও গবাদিপশুর মধ্যেও রয়েছে অনুরূপ রঙের বৈচিত্র্য।" এ-সূরার ২৭-২৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভাবার জন্য অনেকগুলো উপাদান দেখালেন। সেগুলো নিয়ে চিন্তার গভীরে ডুব দিলে বোঝা যায়—আল্লাহর সৃষ্ট এই বিশ্ব-জাহানে কোথাও একঘেঁয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতা নেই। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন প্রকার গাছ উৎপন্ন হচ্ছে। আল্লাহর সৃষ্টিতে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। একই বাবা-মা'র দুটি সন্তানও সবদিক দিয়ে একরকম হয় না।

মহাবিশ্বের এই বৈচিত্র্যই জানিয়ে দিচ্ছে যে, এর নির্মাতা মহাপরাক্রমশালী, তাঁর প্রজ্ঞা নজিরবিহীন। তুলনাহীন তাঁর নির্মাণ-কৌশল। তিনি একই জিনিসের কেবল একটি মাত্র নমুনা হাজির করেননি। বরং তাঁর কাছে প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য রয়েছে অগণিত ডিজাইন। এ ছাড়া মানবিক প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বৈচিত্র্য সম্পর্কে গবেষণা করলে, যেকোনো ব্যক্তি এ-কথা বুঝতে পারে যে, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি-জ্ঞানের নিদর্শন। এ-কথার স্বপক্ষে প্রমাণ হলো—মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, প্রবৃত্তি, কামনা, আবেগ, অনুভূতি, ঝোঁক ও চিন্তাধারার মধ্যে ভিন্নতা। আর এ-কথা সুস্পষ্ট যে, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা যেখানেই পাওয়া যাবে, অনিবার্যভাবে সেখানেই থাকবে এক বিজ্ঞানময় সত্তার উপস্থিতি। বিজ্ঞানী ছাড়া বিজ্ঞানের অস্তিত্বকে কল্পনা করাও অসম্ভব। সুতরাং সুস্থ চেতনার কোনো মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। বরং আল্লাহর সুনিপুণ সৃষ্টি দেখে বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রতি মাথা নুইয়ে দেবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৩০৭)

সূরা ইয়া-সীন

سُوْرَةُ يٰسٓ

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩৬-তম সূরা। এর আগে আছে সূরা ফাতির ও পরে সূরা সাফফাত।

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪১ নং সূরা। এর আগে সূরা জিন ও পরে সূরা ফুরকান নাযিল হয়।

এক নজরে ইয়া-সীন

- সূরা নং: ৩৬
- মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল
- মাক্কি
- আয়াত: ৮৩

নামের রহস্য

সূরাটির প্রথম আয়াত—'ইয়া-সীন'। ইয়া-সীন, আলিফ-লাম-মীম, হা-মীম..—এগুলোকে বলা হয় اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَةُ বা বিচ্ছিন্ন-হরফ। ২৯টি সূরার শুরুতে এরকম হরফ পাওয়া যায়। এগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে না-পড়ে আলাদা আলাদাভাবে পড়তে হয়। এগুলোর অর্থ নিয়ে আছে মতানৈক্য। তো, শুরুতে থাকা 'ইয়া-সীন' হরফ-দুটি থেকেই এ-সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'ইয়া-সীন'।

মেজর থিম

০১ কুরআন, রাসূল ও সাবধানবাণী। হিদায়াত সবার জন্য নয়।

০২ রাসূলকে প্রত্যাখ্যানের পরিণতি: জাতিসুদ্ধ ধ্বংস।

০৩ কিয়ামাতের আকস্মিকতা। জান্নাতি ও জাহান্নামিদের তুলনামূলক অবস্থা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুর দিকে আল্লাহ পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে বলেন, “আমি অবশ্যই মৃতকে জীবিত করব, আর তারা (পরকালের জন্য) অগ্রিম কী পাঠায় ও (দুনিয়ায়) কী কীর্তি রেখে যায়—তা সব লিখে রাখব।” সূরার শেষে আবার বললেন, “তুমি বলে দাও, “এগুলো তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার এগুলো সৃষ্টি করেছিলেন।” এভাবে পরকাল ও পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে মানুষকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ফাতির। যার শেষ দিকে আগেকার জাতির পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—যারা আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করায় ধ্বংস হয়ে গেছে। সূরা ইয়া-সীনের শুরুর দিকেও আল্লাহ তাআলা আগের একটি জনপদের বিবরণ তুলে ধরলেন। রাসূলদের মেনে না-নেওয়ায়, সেই জনপদটিও ধ্বংস হয়েছিল।

শানে নুযুল

যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতা করত, আল্লাহ তাদেরকে এই সূরার মাধ্যমে ভীষণ আযাবের ভয় দেখিয়েছেন। বারবার শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আর তার ফাঁকে ফাঁকে তাদেরকে বুঝিয়েছেন-ও। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তাদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনতে বলেছেন। দেখিয়েছেন—পুরো আসমান-জমিন আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়। সবকিছু তিনি নিখুঁতভাবে বানিয়েছেন। চাঁদ-তারা-সূর্য যে যার কাজে ব্যস্ত। কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রব থাকলে তো সব এলোমেলো হয়ে যেত। এগুলোর পাশাপাশি মানুষ যদি তার নিজের শরীরের দিকে তাকায়, তা হলেও তো বুঝতে পারবে—আখিরাত বলে অবশ্যই কিছু আছে। একজনের আঙুলের ছাপের সাথে দুনিয়ার আর কারও আঙুলের ছাপ মিলবে না! আর রাসূলের বিরোধিতা করার তো কোনো যুক্তিই নেই। তিনি যে এত এত কষ্ট করছেন, এত অত্যাচার মুখ বুজে সইছেন, এর বিনিময়ে কি তিনি কারও কাছে কিছু চেয়েছেন? যে মানুষটা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাকেই নির্যাতন! আর তিনি যে কথাগুলো বলেন, সেগুলোর কোনোটা তো ভুল নয়। তবু তার বিরোধিতা কেন? কারণ বিরোধিতা না-করলে তোমাদের মনের খায়েশ পুরা করতে পারবে না। তা হলে সেই খায়েশ পুরা করে শাস্তির জন্য রেডি হয়ে এসো। সেদিন ঠিকই সবকিছুর ওপর ঈমান আনবে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। এভাবে কাফির-মুশরিকদেরকে সতর্ক করতে এবং সবার হৃদয়ে তাওহীদকে পুরোপুরি গেঁথে দিতে আল্লাহ এ-সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৬/৮১; তাফহীমুল কুরআন, ১৩/১)

সেগমেন্ট

নুবুওয়াতের সত্যায়ন

আল্লাহ তাআলা এই সূরার একেবারে শুরুতেই রাসূল ﷺ -এর নুবুওয়াতের সত্যায়ন করেছেন।

নুবুওয়াত প্রত্যাখ্যানের পরিণাম

একটি গ্রামের লোকদের কাহিনি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে—নবিদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে কেমন পরিণতি হয়।

পরকালের চিত্র

কিয়ামাতের ভয়াবহতার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ ছাড়া জান্নাতের শান্তি ও জাহান্নামের শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে।

ফজিলত

সব গুনাহ মাফ হবে: রাসূল ﷺ বলেছেন, “যে-ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাতের বেলা সূরা ইয়া-সীন পড়বে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে।” (ইবনু হিব্বান, ২৫৭৪, সহীহ)।

সব কাজ সহজ হবে: যে ব্যক্তি সকালবেলা সূরা ইয়া-সীন পড়বে, সারাদিন—একেবারে সন্ধ্যা অবধি—আল্লাহ তার কাজগুলো সহজ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা এ-সূরা পড়বে, সারারাত—একেবারে সকাল পর্যন্ত—আল্লাহ তার কাজগুলো সহজ করে দেবেন। (দারিমি, ৩৪৬২, হাসান)

সুন্দর মৃত্যু হবে: নবি ﷺ বলেছেন, “তোমরা তোমাদের মৃত্যু-পথযাত্রী মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকট ‘সূরা ইয়া-সীন’ পাঠ করো। (ইবনু মাজাহ, ১৪২৪; আবু দাউদ, ৩১২১, দঈফ)

কুরআনের কলব: নবি ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেকটা বস্তুর কলব আছে। কুরআনের কলব হচ্ছে—সূরা ইয়া-সীন।” (তিরমিযি, ২৮৮৭, দঈফ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কুরআন থেকে জেনে নিতে হবে—আগেকার কোন কোন জাতি কেন ধ্বংস হয়েছে;

এতে করে সেসব জাতির পাপগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হওয়া যাবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

পুনরুজ্জীবন বা পুনরুত্থান

১. আল্লাহর ওয়াদা

এই জীবনই শেষ কথা নয়। মানুষকে আবারও জেগে উঠতে হবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বার্তা দিয়েছেন—"আমি অবশ্যই মৃতকে জীবিত করব।"

২. বাস্তব উদাহরণ

এক জনপদের উদাহরণ তুলে ধরলেন আল্লাহ। সেখানে তিনজন নবি পাঠানো হয়েছিলো। তারা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছিলেন। তবে পরকালে বিশ্বাস না থাকায়, নবিদেরকে প্রত্যাখ্যান করল তারা। শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলেন।

৩. আখিরাতের উপমা

পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাকৃতিক নিদর্শন আছে। এগুলো সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তাঁর হাতেই জীবন-মরণ। এমন ক্ষমতাবান আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামাত ঘটানোর ক্ষমতাও রাখেন।

৪. কিয়ামাতের আকস্মিকতা ও বিচার

কিয়ামাত হবে কি, হবে না—এ নিয়ে মানুষ তখনো তর্কে লিপ্ত থাকবে। আর সে-সময়েই হুট করে কিয়ামাত শুরু হয়ে যাবে। এরপর যার যার কাজ অনুযায়ী হাশরের মাঠে তাদের বিচার করা হবে।

ওভারভিউ	আয়াত
পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা। তুলে ধরা হয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ -এর সাথে তাঁর জাতির লোকদের সম্পর্ক।	১-১২
'আসহাবে ক্বরইয়া' বা গ্রামের অধিবাসীদের কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে।	১৩-১৯
নবিদের কথা মেনে নিতে এক মুমিন ব্যক্তি লোকদেরকে আহ্বান জানান। লোকেরা উলটো তাকে হত্যা করে ফেলে।	২০-৩২
আল্লাহর ক্ষমতা ও অনুগ্রহের কিছু নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে।	৩৩-৪৪
সত্য হতে অবিশ্বাসীদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও হিদায়াতের ক্ষেত্রে তাদের অন্ধত্বকে চিহ্নিত করা হয়েছে।	৪৫-৪৭

ওভারভিউ	আয়াত
পুনরুত্থান ও কিয়ামাতের ওপর মুশরিকদের অবিশ্বাসী মনোভাব চিরদিনের। তবে শেষ বিচারের দিন ওরা ভীষণ আফসোস করবে।	৪৮-৫৪
সৎ ও দ্বীনদার লোকদের পুরস্কারের ব্যাপারটি আলোচিত হয়েছে।	৫৫-৫৮
অপরাধী ও পাপিষ্ঠদের শাস্তির ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।	৫৯-৬৮
আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ (তাওহীদ)-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।	৬৯-৭৬
পরকালের ওপর কাফিরদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।	৭৭-৮৩

কেইস-স্টাডি

আগের তিনজন রাসূলকে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনাটি আমাদের জন্য কেইস-স্টাডি। আগের নবিদের জীবনী নিয়ে গবেষণা করলে দেখব, তাদের প্রত্যেকেই তার জাতির কাছ থেকে আঘাত, অপমান ও অপবাদের স্বীকার হয়েছেন। তাই এখনকার দাঈদেরও এসব কিছুর মোকাবেলা করতে হবে। তার ওপর, তখন সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানানোর পেশাদার কেউ ছিল না। মানে, মিডিয়া ছিল না। আর এখন তো সেসবে সমাজ ভরতি। সত্যিকারের দাঈ দেখলেই, তাদের ওপর হামলে পড়ার তালে থাকে। বিভিন্ন ট্যাগ দিয়ে প্রথমে মানুষের সামনে তাদেরকে 'খারাপ' বানাবে। এরপর শুরু করবে মূল পর্ব—অর্থাৎ আগেকার লোকদের মতো অত্যাচার-নিপীড়ন।

(তিরমিযি, ২৩৯৮; ইবনু মাজাহ, ৪০২৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা এ-সূরার ১৩-৩২ নং আয়াতে একটি জাতির উদাহরণ পেশ করেছেন। কিন্তু সেই জাতির নাম-পরিচয়, কোথায় তাদের বসতি—কিছুই উল্লেখ করেননি। এমনকি তিনজন রাসূল যে পাঠানো হয়েছে, তাদের কারোর নামও বলা হয়নি। তো, কুরআন কীভাবে ইতিহাস বর্ণনা করে তা এখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি। সাধারণত তথ্যের চেয়ে আইডিয়ার ওপর কুরআন অধিক গুরুত্ব দেয়। ঠিক এখানটাতেই কুরআন অন্য যেকোনো ইতিহাস বইয়ের চেয়ে আলাদা। অত নাম-ধাম মুখস্থ করে জনগণের কী লাভ? আমাদের প্রয়োজন ঘটনার মোদ্দাকথা। দরকার—শিক্ষা নেওয়া। দুঃখের কথা এই—আজকাল কেউ আর ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, কেবলই তথ্য নেয়। আর পাবলিক-লেকচারে সেসব তথ্য হড়গড়িয়ে এমনভাবে উগড়ে দেয় যেন বিদ্যার জাহাজ!

যাহোক, আসহাবে কাহফের ঘটনা পড়লেও দেখা যায়, যুবকদের সংখ্যা ক'জন ছিল—তা বলা নেই। কিন্তু আমরা বানিয়ে নিলাম—তারা সাতজন। মানে, কুরআন গুরুত্ব দিতে বলল টেক্সটের ওপর। আর আমরা গুরুত্ব দিই কুরআনে যা আসেনি, সেগুলোর ওপর। একেবারে গল্প ফেঁদে-বসা যেটাকে বলে! বাঙালি আবার গাল-গল্পে এমনিতেও এককাঠি সরেস। আর সরেস হবার পেছনে কিছু কারণও আছে। পুরান-আমলে গ্রাম-বাংলায় কবি, গায়ক আর ছড়াকারদের বেশ আনাগোনা ছিল। সন্ধ্যার পরে গ্রামবাসীরা উঠোনে গোল-হয়ে বসত। তারপর শুরু হতো আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনি কিংবা সুর করে পুঁথিপাঠ। এখন তো চটকদার গাল-গল্প ওয়াজ-মাহফিলেও চলে আসছে। এমনকি জুমুআর খুতবা—জনগণকে বার্তা

দেওয়ার কত শক্তিশালী একটা প্ল্যাটফর্ম—অথচ সেখানেও আমরা গল্প ফেঁদে বসি। এমন চর্চা থেকে আমাদের বেরোতে হবে। তথ্য কিছুই নয়, দরকার হিদায়াত। কুরআনের একটা আয়াত পড়ে আপনি কতটা অনুভব করলেন, নিজেকে কতটুকু বদলাতে পারলেন, ওটাই আসল কথা। তবে হ্যাঁ, মূল হিদায়াত গ্রহণ করার পর, কুরআন থেকে বাড়তি জ্ঞান তালাশ করাতে দোষ নেই। মূল ফোকাসটা ঠিক রেখে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, তথ্য, ইতিহাস ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৩১৭; ইবনু মাজাহ, ৩৯৭৬)

কিছু শব্দ জানতেই হয়

আল-আযীয اَلْعَزِيْزُ

'আযযা (عَزَّ) থেকে এসেছে আযীয। শব্দটির একটি অর্থ: ক্ষমতাধর, শক্তিশালী। যাঁর ক্ষমতা সমস্ত আসমান-জমিন জুড়ে। কেউ তাঁর ক্ষমতার বলয় থেকে পালাতে পারে না। যাঁর কাছে সকলের নিরাপত্তা চাওয়া উচিত। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না। আর আরেকটি অর্থ: সম্মানিত। তো, আল্লাহর আযীয নামটি আমাদের শেখায়—মুসলিম হিসেবে নিজেকে সর্বোচ্চ নিরাপদ ও সম্মানিত ভাবতে হবে। যখন আযীয আছেন, আমার ক্ষতি করবার সাধ্য কার? যখন আযীয আছেন—যিনি সম্মানের মালিক—তিনি যদি সম্মান দেন, তবে আমায় কে আর লাঞ্ছিত করতে পারে? তিনিই আল-আযীয—সকল রাজার রাজা, রাজাধিরাজ। যখনই কোনো বিপদের মুখে পড়বেন, গভীর উপলব্ধির সাথে এই নামটি স্মরণ করবেন; দেখবেন অনেকটা হালকা অনুভব করছেন নিজেকে।

(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ৩৩)

রব رَبٌّ

রব নামটি এসেছে 'তারবিয়া' থেকে। তারবিয়া মানে আদর-যতনে আস্তে আস্তে লালন-পালন করা। পরিমাণ-মতো পরিচর্যা করা। একজন কৃষকের কথা চিন্তা করুন। সে তার খেতে পরিমাণ-মতো পানি দেয়। একবারে এত পানি দেয় না যে—চারাগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবে অথবা বীজগুলো ভেসে যাবে। সে সার দেয় পরিমাণ-মতো। ওষুধ দেওয়ার সময়ও রয়ে-সয়ে দেয়। এত বেশি দেয় না যে—পোকা-মাকড় তো মরবেই, সঙ্গে শস্যগুলোও মারা পড়বে! এটাকেই বলে তারবিয়া। আল্লাহ—আমাদের রব—তিনি কেবল আমাদের প্রতিপালন করেন না। বরং অতি যতনের সঙ্গে পরিচর্যা করেন। মায়ের পেট থেকে শুরু করে মরণ পর্যন্ত—তিনি আমাদের পরিমাণ-মতো অক্সিজেন দেন, দরকার-মতো সূর্যের আলো দেন, বাতাস দেন। এক মুহূর্তের জন্যও যদি সূর্যের আলোটা সরাসরি—ছাকনি ছাড়া—আমাদের শরীরে পড়ত, আমরা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে ঝলসে যেতাম। সুবহানাল্লাহ! তিনিই আমাদের রব।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১/৫২)

সূরা সাফফাত

سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫৬-তম সূরা। এর আগে সূরা আনআম ও পরে সূরা লুকমান নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ইয়া-সীন ও পরে সূরা সোয়াদ।

এক নজরে সাফফাত

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল
- সূরা নং: ৩৭
- আয়াত: ১৮২
- মাক্কি

নামের রহস্য

'সাফফাত' শব্দের অর্থ 'সুবিন্যস্ত; সারিবদ্ধ'। ১ নং আয়াতে ব্যবহৃত এই শব্দটি থেকেই এ-সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সাফফাত'।

মেজর থিম

০১. আল্লাহর সৃষ্টি। ফেরেশতাদের কিছু দায়িত্ব।

০২. বিচার দিবস। জান্নাতি ও জাহান্নামিদের অবস্থা।

০৩. কাফিরদের উপলব্ধি। কাফিরদের একে-অন্যকে দোষারোপ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা বলেন, "শপথ (কুরআনের আয়াতগুলোর)—যা সুবিন্যস্তভাবে-সাজানো"। তবে শুধু কুরআনের আয়াতই নয়, সমস্ত সৃষ্টিকেই তিনি চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন। সকলে সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে। সূরাটির শেষ দিকে ফেরেশতাদের উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ একই ইঙ্গিত দিয়েছেন, "(ফেরেশতারা বলে,) 'আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নির্ধারিত জায়গা আছে, (আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে) আমরা সবাই সারিবদ্ধ।'"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ইয়া-সীন; যার শেষে আল্লাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "পবিত্র তিনি—যাঁর হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব"। এই সূরাটির শুরুতেও আমরা একই কথার প্রতিধ্বনি দেখতে পাই, "যিনি মহাকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝখানে যা আছে সবকিছুর অধিপতি, অধিপতি সূর্য ওঠার সব-কয়টি স্থানের।"

শানে নুযুল

১. ইবরাহীম ﷺ একরাতে স্বপ্ন দেখলেন—তাঁর সবচেয়ে আদরের ছেলে— ইসমাঈলকে তিনি কুরবানি দিচ্ছেন। নবিদের স্বপ্ন তো আর সাধারণ মানুষের স্বপ্নের মতো না। তিনি বুঝতে পারলেন—আল্লাহ সত্যিই ইসমাঈলকে কুরবানি দিতে বলছেন। ছেলেকে বিষয়টা জানালে সে বলল, বাবা! আল্লাহ আপনাকে যেই আদেশ দিয়েছেন, আপনি তা পালন করুন। আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন, ইন শা আল্লাহ।

২. মাক্কি যুগে কাফিরদের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এত কষ্ট সইতে না পেরে বহু মুসলিম বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়েছেন। এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ কাফিরদেরকে সতর্ক করেছেন। তবে সবচেয়ে বড় ম্যাসেজটা এসেছে মুমিনদের জন্য। শেষ হাসিটা যে মুমিনরাই হাসবে, সেটি আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। আর এজন্য মুমিনদের উচিত ধৈর্য ধরা। মুমিনরা সেই রক্ত থেকে এসেছে, যাদের পিতা আল্লাহর এক ইশারাতেই নিজ ছেলের গলায় ছুরি চালাতে সংকোচ করেননি। মুমিনরা ভীরু-কাপুরুষ নয়। জানের মায়া করে ঘরে বসে থাকা মুমিনের স্বভাব নয়। বরং সকল অত্যাচার সহ্য করার এবং প্রয়োজনে পালটা হামলা চালাবার শক্তি এ-জাতির আছে। এমন জানবাজ মুমিনদের জন্য সুসংবাদ তো থাকবেই। আর এই সুসংবাদ বাস্তবে ধরা দেয় মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে। মুমিনদের মনোবল বাড়ানোর জন্যই আল্লাহ তাআলা এ-সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১২/৬৩; তাফহীমুল কুরআন, ১৩/৩৭)

সেগমেন্ট

তাওহীদ

সূরার শুরুর দিকে আল্লাহ দেখিয়েছেন—মহাকাশ, পৃথিবী ও এ-দুয়ের মধ্যকার সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

মুক্তি

নানা যুক্তি ও অতীতের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস তুলে ধরে—কাফিরদেরকে ঈমান গ্রহণের জন্য আল্লাহ উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। ঈমান গ্রহণ করলে আছে মুক্তির ওয়াদা।

বিজয়

যারা আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়বে, কুরআনকে নিজেদের জীবনাদর্শ বানাবে, দুনিয়ার বুকে তারাই বিজয়ী হবে। আর আখিরাতের পুরস্কার তো আছেই।

ফজিলত

* আবদুল্লাহ ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বেশি সময় না নিয়ে সংক্ষেপে নামাজ আদায় করার নির্দেশ দিতেন। আমাদেরকে সাথে নিয়ে নামাজ আদায়ের সময় সূরা সাফফাত পড়তেন।' (নাসাঈ, ৮২৬, হাসান)
* এটি শত আয়াত-বিশিষ্ট সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেগুলো 'যাবুর'-এর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা নবি ﷺ-কে উপহার দিয়েছেন।

(দেখুন : আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

জীবনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সংশয় ও সন্দেহমুক্ত থাকতে হবে,

নইলে ভালো কথা ও উপদেশ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

তাওহীদের বিজয় (তাওহীদকে যারা আঁকড়ে ধরবে, তারাই হাসবে শেষ হাসি)

১. গ্রহণ-বর্জন

সূরার শুরুর দিকেই তাওহীদের বাণীকে উচ্চকিত করা হয়। আর সকল ধরনের শির্ক থেকে বেরিয়ে আসবার আহ্বান জানানো হয়।

২. নিরন্তন লড়াই ও বিজয়

দুনিয়ার বুকে কোনো নবি-রাসূলের চলার পথ মসৃণ ছিল না। তবু তারা দৃঢ়পদে লড়ে গিয়েছেন। আর শেষ বিজয়টা আল্লাহ তাদেরকেই দিয়েছেন।

৩. দুটি বিপরীতধর্মী চিত্র

কিয়ামাতের দিন দুটি বিপরীত চিত্র দেখা যাবে। যেখানে একদল লোক উঁচু আসনে বসে পরস্পরের দিকে মুখ করে গল্প করবে। কী চমৎকার সে দৃশ্য! আর কিছু লোককে আপ্যায়ন করা হবে 'কাঁটাযুক্ত বিষাক্ত যাক্কূম ফল' দিয়ে। কী ভয়াবহ সে পরিণতি!

৪. মিথ্যা উপাস্যদের পরাজয় ও তাওহীদের বিজয়

কাফিরদের সকল ভ্রান্ত চিন্তা-বিশ্বাসকে উড়িয়ে দিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে। যেখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে—ওদের সেসব মিথ্যা উপাস্যদের পরাজয় ঘটেছে। আর সগর্বে উড়ে চলেছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের নিশান।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর একত্বের ঘোষণা—তোমাদের ইলাহ একজনই।	১-১০	জাহান্নামে জালিমদেরকে দেওয়া হবে—এ-রকম কিছু শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	৬২-৭৪
পরকালকে মুশরিকরা অবিশ্বাস করে। পরিণামে বিচার-দিবসে তারা পাবে চরম শাস্তি।	১১-৩৯	মহাপ্লাবন হতে নূহ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহর নিরাপত্তা। ইবরাহীম, মুসা, হারুন ও ইলইয়াস ﷺ-এর ঘটনা সমূহের বর্ণনা।	৭৫-১৩২
জান্নাতের নিয়ামাত সমূহের বর্ণনা। জান্নাতিরা দুনিয়ার অবিশ্বাসী সঙ্গীদের ব্যাপারে বেহেশতে স্মৃতিচারণ করবে।	৪০-৫১	লূত ও ইউনুস ﷺ-এর কাহিনি : শিক্ষা ও পরিণতি।	১৩৩-১৪৮
কিয়ামাতকে মিথ্যা মনে করে অবিশ্বাসীরা দুনিয়াতে যা যা বলত, তাদের সেসব কথা তুলে ধরা হয়েছে।	৫২-৫৫	মুশরিকদের ভ্রান্ত-বিশ্বাস, সেগুলোর খণ্ডন ও শেষ-পরিণাম।	১৪৯-১৭০
আল্লাহর প্রতি মুমিনদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারটিকে তুলে ধরা হয়েছে।	৫৬-৬১	আল্লাহর বাহিনী-ই একমাত্র বিজয়ী। অন্য কেউ নয়।	১৭১-১৮২

কেইস-স্টাডি



এই সূরার ১১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আর তার (ইবরাহীম) ও ইসহাকের ওপর করুণা-বর্ষণ করি। অবশ্য তাদের দুজনের বংশধরদের মধ্যে কিছু লোক সুন্দরভাবে দ্বীন মেনে চলছে, আর কিছু লোক নিজেদের ওপর স্পষ্ট অন্যায় করে যাচ্ছে!" এখানে আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় দুইটি—(১) ভালো লোকের বংশধর হলেই-যে কেউ নিজে ভালো বলে গণ্য হবে, তা নয়; আর (২) বংশধরদের কারও অন্যায়ের দরুন পূর্বপুরুষের মহত্ত্ব কমে না। যেমনটা কমেনি ইবরাহীম বা ইসহাক ﷺ-এর। এই আয়াতটা নিয়ে একটু গভীরে গিয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর একনিষ্ঠ গোলাম ছিলেন। তাই বলে ইলম-আমল ছাড়া পীরের বংশধরও পীর হবে—এমন কথার কোনো ভিত্তি নেই। আবার কোনো মানুষ পীর সেজে সবাইকে ধোঁকা দিলে, তার পূর্বপুরুষদের নেক ব্যক্তিরা খারাপ হয়ে যান না। এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সত্যিকারের আল্লাহওয়ালাদের চিনে নিতে হবে।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৫/১১৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

ইবরাহীম ﷺ ছিলেন 'খলীলুল্লাহ'। মানে আল্লাহ তাআলার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অর্থাৎ যার অন্তরের সামান্য একটা অংশও আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দখল করতে পারে না। অন্তর আর কারও দিকে একবিন্দুও ঝুঁকে না। ইবরাহীম ﷺ তেমনই ছিলেন। তাঁর ঘর আলোকিত করে একসময় দুনিয়ায় এলেন ইসমাঈল ﷺ। একেবারে শেষ-বয়সে পাওয়া সন্তান। তার জন্য একটু টান তো হৃদয়ে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে আল্লাহর চাওয়া ছিল ভিন্ন। 'খলীল' হতে হলে পুরো অন্তর জুড়ে কেবল মহান আল্লাহ তাআলাই থাকবেন। তাই হুকুম দিলেন, কলিজার টুকরো সন্তানকে আল্লাহর জন্য কুরবান করতে হবে। এই সূরার ১০১-১০৭ নং আয়াতে এসেছে এই ঘটনা। তো আদেশ অনুযায়ী, ইবরাহীম ﷺ ছুরি চালিয়ে দিলেন ছেলের গলায়। এ-সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটা স্পষ্ট পরীক্ষা।" আল্লাহ দেখলেন, ইবরাহীম ﷺ এর হৃদয়ের সবটুকু জুড়েই রয়েছে রবের কাছে আত্মসমর্পণ। তখন তিনি ইসমাঈল ﷺ-কে বাঁচিয়ে দিলেন আপন মহিমায়। এখান থেকে আমাদের নেবার বিষয় হলো—পুরো অন্তরটা সঁপে দিতে হবে শুধু আল্লাহকে। তবেই আসবে আল্লাহর অপার সাহায্য।

(দেখুন—বুখারি, ১৬, ৬৯৪১; মুসলিম, ৪৩, ২৯৮৫)

কুরআনের অনেক আয়াতেই দেখা যায়, জান্নাতিদের একটি কাজ হবে—মুখোমুখি বসে একে অপরের সঙ্গে আলাপ করা। এই সূরার ৫০ নং আয়াতেও তা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের জানা কথা—জ্ঞানীরা জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করেন। জান্নাতেও এই ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ উঠবে, নতুন নতুন জ্ঞানের দিগন্ত উন্মুক্ত হবে, অজানা সব রহস্য উন্মোচিত হবে; যা কেউ কোনোদিন জানেনি। তাতে এমন প্রশান্তি অনুভূত হবে, যা ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য কারও নেই। আর এই বিষয়টি তিনি বেশ কয়েক জায়গায় আমাদেরকে জানিয়েছেন। যেন আখিরাতের কাজ করতে গিয়ে দুনিয়ার বেড়া টপকানো আমাদের জন্য সহজ হয়। দুনিয়াই যেন গিলে না ফেলে আমাদের সবটুকু সময়।

(দেখুন—ইবনু মাজাহ, ৪১০৬)

সূরা সোয়াদ

سُوْرَةُ صٓ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩৮-তম সূরা। এর আগে সূরা কমার ও পরে সূরা আ'রাফ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা সাফফাত ও পরে সূরা যুমার।

এক নজরে সোয়াদ

- নুবুওয়াতের ৪র্থ/৫ম বছর নাযিল
- সূরা নং: ৩৮
- আয়াত: ৮৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

সূরাটির প্রথম শব্দ—'সোয়াদ'। সোয়াদ, ইয়া-সীন, আলিফ-লাম-মীম, হা-মীম..—এগুলোকে বলা হয় اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَةُ বা বিচ্ছিন্ন-হরফ। ২৯টি সূরার শুরুতে এরকম হরফ পাওয়া যায়। এগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে না-পড়ে আলাদা আলাদাভাবে পড়তে হয়। এগুলোর অর্থ নিয়ে আছে মতানৈক্য। তো, শুরুতে থাকা 'সোয়াদ' হরফটি থেকেই এ-সূরার নাম হয়েছে সূরা সোয়াদ।

মেজর থিম

০১. নবিদের মাধ্যমে তাঁদের উম্মাহকে পরীক্ষা। মানুষের অহংকার।

০২. আগেকার নবিদের উদাহরণ। পরীক্ষার সময়কাল: সারাজীবন।

০৩. পরীক্ষায় পাশ করা লোকদের সাথে, ফেল করা লোকদের পার্থক্য।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তাআলা কুরআনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার উপকরণ হিসেবে—" শপথ কুরআনের, যাতে রয়েছে স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার উপকরণ।" আর সূরাটির শেষ আয়াতেও একই বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়—"এ তো বিশ্ববাসীকে স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার পয়গাম মাত্র।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা সাফফাত; যার শেষে আল্লাহ তাআলা বলেন : "আচ্ছা, তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত নিয়ে আসার জন্য দাবি জানায়?" তাদের এই দাবির পরিণতি কতটা ভয়াবহ, সেই ইঙ্গিত দেওয়া হলো সূরা সোয়াদের শুরুতে। জানানো হলো, তারা যেসব শাস্তি দ্রুত আনার জন্য দাবি জানায়, সেগুলো দিয়েই তো আগেকার কতিপয় জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

শানে নুযুল

নবিজির চাচা আবু তালিব। মারা যাওয়ার সময়ও সে ঈমান আনেনি। তবে নবিজির কাজে কোনোদিন বাধাও দেয়নি। বাধা তো দূরের কথা, বরং সব সময় তাঁর মাথার ওপর বটের ছায়ার মতো অটল ছিল। তার জন্যই মক্কার কাফিররা কোনোদিন নবিজির গায়ে হাত তোলার সাহস করেনি। সেই আবু তালিব তখন বিছানায় পড়ে গেছে। কাফির নেতারা তাই সব এক হলো। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল: 'এই বুড়ো মরে যাচ্ছে। তার আগে চলো, তার কাছে গিয়ে বলি, তিনি যেন তার ভাতিজা ও আমাদের মধ্যে একটা ফায়সালা করে দেয়। সে মারা যাওয়ার পর আমরা মুহাম্মাদের গায়ে হাত তুললে, লোকে মন্দ বলবে। বলবে, দেখো, চাচা মরার পর মুহাম্মাদের গায়ে হাত পর্যন্ত তুলছে! সে বেঁচে থাকতে কখনো এই সাহস করেনি।' আবু তালিবের কাছে ওরা গিয়ে আর্জি জানাল—মুহাম্মাদ যার খুশি তার উপাসনা করুক, কিন্তু আমাদের মূর্তির নিন্দা যাতে না করে। আর আমাদের কাউকে যাতে তার ধর্মের দিকে না ডাকে। আবু তালিব তাদের কথা শুনে নবিজিকে ডাকল। তাঁকে সবকিছু খুলে বলল। তখন নবিজি জবাব দিলেন—চাচা, আমি তো তাদেরকে এমন এক কালিমার দিকে ডাকছি, যেটির মাধ্যমে তারা গোটা আরবের নেতা হবে, অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া-কর দেবে। আর সেটি হলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কথা শুনে কাফির নেতারা রাগে গজগজ করতে করতে উঠে গেল। ওদের সেই ক্ষোভ আর আক্রোশের জবাব দিতেই এ-সূরার শুরুর দিকের আয়াতগুলো নাযিল করা হয়েছে। এ ছাড়াও নয়টি জাতির কাহিনি তুলে ধরে লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছে। জানানো হয়েছে অবাধ্যতার পরিণতি।

(দেখুন—নাসাঈ, ৪৫৬; তিরমিযি, ৩২৩২; আবু ইয়ালা, ২৫৮৩)

সেগমেন্ট

কাফিরদের বিস্ময়

সূরার শুরুর অংশেই দেখানো হয়: একজন নবি এসেছেন—যে তাদের মতোই খায়-দায়, বাজারে যায়; অর্থাৎ তাদের মতোই মানবীয় গুণ আছে তাঁর। এই ব্যাপারে কাফিরদের বিস্ময়ের শেষ নেই।

বিরোধিতার মুখে ধৈর্য

কাফিরদের নানা রকম বিরোধিতা ও উৎপাত থাকবেই। আল্লাহ এসব ব্যাপারে রাসূল ﷺ-কে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়েছেন।

হুঁশিয়ারি ও আহ্বান

সূরার শেষ অংশে অবিশ্বাসীদের প্রতি দেওয়া হয়েছে চরম হুঁশিয়ারি। এ ছাড়া রাসূলের মাধ্যমে তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়—দ্বীনের পথে ফিরে এসো।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর ১০০ আয়াতের কম, সেসব সূরাকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা সোয়াদ।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

নবিগণের একটি অনন্য গুণ হলো, সর্বদা পরকালকে স্মরণে রাখা;

তাই আমাদেরকেও পরকালের কথা বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

নুবুওয়াত ও নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ এবং আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতি

১. নবি-বিদ্বেষীদের প্রতি সতর্কতা

কাফিরদের জন্মগত একটি স্বভাব হলো গোঁয়ার্তুমি। শুধু এই গোঁয়ার্তুমির জেরে তারা রাসূল ﷺ ও কুরআনের বিরোধিতা করে গেছে লাগাতার। সূরার শুরুতে তাদের পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

২. দাউদ ﷺ: নেতৃত্বের দায়িত্ববোধ

দাউদ ﷺ-এর কাছে একটি নালিশ আসে। ফায়সালা দিতে গিয়ে তিনি টের পেলেন—এর মাধ্যমে আসলে আল্লাহ তাঁরই পরীক্ষা নিচ্ছেন। এই ঘটনা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়—নেতৃত্বের সাথে আছে বিশাল দায়-দায়িত্বের বোঝা।

৩. সুলাইমান ﷺ: কর্তৃত্বের বিনয়

সুলাইমান ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা ব্যাপক কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। এটি ছিল একটি পরীক্ষা। তবে বিপুল ক্ষমতা পেয়েও তিনি আল্লাহর সামনে বিনয়ে নত ছিলেন।

৪. অবাধ্যতার পরিণতি

শেষ বিচারের দিন আল্লাহর অবাধ্যদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাদেরকে দিয়ে জাহান্নাম ভরতি করা হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআনের ব্যাপারে কাফিরদের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। ইসলামকে নিয়ে তাদের বিস্ময়ের শেষ নেই।	১-১১	নবি ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর বংশধরদের আলোচনা উঠে এসেছে।	৪৫-৫৪
অবিশ্বাসীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—দেখো, পূর্বের অবাধ্যদের পরিণতি কেমন হয়েছে।	১২-১৬	অবাধ্য ও পাপীদের জন্য যেসব শাস্তি রাখা আছে, সেসব বর্ণনা করা হয়েছে।	৫৫-৬৪
নবি দাউদ ﷺ-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।	১৭-২৬	নবিজির দাওয়াতের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।	৬৫-৭০
মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আছে আল্লাহর গভীর জ্ঞান বা হিকমাহ। এটি কুরআন নাযিল হওয়ার কারণও বটে।	২৭-২৯	নবি আদম ﷺ-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।	৭১-৮৫
সুলাইমান ও আইয়ুব ﷺ-এর কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।	৩০-৪৪	কুরআন একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এটি কোনো মানুষের বানানো নয়।	৮৬-৮৮

কেইস-স্টাডি

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটি স্মরণ-রাখার-বিষয় জানিয়ে দিচ্ছেন এই সূরায়। সেই স্মরণ-রাখার-বিষয়টি হলো—যারা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, তাদের জন্য আছে সুন্দর ঠিকানা—স্থায়ী আনন্দের জান্নাত। এরপর সেই জান্নাতে কী কী নাজ-নিয়ামাত থাকবে, সেগুলোর বিবরণও আল্লাহ তুলে ধরলেন। দুনিয়াতে মানুষ যে সুখের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়, সেই সুখের সন্ধান আল্লাহ-ই আমাদেরকে দিচ্ছেন। তা-ও আবার সাময়িক আনন্দের ধোঁকা নয়, একেবারে চিরস্থায়ী আনন্দের জান্নাত। যার সুখ-শান্তি কখনো ফুরাবে না। কোনোকিছুর অভাব বোধ করবেন না এক মুহূর্তের জন্যও। তবে এই সুখ-লাভের ক্ষেত্রে শুরুতেই আল্লাহ একটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। আর সেই শর্তটি হলো: আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ব্যস, এতটুকুই! তো, শুধুমাত্র আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকলেই যদি এত এত পুরস্কার পাওয়া যায়, তা হলে এজন্য চেষ্টা তো করা উচিত-ই। সামান্য ক'টা দিন একটু ভালো থাকতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া বোকামি ছাড়া আর কী হতে পারে!

(দেখুন—বুখারি, ৭৪৯৮; মুসলিম, ২৮২৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"এটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার কাছে নাযিল করেছি, যাতে এর বার্তাগুলো নিয়ে মানুষ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা (সেগুলো) স্মরণ রাখে।" সূরার ২৯ নং আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি—কুরআন নাযিলের একটি উদ্দেশ্য হলো, এর বার্তাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা এবং তা স্মরণ রাখা। সুতরাং কুরআন দ্রুত পড়ার চেয়ে ধীরে ধীরে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে পড়াই উত্তম। কেননা, দ্রুত পড়লে অনুধাবনের সময়ই মেলে না। আর আস্তে আস্তে পড়া হলে তাদাব্বুর করার সুযোগ পাওয়া যায়। অথচ কত দ্রুত পড়া যায়, আমরা সেই চিন্তায় থাকি। মনে রাখবেন—আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম যিকির হলো কুরআন তিলাওয়াত। এর চেয়ে উত্তম যিকির আর নেই।

(দেখুন—মুনাবি, ফাইযুল কদীর, ১৩০৫; ইবনু কাসীর, ৬/৪১৮)

কাফিররা জাহান্নামে যাওয়ার পর বলবে, 'আমাদের কী হলো! (দুনিয়ায়) আমরা যাদেরকে খারাপ লোক হিসেবে গণ্য করতাম, সেসব লোককে (জাহান্নামে) দেখছি না কেন!' এটি এই সূরার ৬২ নং আয়াত। আপনার আশপাশে তাকিয়ে দেখুন—কাফির-বেঈমানরা মুমিনদেরকে অত্যন্ত মন্দ আর খারাপ হিসেবেই গণ্য করে। অত্যন্ত নিচু চোখে দেখা হয় তাদেরকে। তাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানালেন, কাফিররা যখন জাহান্নামে জ্বলবে, সেখানে একজন মুমিনকেও দেখতে না পেয়ে বলতে থাকবে—ওই লোকগুলোকে দেখছি না কেন? অপ্রিয় হলেও সত্য—আমাদের সমাজেও যারা ঈমানে-আমলে একটু এগিয়ে, তাদেরকে অবহেলা করা হয়। হয়তো তাদের তেমন অর্থকড়ি থাকে না, দামি জামা-কাপড়, গাড়ি-বাড়ি থাকে না। কিন্তু তাদের অন্তরটা থাকে হিদায়াতের নূরে ভরপুর। দুনিয়াতে না পেলেও, পরকালে আল্লাহর কাছে তারা যথাযোগ্য সম্মান পাবে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ১৫/২২৪)

সূরা যুমার — سُوْرَةُ الزُّمَرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৫৯-তম সূরা। এর আগে সূরা সাবা ও পরে সূরা মুমিন/গাফির নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৩৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা সোয়াদ ও পরে সূরা মুমিন/গাফির।

এক নজরে যুমার

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল
- সূরা নং: ৩৯
- আয়াত: ৭৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

'যুমার' শব্দটি 'যুমরা' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ 'দল'। এই সূরায় দুটি দলের কথা আলোচনা করা হয়েছে। শেষ বিচারের পর, কাফিরদেরকে দলবদ্ধভাবে জাহান্নামের দিকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হবে। আবার মুমিনরাও জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে দলবেঁধে। এ-সূরার ৭১-৭৪ নং আয়াতে জায়গা পেয়েছে এ-বিষয়টি। সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে 'যুমার'।

মেজর থিম

০১ শির্কের কারণ।

০২ শির্কের উপমা ও ঈমান।

০৩ বিচার দিবসে কাফিরদের অনুতাপ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

মুশরিকদের আসল উপাস্য যে কোনটা, তা নিয়ে তাদের নিজেদের মাঝেই তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। যদিও আল্লাহ তাআলাই আনুগত্যের একমাত্র হকদার। এ প্রসঙ্গে সূরার শুরুতে আল্লাহ বলেন, "যে-বিষয়ে তারা নানামুখী মত দিচ্ছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের মধ্যে সে-বিষয়ে ফায়সালা দেবেন।" আর আল্লাহর ফায়সালা হবে শতভাগ ন্যায্য। সূরাটির শেষে আল্লাহ বলেন "প্রত্যেকে যা করেছে, তার পাওনা তাকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা সোয়াদ; যা শেষ করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী দিয়ে : "এ তো বিশ্ববাসীকে স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার পয়গাম মাত্র।" আর সূরা যুমার শুরু করা হয়েছে এই বাণী দিয়ে : "এ-কিতাব ধীরে ধীরে নাযিল করা হচ্ছে প্রবল পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে।" এ যেন বলা হলো, স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার পয়গামটিই ধীরে ধীরে দুনিয়ায় নাযিল করা হচ্ছে।

শানে নুযুল

মক্কার কাফিরদের অত্যাচার তখন আর সহ্য করা যাচ্ছে না। কিছু মুমিন হাবশায় হিজরত করার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এমন সময় এই সূরাটি নাযিল হয়। যেখানে বেশিরভাগ কথাই মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে এসব অনাচার থামিয়ে এক আল্লাহর গোলামি করার আদেশ দিলেন। পাশাপাশি নবিজির মিশনের উদ্দেশ্যও জানিয়ে দিলেন তিনি। মানুষ যেন শত মূর্তি বাদ দিয়ে কেবল এক আল্লাহর ইবাদাত করে, তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক না করে। আর জুলুম হয়ে গেলে তাওবা করে যেন তাঁর দিকেই ফিরে আসে। ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে এ-সূরাতে। অত্যাচারের মুখে তারা যেন ঈমান হারিয়ে না বসে। বরং আল্লাহর ইবাদাত করতে বাধা এলে, যেন হিজরত করে অন্য কোথাও চলে যায়। আল্লাহর দুনিয়াটা অনেক বড়। মুশরিকরা এ-ও চাইত, কোনোভাবে নবিজিকে যদি বাগে আনা যায়! হোক সেটা লোভ কিংবা ভয়-ভীতি দেখিয়ে। কিন্তু তাদের সে আশা নস্যাৎ করে দেয় এই সূরা। আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দেন—তারা যা করতে পারে, করুক। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। মোটকথা, শির্ক বাদ দিয়ে এক আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানাতে, আর মুমিনদের মাঝে সাহস সঞ্চার করতে এ-সূরা নাযিল করা হয়েছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৬/৪৩৬; তাফহীমুল কুরআন, ১৩/১২৬)

সেগমেন্ট

কুরআন ও আল্লাহ

কুরআন নাযিল হয়েছে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে—যিনি প্রবল পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

তাওহীদ ও কুরআন

একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব মূল্যহীন। আর সত্যের পথ চেনার জন্য অনুসরণ করতে হবে কুরআনকে।

মুমিন ও কাফির

কুরআনের অসংখ্য জায়গায় মুমিন ও কাফির—এই দুই শ্রেণির আলোচনা এসেছে। দেখানো হয়েছে তাদের পরিণতি। এই সূরার শেষ দিকেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

ফজিলত

আয়িশা ﵂ বলেন, 'নবি ﷺ সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না।'

(তিরমিযি, ২৯২০, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ-ই পথভ্রষ্ট করতে পারে না;

তাই তাঁর কাছে দুআ করতে হবে—'হে অন্তর-পরিবর্তনকারী! আমাকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল রাখুন।'

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
আন্তরিকতাপূর্ণ ইবাদাত ও চূড়ান্ত জবাবদিহিতা

১. একনিষ্ঠ ইবাদাত
কেবল আল্লাহ তাআলাই হলেন বান্দার ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। একাগ্র চিত্তে কেবল তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। এখানে আর কাউকে-ই শরিক করা যাবে না।

২. আলো-আঁধার: ঈমান ও কুফর
ঈমান ও কুফরকে তুলনা করা হয়েছে আলো ও আঁধারের সাথে। অর্থাৎ ঈমান মানুষের জীবনে আলোর বাতি জ্বালে। আর কুফর নিয়ে যায় ঘোরতর অন্ধকার পথে।

৩. পরকালের বাস্তবতা ও জবাবদিহিতা
মারা যাওয়ার পর আবার সবাইকে আল্লাহ জাগিয়ে তুলবেন, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করবেন ও সবার হিসাব নেবেন। এই প্রক্রিয়ার বাইরে কেউ যেতে পারবে না।

৪. শেষ বিচার দিনের শেষ দৃশ্য
সকলের হিসাব-কিতাব শেষে ফলাফল দেওয়া হবে। ফলাফল অনুযায়ী ফেরেশতারা কাউকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন জাহান্নামের দিকে, আবার কাউকে এগিয়ে দেবেন চিরস্থায়ী জান্নাতের পথে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
ইবাদাত লাভের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। মহাবিশ্ব, এমনকি মানুষের নিজের মধ্যেই রয়েছে তাঁর অসংখ্য নিদর্শন।	১-৭	মুশরিকদের প্রতি হুঁশিয়ারি ও মুমিনদেরকে দেওয়া ওয়াদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।	৩২-৩৭
ঈমানদার ও কাফিরের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। মুমিনদের জন্য নির্দেশনা, মুশরিকদের জন্য আছে সতর্কবার্তা।	৮-২০	শিরককারীদের পথভ্রষ্টতা ও তাদের প্রতি আল্লাহর সতর্কবার্তা। আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি তুলে ধরা হয়েছে স্পষ্ট করে।	৩৮-৪৮
আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ ছড়ানো সবখানে। আর তিনি সকল বিষয়ে সবার ওপর ক্ষমতাবান।	২১	সুসময় ও দুঃসময়ে মানুষের ঈমানের অবস্থা কেমন হয়, তার বর্ণনা। আল্লাহর দিকে ফিরে আসবার আহ্বানও জানানো হয়েছে।	৪৯-৫৯
কুরআনের সাথে মুমিনদের সম্পর্কের ব্যাখ্যা। জাহান্নামে কাফিরদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তার এক ঝলক দৃশ্য।	২২-২৬	কিয়ামাতের দিন মানুষের অবস্থা। এ ছাড়া সবকিছুর ওপর আল্লাহর একক ক্ষমতার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া।	৬০-৬৭
মানুষের গভীর চিন্তা-ভাবনার জন্য কিছু উদাহরণ। এ ছাড়া আলোচনা করা হয়েছে কুরআনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে।	২৭-৩১	শিঙায় ফুঁ দেওয়ার মাধ্যমে কিয়ামাতের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। তখন পাপী ও নেককারদের হবে ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি।	৬৮-৭৫

কেইস-স্টাডি

কুরআনের মাধ্যমে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়—পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে 'আল্লাহ' নামটিই বলে। জাগতিক সকল বিষয়ের দেখভালকারী হিসেবেও তাঁকেই সবাই চেনে। তবুও মানুষ তাঁর সাথে শির্ক করে! কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও কুরআনই আমাদেরকে দেয়। এই সূরার ৩ নং আয়াত আমাদেরকে জানায়—'বহু মানুষ আছে, যারা মনে করে, সৃষ্টিকর্তা একজন অবশ্যই আছেন। তবে তিনি তো আর আমাদের কথা সরাসরি শুনবেন না। তাঁর কাছে আমাদের কথা পৌঁছুতে হলে, দরকার পড়বে এক বা একাধিক মাধ্যম। তারা আল্লাহর কাছে আমাদের দাবি-দাওয়া পৌঁছে দেবেন।' আর তারপর 'মাধ্যম' হিসেবে বেছে নেয় শির্কের নানান পথ। অথচ এই ধারণার পেছনে বিন্দুমাত্র সত্যতা নেই। এমন শির্কি-ধারণা মুসলিম সমাজেও দেখা যায় হরহামেশাই। তারা কোনো মূর্তির পূজা করে না ঠিকই, কিন্তু সন্তানাদি বা চাকুরি-ব্যবসার উন্নতির জন্য মাজারে-মাজারে বা পীরের দরবারে ধরনা দেয়। অথচ পৃথিবীর সকল মানুষ একসাথে তাদের প্রয়োজনের কথা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ সবার কথাই আলাদা-আলাদা করে শুনবার ক্ষমতা রাখেন। তাই বিষয়টি আমাদের গভীরভাবে স্টাডি করা দরকার। আমরা যেন আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি আল্লাহর সাথে নিজেকে কানেক্ট করে নিই। তাঁর ক্ষমতায় যেন কাউকে শামিল না করি।

(দেখুন—বুখারি, ৩৪২৮; মুসলিম, ১২৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ১২ নং আয়াতে—আল্লাহর দ্বীনের পথে যারা দাওয়াতের কাজ করবে, তাদের জন্য—একটি গুরুত্বপূর্ণ সবক রয়েছে: "আর আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করি।" নবি ﷺ সবাইকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছেন, তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকেই সবার আগে ইসলাম গ্রহণের আদেশ দিলেন। এ-থেকে বোঝা যায়—যে আহ্বায়ক হয়, মানুষকে রবের দিকে ডাকে, তার কর্তব্য হলো, প্রথমে সে নিজেই রবের আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলবে। সুতরাং আমরা যারা মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিই—বলার মাধ্যমে বা লেখার মাধ্যমে—তাদের সবার জন্য জরুরি হলো, প্রথমে নিজেকে রবের রঙে রাঙানো। নিজের পরিবারের দ্বীনি খোঁজ-খবর রাখা। এমন যদি হয় যে, সবাইকে যে-পথের দাওয়াত দিই, আমি নিজেই তার উলটো পথে চলি; তা হলে পরিণতি হবে ওই অন্ধের মতো, যে নিজের প্রদীপ দিয়ে অপরকে আলো বিলায়, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়। এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লোকজন জান্নাতে যাবে। অথচ তারা নিজেরা নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের দাউদাউ করা আগুনে।

(দেখুন—তাবারানি, ১৬৮১; আবুশ শাইখ, আমসালুল হাদীস, ২৭৬)

এ-সূরার ১৮ নং আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে। যারা মনোযোগী হয়ে শোনে এবং ভালোটা মানে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন, সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং তাদের বুদ্ধিমত্তার তারিফ করেছেন। তারা কুরআনের বাণীও শোনে, আবার অন্যান্য কথাও শোনে। অতঃপর কুরআনের অনুসরণ করে। আমরাও বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য শুনি, হরেক-রকমের বই পড়ি। তবে যা শুনি বা পড়ি, তার যতটুকু কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে মেলে, যেগুলো উত্তমের সংজ্ঞায় পড়ে—কেবল সেগুলো গ্রহণ করব।

(দেখুন—মালিক, আল-মুআত্তা, ২/৮৯৯; ইবনু হাজার আসকালানি, হিদায়াতুর রুওয়াত, ১/১৪০)

সূরা মুমিন

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬০-তম সূরা। এর আগে সূরা যুমার ও পরে সূরা হা মীম সাজদা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা যুমার ও পরে সূরা হা মীম সাজদা।

এক নজরে মুমিন

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল
- সূরা নং: ৪০
- আয়াত: ৮৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

মুমিন | গাফির

এই সূরার দুটি নাম আছে। **(১) 'মুমিন'**; যার অর্থ 'সত্যায়নকারী/সত্য বলে মেনে নেওয়া ব্যক্তি'। ফিরআউনের সভাসদদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের ঈমান আনার কথা গোপন রেখে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিয়েছিলেন। কৌশলে নবি মুসা ﷺ-কে সত্যায়ন করেছেন। সেখান থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'মুমিন'। আর **(২) 'গাফির'**; যার অর্থ ক্ষমাকারী। ৩ নং আয়াতে আল্লাহর এই গুণবাচক নামটি এসেছে।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর গুণাবলি।

০২ ফিরআউনের দলের একজন ঈমানদারের কাহিনি।

০৩ দুআর গুরুত্ব।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলাকে একই সঙ্গে গুনাহ-ক্ষমাকারী, তাওবা-কবুলকারী আর কঠোর শাস্তিদাতা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন সূরাটির শেষ আয়াতে, "আমার শাস্তি দেখার পর তাদের এই ঈমান-আনা তাদের কোনো উপকারে আসেনি...যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" অর্থাৎ, সময় থাকতে-থাকতেই খাঁটি তাওবা করতে হবে। শাস্তি দেখার পর ঈমান আনলে কোনো লাভ হবে না।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা যুমার; যার শেষ অংশে ফেরেশতাদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সূরা মুমিন/গাফিরের শুরুর দিকেও ফেরেশতাদের আলোচনা লক্ষ করা যায়, "যারা আরশ বহন করে ও তার পাশে থাকে, তারা তাদের রবের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁর ওপর ঈমান রাখে।"

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ একমনে মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকে যাচ্ছেন। আর ওদিকে কাফির-মুশরিকদের মনেও দাউদাউ আগুন জ্বলছে। সেই আগুন নেভাতে তারা দুটো রাস্তা বেছে নেয়। এক দিক দিয়ে তারা ফালতু সব যুক্তি দিয়ে নবিজির সাথে তর্ক করত। বিভিন্ন বিতর্ক সৃষ্টি করে তাঁকে চাপে রাখার চেষ্টা করত! তার নামে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালাত। যাতে করে সাধারণ মানুষ নবিজির কাছে না ঘেঁষে। আর আরেক দিক দিয়ে তারা তাদের 'আপদ'কে চিরতরে বিদায় করতে চাইল। অর্থাৎ শুরু হয় রাসূলকে জানে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র । এই রাস্তায় মোটামুটি অনেকদূর এগিয়েও যায় ওরা। একদিন নবিজি কা'বা-চত্বরে নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ করে উকবা এসে পেছন থেকে তাঁর গলায় একটা কাপড় প্যাঁচিয়ে দেয়। এরপর কাপড় ধরে ক্রমাগত মোচড় দিতে থাকে। ওদিকে রাসূলের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। আর সে-মুহূর্তেই আবু বকর ﷺ সেখানে হাজির হলেন। এই অবস্থা দেখে তিনি তাড়াতাড়ি করে উকবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলেন। আর আফসোস করে বলতে থাকেন—"তোমরা কি এইটুকু অপরাধের জন্য একজন মানুষকে মেরে ফেলছো—তিনি শুধু বলেন, 'আল্লাহ আমার রব'?" এই ঘটনার পরই আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেন। যেখানে তিনি কাফিরদেরকে সতর্ক করেন। আর মুমিনদেরকে তাঁর ওপর ভরসা করে নিজেদের কাজ করে যেতে বলেন।

(দেখুন—ইবনু হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারী, ৭/১১৭; আবু নুআইম, হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়া ১/৩১; তাফহীমুল কুরআন, ১৩/১৬৩)

সেগমেন্ট

সূচনা

সূরাটির সূচনাতে আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এরপর তাদের কথা উল্লেখ করেছেন—যারা তাঁর নিদর্শনের ব্যাপারে তর্ক করে।

অতীত থেকে শিক্ষা

'তারা কি দুনিয়াতে সফর করে না? করলে তো দেখতে পেত...।' এভাবে আল্লাহ তাআলা কাফির-মুশরিকদেরকে আগেকার জাতিগুলোর পরিণতি দেখতে বলেছেন।

বেঈমানদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নীতি

যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটায় ও সত্যকে অস্বীকার করে, তাদের বেলায় আল্লাহর নির্দিষ্ট রীতি-নীতি আছে। সে-অনুযায়ী তিনি ওদের সাথে আচরণ করেন।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর ১০০ আয়াতের কম, সেসব সূরাকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। তো এরকমই একটি সূরা হলো সূরা মুমিন/গাফির।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

অনর্থক কোনো কাজে সময় ব্যয় হয়ে গেলে, কিছু সময় নফল ইবাদাতে ব্যয় করতে হবে,

তাতে আশা করা যায়—আল্লাহ আমাদের ভালো কাজগুলো দিয়ে খারাপ কাজগুলোকে মুছে দেবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল

১. ক্ষমাশীল ও অনুশোচনা কবুলকারী
মানুষ ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে, তাঁর কাছে মাফ চাইবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি বান্দার তাওবা কবুল করে নেবেন।

২. ব্যতিক্রমী একজন
ফিরআউনের সভাসদদের মাঝে ব্যতিক্রমী এক ব্যক্তি ছিল। তার কাজকে আল্লাহ পছন্দ করলেন ও কুরআনে সেই ঘটনা তুলে দিলেন।

৩. ফেরেশতাদের সুপারিশ
মুমিনদের জন্য ফেরেশতারা সবসময় দুআ করেন। এমনকি কিয়ামাতের দিনও তারা মুমিন বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এটি আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ।

৪. আল্লাহর সিদ্ধান্তই কার্যকর হবে
সূরাটি একটি শক্তিশালী বার্তার মাধ্যমে শেষ হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে যদিও মনে হচ্ছে—কাফিরদের শক্তি প্রবল। তাদের সামনে দাঁড়ানোই মুশকিল! তবু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফায়সালাই কার্যকর হবে। অর্থাৎ মুমিনরাই বিজয়ী হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি। কাফিরদের অবস্থা ও আগেকার জাতিগুলোর অস্বীকৃতির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।	১-৬	ফিরআউনের দলের একজন ভালো লোকের ঈমান আনা ও তার প্রচেষ্টা। শাস্তি দেখার পর মুশরিকরা ভীষণ আফসোস করবে।	২৮-৫০
আরশ-বহনকারী ফেরেশতাদের কথা। এ ছাড়া মুশরিকদের পরিণতি ও তাদের কাকুতি-মিনতির করুণ চিত্র।	৭-১২	মুমিনদের জন্য বিজয় ও নববি দিক-নির্দেশনা। এ ছাড়া অহংকার ও এর পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।	৫১-৭৬
আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা। কিয়ামাতের অবস্থার কিছু চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।	১৩-২০	নবিজির প্রতি আল্লাহর উপদেশ উল্লেখ করা হয়েছে।	৭৭-৭৮
আগেকার জাতিগুলোর পরিণতি থেকে শিক্ষা নেবার আদেশ।	২১-২২	আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ কিছু অনুগ্রহের বর্ণনা।	৭৯-৮১
ফিরআউন, হামান ও কারুনের কাছে মুসা ﷺ-এর দাওয়াত ও তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানানো হয়েছে।	২৩-২৭	কাফিরদের প্রতি হুমকি দেওয়া হয়েছে, কিয়ামাতের দিন ঈমান আনার সুযোগ নেই। তাই যা করার, করতে হবে এখনই।	৮২-৮৫

কেইস-স্টাডি

"তোমাদের রব বলেছেন, 'আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা আমার গোলামি করতে অহংকার দেখায়, তারা নিশ্চিত অপদস্থ হয়ে জাহান্নামে ঢুকবে।'" এই সূরার ৬০ নং আয়াত এটি। আয়াতটির প্রথম অংশটি আবার খেয়াল করা যাক—'আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ঘোষণা বান্দাকে দারুণ উদ্দীপ্ত করে, নির্ভরতার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দেয়। দুনিয়ার কোনো প্রেসিডেন্ট যদি কাউকে এভাবে নিশ্চয়তা দেয়, তা হলে সেই মানুষটি ভীষণ খুশি হবে। আকাশের চাঁদ হাতে পাবার মতো অনুভূতি জন্ম নেবে তার মনে। সেখানে রাজাধিরাজ আল্লাহ আমাদেরকে কী চমৎকারভাবেই-না নিশ্চিন্ত-নির্ভার করছেন! এই আয়াত আমাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দেয়—জীবনের শত চাওয়া-পাওয়া তুলে ধরতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। তাঁর সামনে মাথা নোয়াবার বেলায় কোনো অহংকার দেখানো যাবে না। তিনিই আমাদেরকে সকল প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধার করবেন।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৫/৩২৭)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৪ নং আয়াতটি লক্ষ করুন—"সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ জীবনযাপন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।" অর্থাৎ কাফিররা আল্লাহর দুনিয়ায় নিশ্চিন্তে বুকটান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খুব ভোগ ও আরাম-আয়েশের মধ্যে তারা ডুবে আছে—এগুলো দেখে ধোঁকায় পড়ো না। তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যায়নি। আসলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে-দেওয়া অবকাশ। এ অবকাশকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে যারা যতটা অপকর্ম করে, তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তাদের দুর্ভাগ্যের পালা একদিন-না-একদিন অবশ্যই আসবে। এ মুহূর্তে যদিও তোমরা দেখছো তাদের অবাধ বিচরণ।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৭/১৩৯)

কাফির-মুশরিকরা দুনিয়ার জীবন জুড়ে আল্লাহর বিধান নিয়ে, ইসলাম নিয়ে হাসি-তামাশা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে থাকে। অন্যকে তাঁর সঙ্গে শরিক করে। মৃত্যুর সময় তাদের অবস্থা কেমন হবে, এ-সূরার শেষ দুটো আয়াতে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে—"তারপর যখন তারা আমার শাস্তি দেখতে পেল, তখন বলে উঠল, 'আমরা একমাত্র আল্লাহকেই মেনে নিলাম, আর এতদিন যাদেরকে তাঁর অংশীদার বানিয়েছিলাম, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম!'" শেষের ঘণ্টা বাজার পর তাদের হুঁশ আসে, ফিরতে চায় আলোর পথে। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। ফিরবার সুযোগ তখন আর থাকবে না। এখন আমরা একটু নিজেদের দিকে তাকাই। দুনিয়ার খুঁটিনাটি বিষয়-আশয়েও আমরা এই বিষয়টা খুব করে বুঝি। সামান্য সময়ের অফারও লুফে নিই বেলা ফুরাবার আগেই। শুধু আখিরাতের ক্ষেত্রে আমাদের যত গড়িমসি। একেবারে শেষটা দেখে তবেই এগুতে চাই। তবে শেষ-পর্যন্ত যাবার আগেই অনেকের নিভে যায় জীবন-প্রদীপ। ফলে শেষটা আর দেখা হয় না।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৫/১১০)

সূরা হা-মীম সাজদা

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬১-তম সূরা। এর আগে সূরা মুমিন/গাফির ও পরে সূরা শূরা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা সূরা মুমিন/গাফির ও পরে সূরা শূরা।

এক-নজরে হা-মীম সাজদা

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৪১
- আয়াত: ৫৪
- মাক্কি

নামের রহস্য

'হা-মীম'-এর ব্যাপারে ইবনু আব্বাস ﵄ বলেছেন, 'حم হলো আল্লাহ তাআলার ইসমে আ'যম।' হা-মীম দিয়ে শুরু-হওয়া সূরাগুলোর মধ্যে এটি একমাত্র সূরা, যার (৩৭–৩৮ নং আয়াতে) সাজদা রয়েছে। তাই, এর নাম দেওয়া হয়েছে 'হা-মীম সাজদা'। এর আরও একটি নাম হলো 'ফুসসিলাত'; যার অর্থ 'স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা'; ৩ নং আয়াতে এ শব্দটি এসেছে।

মেজর থিম

০১ বিস্ময়কর নিদর্শন: আল-কুরআন।

০২ কুরআনের প্রতি কাফিরদের অনীহা।

০৩ ঈমানের পথে মুমিনদের অবিচলতা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক।

সূরাটি শুরু হয়েছে সত্য থেকে কাফিরদের মুখ ফিরিয়ে নেবার আলোচনা দিয়ে, "...যা সুসংবাদ দেয় এবং সাবধান করে। তারপরও তাদের অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, কথা শুনছে না।" আর এই মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণটা সূরার শেষভাগে জানানো হলো—"আমি যখন মানুষের ওপর কোনো করুণা করি, তখন সে (আমার আনুগত্যের আহ্বান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরে চলে যায়।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো সূরা মুমিন; যার শেষ অংশে আল্লাহ বলেন, "তারা নিজেদের জ্ঞান নিয়েই আনন্দে মেতে উঠল, আর তাদেরকে সেটাই ঘিরে ধরল...।" সূরা হা-মীম সাজদাও শুরু হলো কাফিরদের কর্মকাণ্ড নিয়ে—"এরপরও তাদের অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, কথা শুনছে না।"

শানে নুযূল

একদিন নবিজি কা'বা-চত্বরে বসে আছেন। এমন সময় কুখ্যাত মুশরিক উতবা ইবনু রবীআ তাঁর কাছে এল। নবিজির পাশে বসে অনেকগুলো প্রস্তাব দিতে লাগল সে। আর সেগুলো থেকে যেটা ভালো লাগে, নবিজিকে সেটাই বেছে নিতে বলল। যেমন: 'আপনার এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ কামাই করা হয়, তা হলে বলুন—আপনাকে আমাদের মধ্যে সেরা ধনী বানিয়ে দেবো। যদি নেতৃত্ব চান—আপনাকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে আমরা তৈরি। যদি বাদশাহি চান—গোটা আরবের বাদশাহ আপনিই হবেন। আর যদি আপনার ওপর কোনো জিনের আছর পড়ে থাকে, তা হলে আমাদের খরচে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা করাব।' আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন তাকে বললেন, উতবা, আপনার কথা শেষ হয়েছে? তা হলে আমার কথা শুনুন। তখন তিনি এই-সূরাটি তিলাওয়াত শুরু করলেন। যেখানে আদ জাতির অবাধ্যতার শাস্তির কথার বলা হয়েছে, সেই অংশটুকু পড়লেন নবিজি। পুরো তিলাওয়াত শুনে উতবার চেহারার রং পালটে গেল। তার সাথিরা বলা শুরু করল—উতবা, তোমার মধ্যেও জাদুর প্রভাব পড়ল!

মূলত তখনকার কাফিররা নানাভাবে নবিজির দাওয়াত বন্ধ করতে চাইত। মুমিনদের চরম বিরোধিতা ও হয়রানি করত। এই সূরাটি নাযিল করে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সাহস জোগান। উত্তম নৈতিক-চরিত্র নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার উপদেশ দেন। আর কাফিরদেরকে দেখান আযাবের ভয় ও হুঁশিয়ারি।

(দেখুন—ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ, ১/২৯৩-২৯৪; বাইহাকি, দালায়িলুন নুবুওয়াহ, ১/২৩০-২৩১; ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১৪/২৯৫-২৯৬)

সেগমেন্ট

কুরআন বিমুখতা

সূরার শুরুতেই কাফিরদের একটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে—তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

করুণা ও ক্ষমতা

বান্দার প্রতি আল্লাহর করুণার শেষ নেই। তাঁর ক্ষমতাও অসীম। তাঁর অসংখ্য নিদর্শন এই ঘোষণাই দেয় যে—আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

হুঁশিয়ারি

আল্লাহর এত এত নিদর্শন দেখেও যারা ঈমান আনবে না, তাদের প্রতি সূরার একেবারে শেষ অংশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

ফজিলত

এই সূরাটি হা-মীম যুক্ত সূরাগুলোর একটি। যেগুলোর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে : তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন।' তিনি বললেন, "'হা-মীম' যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ করো....।" (আবু দাউদ, ১৩৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

বান্দার যাবতীয় রিযিকের ফায়সালা আসমান থেকেই হয়—এই সত্যটাকে মেনে নিলে;

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ বাড়বে এবং ধৈর্য ধরা সহজ হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

কুরআনের বার্তা পুরোপুরি স্পষ্ট

১. কুরআনের বৈশিষ্ট্য

কুরআনের রয়েছে এক অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এটি পুরো মানব-জাতির জন্য হিদায়াতের বার্তা নিয়ে এসেছে। আর এই বার্তা পুরোপুরি স্পষ্ট। এতে কোনো ধরনের অসংলগ্ন কথাবার্তা নেই।

২. কুরআনের পথে বাধা

প্রতিটি যুগেই এমন কিছু মানুষ থাকে—যারা আল্লাহর বাণীকে নিজেদের ও তাদের জাতির লোকদের জন্য পছন্দ করে না। যতদিক দিয়ে পারা যায়, তারা সত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

৩. মুমিনের জন্য আশার বাণী

কাফিরদের বাধা সত্ত্বেও প্রতিটি যুগে আবার এমন মানুষও থাকে—যারা আল্লাহর বাণীকে সত্য বলে মেনে নেয়। তাদেরকে শোনানো হয়েছে আশার বাণী।

৪. কুরআনের ব্যাপারে আপত্তির জবাব

অবিশ্বাসীরা কুরআনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে যেসব অমূলক আপত্তি তুলে ধরেছে, আল্লাহ সেসব আপত্তির মোক্ষম জবাব দিয়েছেন এই সূরার শেষ অংশে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআনের মিশনের ওপর আলোকপাত। এ ছাড়া মুশরিকদের অবস্থান ও মুমিনদের পুরস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১-৮	আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জায়গাতেই পুরস্কার পাবে।	৩০-৩২
আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ, তাঁর ক্ষমতা ও আসমান-জমিন সৃষ্টি করার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।	৯-১২	আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকবার নিয়ম-কানুন জানানো হয়েছে। এ ছাড়া শির্ক এর ব্যাপারে মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।	৩৩-৪০
আদ ও সামুদ জাতিকে দেওয়া হয়েছিল ভীষণ শাস্তি। সেই কথা স্মরণ করিয়ে মুশরিকদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।	১৩-১৮	পবিত্র কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। অদৃশ্যের সব খবরাখবর ও কিয়ামাতের সঠিক দিনক্ষণ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।	৪১-৪৮
মুশরিকদের সকল কাজের নিখুঁত হিসেব রাখা হচ্ছে। তাদের কাজগুলো খুব খারাপ পরিণতির দিকে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে।	১৯-২৪	মানব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো—বিপদের সময় লম্বা-চওড়া দুআ করে, আর বিপদ কেটে গেলে আবার আল্লাহর অবাধ্য হয়।	৪৯-৫২
আল্লাহর বাণী মেনে না নেওয়ার পেছনে তাদের ভীষণ একরোখা স্বভাব দায়ী।	২৫-২৯	কুরআন একমাত্র আল্লাহর তরফ থেকেই এসেছে—এই দাবির প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ সর্বত্র তাঁর নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছেন।	৫৩-৫৪

কেইস-স্টাডি

ব্যক্তি-জীবনে আমাদের সবারই কমবেশি সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকে। পারস্পরিক কলহ বা ঝুট-ঝামেলা জীবনে এসেই পড়ে। তবে এসব ঝামেলা থেকে বাঁচবার পথ কিন্তু কুরআন আমাদেরকে দেখিয়ে দেয়। এই সূরার ৩৩-৩৪ নং আয়াতগুলো একটু দেখা যাক—"ভালো ও খারাপ সমান হয় না। অধিক ভালো দিয়ে (খারাপের) মোকাবিলা করো; তা হলে দেখবে—তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে কেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে!" দেখলেন তো, কী চমৎকার এক সমাধান! জীবনের চলার পথে যখনই মনে হবে কারও সাথে আপনি উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন, কিংবা না-চাইতেও কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে, তখনই সেই খারাপ পরিস্থিতিকে ভালো কিছুর মাধ্যমে মোকাবিলা করতে শিখুন। সেই ভালোটা কী, তা-ও এরপরের আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে ধৈর্য। যখন এই গুণটি নিজের মধ্যে ধারণ করবেন, তখন দেখবেন, ওসব উটকো ঝামেলা আপনার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। জানের দুশমন হয়ে গেছে অন্তরঙ্গ বন্ধু!

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৫৪১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"যারা আল্লাহর আদেশমতো সম্পদ খরচ ও দান-খয়রাত করে না, সেসব লোকই পরকাল অস্বীকার করে।" এ-সূরার ৭ নং আয়াত এটি। মুশরিকদের ব্যাপারে এসেছে এই আয়াতটি। এখন, মনে একটা ভাবনা ঘুরপাক খায়—তাদের এত এত খারাপ বৈশিষ্ট্য থাকতে, পরকাল অস্বীকার করার সাথে সম্পদ খরচ করার কথা বলা হয়েছে কেন? ওই বিষয়ের সাথে এর কী সম্পর্ক? আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ করার বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হলো, ধন-সম্পদ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। এ জন্য বলা হয়ে থাকে, সম্পদ হলো রূহের সহোদর ভাই। জান কবজ করার সময় যেমন কষ্ট হয়, সম্পদ বের করতেও দেখা যায় অনেকের ওই একই অবস্থা। তাই কেউ যখন এত আদরের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তখন স্পষ্ট হয় যে, সে আখিরাতের ওপর বিশ্বাসী। আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকার কারণেই, দুনিয়াতে সে সম্পদ খরচ করছে। কিন্তু কেউ পরকালের প্রতি অবিশ্বাসী হলে, মনে করবে টাকাটা পানিতে ফেলা হয়েছে। এই আয়াতটি নিয়ে কি আমরা একটুও চিন্তাভাবনা করব না?

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৫/৩৪১)

এ-সূরার ২৬ নং আয়াতটি দেখুন—"যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে, তারা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শুনো না, বরং (কুরআন তিলাওয়াতের সময়) তোমরা শোরগোল করো, যাতে তোমরা জিততে পারো।'" আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যায়, যুগে যুগে বাতিল-পন্থিদের হাতিয়ার ছিল এটাই। যারা সত্য ও বাস্তব-জ্ঞানভিত্তিক কথা বলে, তাদেরকে প্রলোভন ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে মুখ বন্ধ করাতে চায়। কারণ, ওরা নিশ্চিত—এসব কথা পাবলিক শুনলে, ওদের দলে ভাটা পড়বে। তাই তারা তা যথাসম্ভব ঢেকে রাখে। বাজে কথা বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষকে সত্য সম্পর্কে জানার ও ভাবার ফুরসত দেয় না। ইস্যুর-পর-ইস্যু টেনে এনে সামনে হাজির করে। আর সেগুলো দিয়েই সবার মনোযোগ ফিরিয়ে রাখে অন্যদিকে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২০/৪১৭)

সূরা শূরা

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬২-তম সূরা। এর আগে সূরা হা-মীম সাজদা/ফুসসিলাত ও পরে সূরা যুখরুফ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা হা-মীম সাজদা/ফুসসিলাত ও পরে সূরা যুখরুফ।

এক নজরে শূরা

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৪২
- আয়াত: ৫৩
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘শূরা’ শব্দের অর্থ ‘পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া’। এ-সূরার ৩৮ নং আয়াতে মুমিনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো—তারা সামষ্টিক বিষয়ে হুটহাট করে সিদ্ধান্ত নেয় না। বরং নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে নেয়। সেখান থেকেই এই সূরার নাম হয়েছে ‘শূরা’। এর আরেকটি নাম হচ্ছে—সূরা হা-মীম-আইন-সীন-ক্বাফ। কারণ, এই পাঁচটি হরফ দিয়েই সূরাটি শুরু হয়েছে।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর অপার ক্ষমতা।

০২ দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি।

০৩ দাওয়াতের প্রতি সাড়াদান-কারীদের আলামত।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ্ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে, “যিনি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, মহাজ্ঞানী; মহাকাশে যা আছে আর যা আছে পৃথিবীতে—সবই তাঁর, তিনিই সমুন্নত, সুমহান।” আর শেষ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “আল্লাহ্র পথ, যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক; মনে রাখবে—আল্লাহ্র কাছেই সবকিছু ফিরে যাবে।” অর্থাৎ সূরার শুরু-শেষ মিলিয়ে পৃথিবী ও মহাকাশে আল্লাহ্র একক রাজত্বের ঘোষণা দেওয়া হলো।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো: সূরা হা-মীম সাজদা; যা শেষ করা হয়েছে ওহির আলোচনা দিয়ে—“দিগ্‌দিগন্তে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি আমার নিদর্শনগুলো তাদেরকে দেখাতে থাকব, যতক্ষণ-না তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়—এটাই সত্য।” আর সূরা শূরার শুরুতে আল্লাহ জানিয়েছেন, দুনিয়ায় আল্লাহর ওহি এভাবেই আসে।

শানে নুযূল

কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে কাফিররা নবিজির বিরোধিতা করত। এই বিরোধিতার মূলে ছিল তাদের নিজেদের খায়েশ পুরা করা। তারা চাইত, নিজেদের মন-মর্জি মতো চলার অবাধ স্বাধীনতা। আর ইসলামে প্রবেশ করলে তো এহেন স্বেচ্ছাচারিতা হারাতে হবে নিশ্চিত। যাই হোক, সেই বিরোধিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল—‘নবি হিসেবে কেন মানুষকে পাঠানো হলো?’ আর এই ধুয়া তুলে নবিজি যা-ই বলেন, তা-ই তারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়! তাই আল্লাহ্ এই সূরার মাধ্যমে কাফিরদের আকীদা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করতে চাইলেন। নবি হিসেবে মানুষ পাঠানো নতুন কোনো বিষয় না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু আল্লাহর জমিনে বাস করে অন্য কারও, অর্থাৎ মানুষের মনগড়া আইন মেনে নেওয়া—এটা তো পুরোপুরি অস্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ্ আসমান-জমিন সবকিছুর মালিক। তোমরা তাঁর করুণায় দুনিয়ার সবকিছু ভোগ করছো। আর বিধান মেনে নিচ্ছ অন্য কারও! এই অপরাধের জন্য আকাশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়লেও তো সেটা অবাক হবার বিষয় হবে না। রাসূলকে কেবল বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে তো আর আইনদাতা করে পাঠানো হয়নি। তিনি তো শুধু অতটুকুই বলেন, যতটুকু বলার অনুমতি আল্লাহ্ তাঁকে দেন। তা হলে তাঁর কথা মেনে নিতে এত আপত্তি থাকবে কেন? আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রমাণ তুলে ধরতে এ-সূরাটি নাযিল করেছেন। এ ছাড়া যারা এসব বিষয়কে অস্বীকার করে, তাদেরকে জানিয়েছেন শাস্তির সংবাদ।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৭/২৩০; তাফহীমুল কুরআন, ১৪/৪৪)

সেগমেন্ট

কুরআন অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা। আর যিনি স্রষ্টা, তিনিই তো তাঁর সৃষ্টির ক্যাটালগ ঠিক করে দেবেন। তাই তো আল্লাহ পাঠালেন কুরআন—'দ্য পারফেক্ট গাইডলাইন।'

দ্বীনের ব্যাপারে করণীয়

সামষ্টিকভাবে দ্বীন কায়েম করতে হবে, দ্বীনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা যাবে না।

কুরআন: উদ্দীপনা ও আলো

কুরআন মানুষের জন্য সুস্পষ্ট হিদায়াত। মানুষের হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার করে। আলো হয়ে তাদেরকে পথ দেখায়।

ফজিলত

এই সূরাটি হা-মীম যুক্ত সূরাগুলোর একটি। যেগুলোর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵄-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে : তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন।' তিনি বললেন, "'হা-মীম' যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ করো....।"

(আবু দাউদ, ১৩৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

রাসূল ﷺ যেভাবে ইসলামকে শিখিয়ে গিয়েছেন, ইসলামকে ঠিক সেভাবে প্র্যাকটিস করলে ও দাওয়াত দিলে;

আল্লাহ আমাদের জন্য দ্বীনের ওপর অটল থাকা সহজ করে দেবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

নীতির ধারাবাহিকতা ও আল্লাহর ক্ষমতা

১. সার্বজনীন বার্তার ধারাবাহিকতা
কুরআন নাযিল হয়েছে গোটা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। তবে আগেকার আসমানি কিতাবসমূহে মূল যে বার্তা ছিল, কুরআনেও তা এসেছে। সেটা হলো—আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা।

২. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বান্দার সীমাবদ্ধতা
সবকিছুর ওপর আল্লাহর রয়েছে একক কর্তৃত্ব। কিন্তু বান্দার রয়েছে হাজারো সীমাবদ্ধতা। মানুষ সর্বদা সম্পদ, ক্ষমতা আর প্রভাব- প্রতিপত্তির মুখাপেক্ষী। তবে সে ততটুকুই পাবে, যতটুকু আল্লাহ তার জন্য ভালো মনে করেন।

৩. পারস্পরিক সংলাপ ও সহযোগিতা
মুমিনরা সামষ্টিক বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। এর মাধ্যমে মুমিনদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

৪. বাধা এলেও অবিচল থাকতে হবে
আল্লাহর পথে চলতে গেলে বাধা আসবেই। তবে সেই বাধার মুখে অবিচল থাকতে হবে। বিনয়ের সাথে আল্লাহর আদেশ মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। এতে করে আল্লাহর সাহায্য আসবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
ধরার বুকে ওহির আগমন ও আল্লাহর মহত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে।	১-৬	আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর নীতি আগে থেকেই ঠিক করা আছে। নির্ধারিত সময়ে সবকিছু ঘটবে। নিয়ন্ত্রণ কেবল আল্লাহর হাতে।	২৮-৩৬
কুরআন বা ওহি নাযিলের উদ্দেশ্য হলো মক্কা ও এর চারিদিকের লোকদেরকে সতর্ক করা।	৭-১২	মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	৩৭-৪৩
সৃষ্টির শুরু থেকে একমাত্র ইসলামই আল্লাহর বাছাই করা দ্বীন। কিন্তু মানুষ তা বিকৃত করে হাজারো ধর্মের সৃষ্টি করেছে।	১৩-১৪	জাহান্নামিদের অবস্থার একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।	৪৪-৪৬
অবিচল থেকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার আদেশ এসেছে। সেই সাথে একগুঁয়ে কাফিরদের যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।	১৫-১৯	আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া ও তাঁর গভীর জ্ঞান বা হিকমাহ'র সামনে মাথা নোয়াবার আদেশ দেওয়া হয়েছে।	৪৭-৫০
বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের শেষ পরিণতি নিয়ে কথা বলা হয়েছে।	২০-২৭	ওহি পাঠানোর তিনটি স্টাইলের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।	৫১-৫৩

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে, তা দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-সামগ্রী; আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা সেসব লোকের জন্য উত্তম ও অধিক স্থায়ী—যারা (আল্লাহর পয়গামকে সত্য) বলে মানে ও নিজেদের রবের ওপর ভরসা রাখে।" এই আয়াত আমাদের সবার জন্য ভাবনার খোরাক জোগায়। এই দুনিয়ার ভোগ-বিলাস কি স্থায়ী? এগুলো কি আমার সাথে চিরজীবন থাকবে? মৃত্যুর পর আমার সাথে এগুলো কবরে যাবে? সবগুলোর উত্তর হলো 'না'! তা হলে কীসের পেছনে আমরা দিন-রাত এক করে, হন্যে হয়ে ছুটছি? অথচ মৃত্যুর পরের অনন্ত সময়ের ব্যাপারে আমরা একেবারেই বেখবর। সেখানে আমরা কীভাবে থাকব, সেখানে কী পাব না-পাব, ওসব নিয়ে আমাদের মোটেও দুশ্চিন্তা নেই। যত দুশ্চিন্তা সব এই দুনিয়াকে নিয়ে। তাই সময় এসেছে—জীবনের হিসাব-কিতাব খুলে বসার; আল্লাহর কাছে যেসকল উত্তম ও স্থায়ী পুরস্কার আছে, সেগুলোর যোগ্যতা অর্জন করলাম কি-না, সেটা ভেবে দেখার।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২০/৫২১; আবুস সাউদ, তাফসীর, ৮/৩৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"তোমরা যে-বিষয়েই মতবিরোধে লিপ্ত হও, তার চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহর কাছে।" এ-সূরার ১০ নং আয়াতে মুসলিম উম্মাহ কোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলে, কী করণীয় তা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো বিষয়ে একমত হলে তা পালন করা জরুরি। অর্থাৎ—এই উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তবে অবশ্যই তা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে। এই ব্যাপারে নবি ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মত কখনো ভ্রান্ত বিষয়ের ওপর একমত হবে না।" সুতরাং এখান থেকে শিক্ষা হলো—মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। সকল মুসলিম ভাইয়ের সাথে মিলেমিশে দ্বীনি কাজে শরিক থাকতে হবে।

(দেখুন—তিরমিযি, ২১৬৭)

আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করা যাবে কি না; সে সম্পর্কে ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ "তোমরা তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না।" এখানে কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেননি, وَلَا تَتَّبِعْ دِينَهُمْ "তোমরা তাদের দ্বীনের অনুসরণ করো না।" বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। আসলে সব নবি-রাসূলের আনীত দ্বীনের মূল-নির্যাস ছিল একই। তাই এখানে দ্বীন অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়নি। আসল বিষয় হলো, দ্বীনের নামে ওরা নিজেদের খেয়ালখুশি আর প্রবৃত্তির অনুসারী। তাই এই উম্মাহকে তাদের খায়েশের অনুসরণ করতে বারণ করা হয়েছে। বরং তাদেরই উচিত—ওসব ভণ্ডামি ছেড়ে এই উম্মাহকে-দেওয়া পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করা; যা সব গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৩/২৫)

সূরা যুখরুফ

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬৩-তম সূরা। এর আগে সূরা শূরা ও পরে সূরা দুখান নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা শূরা ও পরে সূরা দুখান।

এক নজরে যুখরুফ

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৪৩
- আয়াত: ৮৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

'যুখরুফ' শব্দের অর্থ 'স্বর্ণ; চাকচিক্যের উপকরণ'। আল্লাহ এই সূরার ৩৩-৩৫ নং আয়াতে আমাদেরকে জানালেন—সব মানুষ (লোভে পড়ে) আল্লাহর অবাধ্যতায় জড়াবে, এমন আশঙ্কা না-থাকলে তিনি কাফিরদেরকে অঢেল চাকচিক্যের উপকরণ দিতেন। তাদের ঘরদোর রুপা দিয়ে ভরিয়ে দিতেন। তো সেখানে ৩৫ নং আয়াতে ব্যবহৃত 'যুখরুফ' শব্দটি থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর নিয়ামাতসমূহ।

০২ মক্কাবাসীদের সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা।

০৩ কিয়ামাতের দিন বন্ধু পরিণত হবে শত্রুতে।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

নবুওয়াতের শুরুর দিকে কাফিরের দল নবিজিকে নিয়ে হাসি-তামাশা করত। সেই কাফিরদেরকে লক্ষ্য করে সূরাটির শুরুতে আল্লাহ বলেন, "তোমরা হলে অবাধ্যতায়-সীমা-ছাড়িয়ে-যাওয়া এক জনগোষ্ঠী; তাই বলে কি আমি (তোমাদেরকে) উপেক্ষা করে এই পয়গাম তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেব?" এই ধরনের উপদ্রব সৃষ্টিকারী লোকজনের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, তা ফুটে উঠেছে সূরাটির শেষ আয়াতে, "অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো, আর বলো, শান্তিতে থাকো!

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা শূরা। যার শেষভাগে বলা হয়েছে—আসমানি কিতাব হলো আলো। যা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। আর সূরা যুখরুফের শুরুতে আল্লাহ বলেন, "শপথ এই কিতাবের—যা (সঠিক পথ ও ভুল পথ) স্পষ্ট করে দেয়। আমি একে আরবি কুরআন বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো।"

শানে নুযুল

মুশরিকদের মূর্তিগুলোর বেশিরভাগই নারী আকৃতির। শাড়ি বা গয়নাগাটি পরিয়ে পুরো বিয়ের কনের মতন সাজ দিয়ে রাখে মূর্তিগুলোকে। মক্কার মুশরিকদের ধারণা ছিল—ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান। আর এই সন্তানগুলো সবাই নারী। অথচ মজার ব্যাপার হলো, তারা নিজেদের জন্য কোনোভাবেই কন্যা সন্তান পছন্দ করে না! একে তো আল্লাহর সন্তান থাকার প্রশ্নই ওঠে না, তিনি সমস্ত জৈবিক কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র। সেখানে তারা সন্তানের বোঝা চাপাচ্ছে তো চাপাচ্ছে, তা-ও আবার মেয়ে সন্তান! তারা আল্লাহকে উপাসনার যোগ্য মানে, আসমান-জমিনের মালিক হিসেবেও স্বীকার করে। কিন্তু শির্ক করার বেলায়ও পিছপা হয় না। মুশরিকদের কাজ-কারবার এমনই অদ্ভুত আর ঘোলাটে। শির্ক করতে নিষেধ করলে দ্রুত একটা যুক্তি খাড়া করে ফেলে—মূর্তিপূজা যদি খারাপ-ই হতো, তবে আল্লাহ আমাদেরকে তা করতে দিতেন না। তিনি না চাইলে আমরা কি এগুলো করতে পারতাম? যেন আল্লাহ নিজে মাটিতে নেমে এসে তাদেরকে নিষেধ করবেন! অথচ তিনি যে কুরআন ও রাসূল পাঠিয়েছেন, তাতে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

তখনকার কুরাইশ ও আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত এমন সব জাহিলিয়াত ও কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা করে এ-সূরাটি নাযিল করা হয়। তাদের এসব শয়তানি এমন নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে—যার মধ্যে ন্যূনতম বিবেক-বোধ আছে, মুশরিকদের এই অজ্ঞতা ও ধান্দাবাজি সে-ই ধরতে পারবে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাজমুদ দুরাদ, ১৭/৩৭৬; তাফহীমুল কুরআন, ১৪/৯৬)

সেগমেন্ট

কাফিরদেরকে বোঝানো

বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে সূরার প্রথম অংশে আল্লাহ কাফিরদেরকে বুঝিয়েছেন। নানাভাবে তাদেরকে ঈমানের পথে ডেকেছেন।

কিয়ামাতকে স্মরণ করানো

সূরার পরের অংশে এসে—পুরো মানব-জাতিকে আল্লাহ কিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিয়ামাতের বাস্তবতা তুলে ধরলেন স্পষ্ট করে।

রাসূল ﷺ-কে সান্ত্বনা

নানা বিপর্যয়ের মুখে নবিজি তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। সেই সাথে দাওয়াত যতদিন চলবে, ততদিন কাফিরদের ওপর তাঁকে দয়া দেখাতে বললেন।

ফজিলত

এই সূরাটি হা-মীম যুক্ত সূরাগুলোর একটি। যেগুলোর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে : তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন।' তিনি বললেন, "'হা-মীম' যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ করো....।"

(আবু দাউদ, ১৩৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করলে; → নিয়ামাতের পরিমাণ আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন আরও।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

সম্পদ, ক্ষমতা ও নেতৃত্বের নতুন সংজ্ঞায়ন

১. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ
জাহিলি যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ধারণাকে কুরআন চ্যালেঞ্জ জানায়। সাফ সাফ জানিয়ে দেয়—সম্পদ কখনো সম্মানের প্রতীক বা মাপকাঠি হতে পারে না।

২. পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ
আগেকার জাতিগুলোর একটা নীতি ছিল—যতকিছুই হোক, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের রীতিতেই অটল থাকবে। শিরককে আঁকড়ে ধ্বংসের পথে পা বাড়াবে। আজকের দুনিয়ার মানুষের জন্য এটি বড় একটি শিক্ষা।

৩. নেতৃত্বের যোগ্যতা
সম্পদ যার হাতে, নেতৃত্বের অধিকারও তার—বহুকাল ধরে এই জাহিলি রীতি মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—সম্পদ নয়, নেতৃত্বের ভিত্তি হবে নৈতিকতা।

৪. সম্পদ ও ক্ষমতা পরীক্ষার উপকরণ
সম্পদ ও ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেন। তিনি দেখতে চান—এই সম্পদ ও ক্ষমতাকে মানুষ কোন পথে ব্যবহার করে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআনের মর্যাদা ও রাসূলদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করার শাস্তি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই না।	১-৮	মুসা ﷺ ও ফিরআউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।	৪৬-৫৬
মহাকাশ ও পৃথিবীর মালিক আল্লাহ—মুশরিকরাও এই স্বীকৃতি দেয়!	৯-১৪	নবি ঈসা ﷺ-এর কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।	৫৭-৬৬
তবে সত্যিকারের ইলাহ ঠিক করার ক্ষেত্রে তারা বিভ্রান্তি ও চরম মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে।	১৫-২৫	বিচার-দিবসে আছে মুমিন বান্দাদের ওপর আল্লাহর রহমত-বর্ষণের নিশ্চয়তা।	৬৭-৭৩
কাকে নুবুওয়াত দেওয়া যায় বা কাকে কতটুকু রিযিক দিতে হবে, এসব বিষয় আল্লাহর জ্ঞানের পরিধিতে আছে।	২৬-৩৫	সেদিন পাপী আর সীমা-লঙ্ঘনকারীদের যে অবস্থা হবে, তার খণ্ডদৃশ্য দেখানো হয়েছে।	৭৪-৮০
যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে রাসূলকেও দেওয়া হয়েছে সান্ত্বনা।	৩৬-৪৫	মহান আল্লাহর কোনো সন্তানাদি কিংবা সঙ্গী নেই। এসব গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি পবিত্র।	৮১-৮৯

কেইস-স্টাডি

কিয়ামাতের ভয়াবহতা হবে ভীষণ তীব্র। এটি পুরো মানব-জাতিকে স্তব্ধ করে দেবে। একটিমাত্র নেকির আশায় মানুষ ছুটে বেড়াবে পাগলের মতন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো—সেদিন সবাই একে-অন্যের থেকে লুকাবে। 'না-জানি সে আবার আমার কাছে নেকি চেয়ে বসে! আমি নেকি পাব কোথায়? আমারই তো বেহাল দশা!' হাশরের ময়দানে এই হবে দুর্দশার চিত্র। আল্লাহ তাআলা এই সূরার ৬৭ নং আয়াতে বলেন, "তখন তো অন্তরঙ্গ বন্ধুও পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে।" তবে এখানে ব্যতিক্রমও আছে। সবাই ঠিক এভাবে পালাবে না, বা নেকির জন্য হুড়োহুড়িও করবে না। সেই ব্যতিক্রমের কথা এই আয়াতেই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—"...ব্যতিক্রম থাকবে কেবল সেসব লোক—যারা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে।" তার মানে মোদ্দাকথা হলো: কিয়ামাতের সেই ভয়াবহতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে, আল্লাহর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ নির্দ্বিধায় মাথা পেতে নিতে হবে।

(দেখুন—ইবনুল জাওযি, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, ৪/৮২)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

যেকোনো যানবাহনে; যেমন অটোতে, রিক্সায়, বাসে বা ট্রেনে ওঠার সময় পড়ার একটা দুআ আছে—سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ "পবিত্র তিনি, যিনি এগুলোকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আমরা তো নিজে থেকে এগুলো নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতাম না, আর আমাদের রবের কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" দুআটি এ-সূরার ১৩-১৪ নং আয়াত থেকে নেওয়া। দুআর শেষটুকু দেখুন—"আর আমাদের রবের কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে"। কোথাও সফরে বের হওয়ার পর এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আছে। আর তা হলো, আমরা যেন ছোট ছোট সফরগুলোতেও আমাদের মহা-সফর—অর্থাৎ আখিরাতের দিকে যাত্রার কথা ভুলে না যাই। দুনিয়াতে সামান্য সফরের জন্য আমরা যেমন প্রস্তুতি নিয়ে থাকি, তেমনি আখিরাতের সেই বিশাল সফরের জন্যও প্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৫৬৬)

আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে প্রথমে কোমল আচরণ করেন। ফিরআউনকে দাওয়াত দিতে পাঠানোর সময় মুসা ও হারুন ﷺ-কে তিনি নির্দেশনা দিয়েছিলেন—তার সাথে কোমল কথা বলবে। কিন্তু ফিরআউন সেসবের তোয়াক্কা না করে দিনের-পর-দিন আল্লাহর অবাধ্যতা করে গিয়েছে। অবশেষে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেছেন। এ-সূরার ৫৫ নং আয়াত বলছে: "এরপর তারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুললে আমি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিই এবং তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিই।" এখানে মনোযোগ দেওয়ার বিষয় হলো 'তারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুললে'—এই শব্দগুলো। হয়তো লম্বা একটা সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ পাপের শাস্তি দিচ্ছেন না—এটা দেখে আরও বেশি পাপ করার পশুবৃত্তি যেন জেগে না ওঠে। কারণ, আল্লাহকে ক্ষুব্ধ করলে রেহাই নেই। ধ্বংস আসবেই। মনে রাখবেন—আল্লাহ ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না।

(দেখুন—ইবনু আবী হাতিম, তাফসীর, ১০/২৮৪; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৪২২০)

সূরা দুখান

سُوْرَةُ الدُّخَانِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬৪-তম সূরা। এর আগে সূরা যুখরুফ ও পরে সূরা জাসিয়া নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪৪ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা যুখরুফ ও পরে সূরা জাসিয়া।

এক নজরে দুখান

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৪৪
- আয়াত: ৫৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

'দুখান' শব্দের অর্থ 'ধোঁয়া'। কিয়ামাতের আগে আগে আকাশ জুড়ে দেখা দেবে ধোঁয়া আর ধোঁয়া—ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কিয়ামাতের আলোচনায় এ-সূরার ১০ নং আয়াতে এ-শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সেখান থেকেই এই সূরার নামকরণ হয় 'দুখান'।

মেজর থিম

০১ নির্ভেজাল কিতাব আল-কুরআন নাযিল।

০২ ইতিহাস থেকে শিক্ষা: তুব্বা জাতির ধ্বংস।

০৩ পাপী ও আল্লাহভীরু: বিপরীতমুখী পরিণতি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুর দিকে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অপেক্ষা করতে বলেছেন, "সুতরাং সেদিনের জন্য অপেক্ষা করো, যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী নিয়ে হাজির হবে।" আর সূরাটির শেষ অংশেও পাওয়া যায় একই আদেশ, "অতএব, (এ-পয়গাম গ্রহণ-বর্জনের পরিণতি দেখার জন্য) তুমি অপেক্ষা করো, তারা তো অপেক্ষা করছেই!"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা যুখরুফ; যা শেষ হয়েছে এই বাণী দিয়ে : "অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো, আর বলো, 'শান্তিতে থাকো!' ক'দিন পরেই এরা (এর পরিণতি) জানতে পারবে।" এ-রকমই আরেকটি সাবধান-বাণী দিয়ে শুরু হলো সূরা দুখান— "(কুরআনের মাধ্যমে) আমি (মানুষকে) সাবধান করে দিচ্ছি।"

শানে নুযুল

মক্কার কাফিররা কোনোভাবেই কথা শুনছে না। বরং কতদিক দিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করা যায়, সে-পথই খুঁজে বেড়ায় দিন-রাত। ওদিকে নবিজিও দেখলেন—এরা তো কোনো কথাই শুনছে না। আর শুনবে, তেমন আশাও নেই। কিন্তু এভাবে ঈমান না-নিয়ে কবরে গেলে তো ভীষণ বিপদে পড়বে এই লোকগুলো! রাসূল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ, আল্লাহ তো তাকে বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। তার উম্মতের বিরাট একটা অংশ জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, এটা তিনি সহ্য করবেন কী করে? তখন একটা বিষয় নিয়ে বেশ ভাবলেন তিনি। এই অবাধ্য কাফিরদের চাপে ফেললে বা সাময়িক কোনো আযাব দিলে, হয়তো তাদের মন নরম হবে। এরপর আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এরা। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে নবিজি দুআ করলেন—হে আল্লাহ, নবি ইউসুফের সময় লোকদের ওপর যে-রকম দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন, আমার জাতির ওপরও তেমন একটা দুর্ভিক্ষ দিন। এতে করে তারা ঈমান আনতে পারে। আল্লাহ তার দুআ কবুল করলেন। মক্কাবাসীর ওপর নেমে এল চরম দুর্ভিক্ষ। আর সে-সময়ে এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এই সূরাটি নাযিল হয়। মুশরিকরা যে সাময়িক সময়ের জন্য নমনীয় হবে, এবং বিপদ কেটে গেলেই আগের মতো আচরণ শুরু করবে—এই সূরায় আল্লাহ সেটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

(দেখুন—বুখারি, ১০০৭, ৪৮০৯, ৪৮২১, ৪৮২২; মুসলিম, ২৭৯৮; আহমাদ, ১/৩৮০–৩৮১)

সেগমেন্ট

কুরআন ও আল্লাহর পরিচয়

এই সূরার শুরুতেই আল্লাহ কুরআনের সত্যতা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তাঁর ক্ষমতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

অবিশ্বাসীরা খেলায় মজে আছে

পরবর্তী অংশে কাফিরদের চিন্তা-চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে—কাফিররা আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহে ভুগছে ও তাদের অবিশ্বাস নিয়ে স্রেফ খেলায় মেতে আছে।

হুমকি

যারা এ-ধরনের খেলায় মজে আছে, তাদেরকে সূরার শেষ অংশে হুমকি দেওয়া হয়েছে—কিয়ামাত ও এর বিভীষিকা সামনেই অপেক্ষা করছে। তৈরি আছে জাহান্নামের শাস্তিও।

ফজিলত

নবি ﷺ এক রাকআতে মাঝে মাঝে একই রকমের দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। এরকমভাবে জোড়া মিলিয়ে তিনি এক রাকআতে তিলাওয়াত করতেন—সূরা দুখান ও সূরা তাকভীর।

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

যখনই নতুন কোনো জায়গায় যাবেন, চেষ্টা করবেন—সেখানে অন্তত দু'রাকআত নামাজ পড়ে নিতে;

ফলে সেই জায়গাটি ইবাদাতের চিহ্ন হিসেবে বিচার দিবসে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মানব জীবনে ওহির প্রভাব

১. পথপ্রদর্শন ও ইতিহাস গঠনে ওহির ভূমিকা

মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতেই ওহি নেমে আসে এই জগতে। আর এই ওহির মাধ্যমে মানুষ নিজেদের পরিবর্তন করে, সেই সাথে মোড় ঘোরে ইতিহাসের।

২. ওহির প্রকৃতি

আল্লাহর বাণী চিরসত্য। যদিও এখন মানুষ অস্বীকার করে চলেছে, কিন্তু 'দুখান' বা কিয়ামাত ঘটবার সময়কার ধোঁয়া দেখার সাথে সাথে তাদের হুঁশ ফিরবে।

৩. করুণা ও বিদ্রোহ: প্রসঙ্গ ফিরআউন

ফিরআউন আল্লাহর অবাধ্যতা করলেও, আল্লাহ তাকে সাথে সাথে ধ্বংস করেননি। বরং বেশ কয়েকবার তাকে সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু সে কোনো সুযোগই কাজে লাগায়নি।

৪. কুরআনের বার্তা: গ্রহণ-বর্জনের পরিণাম

কুরআনকে আল্লাহ সহজ করে নাযিল করেছেন। যারা এর বাণীকে গ্রহণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তারাই হবে সফল। আর একে ত্যাগ করার মানে হলো—দু'জাহানেই ব্যর্থতা।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
বিস্ময়কর কুরআন নাযিল হয় এক বরকতময় রাতে (অর্থাৎ লাইলাতুল কদরে)।	১-৬	মুশরিকদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে—ফিরআউন ও তার দলবলের পরিণতি কেমন ছিল।	১৭-৩৩
আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। অতি অল্প কথায় তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার একটি চিত্র আঁকা হয়েছে।	৭-৮	পুনরুত্থানের প্রতি মুশরিকদের অবিশ্বাস এবং পরকালে তাদের পরিণতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।	৩৪-৫০
কুরআনের দিকে আহ্বান ও এ-ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান দেখানো হয়েছে।	৯-১৬	বিচার-দিবসে মুত্তাকী তথা সৎকর্মশীল লোকদের পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।	৫১-৫৯

কেইস-স্টাডি

"আমি মহাকাশ, পৃথিবী ও এ-দুয়ের মাঝখানে যা আছে, সেগুলো খেল-তামাশার জন্য সৃষ্টি করিনি। এগুলো সৃষ্টি করেছি যথাযথ উদ্দেশ্য সামনে রেখে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।" এই সূরার ৩৮-৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ এই কথাটুকু জানিয়ে দিলেন। এই যে বিরাট আকাশ, লক্ষ-কোটি তারার মেলা, সবুজ-অরণ্যে-ঘেরা সুন্দর পৃথিবী—মহামহিম

আল্লাহ কি এগুলো এমনি এমনি সৃষ্টি করেছেন? না, তিনি এগুলোকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। বরং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশ, পৃথিবী ও এর মাঝের তাবৎ কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্যটি হলো—পরকালে মানুষের কৃতকর্মের বদলা দেওয়া। যারা তাদের দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করেছে, তাদেরকে সেদিন আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন। আর যাদের জীবন কেটেছে আল্লাহর অবাধ্যতায়, তাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে ভীষণ শাস্তি। তাই এই আয়াতটি আমাদের সকলের জন্য কেইস-স্টাডির বিষয়। আল্লাহ যে উদ্দেশ্য নিয়ে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আমরা যেন সেই উদ্দেশ্যকে নিজের মধ্যে ধারণ করি। আর সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাই প্রতিটি পদক্ষেপে।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৬/১৪৭; মাওয়ারদি, তাফসীর, ৫/২৫৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কাফির ও অবাধ্য জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর পরের একটি চিত্র আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ-সূরার ২৯ নং আয়াত—"তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে আকাশ কাঁদেনি, জমিনও কাঁদেনি!" এখান থেকে বোঝা যায়—কারও কারও মৃত্যুতে আকাশও কাঁদে, জমিনও কাঁদে। কিন্তু এর কারণ কী? যখন এমন কেউ মারা যায়; যারা আমাদের জন্য ভালো কিছু করে, যাদের আচার-আচরণে আমরা মুগ্ধ হই—তাদের কারও মৃত্যুতে আমরা কান্না করি। ঠিক তেমনি কেউ যখন জমিনের একটা অংশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, যিকির করে, কুরআন পাঠ করে, তখন সেই অংশটুকু ওই ব্যক্তিকে ভালোবাসে। বারবার সালাত আদায়ের কারণে ওই ব্যক্তির সাথে ওই জায়গাটার একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়। আকাশের যে অংশটুকু দিয়ে তার নেক আমল ওপরে ওঠে, সে-অংশটুকু তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। তাকে পছন্দ করে। তাদের মাঝে তৈরি হয় নিবিড় বন্ধন। এরপর সেই ব্যক্তিটি যেদিন মারা যায়, সেদিন থেকে জমিনেও তার সালাত আদায় বন্ধ হয়, আকাশেও ওঠে না আর কোনো নেক আমল। এই কারণে জমিন আর আকাশ উভয়েই শোকাতুর হয়। এই কান্না বিচ্ছেদের কান্না। অপরদিকে পরকালের প্রতিদানের ব্যাপারে কাফিরের কোনো মাথাব্যাথা নেই। তাই সে ভালো কাজের ধার ধারে না। ফলে আসমান-জমিনের কোথাও তার জন্য একফোঁটা সহমর্মিতাও সৃষ্টি হয় না। তারা বরং কাফিরের মৃত্যুতে খানিকটা খুশিই হয়। কারণ, তাদের খারাপ আমলগুলো আর দুর্গন্ধ ছড়াবে না অন্তত। তাই আমাদেরও ভাবা দরকার—যখন আমরা থাকব না, মৃত্যু এসে যখন আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়বে, তখন কি আসমান-জমিন কাঁদবে আমাদের জন্য? আমরা কি তাদের কান্না করার মতো উপকারী কিছু করছি? নাকি আমাদের মৃত্যুতে চারপাশে খুশির একটা আবহ তৈরি হবে, যেভাবে দাগি-আসামির চলে যাওয়াতে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে?

(দেখুন—তিরমিযি, ৩২৫৫; বাগাবি, তাফসীর, ৭/২৩২; আবু ইয়ালা, ৪২৩৩)

সূরা জাসিয়া سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬৫-তম সূরা। এর আগে সূরা দুখান ও পরে সূরা আহকাফ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা দুখান ও পরে সূরা আহকাফ।

এক নজরে জাসিয়া

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৪৫
- আয়াত: ৩৭
- মাক্কি

নামের রহস্য

'জাসিয়া' শব্দের অর্থ 'হাঁটু-গেড়ে বসে থাকা'। কিয়ামাতের দিন মানুষ আল্লাহর সামনে হাঁটু-গেড়ে বসে থাকবে। ঠিক যেমন বিচারকের সামনে বিচারপ্রার্থী ব্যক্তি নতজানু হয়ে রায়-ঘোষণার প্রহর গুনতে থাকে। এ-সূরার ২৮ নং আয়াতে এই বিষয়টি আল্লাহ আমাদেরকে জানান। তো সেই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'জাসিয়া' থেকেই এই নামটি দেওয়া হয়েছে।

মেজর থিম

০১. ওহি : আল্লাহর বিরাট নিদর্শন।

০২. কাফিরদের বৈশিষ্ট্য।

০৩. বিচার দিবসে কাফিরদের অবস্থা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহর দুইটি গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—"এ-কিতাব ধীরে ধীরে নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।" তাঁর এই দুইটি গুণের কথা এসেছে সূরার শেষ আয়াতেও—"মহাকাশ ও পৃথিবীতে রাজকীয় ক্ষমতার মালিক তিনিই; তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা দুখান; যা কুরআনের আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে: "আমি এই কুরআন তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" সূরা জাসিয়াও শুরু হয়েছে কুরআন মাজীদের আলোচনা দিয়েই—"এ-কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে...।"

শানে নুযুল

কাফিররা বলত—আল্লাহ আবার এক হয় কী করে! শেষ দিককার ধর্ম—অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মেও তো এমন কথা শুনিনি যে, আল্লাহ এক। তারা আরও বলত—মরণের পর আর কোনো জীবন নেই। আমাদেরকে আর জাগতে হবে না। বিচার-আচারও হবে না। এগুলো সব বানোয়াট। আমাদের আত্মার অস্তিত্ব মৃত্যুর পর বিলীন হয়ে যাবে। সবাই কালের গর্ভে চিরতরে হারিয়ে যাব একদিন। এভাবে তারা তাওহীদ ও আখিরাতকে পুরোপুরি অস্বীকার করত। রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তুলে ধরত নানা আপত্তি, আর ভ্রান্ত সব যুক্তি। তাওহীদের ও আখিরাতের ওপর তাদের এই সন্দেহ-সংশয় দূর করতে এই সূরা নাযিল হয়। আল্লাহ এখানে চমৎকার সব যুক্তি তুলে ধরেছেন। তাওহীদ ও আখিরাত যে চরম সত্য, সে ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন বারংবার। তার পরও যারা মুখ ফিরিয়ে রাখবে বা এসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে, তাদেরকে দিতে হবে চড়া মূল্য।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৮/৫৮)

সেগমেন্ট

আল্লাহর নিদর্শন ও সতর্কতা

পৃথিবীতে আল্লাহর অগণিত নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করলে আল্লাহর ওপর ঈমান আনা সহজ হয়। তবু যারা দেখেও দেখে না, তাদের জন্য আছে মহা-শাস্তি।

দুটি দল দুই পথে

আল্লাহর অবাধ্য ও আল্লাহর অনুগত। পুরো পৃথিবী এই দুই দলে ভাগ হয়ে আছে। দুটি দলের পরিণতিও যে দু-রকম, সে-দৃশ্য সূরার দ্বিতীয় অংশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ

আসমান-জমিন সবখানেই সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। প্রশংসা, মহানুভবতা, অপার ক্ষমতা—এ সবই একমাত্র তাঁরই।

ফজিলত

সূরা জাসিয়া হা-মীম যুক্ত সূরাগুলোর একটি। যেগুলোর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵄-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে : তিনি বলেন, ‘এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন।’ তিনি বললেন, “‘হা-মীম’ যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ করো....।”

(আবু দাউদ, ১৩৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কাফিররা আখিরাতকে ভুলে দুনিয়ার সুখে মজে থাকে; → তাই আখিরাতে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে থাকবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
আল্লাহর জ্ঞান বনাম মানুষের জ্ঞান

১. ওহির জ্ঞান ছাড়া মানুষ আলোহীন
মানুষ নিজেকে যত বড় পণ্ডিতই ভাবুক না-কেন, ওহির আলোয় আলোকিত না হলে, তার হৃদয় থাকবে সব সময় আঁধারে ঢাকা।

২. জ্ঞানগত সংকট বিপথে নিয়ে যায়
জ্ঞানের সংকট মানুষকে আল্লাহর নিদর্শনের ব্যাপারে ভাবতে উৎসাহিত করে না। বরং দুনিয়াবি চিন্তা-চেতনা বা সেক্যুলারিজমের আদর্শকে মস্তিষ্কে গেঁথে দেয়।

৩. মানব-সৃষ্ট-মূল্যবোধের অসারতা
সেক্যুলারিজমের দর্শনই হলো—এই জীবনের পর আর কোনো জীবন নেই, নেই কোনো হিসেব-নিকেশ। তাই দুনিয়াতে চলবার জন্য তারা নিজেদের আইন নিজেরাই বানিয়ে ফেলে। এভাবে আল্লাহর দেখানো পথ থেকে তারা বহুদূরে চলে যায়।

৪. পরকালে আসল সত্য প্রকাশ
কিয়ামাতের দিন তাদের এই দর্শন ভুল প্রমাণিত হবে। তারা হাড়ে হাড়ে টের পাবে—দুনিয়াই শেষকথা নয়, আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। সেদিন তাদের জন্য থাকবে ভয়ানক শাস্তি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআন হলো মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বাণী। আর তাঁর ওপর ঈমান আনতে প্রাণীজগতের সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে চিন্তা করাই যথেষ্ট।	১-৪	নিজের মনকেই খোদা বানিয়ে ফেলার পরিণতি—পথভ্রষ্টতা, কান ও অন্তরে সিলমোহর, আর চোখের ওপর পর্দা।	২০-২৩
বিবেকবানদের জন্য অনেক শিক্ষা আশেপাশেই ছড়িয়ে আছে। তারপরও আল্লাহকে অস্বীকার করলে, পরিণামে আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	৫-৮	বস্তুবাদীরা বলে, মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই। তারা মহাকালের আবর্তে হারিয়ে যাবে। এসব অনুমান-নির্ভর কথাবার্তা।	২৪-২৭
কাফিররা আল্লাহর বাণী নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। অথচ পরকালে তাদের বানোয়াট ঈশ্বরেরা কোনো কাজেই আসবে না।	৯-১১	আল্লাহর করুণার মধ্যে ঠাঁই পাওয়াটাই হলো আসল সফলতা। সফল হতে হলে, ঈমান এনে ভালো ভালো কাজ করতে হবে।	২৮-৩০
আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সবকিছু মানুষের জন্য বানিয়েছেন। ভালো কাজের পরিণাম ভালো, আর মন্দের ফল মন্দ।	১২-১৫	কাফিররা দুনিয়ার মজা-মাস্তিতে বুঁদ হয়ে থাকে। তারা বেমালুম ভুলে যায় আখিরাতের কথা।	৩১-৩৪
জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করলেও, ইহুদিরা হয়েছে অহংকারী। অমুসলিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু।	১৬-১৯	কাফিরদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেখান থেকে তাদেরকে বের করা হবে না। আল্লাহই সকল ক্ষমতার পরাক্রমশালী মালিক।	৩৫-৩৭

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ১২-১৩ নং আয়াতে এসেছে, “আল্লাহই তোমাদের কল্যাণে সমুদ্রকে অনুগত করে রেখেছেন—যাতে সেখানে তাঁর আদেশে জাহাজ চলতে পারে, তোমরা তাঁর কিছু করুণা খুঁজে নিতে পারো। মহাকাশে যা আছে, আর যা আছে পৃথিবীতে—সবকিছু তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের কল্যাণে অনুগত করে রেখেছেন; যারা গভীরভাবে চিন্তা করে, তাদের জন্য এতে অনেক শিক্ষা রয়েছে।” সমুদ্রের অথই জলে জাহাজ চলতে পারে কেবল আল্লাহর ইচ্ছাতেই। না হলে নানা বিপর্যয়ের মুখে প্রতিনিয়ত জাহাজ-ডুবির ঘটনা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। সমুদ্রের মাছ আর খনিজ সম্পদও কিন্তু আল্লাহর বিশাল এক নিয়ামাত। এবার প্রশ্ন—কী শিক্ষা আছে এখানে? আসলে আল্লাহ এগুলো সবই মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এত এত নিয়ামাতের বিপরীতে বান্দার করণীয় কী? আল্লাহ চান, এই সবকিছুর কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ আমরা কেবল তাঁরই আনুগত্য করি। কেবল তাঁকেই একমাত্র রব হিসেবে মেনে নিই। ব্যস! আর কিছু না। তাই এই আয়াত দুটো নিয়ে আমাদের গবেষণা ও স্টাডি করা উচিত।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৭/২৪২)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

“যারা (আল্লাহর পয়গামকে) সত্য বলে মানে, তাদের জন্য মহাকাশ ও পৃথিবীতে অনেক শিক্ষা রয়েছে। যেসব লোক সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে তোমাদের সৃষ্টি ও (দুনিয়া-জুড়ে) তাঁর-ছড়িয়ে-দেওয়া প্রাণীকুলের মধ্যে। আর রাত ও দিনের পালাবদল, আকাশ থেকে আল্লাহর-পাঠানো জীবিকা—যার মাধ্যমে তিনি জমিন নিষ্প্রাণ হয়ে যাওয়ার পর তাতে প্রাণ-সঞ্চার করেন—ও বিভিন্ন দিক থেকে বায়ুর প্রবাহ: এগুলোতে সেসব লোকের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে, যারা বিবেক খাটায়।” এ-সূরার ৩-৫ নং আয়াতে তাওহীদের ছয়টি দলিল রয়েছে, যেগুলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও পরিপূর্ণ কুদরত এবং তিনিই যে ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার, তার প্রমাণ বহন করে। দলিলগুলো হলো: (১) আসমান-জমিন সৃষ্টি, (২) মানুষ সৃষ্টি, (৩) প্রাণীকুল সৃষ্টি, (৪) দিন-রাতের পালাবদল, (৫) আসমান থেকে পানি বর্ষণ ও এর মাধ্যমে মৃত জমিনকে জীবিত করা, এবং (৬) বাতাস প্রবাহিত করা।

(দেখুন—শানকিতি, তাফসীর, ৭/৩৫১)

এ-সূরার ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: “যারা খারাপ কাজে লিপ্ত, তারা কি ভেবেছে—আমি তাদের জীবন ও মৃত্যুকে সেসব লোকের (জীবন ও মৃত্যুর) মতো বানিয়ে দেবো, যারা ঈমান এনে ভালো কাজগুলো করে যাচ্ছে?” ভালো লোক আর খারাপ লোকের চলাফেরা, ওঠাবসা, জীবনযাপন; সবই আলাদা। বিপরীতমুখী। একজন মানুষের ওপর জুলুম-অত্যাচার করে, জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়। অন্যজন অভাবীদেরকে খাবার খাওয়ায়, নিপীড়িত মানুষদের সাহায্য করে। একজন নিজের মনমতো জীবন কাটায়, আরেকজন রবের দেওয়া বিধানে জীবন সাজায়। দুনিয়ার বিচারে হয়তো দুজনের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য দেখা যাবে না। কিন্তু আখিরাতে দু'জনার পথ হবে দুদিকে—একজন থাকবে জাহান্নামে, ভয়ানক শাস্তির ভেতর; আরেকজন থাকবে জান্নাতে, অফুরন্ত শান্তি-সুখে সন্তুষ্ট অবস্থায়।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৫১১)

সূরা আহকাফ

سُوْرَةُ الْأَحْقَافِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬৬-তম সূরা। এর আগে সূরা জাসিয়া ও পরে সূরা যারিয়াত নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা জাসিয়া ও পরে সূরা মুহাম্মাদ/কিতাল।

এক নজরে আহকাফ

- মাক্কি যুগের শেষ-দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৪৬
- আয়াত: ৩৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘আহকাফ’ শব্দটি ‘হিকফ’-এর বহুবচন; যার অর্থ ‘সুউচ্চ বালিয়াড়ি’। তবে এ-বালিয়াড়ি পাহাড়ের মতন অতটা উঁচু নয়। খুব সম্ভবত এই জায়গাটির অবস্থান ছিল ওমান, ইয়ামান ও হাদরামাউতের মাঝামাঝি কোথাও—যেখানে বসতি ছিল আদ জাতির। এ-সূরার ২১ নং আয়াতে আদ জাতির অবস্থান বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেখান থেকে এই সূরার নাম হয়েছে ‘আহকাফ’।

মেজর থিম

০১ মূর্তির অসারতা।

০২ মুমিনদের দুআ।

০৩ জিন জাতির ঈমান গ্রহণ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে কাফিরদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন, "অথচ কুফরে-লিপ্ত লোকদেরকে যেসব বিষয়ে সাবধান করা হচ্ছে, সেগুলো থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রাখছে!" অন্যদিকে সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ তাদের পরিণতি নিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন—"তাদেরকে বাদ দিয়ে কি অন্যদেরকে ধ্বংস করা হবে?" অর্থাৎ সূরার শুরু-শেষ মিলিয়ে কাফিরদের কর্মকাণ্ড ও পরিণতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা জাসিয়া; যার শেষ অংশে মুশরিকদেরকে তিরস্কার ও শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আবার সূরা আহকাফও শুরু হয়েছে ঠিক একই রকম আলোচনা দিয়ে।

শানে নুযূল

তিন বছরের টানা অবরোধ শেষে সবেমাত্র রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা মুক্তি পেয়েছেন। আর এমন সময়েই নবিজির চাচা আবু তালিব ও তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন খাদিজা رضي الله عنها ইন্তেকাল করেন। তাদের মৃত্যুশোকে নবিজি বেশ মুষড়ে পড়েন। ওদিকে কাফিররা তখন আরও সাহস পেয়ে যায়। নবিজিকে খুব বেশি যন্ত্রণা দিতে থাকে। তাই তিনি তায়েফ গেলেন। উদ্দেশ্য—বনু সাকীফ গোত্রকে দ্বীনের দাওয়াত দেবেন। তারা দাওয়াত গ্রহণ তো করলই না; বরং নবিজিকে রক্তাক্ত করে বের করে দিলো। হতাশ হয়ে সেখান থেকে ফিরতে লাগলেন নবিজি। শারীরিক-মানসিক কষ্টে সে-মুহূর্তে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পথ চলতে চলতে তাই 'নাখলা' নামক একটা জায়গায় থামেন। সেখানে অবস্থান করার সময়ে এক রাতে নামাজের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন নবিজি। আর ওই মুহূর্তেই সেখান দিয়ে জিনদের একটি দল যাচ্ছিল। রাসূলের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে থমকে দাঁড়াল তারা। মনোযোগ দিয়ে শুনল রাসূল ﷺ-এর তিলাওয়াত। এরপর নবিজির ওপর ঈমান এনে তারা নিজ জাতির কাছে ফিরে যায়। নবিজির দাওয়াত কিছু মানুষ ফিরিয়ে দিলেও, জিনেরা তা গ্রহণ করেছে ও নিজ জাতির কাছে প্রচার করেছে—আল্লাহ তাআলা এ সুসংবাদটি নবিজিকে জানিয়ে দিতেই এই সূরার কিছু অংশ নাযিল করেন।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৭/২৬৫; হাকিম, ২/৪৫৬)

সেগমেন্ট

মুশরিকদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা

মুশরিকরা মূর্তির উপাসনা করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে ওদের দৃষ্টিভঙ্গি জঘন্য। ওদের কাজ-কর্মের সামগ্রিক চিত্র সূরার শুরুতেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

হূদ ﷺ ও তাঁর জাতি

হূদ ﷺ-এর জাতি নিজেদের নবি ও আল্লাহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে ভীষণ আযাবের মুখোমুখি হয় তারা। এই ঘটনা মক্কার মুশরিকদের জন্য ছিল একটি রিমাইন্ডার।

জিন জাতি

সূরার শেষ দিকে দেখানো হয়—রাসূলের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে জিন জাতির উপলব্ধি—'অবশ্যই এই বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।' এরপর তারা নবিজির ওপর ঈমান আনে।

ফজিলত

এই সূরাটিও হা-মীম যুক্ত সূরাগুলোর একটি; যেগুলোর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে : তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন।' তিনি বললেন, "'হা-মীম' যুক্ত তিনটি সূরা পাঠ করো....।"

(আবু দাউদ, ১৩৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দুনিয়ার সময়সীমা যেহেতু নির্ধারিত; → তাই জীবন ফুরিয়ে যাবার আগেই ভালো কাজগুলো করে নিতে হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মানুষের বড়াই, আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কতা

১. মানুষের দাপট: অতীতকে ফিরে দেখা

মানুষ যদি অতীতের দিকে একটু চোখ ফেরায়, তা হলেই বুঝতে পারবে—দাপট কতটা ক্ষণস্থায়ী। অতীতের কত বীর-পালোয়ান জাতি ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে!

২. মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও সত্য-বিমুখতা

মানুষ স্বভাবগতভাবেই অকৃতজ্ঞ। তাই স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও সে আল্লাহকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস দেখায়।

৩. অবাধ্যতার পরিণতি

অতীতে যেসকল জাতি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে এগিয়ে গিয়েছে, তারাই নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবেছে। ভেবেছে, আমাদের আর রবের কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের এই চিন্তা-চেতনা তাদেরকে ভীষণ বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়।

৪. সত্য-মিথ্যার মনস্তাত্ত্বিক লড়াই

নবি-রাসূলগণ মানুষকে ডাকেন চিরস্থায়ী সফলতার দিকে। আর পথভ্রষ্ট লোকেরা ডাকে ক্ষণস্থায়ী অর্জনের দিকে। এই দুই পক্ষের মধ্যে চলে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক লড়াই।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে এর মেয়াদও ফিক্সড় করে দিয়েছেন।	১-৩	হাশরের মাঠে যার যা পাওনা, আল্লাহ তাকে তা-ই বুঝিয়ে দেবেন। কারও ওপর একটুও জুলুম করা হবে না।	১৯-২০
আল্লাহকে বাদ দিয়ে মুশরিকরা কতগুলো মূর্তিকে ডাকে। অথচ এগুলো জড়বস্তু; উপকার কিংবা ক্ষতি করার কোনো সামর্থ্য এদের নেই।	৪-৭	হূদ ﷺ-এর আদ জাতির অবাধ্যতা ছিল সীমাহীন। এরপর এল আল্লাহর শাস্তি, যা দেখে প্রথমে আনন্দে মেতে উঠেছিল তারা।	২১-২৫
ইহুদি নামধারীরা মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসেবে মানে না। অথচ স্বয়ং মুসা ﷺ তাঁর উম্মতকে নবিজির আগমনের খবরটা দিয়ে গেছেন।	৮-১০	আদ জাতির ছিল প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি। কিন্তু আল্লাহর আযাবের সামনে কোনো ক্ষমতাই কাজে আসে না।	২৬-২৮
কুরআনের ব্যাপারে কাফিরদের অযৌক্তিক প্রশ্ন ও হাস্যকর সব অজুহাত। পিতামাতার প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ।	১১-১৫	নবিজির কুরআন তিলাওয়াত শুনে একদল জিনের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।	২৯-৩২
খারাপ লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো—এরা পরকালকে অস্বীকার করে। তারা বলে, আখিরাত গালগপ্প ছাড়া আর কিছুই না।	১৬-১৮	জাহান্নাম দেখার পরই কাফিররা পরকালের সত্যতা টের পাবে। তাই মুমিনদের উচিত ধৈর্য ধরা।	৩৩-৩৫

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তুমি বলে দাও, 'তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেগুলোকে ডাকো, সেগুলো সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছ? আমাকে দেখাও—দুনিয়ার কোন জিনিসটা তারা সৃষ্টি করেছে। নাকি মহাকাশে তাদের কোনো অংশীদারি আছে?" কুরআনের এই আয়াতটি আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে। আসলেই কি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রব হতে পারে? আচ্ছা, সামান্য একটা মাছি যদি মূর্তিগুলোর কাছ থেকে কিছু নিয়ে যায়—যেমন, ওগুলোর সামনে যেসব খাবার দেওয়া হয়, মাছি সেখান থেকে কিছু নিয়ে উড়ে গেল—সেক্ষেত্রে ওগুলো কিছু করার ক্ষমতা রাখে কি? আর মাছি বানানো তো বহু দূরের আলাপ! তা হলে কীভাবে মানুষ নিজ-হাতে-গড়া মূর্তিকে প্রভু বলে মেনে নেয়? এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করা—মানুষের আত্মসম্মানবোধকে গলা টিপে হত্যা করার শামিল। আসলে আল্লাহর দেওয়া উদাহরণগুলো নিয়ে আমাদের বেশি বেশি চিন্তা করতে হবে। তবেই আমরা মানুষ হিসেবে বাঁচার সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারব।

(দেখুন—ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ২৬/৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ১৫ নং আয়াতটি দেখুন—"আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি তার মাতাপিতার সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করার জন্য। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, তাকে জন্ম দেওয়ার সময়ও কষ্ট করেছে, আর তাকে গর্ভে ধারণ ও (জন্মের পর) বুকের দুধ ছাড়িয়ে অন্য খাবারে অভ্যস্ত করতে ব্যয় করেছে তিরিশ মাস।" এখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদেশ দিলেন, মা-বাপ উভয়ের সাথে সুন্দর আচার-ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু মায়ের আলাদা কিছু কষ্টকর বৈশিষ্ট্যের কথাও আয়াতটিতে উঠে এসেছে—সন্তানকে দীর্ঘ সময় ধরে গর্ভে ধারণ করা, তারপর প্রসব করার সময় অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করা এবং জন্মের পর সুদীর্ঘ সময় দুধ পান করানো। এগুলোর একটাতেও পিতার কোনো অংশগ্রহণ নেই। এ থেকেই বোঝা যায়—আল্লাহর কাছে বাবার চেয়ে মায়ের মর্যাদা বেশি। কারণ, সন্তান পালনে মায়ের কষ্টটা বেশি। সুতরাং মা'কে গুরুত্ব দিতে হবে সর্বাধিক। হাদীসেও এর প্রমাণ মেলে—এক ব্যক্তি নবি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'আমার ওপর কার খেদমতের হক সবচেয়ে বেশি?' নবি ﷺ বললেন, 'তোমার মায়ের।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে আবারও জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার বাবা।' তিনবার মায়ের কথা বলে একবার বললেন বাবার কথা। কারণ, এমন তিনটি কষ্ট আছে, বাবাকে যার একটাও সইতে হয় না—গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসবের কষ্ট এবং দুধপান করানোর কষ্ট।

(দেখুন—বুখারি, ৫৯৭১; মুসলিম, ২৫৪৮; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৫২২)

সূরা মুহাম্মাদ

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯৫-তম সূরা। এর আগে সূরা হাদীদ ও পরে সূরা রা'দ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আহকাফ ও পরে সূরা ফাতহ।

এক নজরে মুহাম্মাদ

- মাদানি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ৪৭
- আয়াত: ৩৮
- মাদানি

নামের রহস্য

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নাম হলো 'মুহাম্মাদ'। সূরার ২ নং আয়াতে রাসূল ﷺ-এর নাম এসেছে। তাঁর নামানুসারেই এই সূরাটির নাম রাখা হয় 'মুহাম্মাদ'। এ-সূরার আরও একটি নাম আছে। আর সেটি হলো 'কিতাল'। কিতাল অর্থ যুদ্ধ। এই সূরায় যুদ্ধ-সংক্রান্ত বেশকিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় এর নাম হয়েছে 'কিতাল'।

মেজর থিম

০১ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ। মুমিনদের পুরস্কার।

০২ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য: জিহাদ থেকে পলায়ন।

০৩ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য: নিরাশ না-হওয়া।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

যারা আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেয় তাদের সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। একই ঘোষণা পাওয়া যায় সূরাটির শেষ অংশেও—"যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেয় এবং নিজেদের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়—তারা কক্ষনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তিনিই তাদের কাজগুলো বরবাদ করে দেবেন।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আহকাফ; যার শেষে বলা হয়েছে: "যেসব লোক আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে অবাধ্যতার পথে চলতে চায়, তাদেরকে বাদ দিয়ে কি অন্যদেরকে ধ্বংস করা হবে?" আর সূরা মুহাম্মাদ শুরু: "যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান ও আল্লাহর রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে, তিনি তাদের (ভালো) কাজগুলো বাতিল করে দেবেন।" মানে অবাধ্যদের ধ্বংস অনিবার্য।

শানে নুযুল

পবিত্র নগরী মক্কা নবিজির জন্মভূমি। তিনি এই ভূমিকে বড়ো ভালোবাসতেন। নুবুওয়াতের দায়িত্ব কাঁধে ওঠার পর থেকে কাফিরদের শত্রুতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। শুধু নবিজিই না, সে-সময় যারাই ঈমান আনত, তাদের সবার ওপরই চলতো কুরাইশদের অমানুষিক নির্যাতন। অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন নবিজি। অন্য মুসলিমরাও হিজরত করতে শুরু করল। সহায়-সম্বল সব মক্কাতে ফেলে আসতে হতো তাদের। তবুও তো সেই সীমাহীন অত্যাচার থেকে বাঁচা যাবে! তাই আরবের বিভিন্ন দিক থেকে ঈমানদাররা সবাই মদীনাতে এক হতে লাগল। কিন্তু মুসলিমরা নিজেরা নিজেরা ভালো থাকবে—এটাও মক্কার মুশরিকদের সহ্য হলো না। তারা চারিদিক থেকে মদীনাকে অবরোধ করে রাখল—যাতে করে মানবিক কোনো সুযোগ-সুবিধে মুসলিমরা না-পায়। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিমদের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা—হয় দ্বীন ত্যাগ করে মুশরিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করা; আর না-হয় হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া। তাই এ সূরার ৪ নং আয়াতে সরাসরি যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুশরিকদের সাথে শেষ ফায়সালা হয়ে যাক—এই আরব ভূমিতে হয় ইসলাম থাকবে, আর না হয় কুফর। এসব মুশরিকদের অস্ত্রশস্ত্র ও বাহ্যিক শক্তি দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আল্লাহর ওপর ভরসা করে মুসলিমদেরকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এরকম নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই সূরা নাযিল করেন।

(দেখুন—ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ২৬/৭২; বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৮/১৯৪)

সেগমেন্ট

যুদ্ধনীতি

কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নীতি কী হবে, তা আল্লাহ সূরার শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন।

বিজয়ের শর্ত ও বাধা

বিজয় পেতে হলে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে, ও সেই বিজয়ের পথে কী কী বাধা আসতে পারে—সূরার মাঝের অংশে এসেছে এই আলোচনা।

মুনাফিকি করা যাবে না

যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো বা কোনো ধরনের দুর্বলতা প্রকাশ করা মুমিনের শোভা পায় না। এই কাজ শুধুমাত্র মুনাফিকদের দ্বারাই সম্ভব।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর ১০০ আয়াতের কম, সেগুলোকে বলা হয় মাসানি। ইনজীলের পরিবর্তে, আল্লাহ তাআলা মাসানি সূরাগুলো নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা মুহাম্মাদ/কিতাল।

(দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ভালোভাবে জেনে নিতে হবে; → যেন এমন লোকদের থেকে সতর্ক থাকা যায়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
জিহাদের ফিলোসফি

১. জিহাদের বৈধতা ও এর উদ্দেশ্য
সূরার শুরুতে আল্লাহ মুমিনদেরকে জিহাদ করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে জিহাদকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম বানানো যাবে না। বরং সমাজ থেকে জুলুম-নির্যাতন দূর করতে ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

২. জিহাদের জন্য শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি
জিহাদের জন্য একজন মুমিনের শারীরিক ও মানসিক—উভয় প্রস্তুতিই গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে এটা মাথায় রাখা দরকার—বিজয় ঠিক তখনই আসবে, যখন আল্লাহর ওপর সত্যিকার অর্থে নির্ভর করা হবে।

৩. যুদ্ধের নৈতিক নির্দেশনা
যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কী কী নৈতিক বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, তা আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি মূল্যবোধ যুদ্ধবন্দিদের সাথে ভালো আচরণের ওপর জোর দেয়।

৪. ধৈর্যের সাথে লড়াই
যুদ্ধের ময়দানে জয়-পরাজয় বড় কথা নয়। এ সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর হাতে। আর এর মাধ্যমে তিনি বান্দাকে পরীক্ষা করেন—কারা তাঁর পথে অটল-অবিচল থাকে, তা তিনি দেখতে চান।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কাফির ও মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের কাজের বদলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১-৩	মুনাফিকরা দ্বীনের ব্যাপারে চরম উদাসীনতা দেখায়। তাদের মন যা চায়, তা-ই তারা করে। আর মুমিনরা চলে সঠিক পথে।	১৭-১৮
আল্লাহ মুমিনদের জন্য যুদ্ধনীতি সেট করে দিলেন। শহীদদের আমল বিফলে যাবে না। তারা পাবে জান্নাত।	৪-৬	জ্ঞান ও ক্ষমা চাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।	১৯
কাফিররা অবশ্যই পরাজিত হবে। শর্ত মেনে চললে জয়ী হবে মুমিনরা। আর সীমালঙ্ঘনের শাস্তি ভয়ংকর।	৭-১৪	মুনাফিকদের অবস্থা, তাদের পরিণতি ও মুজাহিদীন বা যোদ্ধাদের মনের পরীক্ষার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।	২০-৩৪
ঈমানদার ও বেঈমানের জন্য আল্লাহ যা যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, সেসবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	১৫	ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা। এ ছাড়া দান-খয়রাত ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ চালিয়ে যাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে।	৩৫-৩৮

কেইস-স্টাডি

তাওবা মুমিনের জীবনে এক বিরাট নিয়ামাত। মানুষ হিসেবে চলার পথে কিছু ভুলত্রুটি হয়েই যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকড়াও করেন না; বরং অনুশোচনার জন্য আমাদেরকে সময় দেন। এই সূরার ১৯ নং আয়াতটি খেয়াল করা যাক—"সুতরাং এই জ্ঞানের ওপর অটল থাকো—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; আর তোমার গুনাহের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করো।" এই আদেশটি স্বয়ং মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেওয়া হয়েছে। অথচ নবিজিকে আল্লাহ ইতোমধ্যেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তবুও এমন আদেশের কারণ হলো: নবিজির মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে শেখালেন—আমরাও যেন আমাদের গুনাহের ব্যাপারে অনবরত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকি। চলতি পথে যখনই পা পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে, তখনই যেন তাঁর কাছে ফিরে আসি, মাফ চাই। এ ছাড়াও আমরা যেন ক্ষমা চাই সকল মুমিন নারী-পুরুষের জন্য।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৬/২৪২; মাওয়ারদি, তাফসীর, ৫/৩০০)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এই সূরার ৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যারা আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছ, তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর (প্রতিকূল পরিবেশে) তোমাদের পা অটল রাখবেন।" আল্লাহকে সাহায্য করা বলতে আসলে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করাকে বোঝানো হয়েছে। তো হিসেবটা সহজ—আমরা যদি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করি, তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে সমুন্নত করতে চেষ্টা করি, তবে তিনিও আমাদেরকে সাহায্য করবেন। যেকোনো বিপদ-মুসিবতে, দুঃখ-কষ্টে তিনি আমাদের পা অটল রাখবেন। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তো সবচেয়ে বড় সাহায্য হলো—তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ। তাই আল্লাহ আমাদের সকলের পরকালের যাত্রাকে সুন্দর করে দিন, আ-মীন।

(দেখুন—তাফসীরুল জালালাইন, ৫৭৬; বাগাবি, তাফসীর, ৭/২৮১)

এ-সূরার ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কাফিররা দুনিয়াতে গবাদিপশুর মতো খাওয়া-দাওয়া করতে থাকে। এভাবে তারা আনন্দে-উল্লাসে মেতে ওঠে। পরিণামে তাদের ঠিকানা হয় জাহান্নাম। এতে আমাদের জন্য চিন্তার বিরাট খোরাক রয়েছে। গবাদিপশু বা জন্তু-জানোয়ারদের কেবল পেটের চিন্তা থাকে। মানে, দেহের সুখই তাদের বড় সুখ। একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন, কাফির-বেঈমানদের অবস্থাও কিন্তু সত্যিই এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। তারাও কেবল পেট-শরীরের চিন্তাতেই বিভোর থাকে—কীভাবে আরও একটু আরামে থাকা যায়। বাড়ি, গাড়ি, নারী ছাড়া ভিন্ন কোনো ভাবনা তাদের থাকে না। এখন আমাদের নিজেদের নিয়ে চিন্তার গভীরে একটু ডুব দিই—আমাদের অনেকের মাঝেও কিন্তু এমন চিন্তা-চেতনা কাজ করে। আখিরাতের ভাবনা মাথায় আসে না। কেবল দুনিয়া আর দুনিয়া—ব্যস্ততার কোনো শেষ নেই। ঘুমের মধ্যেও দুনিয়াবি উন্নতি কীভাবে করব, সেই স্বপ্ন দেখি। এই আয়াতটি তাদেরকে শক্তমতো একটা ধাক্কা দিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়—কাফিরদের বৈশিষ্ট্য যেন তোমাদের মধ্যে এসে না যায়! তাই প্রতিদিনকার সময়ের একটা অংশ যেন আমরা আখিরাতের কাজে ব্যয় করি। একান্তই আপন রবকে খুশি করতে সচেষ্ট থাকি।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৫৫১)

সূরা ফাতহ

سُوْرَةُ الْفَتْحِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১১১-তম সূরা। এর আগে সূরা জুমুআ ও পরে সূরা মাইদা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুহাম্মাদ/কিতাল ও পরে সূরা হুজুরাত।

এক নজরে ফাতহ

- ৬ষ্ঠ হিজরিতে নাযিল
- সূরা নং: ৪৮
- আয়াত: ২৯
- মাদানি

নামের রহস্য

'ফাতহ' শব্দের অর্থ 'বিজয়; উন্মুক্তকরণ'। সূরার ১ নং আয়াতে 'ফাতহ' শব্দটি এসেছে; যেখানে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে বিজয়ের আগাম সুসংবাদ দিয়েছেন। সেখান থেকেই এই সূরার নাম হয়েছে 'ফাতহ'।

মেজর থিম

০১ হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি।

০২ আনুগত্যের অঙ্গীকার।

০৩ সেরা সঙ্গীদের গুণাগুণ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুর দিকে আল্লাহ ঘোষণা দিলেন—"তিনি মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে সেসব জান্নাতে প্রবেশ করাতে চান, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলছে।" কিন্তু কীসের বিনিময়ে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এই পুরস্কারের ওয়াদা দিলেন, তা জানালেন সূরার একেবারে শেষে—তাদের মধ্যে যারা ঈমানের ওপর অটল থেকে ভালো কাজগুলো করে যাবে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুহাম্মাদ; যার অপর নাম সূরা কিতাল বা যুদ্ধের সূরা। এরপরে এসেছে সূরা ফাতহ। ফাতহ মানে বিজয়। অর্থাৎ যুদ্ধের পরেই এসেছে বিজয়ের সুসংবাদ—"নিঃসন্দেহে আমি তোমার জন্য স্পষ্ট বিজয়ের পথ খুলে দিয়েছি।"

শানে নুযুল

মুসলিমরা মদীনায় এসেছে পাঁচ বছর হয়ে গেল। এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বপ্নে দেখলেন—তিনি তাঁর সাহাবিদের নিয়ে আল্লাহর ঘর কা'বা তাওয়াফ করছেন। নবিজির স্বপ্ন সাধারণ কোনো স্বপ্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে এটিও আল্লাহর একটি আদেশ। তাই সাহাবিদেরকে নিয়ে নবিজি মক্কার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। ওদিকে কুরাইশরা কোনোভাবেই চাচ্ছে না—নবিজি মক্কায় প্রবেশ করুক। নানাভাবে মুসলিমদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তখন তারা কৌশলে মুসলিমদের সাথে হুদাইবিয়ার ময়দানে সন্ধিচুক্তি করতে চাইল। নবিজি তাতে রাজি হলেন। চুক্তির শর্তগুলো মুশরিকরা এমনভাবে লিখল, যাতে করে মুসলিমরা বেকায়দায় পড়ে। এমনকি সে-বছর মুসলিমরা উমরা পর্যন্ত করতে পারবে না। ফের আসতে হবে আগামী বছর। নবিজি তাদের সব শর্ত মেনে নিলেন। সত্যি বলতে, বাহ্যিকভাবে দেখলে মনে হবে—এই চুক্তিতে মুসলিমরা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের পরাজয় হয়েছে। তবে আসল সত্যটা হলো—এই চুক্তিতে একমাত্র লাভবান হয়েছে মুসলিমরাই। আর শেষ পর্যন্ত বেকায়দায় পড়েছে কাফির-মুশরিকরা। এটা যে মুসলিমদের বিজয়, এই কথাটিই আল্লাহ এ-সূরাতে জানিয়ে দিয়েছেন। হুদাইবিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসার পথেই এই বার্তা নিয়ে সূরাটি নাযিল হয়। আর বাস্তবেই, এই সন্ধির হাত ধরে কিছুকাল পরেই মুসলিমরা মক্কা বিজয় করে; যা ছিল এক মহা-বিজয়।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৭/২৯৩, ৩০০)

সেগমেন্ট

সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ ও মুমিনদেরকে বিজয় ও ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন। সেই সাথে মুশরিক ও মুনাফিকদের দিয়েছেন বিরাট শাস্তির হুঁশিয়ারি।

অঙ্গীকারে অবিচল থাকা

যারা নবিজির হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করেছে, আল্লাহ তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সেই সাথে তারা যাতে তাদের ওয়াদায় অটল থাকে, সেই আদেশও দিয়েছেন।

রাসূলের উদ্দেশ্য: ইসলামের বিজয়

আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-কে পৃথিবীতে রাসূল ও নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন—যেন তিনি দুনিয়াতে ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

ফজিলত

গোটা দুনিয়ার চেয়ে বেশি প্রিয় : আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'আজ রাতে আমার ওপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সমগ্র দুনিয়ার চেয়ে বেশি প্রিয়।' এরপর তিনি সূরা ফাতহ পাঠ করে শোনান।

(বুখারি, ৪৮৩৩, ৪১৭৭)

বিজয়ের দিনে তিলাওয়াত : মক্কা বিজয়ের দিন নবি ﷺ প্রকম্পমান ও চমৎকার আওয়াজে সূরা ফাতহ পাঠ করেছিলেন।

(বুখারি, ৪৮৩৫; মুসলিম, ১৮৫৩)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

রাসূল ﷺ-এর ওপর বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পাঠাতে হবে;

তবেই রাসূলের জীবনবোধ আমাদের সামনে সব সময় জাগ্রত থাকবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়, শান্তি ও আত্মিক শক্তি

১. বিজয়ের ধারণা

সূরার শুরুতেই আল্লাহ মুমিনদেরকে আসন্ন বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। একইসাথে দিয়েছেন—ক্ষমা, শান্তি ও সাহায্যের সুসংবাদও।

২. আল্লাহর ওয়াদায় পূর্ণ ভরসা রাখা

বিজয়ের পথে কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি আসাটা স্বাভাবিক। তবে সে-সময়ে শান্ত থাকবে হবে। কোনোভাবেই অস্থির হওয়া যাবে না। কারণ আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পুরা হবে।

৩. মুমিনদের কৌশলগত বিজয়

শুরুর দিকে আপাত দৃষ্টিতে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে নেতিবাচক মনে হয়েছিল। আদতে এটিই পরবর্তী সময়ে বিজয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছে।

৪. আদর্শ নেতা

কোনো জাতির উত্থান বা বিজয়ের জন্য সে জাতির নেতাকে সবার আগে আদর্শবান হতে হয়। এবং তার অনুসারীদের সাথে বন্ধন বেশ পোক্ত হতে হয়। দু'দিক থেকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ শতভাগ সফল।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
'হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি' ও এর ফলাফল নিয়ে কথা বলা হয়েছে।	১-৭	'বাইআতে রিদওয়ান'-এ অংশগ্রহণকারীদের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ও তাদেরকে দিয়েছেন বিজয়ের ওয়াদা।	১৮-২৪
নবি ﷺ-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও 'বাইআতে রিদওয়ান' এর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।	৮-১০	যুদ্ধের হুকুম না দিয়ে আল্লাহ কেন 'হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি' করালেন, আর তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	২৫-২৬
হুদাইবিয়ার বছর উমরার সফরে অংশ না-নেওয়া লোকদের ব্যাপারে কিছু কথা বলা হয়েছে।	১১-১৭	রাসূলের দেখা স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবতায় রূপ নেবে। রাসূল ও তাঁর সাহাবিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইতি টানা হয় সূরাটির।	২৭-২৯

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। আর সেটি হলো—ওরা ইসলামের ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে মূর্খতাপ্রসূত ঘৃণার স্থান দেয়। এ ঘটনা হুদাইবিয়ার সময়। হজ্জ ও উমরা পালন করতে আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই এসে বাধ সাধে

মক্কার কাফির-মুশরিকরা। তারা নবিজিকে এই বছর মক্কায় ঢুকতে দেবে না। কারণ—তাদের আশেপাশের সকল আরব গোত্রই জানে যে, মুশরিক ও মুসলিমদের মধ্যে তুমুল বিরোধ। এই অবস্থায় যদি তারা মুসলিমদেরকে মক্কায় ঢুকতে দেয়, তা হলে সবাই মনে করবে—মুসলিমরা বুঝি কুরাইশদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে গেল! তাই মুশরিকরা গোঁ ধরে বসে—মুসলিমদের মক্কায় ঢুকতে দেওয়া মানেই আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাওয়া! তাদের এই গোঁয়ার্তুমিকেই আল্লাহ মূর্খতাপ্রসূত ঘৃণা বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সময়ের সাথেও কিন্তু আমরা এই ব্যাপারটিকে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখতে পারি। দুনিয়া জুড়ে নিজেদের ক্ষমতা আর দাপট দেখাতে কত দেশ আজ মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি মূর্খতাপ্রসূত ঘৃণা লালন করে। মক্কার মুশরিকদের মতো তারাও এর পরিণাম ভোগ করবে। পরিশেষে মক্কা বিজয়ের মতো মুসলিমরা গোটা দুনিয়ায় বিজয়ী হবে, ইন শা আল্লাহ।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৩/২৬৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের জন্য দাউদাউ করা আগুন তৈরি করে রেখেছেন, এ-কথা বলার পরে ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মহাকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর; তিনি যাকে চাইবেন, মাফ করে দেবেন, আর যাকে চাইবেন, শাস্তি দেবেন; আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।" আয়াতের শেষে 'গাফূর/অত্যন্ত ক্ষমাশীল' এবং 'রহীম/পরম দয়ালু'—এ নাম-দুটি আনা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেউ যত বড় অপরাধই করুক না কেন, যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, অপরাধ থেকে ফিরে আসে; আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার ওপর দয়া করবেন। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনের অপরাধীরা সেসময় ক্ষমা চায়। আবার দিনের বেলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন, যেন সেসময় রাতের অপরাধকারীরা ক্ষমা চায়। কিয়ামাত আসার আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে এভাবেই। আমরা যারা অপরাধ করতে করতে সত্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছি, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমার দরজা এখনো খোলা আছে। তাই সব পাপাচার আর অপরাধ ছেড়ে এখনই তাওবা করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করলে, আল্লাহ সব ক্ষমা করে দেবেন। কারণ তিনি গাফূরুর রহীম।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৩/২৫৫; আবুস সাঊদ, তাফসীর, ৮/১০৮)

"মুহাম্মাদ আল্লাহর বার্তা-বাহক; আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে ভীষণ কঠোর, নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত কোমল।" এ-সূরার শেষ আয়াতে মুমিনদের বিপরীতমুখী দুটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—কঠোরতা এবং কোমলতা। কাফিরদের সঙ্গে কঠোর আর মুমিনদের সঙ্গে কোমল। এ-থেকে বোঝা যায়, মুমিন হয় বিচার-বোধসম্পন্ন ব্যক্তি। তারা প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত আচরণ করে। কোনো একদিকে যেমন ঝুঁকে পড়ে না, আবার একেবারে শিথিলতাও দেখায় না।

(দেখুন—ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ২৬/২০৫)

সূরা হুজুরাত

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৪৯-তম সূরা। এর আগে আছে সূরা ফাতহ ও পরে আছে সূরা ক্বফ।

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০৬ নং সূরা। এর আগে সূরা মুজাদালা ও পরে সূরা তাহরীম নাযিল হয়।

এক নজরে হুজুরাত

- সূরা নং: ৪৯
- ৯ম হিজরিতে নাযিল
- মাদানি
- আয়াত: ১৮

নামের রহস্য

‘হুজুরাত’ শব্দটি বহুবচন। একবচনে ‘হুজরাহ’। হুজরাহ মানে ‘ঘর, বাড়ি, খাস-কামরা’। নবিজির এরকম নয়টির মতো ছোট ছোট ঘর ছিল। সবগুলোই ছিল মাটি দিয়ে বানানো। আর ওপরে ছাউনি হিসেবে থাকত খেজুর-পাতা। একেক ঘরে নবিজির একেক স্ত্রী বাস করতেন। সূরার নামটি হুজুরাত হওয়ার কারণ: ঘরে ও ঘরের বাইরে মুসলিমদের পারস্পরিক আচরণ বা ম্যানার কেমন হবে, এ-সূরায় তা শেখানো হয়েছে।

মেজর থিম

০১ আল্লাহ ও নবিজির সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। তথ্য যাচাই ছাড়া সিদ্ধান্ত নয়।

০২ মুমিনদের মাঝে বিবাদ হলে মিটমাট জরুরি। ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও দোষ বলে বেড়ানো নিষেধ।

০৩ সত্যিকার মুমিনের পরিচয়।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে প্রকৃত ঈমানদারদের সম্বোধন করে, তাদেরকে বেশ কিছু সামাজিক আচার-ব্যবহার শেখানো হয়েছে। আর শেষে এসে প্রকাশ করা হয়েছে—ঈমানের ব্যাপারে মিথ্যা দাবিদারদের আসল চেহারা।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—ফাতহ। যার শেষ দিকে এসে বলা হয়েছে: রাসূলের যারা অনুসারী, তারা কাফিরদের প্রতি ভীষণ কঠোর। কিন্তু নিজেদের মধ্যে খুবই কোমল। আর এ-সূরায় এসে সেই কোমলতার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মানে, মুমিনরা একজন অপরজনের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে—তা শেখানো হয়েছে।

শানে নুযুল

একবার বনু তামীম গোত্রের কিছু লোক এল নবিজির কাছে। তাদের নেতা কে হবে এ নিয়ে তারা পরামর্শ করতে চায়। কাকে তাদের নেতা বানানো উচিত—এ বিষয়ে নবিজির সিদ্ধান্তের আগেই আবু বকর ও উমর ﵄ তর্কে জড়িয়ে পড়েন। এমনকি একসময় তাদের গলার আওয়াজ বেশ উঁচুতে উঠে যায়। এই সূরায় আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—নবির সামনে গলার আওয়াজ চড়া হবে না। আরেকদিন রাসূল ﷺ নিজের হুজরায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন-সময় কিছু বেদুইন এসে বাইরে থেকে ‘ইয়া মুহাম্মাদ’ বলে জোরে জোরে ডাকতে থাকে। সূরার পরের অংশে আল্লাহ এই আচরণের ব্যাপারে সাবধান করে দিলেন। জানিয়ে দিলেন—রাসূলকে তাঁর নাম ধরে ডাকা যাবে না। এর কিছুদিন বাদে যাকাত সংগ্রহ করতে ওয়ালিদ ইবনু উকবাকে একটা গোত্রের কাছে পাঠালেন নবিজি। একটা ভুল বোঝাবুঝিতে যাকাত না নিয়েই চলে এলেন তিনি। আর এসে নবিজিকে বললেন, লোকগুলো যাকাত দিতে চাচ্ছে না। নবিজি ভীষণ রেগে গেলেন। এমনকি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নিয়তও করে ফেললেন! এমন-সময় তারা এসে জানাল—আমরা তো যাকাত না-দেওয়ার কথা ভাবিনি। ওয়ালিদ তো যাকাত না নিয়েই চলে এল। তখন আল্লাহ জানালেন, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালো করে খোঁজ-খবর নিয়ো। না হলে পরে আফসোস করতে হতে পারে। এ ছাড়া আরেকটি গোত্র নবিজির কাছে নিজেদের গোত্রের গুণগান করতে থাকলে, আল্লাহ তাদের সমালোচনা করেন। অর্থাৎ ইসলামে গোত্র বা বংশপ্রীতির কোনো স্থান নেই। ইসলাম ‘জাতীয়তাবাদ/Nationalism’-এ বিশ্বাসী না। সব মিলিয়ে এই সূরায় আল্লাহ নাযিল করেছেন মুমিনদের আদব-কায়দা, সামাজিক আচরণ ও শিষ্টাচার।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৭০৭; বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৮/৩৪৯)

সেগমেন্ট

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই আল্লাহর সাথে আমাদের আচরণ-বিধি কেমন হবে—তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

রাসূলের সঙ্গে সম্পর্ক

তারপর এসেছে রাসূলের সাথে আচরণ-বিধির আলাপ। আল্লাহর সঙ্গে আমাদের আচরণ যত সুন্দর হবে, রাসূলের আনুগত্য আমাদের জন্য তত সহজ হবে।

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সম্পর্ক যত মজবুত হবে, সামাজিকভাবে আমাদের পারস্পরিক বন্ধনও তত মজবুত হবে।

ফজিলত

বিশুদ্ধ বর্ণনায় এ-সূরার তেমন কোনো ফজিলতের হাদীস আসেনি। তবে আলিমগণ এ-সূরাকে উসূলুল আদাব তথা 'আদব-শেখার-সূত্র' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা, এ-সূরায় মানুষের সামাজিক আচরণ-বিধি সম্পর্কে খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হক যত বেশি আদায় করা যাবে; → বান্দার হকও আমরা তত বেশি আদায় করতে পারব।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

সুশৃঙ্খল আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ

১. নেতার প্রতি দায়িত্ব

রাসূলের সাথে মুমিনের আচরণ কেমন হবে, সূরার শুরুতেই আল্লাহ দিলেন সেই শিক্ষা। এরই ধারাবাহিকতায়—সকল যুগেই মুমিন নেতা পাবে যথাযোগ্য সম্মান। নেতার আনুগত্যে সুশৃঙ্খল হবে সমাজ।

২. নেতার কর্তব্য

মুমিনদের পারস্পরিক বিবাদ নেতা মিটমাট করে দেবে। কেউ বাড়াবাড়ি করলে, অন্যের ওপর জুলুম করলে, নেতা ন্যায়বিচার করবে।

৩. যে-আচরণ করা যাবে না

মুমিন তার আরেক মুমিন ভাইকে নিয়ে হাসি-তামাশা করবে না। তার ব্যাপারে বাজে কথা ছড়াবে না। তাকে খারাপ নামে ডাকবে না। তার ব্যাপারে কোনো অমূলক ধারণা পোষণ করবে না।

৪. ইসলামকে মনেপ্রাণে ধারণ

শুধু মুখে মুখে নয়, ইসলামকে ধারণ করতে হবে হৃদয়ের গভীর থেকে। আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে নিতে হবে বিনা বাক্যে। তবেই তো মিলবে প্রকৃত শান্তি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
বিচার-ফায়সালা করতে গিয়ে মনগড়া আইন বানানো যাবে না। কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে কিছু বলার সুযোগ নেই।	১	মুমিনরা ভাই-ভাই। তাদের পরস্পরের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ কাম্য নয়। এক্ষেত্রে মীমাংসা উত্তম পথ।	৯-১০
কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে তর্কের সুযোগ নেই। শরীয়তের ব্যাপারে আজগুবি ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো যাবে না।	২-৩	মুমিনরা একে-অপরকে নিয়ে হাসি-তামাশা কিংবা খারাপ নামে ডাকবে না। অন্যের দোষত্রুটি বলে বেড়াবে না।	১১
নবিকে তাঁর বাড়ির বাইরে থেকে নাম ধরে ডাকাডাকি করা যাবে না। তিনি সম্মানিত রাসূল—তাঁকে ওভাবে ডাকা মোটেও শোভনীয় নয়।	৪	আন্দাজ করা ও অন্যের গোপন কথা জানবার চেষ্টা ভালো নয়। গীবত তো মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো জঘন্য।	১২
ডাকার পর বেরোতে দেরি হলে, একটু সবর করতে হবে। চেঁচামেচি করার কোনো সুযোগ নেই।	৫	মানুষকে গোত্র, বংশ ও জাতিতে ভাগ করা হয়েছে পরিচয়ের জন্য—জাতীয়তাবাদ চর্চার জন্য নয়।	১৩
কোনো খবর শোনা-মাত্র বিশ্বাস করা যাবে না। আগে ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। না-হলে পরে পস্তাতে হবে।	৬-৮	মুসলিম হওয়া আর মুমিন হওয়া এক কথা নয়। বাইরে মুসলিম মানেই অন্তরে মুমিন—এমনটা না-ও হতে পারে।	১৪-১৮

কেইস-স্টাডি

মদীনার আশেপাশে কিছু বেদুইন গোত্র থাকত। তাদের একটি গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর এরা মদীনায় এসে শুরু করল উৎপাত। আকারে-ইঙ্গিতে নবিজিকে বোঝাতে চাইল—'দেখুন, আমাদের সাথে আপনার কোনো যুদ্ধ বা ঝামেলা করতে হয়নি। আমরা নিজের থেকেই ঈমান এনেছি। আপনার ওপর কতটা দয়া করেছি—একবার ভেবে দেখুন।' এরই প্রেক্ষিতে এই সূরার ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ জানালেন, "বেদুইনরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' তুমি বলে দাও, 'তোমরা ঈমান আনোনি, বরং বলো—'(যুদ্ধে নিহত বা দাস হওয়ার ভয়ে) আমরা আত্মসমর্পণ করেছি।' ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে ঢোকেনি।'" তার মানে, তারা কেবলমাত্র দুনিয়াবি প্রোটেকশনের জন্য ভান করছে শুধু। তাদের অন্তরে ঈমানের ছিটেফোঁটাও নেই। তাই আমরা যারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করি, এই আয়াতটি তাদের সকলের জন্য কেইস-স্টাডির টপিক। চলুন যাচাই করে দেখি—আমরা কি সত্যিকার অর্থেই ঈমান এনেছি? নাকি কোনো স্বার্থ বা লোকলজ্জার ভয়ে শুধু মুখে মুখেই ঈমানের বুলি আওড়াই, টিয়াপাখির মতো!

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৬/৩৪৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরায় একটি চমৎকার বিপরীতমুখী চিত্র দেখানো হয়েছে। কথা যখন হবে ওহির বিধান নিয়ে, তখন আর কোনো প্রশ্ন নেই। শুনলাম তো মানলাম। অন্যদিকে কথা যখন হবে মানুষের—কোনো তথ্য বা খবর নিয়ে—তখন সরাসরি বিশ্বাস করা যাবে না। আগে প্রশ্ন করতে হবে—খবরটা সঠিক কি না। দুনিয়ার যেকোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান মেনে নেওয়ার আগে কুরআনের ফিল্টারে যাচাই করতে হবে। যদি সেটা কুরআনের বিপরীতে কিছু না বলে, তা হলে মানতে আপত্তি নেই। তথ্য যাচাইয়ের দুইটা মাধ্যম: (১) সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী, (২) ওহি। তবে মিডিয়ার পেছনে যারা থাকে, এদের মধ্যে কিছু কুচক্রী মহল আছে, যাদের কাজই গুজব ছড়ানো। তার ওপর দেশ ও জনতার ব্যাপারে এদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এরা কাজ করে নিজস্ব অ্যাজেন্ডা সামনে রেখে। আর সেসব অ্যাজেন্ডা দিনশেষে ইসলাম-বিদ্বেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। তাই এদের সাক্ষ্য বা তথ্য নেওয়ার আগে ভালো করে ভাবতে হবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৭০৭)

"আর তোমাদের কেউ যেন অপরের অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি আলোচনা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত-ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তা অপছন্দই করবে।" এ-সূরার ১২ নং আয়াতে গীবতকে হারাম করা হয়েছে। গীবত মানে অপরের অনুপস্থিতিতে তার দোষত্রুটি আলোচনা করা। এখানে খেয়াল করার বিষয়

হলো—গীবত করাকে আল্লাহ তাআলা মৃত-ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে জঘন্য এক কাজ। কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ এমন কিছু করতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে তার জন্য এটাও জরুরি—সে কারও দোষত্রুটি নিয়ে আলাপ করবে না। আয়াতের এ অংশ থেকে আরেকটি ব্যাপার স্পষ্ট হয়। গীবত হারাম হওয়ার প্রধান কারণ এটা নয় যে, যার গীবত করা হয়েছে সে মনে কষ্ট পাবে। কষ্ট পাক বা না-পাক, সে জানুক বা না-জানুক, তাতে কিছু আসে যায় না। বরং কারও অবর্তমানে তার গীবত করাই হারাম।

(দেখুন—বুখারি, ৬০৫২; মুসলিম, ২৫৮৯; আবু দাউদ, ৪৮৭৬; তিরমিযি, ১৯৩৪)

'তাবাইয়্যানু' মানে, তোমরা যাচাই করো। এই যাচাই করার মাত্রা বুঝবার জন্যই শব্দটিকে একটু খতিয়ে দেখা দরকার। بَانَ (বা-না) থেকে তাবাইয়্যানু। বা-না মানে আলাদা আলাদা করা। খণ্ড খণ্ডে ভাগ করা। তার মানে, ফাসিক লোকের থেকে কোনো সংবাদ এলে, ওটার প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা আলাদাভাবে যাচাই করতে হবে। অনেক সময় এমন হয়—মিডিয়া একটা খবর প্রচার করল। খবরটা মোটাদাগে সত্য। কিন্তু এর মধ্যে দু-চারটা মিথ্যা বাক্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিদেনপক্ষে দু-চারটা শব্দ হলেও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর দু-চারটি শব্দের কারণেই সংবাদের টোন বদলে যায় পুরোপুরি। এজন্য যেন-তেন ভাবে যাচাই হলে চলবে না। শব্দে শব্দে যাচাই করে তার পরই মানতে হবে।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৩/২৯৮)



اَلْقِسْطُ অর্থ 'ইনসাফ, ন্যায়বিচার, সমতা। শব্দটিকে বলা যায়—ইসলামি বিধি-বিধানের সারাংশ। যার যা প্রাপ্য, তাকে তা প্রদান করা। এই গুণের সর্বোচ্চ ধারক হলেন আল্লাহ তাআলা। এই শব্দ থেকেই তাঁর একটি নাম 'আল-মুকসিত/ পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারকারী'। আল্লাহ পুরো সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে ইনসাফ করেছেন, কোথাও এতটুকু জুলুম হয়নি। এই কারণেই পুরো মহাবিশ্ব চলছে ঠিকঠাকভাবে। নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। ঠিক তেমনি মানুষের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ন্যায় বিচারের কোনো বিকল্প নেই। এটি শুধু সমাজ বা জাতির জন্য নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও একজন মুসলিমের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি—যার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক লেনদেন, পরিবার ও ব্যক্তি-জীবন সুখময় হয়।

(দেখুন—যাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ৬২-৬৩)

সূরা ক্বফ سُوْرَةُ قٓ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩৪-তম সূরা। এর আগে সূরা মুরসালাত ও পরে সূরা বালাদ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা হুজুরাত ও পরে সূরা যারিয়াত।

এক নজরে ক্বফ

- নুবুওয়াতের ৪র্থ বছর নাযিল
- সূরা নং: ৫০
- আয়াত: ৪৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

সূরাটির প্রথম শব্দ—'ক্বফ'। ক্বফ, সোয়াদ, ইয়া-সীন, আলিফ-লাম-মীম,..—এগুলোকে বলা হয় اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَةُ বা বিচ্ছিন্ন-হরফ। ২৯ টি সূরার শুরুতে এরকম হরফ পাওয়া যায়। এগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে না-পড়ে আলাদা আলাদাভাবে পড়তে হয়। শুরুতে থাকা 'ক্বফ' হরফটি থেকেই এ-সূরার নাম রাখা হয়েছে 'ক্বফ'।

মেজর থিম

০১ বৈচিত্র্যময় পৃথিবী।

০২ আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের গভীরতা।

০৩ জাহান্নামের ভয়াবহতা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

কুরআনের কসম দিয়ে আল্লাহ তাআলা সূরাটি শুরু করেছেন, "ক্বফ। মহিমান্বিত কুরআনের কসম!" আর কুরআনের আলোচনা দিয়েই সূরার সমাপ্তি হয়েছে: "সুতরাং কুরআনের মাধ্যমে সেই লোককে স্মরণ করিয়ে দাও—যে আমার সাবধান-বাণীকে ভয় পায়।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা হুজুরাত; যার শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন, "মুমিন কেবল তারা—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মানে,...।" অন্যদিকে সূরা ক্বফের শুরুতেই উঠে এল অবিশ্বাসীদের কথা, যারা রাসূল হিসেবে মানুষের আগমনকে ভারি আশ্চর্যের বিষয় মনে করছে।

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ সূরা ক্বফকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। ঈদ বা জুমুআর নামাজে যেহেতু একসাথে অনেক মানুষের জমায়েত হতো, তাই এসব নামাজে তিনি সূরা ক্বফ তিলাওয়াত করতেন। যাতে করে একসাথে অনেক মানুষের কাছে এই সূরার বার্তা পৌঁছানো যায়। এই সূরাটিকে নবিজি এত গুরুত্ব দিতেন এই কারণে যে—পুরো সূরাটিতে আখিরাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

মুশরিকদের কাছে আল্লাহর রাসূলের যে কথাটি সবচেয়ে বেশি অদ্ভুত মনে হতো, তা হলো—মৃত্যুর পর তাদেরকে আবার জীবিত করা হবে, তাদের দেহের অণু-পরমাণুগুলো মাটিতে মিশে যাওয়ার হাজারো বছর পর আবার সেগুলো একত্রিত হবে, এরপর আবার হিসেব-নিকেশও হবে।

আল্লাহ এই সূরা নাযিল করে ব্যাপারগুলোকে পরিষ্কার করলেন। গোটা কুরআনে এটিই একমাত্র সূরা, যার পুরো আলোচনা আখিরাত নিয়ে। আখিরাত যে অবশ্যই হবে, এতে সন্দেহ রাখার যে কোনো সুযোগ নেই।

(দেখুন—মুসলিম, ৮৭৩; কুরতুবি, তাফসীর, ১৭/১)

সেগমেন্ট

কাফিরদের বিস্ময়

সূরার শুরুতেই রাসূল ﷺ ও পরকালের ব্যাপারে কাফিরদের বিস্ময় তুলে ধরা হয়। তারা কোনোভাবেই রাসূল ও পরকালের সত্যতা মেনে নিতে পারে না।

আল্লাহর অনন্য সৃষ্টি

এসব কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আল্লাহর অনন্য সব সৃষ্টির ওপর—সুসজ্জিত নিখুঁত মহাকাশ, বিস্তৃত পৃথিবী, মজবুত পাহাড়, বাহারি উদ্ভিদ, বৃষ্টি ইত্যাদি।

জোরাজুরি নেই

সূরার একেবারে শেষ আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—দাঈ'র কাজ শুধু আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়া, কাউকে ঈমান আনতে বাধ্য করা নয়।

ফজিলত

দুই ঈদে তিলাওয়াত করা সুন্নাহ: উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه আবু ওয়াকিদ লাইসি رضي الله عنه-কে জিজ্ঞেস করেন, 'ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে আল্লাহর রাসূল ﷺ কী পড়তেন?' জবাবে তিনি বলেন, 'তিনি দুই ঈদে সূরা ক্বফ ও সূরা কমার পড়তেন।' (মুসলিম, ৮৯১)

জুমুআর খুতবায় পাঠ করা সুন্নাহ: আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রত্যেক জুমুআর খুতবায় সূরা ক্বফ পড়তেন। (মুসলিম, ৮৭৩)

ফজরের সালাতে তিলাওয়াত: নবি ﷺ ফজর নামাজে সূরা ক্বফ পড়তেন, এরপর বাকি নামাজটুকু সংক্ষেপে পড়তেন। (মুসলিম, ৮৫৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

চোখ-দুটো বন্ধ হয়ে গেলে আর কিছুই করার থাকবে না; → তাই আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান রেখে তাঁর সন্তুষ্টির কাজ করে যেতে হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বাস্তবতা

১. সৃষ্টির মাঝেই পুনরুত্থানের নিদর্শন

আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও মহাকাশের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এখানকার সকল নিদর্শন এই সাক্ষ্য দেয় যে—মৃত্যুর পর আবারও আল্লাহ সবাইকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।

২. মানুষের ওপর নজরদারি

কিয়ামাতের দিন প্রতিটি আত্মাই হিসেবের মুখোমুখি হবে। সে প্রতিনিয়ত কী কাজ করছে, তা তার কাঁধে-থাকা ফেরেশতারা লিখে চলেছেন।

৩. অস্বীকার করা ও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা

যদিও আল্লাহ মানব-জাতির সামনে হাজারো নিদর্শন তুলে ধরেছেন, তবু মানুষের স্বভাব হচ্ছে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সত্যতাকে অস্বীকার করা ও ভুলে থাকা।

৪. উপলব্ধিবোধ

এ ধরনের মানুষরা কিয়ামাতের দিন যখন হিসেবের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের সামনে সত্য-মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হবে না।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
অবিশ্বাসীরা আখিরাতের বাস্তবতা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তাই নানান কু-যুক্তি দিয়ে পরকালকে এড়িয়ে যেতে চায়।	১-৫	অপরাধীরা দুনিয়াতে তার-সাথে-থাকা শয়তানকে দোষ দেবে। এদিকে, সেই শয়তানও তখন নিজেকে নির্দোষ দাবি করবে।	২৫-২৮
পৃথিবী ও মহাকাশকে আল্লাহ সুসজ্জিত করেছেন যেন মানুষ এই নিদর্শন দেখে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে।	৬-১০	সেদিন জাহান্নামকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, "তোমার পেট ভরেছে কি?" জাহান্নাম তখন উত্তরে বলবে, 'আরও আছে কি?'	২৯-৩০
শুকনো জমিন সজীব করার মতোই আল্লাহ মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আগের যে জাতিই অস্বীকার করেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।	১১-১৪	আর যারা ভালো কাজ করবে, তাদের জন্য জান্নাতকে কাছে নিয়ে আসা হবে। তারা যা চাইবে, আল্লাহ তা-ই দেবেন।	৩১-৩৫
প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করে আল্লাহ অক্ষম হয়ে যাননি। দ্বিতীয়বারও তাদেরকে অবিকল আগের মতো সৃষ্টি করার ক্ষমতা তিনি রাখেন।	১৫-১৯	এর আগে এমন প্রজন্ম ধ্বংস করা হয়েছে—যাদের দেহ ভীষণ শক্তপোক্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহর অবাধ্য হওয়ায় শাস্তি পেয়েছে।	৩৬-৪০
বিচারের দিন কাফিরের চোখের ওপর থেকে সকল পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে। ফলে সবকিছু সে নিজ চোখে দেখতে পারবে।	২০-২৪	আল্লাহ তাআলা-ই জীবন দেন, মরণও দেন তিনিই। আর তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।	৪১-৪৫

কেইস-স্টাডি

সারাদিনের কর্মব্যস্ততায় আমরা মুখর থাকি। কেউ কাজের কাজ করে, আবার কেউ-বা অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করে। যে যা-ই করি না কেন, আমাদের মাথায় রাখতে হবে—আমাদের প্রত্যেকটি কাজ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। "যখন মুখোমুখি হওয়ার দুজন পরস্পরের মুখোমুখি থাকে—একজন বসে ডানে, আরেকজন বামে। সে যে-কথাই উচ্চারণ করে, তার পাশেই থাকে সদাপ্রস্তুত এক পাহারাদার।" এই সূরার ১৭-১৮ নং আয়াতে পাওয়া যাবে এই অংশটুকু। অর্থাৎ আমরা মুখ দিয়ে যা-কিছুই উচ্চারণ করি না-কেন, তার সবকিছুই হুবহু তুলে ফেলছেন আমাদের দু'কাঁধে থাকা দুজন ফেরেশতা। ক্লোজ-সার্কিট বা সিসি ক্যামেরার সামনে কেউ কোনো অপকর্ম করার সাহস করে না। কারণ সে জানে, তার সবকিছু রেকর্ড করা হচ্ছে। তাকে খুঁজে পেতে কর্তৃপক্ষের একটুও বেগ পেতে হবে না। ঠিক তেমনি আমরা যদি এই বিষয়টি মাথায় গেঁথে নিই যে—আমাদেরকেও সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তা হলে আমাদের জন্যও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/১১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৩৩ নং আয়াতে জান্নাতিদের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, "যারা পরম করুণাময়কে অগোচরে ভয় করবে।" এর মানে হলো মানুষের সামনে আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে লোক-দেখানো একটা মনোভাব থাকতে পারে। কিন্তু ঘরের ভেতরে বা অন্ধকারে যখন আমরা একাকী থাকি, তখনকার খাঁটি ভয়টার কথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে। আমরা আল্লাহকে কেমন ভয় করি, তা বোঝার একটা মাপকাঠি আছে। আর তা হলো আমাদের নির্জনতাগুলো পরখ করা। নির্জন সময়টুকুতে আমাদের মাঝে আল্লাহভীতি ফুটে ওঠে কি-না। আল্লাহ-ওয়ালা মানুষদের নির্জনতার সময়গুলোও রঙিন থাকে আল্লাহর রঙে। মূলত উপকারী ভয় হচ্ছে প্রকাশ্য-গোপন উভয় অবস্থাতেই আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করা।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/১৯)

"নিঃসন্দেহে এতে এমন লোকের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে—যার বিবেক আছে অথবা যে চোখ-কান খোলা রেখে মনোযোগ দিয়ে শোনে।" এ-সূরার ৩৭ নং আয়াতে দেখুন আল্লাহ তাআলা 'أَوْ/অথবা' ব্যবহার করেছেন; 'وَ/এবং' ব্যবহার করেননি। এখানে একটি হিকমাহ আছে। সাধারণত দুই শ্রেণির মানুষ কুরআনের আয়াতগুলো থেকে উপকৃত হয়ে থাকে—প্রথম শ্রেণি: যারা জাগ্রত বিবেকের অধিকারী, অত্যন্ত মেধাবী; সামান্য মনোযোগেই তারা কুরআন থেকে দিক-নির্দেশনা লাভ করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণি : যারা আগের লোকদের মতো অতটা প্রস্তুত থাকে না। তাই যখন কুরআনের বাণী শোনে, তখন তাদেরকে সবদিক থেকে মনোযোগটাকে ফিরিয়ে আনতে হয়। কান লাগাতে হয় হিদায়াতের খোঁজে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ-দুটো শ্রেণিকেই উল্লেখ করেছেন এবং মাঝে 'অথবা' শব্দ বসিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এখন দেখার বিষয়, আমরা কোন দলে আছি? যেকোনো একদলে তো থাকতেই হবে। নইলে যে কুরআন থেকে উপকার লাভ করা কঠিন হয়ে যাবে।

(দেখুন—ইবনুল কাইয়িম, মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ১/৪৯০)

সূরা যারিয়াত

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ

তারতীব বিন-নুযুল।

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬৭-তম সূরা। এর আগে সূরা আহকাফ ও পরে সূরা গাশিয়া নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ।

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ক্বফ ও পরে সূরা তূর।

এক নজরে যারিয়াত

- হিজরতের দুই বছর আগে নাযিল
- সূরা নং: ৫১
- আয়াত: ৬০
- মাক্কি

নামের রহস্য

'যারিয়াত' শব্দের অর্থ 'দ্রুত গতিতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বায়ু'। সূরার ১ নং আয়াতে 'যারিয়াত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকেই সূরার নাম রাখা হয়েছে 'যারিয়াত'।

মেজর থিম

০১ আল্লাহভীরু মানুষদের বৈশিষ্ট্য।

০২ লূত ﷺ-এর জনগোষ্ঠী।

০৩ জীবনের উদ্দেশ্য।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর মানব-জাতির পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন: "তোমাদেরকে যা ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা নিশ্চিত সত্য।" আবার এই ওয়াদা সম্পর্কে আলোচনা দিয়েই সূরাটি শেষ হয়েছে : "আর এদেরকে যেদিনের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, সেদিন আমার পয়গাম প্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ক্বফ; যা শেষ হয়েছে পুনরুত্থানের আলোচনা দিয়ে। সূরা যারিয়াতের শুরুতে কসম খেয়ে বলা হয়েছে যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং মানুষের পুনরুত্থানও হবে: "তোমাদেরকে যা ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা নিশ্চিত সত্য।"

শানে নুযুল

অধিকাংশ মানুষই আখিরাতের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ করে। হাতেগোনা কিছু লোক যথাযথ ধারণা রাখলেও, বহু লোক একে একেবারে অস্বীকার করে। আবার কিছু লোক আছে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে, তবে ভুল ধারণা নিয়ে। তারা মনে করে, মরার পর আবার জীবিত হয়ে এই দুনিয়াতেই আবার আসব। এবার এসেছি মানুষ হয়ে, তো পরেরবার আসব ইঁদুর বা বাদুড় হয়ে! এর পরেরবার হয়তো আবার অন্যকিছু হয়ে। অর্থাৎ একেক মানুষ একেক দৃষ্টিভঙ্গিতে আখিরাতকে বিবেচনা করে। তার মানে, তাদের এই ধারণার পেছনে জ্ঞানের কোনো উৎস নেই। বরং সব আন্দাজ-অনুমান। সঠিক তো তারাই, যারা কুরআনিক রেফারেন্সে কথা বলে। কুরআনে যা বলা হয়েছে, সে-হিসেবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। আর যারা আন্দাজে কথা বলে, তাদের পরিণতি তো ভয়াবহ হবে। কারণ তারা তাদের রবকে চিনতে পারেনি। রবের বাণীকে সত্য হিসেবে মেনে নেয়নি। তাদের উপাসনা পায় কয়েকটা মাটির মূর্তি। যেগুলো তাদেরকে তো রিযিক দিতেই পারে না, উলটো পূজারির 'প্রসাদ'-এর সামনে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! মোটাদাগে আল্লাহ তাআলা আখিরাত ও তাওহীদের দাওয়াত দিতেই এই সূরাটি নাযিল করেছেন। সূরাটি ছোট হলেও, বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৮/৪৪৪; তাফহীমুল কুরআন, ১৫/১৩০)

সেগমেন্ট

আল্লাহর শপথ

সূরার একেবারে শুরুর অংশেই আল্লাহ শপথ করে বলেন—পরকাল ও এর হিসাব-নিকাশ অবশ্যই হবে।

উপেক্ষা ও মনোযোগের নীতি

যারা আগে থেকে গোঁ ধরে বসে আছে—'যত যা-ই হোক, ঈমান আনব না'—তাদের পেছনে অযথা সময় নষ্ট না করে, মুমিনদের প্রতি বেশি করে নজর দিতে হবে।

শাস্তির জন্য তাড়াহুড়োর দরকার নেই

যারা অপরাধী, তাদের জন্য আল্লাহর শাস্তি ঠিক করা আছে। তারা দুনিয়া ও আখিরাত—দু-জায়গাতেই ধরা খাবে। তাড়াহুড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

ফজিলত

এই সূরাটি মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহর অনুগত বান্দারা রাতের অল্প সময় ঘুমায় ও শেষ রাতে জেগে উঠে রবের কাছে ক্ষমা

ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর হয়, আর সেই সাথে জীবনে আসে গতি, শৃঙ্খলা ও প্রশান্তি।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর কর্তৃত্ব ও মানুষের দায়িত্ব

১. আল্লাহর অপার নিদর্শন
সূরার শুরুতেই আল্লাহ বেশকিছু নিদর্শন তুলে ধরলেন। সেগুলোর নামে শপথ করলেন। অবাক হয়ে দেখতে হয়—আল্লাহর শপথের বিষয়গুলোর মধ্যে কী চমৎকার যোগসূত্র রয়েছে।

২. অতীত পর্যালোচনা ও শিক্ষা
এ-পর্বে কুরআনের বর্ণনা মোড় নেয় ভিন্ন দিকে। যেখানে দেখানো হয়েছে অতীতের অবাধ্য জাতিগুলোর পরিণতি। আর আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে বার্তা।

৩. মানুষ ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য
কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত ও আনুগত্য করতে হবে। মাথা পেতে দিতে হবে কেবল তাঁরই হুকুমের সামনে। এজন্যই সৃষ্টি হয়েছে এই দুই জাতি। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দায়িত্ব তো এমনই।

৪. কিয়ামাত ও শেষ বিচার
অপরাধীরা কিয়ামাত ও শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান রাখে না। তাই তারা মজা করে বলে, 'তাড়াতাড়ি শাস্তি নিয়ে আসো।' আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ওয়াদা পূরণ হবেই।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ঘটনা নিশ্চিত সত্য। তবে যারা একে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য থাকবে ভয়াবহ শাস্তি।	১-১৪	আগেকার কিছু জাতির বিবরণ তুলে ধরা হয়—অবাধ্যতার দরুন আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করে দেন।	৩১-৪৬
মুত্তাকীদের চারটি বিশেষ কোয়ালিটির কথা জানানো হলো। এর বিনিময়ে পরকালে তারা থাকবে বাগান ও ঝরনাধারায়।	১৫-১৯	এ-পর্যায়ে আল্লাহ মানুষের জন্য তিনটি গভীর ভাবনার উপকরণ দিলেন—মহাকাশ, পৃথিবী ও জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ-প্রাণী সৃষ্টি।	৪৭-৪৯
আল্লাহর তিনটি বিশেষ নিদর্শন—মহাকাশ, পৃথিবী ও মানুষ। এ-সকল সৃষ্টির ওপর তাঁর ক্ষমতাই সর্বোচ্চ।	২০-২৩	মুক্তির রাস্তা খুঁজে পেতে হলে, সকল অবাধ্যতা থেকে পালিয়ে আল্লাহর আশ্রয়ে আসতে হবে।	৫০-৫১
ফেরেশতাদের আগমন ও ইবরাহীম ﷺ-কে পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ প্রদান। ইবরাহীম ﷺ-এর স্ত্রী ভীষণ আনন্দিত হন।	২৪-৩০	জিন ও মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। আর অবাধ্যদের জন্য বরাদ্দ আছে কঠিন শাস্তি।	৫২-৬০

কেইস-স্টাডি

ধরুন, জীবনের কোনো একটা জায়গায় ভীষণভাবে আটকে গেছেন। শত চেষ্টা করেও বেরোবার পথ পাচ্ছেন না। জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে পড়েছেন। ভাবছেন—আর বুঝি কিছুই করার নেই। না, ব্যাপারটা তেমন না। আল্লাহ যদি আপনার সাথে থাকেন, তা হলে হাজারো প্রতিকূল অবস্থা থেকে আপনি বের হয়ে আসতে পারবেন। এই যেমন এই সূরার ২৮-৩০ নং আয়াতের দিকে লক্ষ করুন। তখন ইবরাহীম ﷺ তো বৃদ্ধ বটেই, সেই সাথে তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বন্ধ্যা। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তাঁদেরকে পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ শোনালেন। দান করলেন ফুটফুটে ধৈর্যশীল এক সন্তান ইসমাঈল। তাই জীবনে কোনো বাধার দেয়াল সামনে এলে, কোনো বিপদ-মুসিবত থেকে মুক্তি অসম্ভব মনে হলে, কেবল আল্লাহর কুদরতের কথা ভেবে এই আয়াতগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবেন। দেখবেন, হতাশার মেঘ সরে গিয়ে আপনার সামনে হাজির হয়েছে আলো ঝলমলে দিন।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৭/৪৭; সা'লাবি, তাফসীর, ২৪/৫৪৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

২৬ নং আয়াতে মেহমানদারির দারুণ কিছু সবক রয়েছে আমাদের জন্য। ঘটনা হলো, কয়েকজন ফেরেশতা লূত ﷺ-এর কওমকে ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছেন। পথে তাঁরা ইবরাহীম ﷺ-এর বাড়িতে থেমেছেন; একটা সুসংবাদ দেওয়ার জন্য। তাঁরা আসামাত্রই ইবরাহীম ﷺ কী করলেন, আয়াতে দেখুন—"এরপর তাদেরকে বুঝতে না দিয়ে সে তার পরিবারের কাছে যায়। কিছুক্ষণ পর সে একটা মোটাতাজা বাছুর (ভুনা করে) এনে তাদের সামনে পরিবেশন করে।" আয়াতটি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে কয়েকটি বিষয় আমরা লক্ষ করব—বাড়িতে মেহমান এলে, তাদের খাবারের প্রথম আয়োজনটা যত দ্রুত সম্ভব করে ফেলতে হবে। আবার আয়োজনটা তাদেরকে জানিয়ে করতে হবে যে—আপনারা বসুন, আপনাদের জন্য খাবার আনছি—এরকম নয়। বরং তাদের অগোচরেই আয়োজনটা হতে পারে। নইলে তো মেহমানরা অস্বস্তিতে পড়বে! আবার খেয়াল করুন, ইবরাহীম ﷺ একটা মোটাতাজা বাছুর ভুনা করে এনেছিলেন। এখান থেকে বোঝা যায়—সাধ্য অনুযায়ী খাবারটা একটু মানসম্মত করতে হবে। ইসলাম আসলে মেহমানদেরকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে। তাই, মেহমানদারির প্রতি আগ্রহই প্রমাণ করবে, আপনার ঈমানের গভীরতা কতটুকু। সুতরাং মেহমানের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করাটা আমাদের জন্য জরুরি।

অনেকেই মেহমানকে বোঝা বা বাড়তি চাপ মনে করে। এমনটা ভাবা উচিত নয়। কারণ, মেহমান তার সাথে নিজের রিযিকও নিয়ে আসেন। আপনার রিযিক সে খেয়ে ফেলবে না। যেমনটা এই সূরার ২২ নং আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের রিযিক এবং তোমাদেরকে যে (পুরস্কার ও শাস্তির) ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে—সবই আকাশে আছে।"

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ২২৮/১৭৭)

সূরা তূর

سُوْرَةُ الطُّوْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭৬-তম সূরা। এর আগে সূরা সাজদা ও পরে সূরা মুলক নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা যারিয়াত ও পরে সূরা নাজম।

এক নজরে তূর

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৫২
- আয়াত: ৪৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

'তূর' শব্দের অর্থ 'পাহাড়; পর্বত'। পবিত্র কুরআনে 'তূর' বলতে 'সিনাই' পাহাড়কে বোঝানো হয়। এই সিনাই পাহাড়েই মুসা ﷺ আল্লাহর সাথে কথা বলেছিলেন। সূরার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ এই পাহাড়ের নামে শপথ করেন। সেখান থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে 'তূর'।

মেজর থিম

০১. আল্লাহর শাস্তি সরাবার ক্ষেত্রে মানুষের অক্ষমতা।

০২. অনুগত বান্দাদের পুরস্কার।

০৩. রাসূলের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের মনোভাব।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে আছে কাফিরদের শাস্তির নিশ্চয়তা, "তোমার রবের (ঘোষিত) শাস্তি কার্যকর হবেই।" আর সূরাটি শেষ হয়েছে নবি ﷺ-কে এই আদেশ দিয়ে যে, তিনি যেন কাফিরদেরকে ছেড়ে দেন। কারণ আল্লাহর শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই শাস্তি থেকে তাদের কোনো নিস্তার নেই: "সুতরাং তাদেরকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ-না তারা তাদের সেদিনের মুখোমুখি হচ্ছে, যেদিন তারা ধ্বংস হবে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা যারিয়াত; যার শেষে আল্লাহ তাআলা শাস্তির ব্যাপারে কাফিরদেরকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন। আর কাফিরের দল আবেদন করুক আর না করুক, এই শাস্তি যে অবশ্যই আসবে, আল্লাহ তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন সূরা তূরের প্রথম অংশে—"তোমার রবের (ঘোষিত) শাস্তি কার্যকর হবেই।"

শানে নুযুল

আখিরাতের অস্তিত্ব অবশ্যই সত্য। আর একে থামানোর মতো শক্তি কারও নেই। আখিরাতের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে—এমন অনেক নিদর্শন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আর এই সূরাতে সে-রকম কয়েকটি নিদর্শনের শপথ করেছেন তিনি। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝালেন। তিনি জোর দিয়ে এই ঘোষণা দিলেন—'কিয়ামাত অবশ্যই হবে, আর তোমাদেরকে সেই পরকালের মুখোমুখি হতে হবে, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে রেখেছ। যে নবি নিজের কোনো স্বার্থ ছাড়াই তোমাদের পেছনে জীবনটাকে বিলিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর দিকে ফিরেও তাকাও না। বরং নানা ধরনের অপবাদ দিয়ে তাঁর জীবনটাকে সংকীর্ণ করার চেষ্টা করছো! এমনকি কীভাবে তাঁকে চিরতরে ধ্বংস করা যায়, সেই চেষ্টার কমতিও করছো না। এভাবে নিজেদের জাহিলিয়াতের মধ্যেই ডুবে রয়েছ! এর ফল যে কত ভয়াবহ, তা কোনোভাবে আঁচ করতে পারছো না।' অপরদিকে—যারা আখিরাতের ওপর বিশ্বাস এনেছে, রাসূলের আনুগত্য করে ভালো ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্য যে কত কত নিয়ামাত অপেক্ষা করছে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। মূলত আখিরাতের ওপর ঈমান আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেই এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৯/১-২)

সেগমেন্ট

শাস্তির ওয়াদা

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা কিছু বিষয়ের ওপর শপথ করেছেন। এরপর এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, অবাধ্যদের জন্য তিনি যে শাস্তি ঘোষণা করেছেন, তা সত্য হবেই।

সুখবর

সূরার দ্বিতীয় অংশে দেখানো হয়েছে—যারা আল্লাহর অনুগত হবে, তাদের জন্য কী কী পুরস্কার থাকছে।

কাফিরদের মন্তব্যের জবাব

কাফিরদের বেশ কিছু অমূলক আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে সূরার শেষদিকে।

ফজিলত

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পড়তেন। জুবাইর ইবনু মুতয়িম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-কে মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পড়তে শুনেছি।'

(বুখারি, ৩০৫০; মুসলিম, ৪৬৩)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে কোনো লাভ নেই;

কারণ, যারা এ-ধরনের চক্রান্ত করে, দিনশেষে তারাই সেই চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
আল্লাহর ওয়াদা ও পরকালের বাস্তবতা

১. আল্লাহর শপথ
বেশ কিছু বিষয়ের ওপর আল্লাহ শপথ করেছেন। এরপর অবাধ্যদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন—আল্লাহর ঘোষিত শাস্তি কার্যকর হবেই।

২. অফুরন্ত সুখের স্থান
যত সুখ-শান্তি কিংবা ভালো লাগা আছে—তার সবই মিলবে জান্নাতে। তবে তা পেতে চাইলে, হতে হবে আল্লাহর অনুগত বান্দা।

৩. সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিণতি
যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে, তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে ভয়ংকর আযাব।

৪. ধৈর্য ধরার আদেশ
আল্লাহর ফায়সালা সত্যে পরিণত হবেই। তাই ধৈর্য ধরতে হবে। আর জীবনভর আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে যেতে হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ যে শাস্তির ওয়াদা করেছেন, তা সত্য হবেই। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।	১-৮	বিরুদ্ধবাদীদের মন্তব্যের জবাব। এ ছাড়া যারা আল্লাহর পয়গাম নিয়ে সন্দেহে ভোগে, তাদের বিবেকের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন।	২৯-৪৭
কিয়ামাতের দিন আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যানকারীদের ভীষণ দুর্ভোগ পোহাতে হবে। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।	৯-১৬	রাসূলকে নির্দেশ দেওয়া হলো—ধৈর্য ধরো ও তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনা করো। এই নির্দেশ মুমিনদের ওপরও বর্তায়।	৪৮-৪৯
আল্লাহর অনুগত বান্দারা পরকালে থাকবে আরাম-আয়েশ, অফুরন্ত অবসর আর নয়নাভিরাম সব অনুগ্রহের ভেতর।	১৭-২৮		

কেইস-স্টাডি

কিয়ামাতকে মিথ্যে বলাটা ভীষণ অন্যায়। এটা অসম্ভব যে—আল্লাহ এই পৃথিবীকে কোনো কারণ ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি করেছেন, তারপর এখানকার সবকিছুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। এ-ও হতে পারে না যে—এখানে যার যা মন চাইবে, তা-ই করবে, অন্যের ওপর জুলুম করবে, আর তার কোনো বিচার হবে না। হ্যাঁ, দুনিয়ার আদালতে বিচার হয়তো না-ও

হতে পারে। ক্ষমতার দাপটে কিংবা আইনের মারপ্যাঁচে অপরাধীরা রায়কে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আল্লাহর আদালতে এসবের কোনো সুযোগ নেই। সেখানে অবশ্যই ন্যায়-বিচার হবে। কিছু মানুষ শুধু অস্বীকারই করে না, বরং কিয়ামাত নিয়ে স্রেফ হাসি-ঠাট্টায় মেতে থাকে। এই সূরার ১২-১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে—"যারা (দুনিয়ার) পরীক্ষার মধ্যে খেলায় মজে আছে, সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (আর বলা হবে,) 'এই সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে!'" তাই এই আয়াতটি নিয়ে আমাদের সকলেরই স্টাডি করা উচিত। যাতে পরকালের সত্যতা মনে গেঁথে যায়, এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করার পাথেয় পাওয়া যায়।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২১/৫৭৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"(মুমিনদেরকে বলা হবে) তোমরা যেসব কাজ করে এসেছ, তার বিনিময়ে মজা করে পানাহার করো।" এ-সূরার ১৯ নং আয়াত এটি। এখানে هَنِيٓـًٔا/'মজা করে' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। জান্নাতে খাবারের জন্য মানুষকে কোনো প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম করতে হবে না। সেগুলো কখনো শেষও হবে না। যত খুশি তত খাও—রোগ-বালাইয়ের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তা ছাড়া সেসব খাদ্য কোনো প্রকার বর্জ্যও সৃষ্টি করবে না। তাই পৃথিবীতে মজা করে পানাহার করা, আর জান্নাতে মজা করে পানাহার করা—আকাশ-পাতাল তফাত! আসলে পৃথিবী নয়, জান্নাতই হলো পুরোদমে উপভোগ করবার জায়গা।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ২৮/২০৬)

জান্নাতি লোকদেরকে জান্নাতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলবে, "আমরা ইতঃপূর্বে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে থাকাকালে (আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে) ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করতাম।" এই সূরার ২৬ নং আয়াতে, পরিবারের মধ্যে থাকাকালে ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করার কথা তুলে ধরা হয়েছে—বিশেষত এ-কারণে যে—মানুষ বেশিরভাগ সময় গুনাহে লিপ্ত হয় তার স্ত্রী-সন্তানের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতে গিয়ে। এ জন্য সে হারাম উপার্জনের দিকে পা বাড়ায়। দুর্নীতি করে। অন্যের হক নষ্ট করে। কিন্তু মুমিনরা বলবে, আমরা দুনিয়াতে বিলাসিতায় ডুবে থাকিনি। শুধু নিজেদেরকে নিয়ে মগ্ন থেকে গাফলতির জীবনও কাটাইনি। সেখানে সব সময়ই ভয়ে ভয়ে থাকতাম। আর এ-কারণেই জান্নাতে যাওয়ার কারণ হিসেবে মুমিনরা এ-বিষয়টি উল্লেখ করবে। আসলে দুটি ভয় কখনো একত্রিত হবে না—দুনিয়ায় থাকতে আল্লাহর পাকড়াওয়ের ভয়, আর আখিরাতে গিয়ে আল্লাহর আযাবের ভয়। কারণ, যারা আল্লাহকে ভয় করে দুনিয়া-যাপন করবে, আখিরাতে তারা হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৪৮; আবুস সাঊদ, তাফসীর, ৮/১৫০)

সূরা নাজম

سُوْرَةُ النَّجْمِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২৩-তম সূরা। এর আগে সূরা ইখলাস ও পরে সূরা আবাসা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা তূর ও পরে সূরা কমার।

এক নজরে নাজম

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৫৩
- আয়াত: ৬২
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘নাজম’ শব্দের অর্থ ‘ধীরে ধীরে নাযিল হওয়া’। আবার বিশেষ্য (Noun) হিসেবে এর অর্থ ‘নক্ষত্র; আকাশের তারা’। সূরার ১ নং আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে ‘নাজম’।

মেজর থিম

০১. কুরআন নাযিল প্রসঙ্গ।

০২. আল্লাহর অবাধ্যদের পরিণতি।

০৩. মুশরিকদের সংশয়পূর্ণ মনোভাব।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা সূরা নাজমের শুরুতেই রাসূল ও কুরআনের ব্যাপারে বলেছেন, "সে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ এই কুরআন) মনের খায়েশ থেকে বলে না, এটা কেবল সেই পয়গাম, যা (তার কাছে) পাঠানো হয়।" তবুও কাফিরের দল রাসূলের কথা মেনে নেয় না। এ প্রসঙ্গে সূরাটির শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা বলেন, "এই বার্তা কি তোমাদের কাছে আজব মনে হচ্ছে?...আর (শিক্ষা গ্রহণ না করে) খেল-তামাশায় মজে আছো?"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা তূর; যা শেষ হয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী দিয়ে: "আর তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো রাতের বেলা ও (ফজরের সময়) যখন তারকারাজি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।" আর সূরা নাজমের শুরুতেও পাওয়া যায় তারকারাজির কথা—"শপথ নক্ষত্রের, যখন তার পতন ঘটে।"

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নুবুওয়াতের পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই লম্বা সময়ে ঘরোয়া পরিবেশে আর বিশেষ বিশেষ বৈঠকে কুরআনের বাণী শোনাতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু সব মানুষকে একত্রিত করে অর্থাৎ সামষ্টিকভাবে কুরআনের আলোচনা করার সুযোগ পাননি। এর কারণ—মক্কার মুশরিকদের বাধা। নবিজি যখনই কোনো দল বা গোত্রকে দাওয়াত দিতে যেতেন, তখনই কুরাইশরা সেখানে ঝামেলা শুরু করে দিত। এমন হট্টগোল করত যে, কিছুই শোনা যেত না। রাসূলের ব্যক্তিত্ব ও মানুষের ওপর কুরআনের প্রভাব কেমন, তা কুরাইশরা ভালোভাবেই জানত। তাই তারা রাসূলকে পাগল, বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট ইত্যাদি বলে বেড়াতে লাগল। ওরা এ-ও দাবি করত—এই কুরআন সে নিজে নিজে বানিয়ে বলছে। যা-ই হোক, সেই বছর একটা সুযোগ এল—একটি জনসমাবেশে নবিজি বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেলেন। এই সমাবেশে মুসলিম-কাফির সব ধরনের মানুষই উপস্থিত ছিল। তিনি এই সূরাটিকে বক্তৃতা আকারে সকলের সামনে পেশ করলেন। এরপর যখন সাজদার আয়াত এল, তখন সাজদা করলেন। আর তাঁর সাথে সাথে উপস্থিত মুসলিম-কাফির সকলেই একযোগে আল্লাহর উদ্দেশে সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। মূলত কাফিরদের এরকম নানামুখী বিরোধিতার আলোচনা নিয়েই এ-সূরাটি নাযিল হয়েছে। ওরা কুরআন ও নবিজির বিষয়ে যে আচরণ ও নীতি অবলম্বন করেছিল, সেই নীতির সমালোচনা ও সে-ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৯/৪০; তাফহীমুল কুরআন, ১৬/১)

সেগমেন্ট

মি'রাজ

মি'রাজে গিয়ে রাসূল ﷺ বড় বড় অনেক নিদর্শন দেখেছিলেন। তাঁর চোখ ভুলে কিছু দেখেনি। আর তাঁর ওপর যে ওহি এসেছে, সেটাও তাঁর মনগড়া কিতাব না। সূরার শুরুতে আল্লাহ এসব কথা জানিয়ে দিলেন।

মুশরিকদের মনগড়া বিচার

মুশরিকরা নিজেদের জন্য মেয়ে সন্তান পছন্দ করে না। অথচ তারা দাবি করে—ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে! নাউযুবিল্লাহ।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা আগেকার নবিদের ওপর বেশ কতগুলো কিতাব নাযিল করেছেন। সেই সকল কিতাবের সারাংশ হচ্ছে আল-কুরআন।

ফজিলত

ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার নবি ﷺ সূরা নাজম তিলাওয়াতের পর সাজদা করেন। তখন তাঁর সাথে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জিন ও ইনসান সবাই সাজদা করেছিল।'

(বুখারি, ১০৭১)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আমাদের উচিত নম্রতার সাথে মনোযোগ দিয়ে কুরআন শোনা;

তা হলে কুরআনের বাণী অন্তরে গভীর দাগ কাটবে, এবং আত্মাকে জাগিয়ে তুলবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের আহ্বান

১. রাসূলের সততা

আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনোই তাঁর ব্যক্তিগত কোনো কথা কুরআনে ঢোকাননি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২. শির্কের সমালোচনা

মানুষ নিজেদের হাতে মূর্তি বানায়। ওগুলোর নাম রাখে। এরপর ওগুলোর সামনেই আবার মাথা ঠুকে এটা-সেটা চায়! মানুষের দ্বারা এটা কীভাবে সম্ভব!

৩. শাস্তি ও শিক্ষা

অতীতে যারা এই শির্ককে আঁকড়ে ছিল—তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই ইতিহাস থেকে নিতে হবে শিক্ষা, ছাড়তে হবে শির্ক।

৪. নত হওয়ার আদেশ

সূরাটি শেষ হয়েছে আল্লাহর সামনে মাথা নোয়াবার (বা সাজদা করার) আদেশ প্রদানের মাধ্যমে। এতেই মিলবে মানুষের মুক্তি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর রাসূল পথভ্রষ্ট নন। তাই কুরআনের নামে নিজের কথা চালিয়ে দেবেন, এমন চিন্তার কোনো সুযোগ নেই।	১-৪	আন্দাজ-অনুমান দিয়ে জ্ঞানের কাজ হয় না। দুনিয়া-লোভীদের এড়িয়ে চলতে হবে।	২৪-৩০
প্রচণ্ড শক্তিশালী ফেরেশতা জিবরীল ﷺ রাসূলের কাছে ওহির বাণী পৌঁছে দেন। রাসূলকে করানো হয় মি'রাজ।	৫-১৮	পাপী ও নেককারদের প্রতিদান সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	৩১-৩২
মূর্তির ব্যাপারে মুশরিকদের চিন্তা-ভাবনা খুবই উদ্ভট। মানুষের সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।	১৯-২৩	মুশরিকদের ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণস্বরূপ তাঁর বার্তাগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।	৩৩-৬২

কেইস-স্টাডি

“তাকে শেখায় প্রচণ্ড শক্তিশালী সুঠামদেহী এক (ফেরেশতা)। সে নিজের আসল আকৃতিতে হাজির হয়েছিল: যখন সে ছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে, তারপর কাছে এল, আরও কাছে, একপর্যায়ে ব্যবধান থাকল দুই ধনুকেরও কম; এরপর তিনি তাঁর গোলামের কাছে যে পয়গাম পাঠানোর তা পাঠালেন।” এ-সূরার ৫-১০ নং আয়াতে জিবরীল ﷺ-এর সাথে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্লোজ ইন্টারেকশান দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাছে বার্তা পাঠাবেন। সেটা তিনি যেন-তেনভাবে পাঠালেন না। বরং শক্তিশালী, সম্মানিত এক ফেরেশতার মাধ্যমে পাঠালেন। তার মাধ্যমে রাসূলকে শেখালেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনে একজন পথ-নির্দেশক বা মেন্টরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে পারি। যিনি আমাদের অবস্থা বুঝে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান বাতলে দেবেন। যার সাথে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক থাকবে। ভালো-মন্দ সকল পরিস্থিতিতে তিনি আমাদেরকে সঠিক উপদেশ দিতে পারবেন।

(দেখুন—বুখারি, ১০০; মুসলিম, ৫৫; আবু দাউদ, ৪৯৪৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার শুরুতে নক্ষত্ররাজির শপথ করে বলা হয়েছে—রাসূলুল্লাহ ﷺ পথ হারাননি এবং তিনি ভুল পথও বেছে নেননি। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি পেয়েছেন। এর পেছনকার কারণ খুঁজলে দেখা যায়, ওহির সাথে আকাশের তারাদের দারুণ একটা মিল আছে। তারকারাজি হলো আকাশের সৌন্দর্য। আর ওহি হলো জমিনের শোভা। জমিনে যদি নবি-রাসূলরা ওহির জ্ঞানকে ছড়িয়ে না দিতেন, তা হলে অজ্ঞতা-মূর্খতার ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে যেত দুনিয়া। ঠিক যেমন করে তারাহীন অমাবস্যার রাত নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা পড়ে। এখান থেকে আরেকটা বিষয় বুঝে আসে—ওহির জ্ঞান থাকলে মানুষ হয় আলোকিত। আর ওহির জ্ঞান-শূন্য হলে, মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানুষ হয়ে যায় পশুতুল্য বা তার চেয়েও জঘন্য। যেমনটি আমরা কুরআনের অন্য সূরাতেও দেখতে পাই; যেমন : সূরা আ'রাফের ১৭৯ এবং সূরা ফুরকানের ৪৪ নং আয়াতে।

(দেখুন—সা'দি, তাফসীর, ৩১৮)

নবি ﷺ সম্পর্কে সূরাটির ৩-৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “সে নিজের খেয়াল-খুশিমতো কথা বলে না। যা তার কাছে নাযিল করা হয়, তা ওহি ছাড়া আর কিছুই নয়।” এখান থেকে সাব্যস্ত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যেসব হাদীস প্রমাণিত আছে, সেগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো ওহি। তাই কুরআনকে যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই, ঠিক তেমনি হাদীসের ব্যাপারেও দ্বিধা বা সংশয়ে থাকার উপায় নেই। কুরআন হলো মূলপাঠ আর হাদীস হলো তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সুতরাং একটা রেখে কেবল আরেকটাকে আঁকড়ে ধরা যুক্তিসংগত নয়।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৭/৮৫)

সূরা কমার

سُوْرَةُ الْقَمَرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩৭-তম সূরা। এর আগে সূরা তারিক ও পরে সূরা সোয়াদ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫৪ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা নাজম ও পরে সূরা আর-রহমান।

এক নজরে কমার

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৫৪
- আয়াত: ৫৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘কমার’ শব্দের অর্থ ‘চাঁদ’। নবিজির হাতের ইশারায় চাঁদ দু-টুকরো হয়ে দু’দিকে সরে যায়। সবাই তা স্বচক্ষে দেখতেও পেয়েছিল। সূরার শুরুর আয়াতে সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সেখান থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে ‘কমার’।

মেজর থিম

০১ রাসূল ﷺ-এর মু'জিযা।

০২ কিয়ামাতের সময়কার দৃশ্য।

০৩ অতীতের উদাহরণ ও মানুষের জন্য উপদেশ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক।

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ বলেন, “কিয়ামাতের সময়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। অথচ তারা নিদর্শন দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলছে, ‘এটা চোখের ভুল!’” এই অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ নানাভাবে শাস্তি দেবেন। তবে তাদের মূল শাস্তি হবে শেষ বিচারের দিন। সূরার শেষদিকে আল্লাহ বলেন, “অবশ্য তাদের (আসল শাস্তি দেবার) প্রতিশ্রুত সময় হলো কিয়ামাত, আর কিয়ামাত অত্যন্ত ভয়ংকর ও ভীষণ তিক্ত জিনিস।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা নাজম; যার শেষে কিয়ামাতের সময়কাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: “(জবাবদিহিতার চূড়ান্ত সময়ক্ষণ) যা একেবারে কাছে, তা আরও কাছে চলে এসেছে।” সূরা কমারের শুরুটাও হয়েছে এই একই বিষয়কে কেন্দ্র করে: “(জবাবদিহিতার) চূড়ান্ত সময়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।”

শানে নুযুল

রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে দাওয়াত দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। আর ওরাও পারলে নবিজির কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচে। কাফিররা তখন জোরেশোরে বিরোধিতা শুরু করলেও, শারীরিকভাবে জুলুম-নির্যাতন শুরু করেনি। তো মাথায় কি-না-কি এল— নবিজিকে তারা বলে বসল, ‘আগেকার নবিদের তো কত মু’জিযা ছিল, তোমার থেকে কখনো কোনো মু’জিযা দেখিনি। তুমি যদি সত্যিই আল্লাহর নবি হয়ে থাকো, তা হলে আকাশের চাঁদটাকে দুই ভাগ করে দেখাও দেখি। যদি দেখাতে পারো, তা হলে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনব।’ এর আগেও তারা মু’জিযা দেখতে চেয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তা দেখাননি। এবার নবিজি আল্লাহর কাছে দুআ করতেই তা কবুল হয়ে গেলো। এরপর নবিজি নিজের শাহাদাত আঙুল চাঁদের দিকে ইশারা করে চাঁদটাকে চিরে ফেললেন। আর বাস্তবেও চাঁদটা দুটো খণ্ড হয়ে সরে গেল দুই দিকে। এই দৃশ্য কাফিররা নিজেদের চোখ দিয়েই দেখল। কিন্তু ওই যে গোঁয়ার্তুমি! তারা তো কোনোভাবেই সত্যকে মেনে নেবে না। তাই এই ঘটনাটিকে-ও ‘জাদু’ ও ‘চোখের ভুল’ বলে দিলো। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেন। যেখানে মুশরিকদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেন তিনি। ওরা যে কেবল হঠকারী জাতি, তা তিনি দেখিয়ে দেন। আর এই হঠকারিতার পরিণতির ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করেন ওদেরকে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৯/৮৬; তাফহীমুল কুরআন, ১৬/৪৩)

সেগমেন্ট

কাফিরদের বৈশিষ্ট্য

সূরার পয়লা অংশেই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—শত নিদর্শন বা মু'জিযা দেখেও কাফিররা ঈমান আনবে না।

আগেকার জাতির ইতিহাস

আগেকার জাতিগুলোর ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে সূরার উল্লেখযোগ্য একটি অংশে। এর কারণ, মানুষকে স্মরণ করানো, উৎসাহ দেওয়া ও সতর্ক করা।

মুমিনদের জন্য সুখবর

সূরার শেষ আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীদের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

ফজিলত

দুই ঈদে তিলাওয়াত করা সুন্নাহ: উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ একবার আবু ওয়াকিদ লাইসি ﵁-কে জিজ্ঞেস করেন, 'ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে আল্লাহর রাসূল ﷺ কী পড়তেন?' জবাবে তিনি বলেন, 'তিনি দুই ঈদে সূরা ক্বফ ও সূরা কমার পড়তেন।'

(মুসলিম, ৮৯১; আহমাদ, ২১৮৯৬)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

চাঁদ দু-খণ্ড হওয়ার ঘটনাটি একে-অন্যের সাথে শেয়ার করুন ও পুরো মুসলিম কমিউনিটিতে ছড়িয়ে দিন;

এতে আল্লাহর ওপর সবার ঈমান বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তার খোরাক জোগাবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বাস্তব-জীবনে প্রয়োগ

১. কাফিরদের উদাসীনতা
চোখের সামনে জ্বলজ্বলে নিদর্শন দেখানো হলো। কাফিররা 'চোখের ধাঁধা' বলে এড়িয়ে গেল। তারা সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যের সাথে সন্ধি করল।

২. ইতিহাস পর্যালোচনা
ইতিহাস ঘাঁটলেই মানুষ দেখতে পাবে—আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতি কেমন!

৩. হাল-আমলের জাতিগুলোর প্রতি বার্তা
আগেকার জাতিগুলোর ইতিহাস বর্ণনা করার একটাই কারণ—এখনকার অবাধ্য লোকদেরকে সাবধান করে দেওয়া।

৪. কুরআন: বিশ্বস্ত রিমাইন্ডার
কুরআন এমন এক কিতাব, যে কিনা মানুষকে কেবল কল্যাণের পথেই ডাকে। বারবার তাদের ভুলগুলো শুধরে দেয়। সঠিক রাস্তায় চলার পরামর্শ দেয়, পথ দেখায়।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
চাঁদ দু-খণ্ড হওয়ার নিদর্শন এবং এর প্রতি মুশরিকদের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা।	১-৮	লূত ﷺ-এর জাতির প্রতিক্রিয়া ও তার ফলাফলের ওপর আলোকপাত।	৩৩-৪০
নূহ ﷺ-এর সাথে তার জাতির লোকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা।	৯-১৭	ফিরআউনের জনগোষ্ঠীকে দেওয়া শাস্তির ব্যাপারে আলাপ করা হয়েছে।	৪১-৪২
হূদ ﷺ-এর জাতির লোকদের ওপর ধেয়ে আসা ভয়ানক শাস্তির কথা।	১৮-২২	মক্কার কাফিরদের হাসি-ঠাট্টা এবং অপরাধীদের শেষ পরিণতি দেখানো হলো।	৪৩-৫৩
সালিহ ﷺ ও তার জাতির লোকদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।	২৩-৩২	মুত্তাকীদেরকে দেওয়া হয়েছে পুরস্কারের নিশ্চয়তা।	৫৪-৫৫

কেইস-স্টাডি

মক্কার মুশরিক নেতাদের দিকে ইঙ্গিত করে এই সূরার ৩ নং আয়াতে বলা হয়, "তারা (আল্লাহর বার্তাকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, আর নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে; অচিরেই সবকিছুর ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যাবে!" মুশরিক নেতারা দেখল আল্লাহর স্পষ্ট মু'জিযা— তাদের চোখের সামনেই চাঁদটা দু-টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু তারা সত্যকে

সত্য বলে মেনে নিল না। মেনে নেবেই-বা কী করে! তাদের হৃদয়টা যে মিথ্যে গর্ব আর অহংকারে ভরা! এবার আজকের দুনিয়ার দিকে একটু তাকানো যাক। সারা দুনিয়ায় এতগুলো দেশের মধ্যে কতগুলো নেতা! কিন্তু ক'জন নেতা সত্যকে চিনতে পারে! তাদের ভেতর অহংকারের বীজ এতটাই পোক্ত যে, তারা ভালো কোনো উপদেশ নিতে পারে না। তাদের নিজেদের কাছে যেটা ভালো মনে হয়, তারা তা-ই করে। এতে কে মরল আর কে বাঁচল, তাতে তাদের কী যায়-আসে? জুলুম-নির্যাতনে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে একধাপ এগিয়ে, তারা জালিমের ত্রাণকর্তা হিসেবে হাজির হয়। তবে তাদের সামনেও সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। মক্কার মুশরিকদের মতো এরাও পদে পদে নাকানি-চুবানি খাবে নিশ্চিত।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৮৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে—"উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণ করার আছে কি কেউ?" সুবহানাল্লাহ! আমাদের দেশের হিফজ-খানাগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, কচিকাঁচা ছেলেমেয়েরা পুরো কুরআন মুখস্থ করছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন হিফজ-করা কত সহজ করে দিয়েছেন। এটিই কুরআনের সত্যতার জন্য যথেষ্ট। কেউ কি ৬১০ পৃষ্ঠার অন্য একটি কিতাব মুখস্থ করে হুবহু শুনিয়ে দিতে পারবে? অসম্ভব! কুরআন ছাড়া অন্য আসমানি কিতাব—তাওরাত, যাবুর, ইনজীলও মুখস্থ করা সম্ভব নয়। কারণ, সহজ করার এই ওয়াদা আল্লাহ তাআলা কেবল পবিত্র কুরআনের ব্যাপারেই দিয়েছেন। কুরআন সহজ করার এটি হলো একটি দিক। আরেকটি দিক হলো—কুরআন থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা। পুরো কুরআনেই ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নিদর্শন ও শিক্ষা। আসলে বুঝে বুঝে কুরআন পড়লে মোটিভেশনের জন্য বর্তমানের বস্তাপচা সেলিব্রেটিদের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু হীরা ছেড়ে কাচের পেছনে জীবন ক্ষয় করা যে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে!

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৮৯)

এ-সূরার ৪৮ নং আয়াতে অপরাধী কাফির-মুশরিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "সেদিন তাদেরকে তাদের চেহারার ওপর টেনে-হেঁচড়ে আগুনের ভেতর নেওয়া হবে।" এখানে গভীরভাবে ভেবে দেখার একটা বিষয় হলো—তাদেরকে তাদের চেহারার ওপর হেঁচড়ানো হবে। মানুষের চেহারা হলো সবচেয়ে সেরা অঙ্গ। এই চেহারাকে মাটিতে রাখা হবে—তাদেরকে সর্বোচ্চ অপমানিত ও অপদস্থ করার জন্য। কারণ, তারাও যে সবচেয়ে সেরা নবি ও কিতাবকে অস্বীকার করেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনের বিরোধিতা করেছে।

(দেখুন—ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ২৭/২১৫)

সূরা আর-রহমান   سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯৭-তম সূরা। এর আগে সূরা রা'দ ও পরে সূরা দাহ্র/ইনসান নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কমার ও পরে সূরা ওয়াকিয়া।

এক নজরে আর-রহমান

- মাদানি বা মাক্কি যুগে নাযিল: মাক্কি মাদানি
- সূরা নং: ৫৫
- আয়াত: ৭৮

নামের রহস্য

'আর-রহমান' মানে 'পরম করুণাময়'। যাঁর করুণা সমগ্র মহাবিশ্বের ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে ছড়ানো। আল্লাহর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে ১ নং আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে 'আর-রহমান'।

মেজর থিম

- ০১ আল্লাহর বড় বড় কিছু নিদর্শন।
- ০২ আল্লাহর ক্ষমতা।
- ০৩ রবের অনুগ্রহ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

মহান আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম 'রহমান/পরম করুণাময়' উল্লেখ করার মাধ্যমে সূরাটি শুরু। আর শেষে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর আরেকটি নাম 'যুল জালালি ওয়াল ইকরাম/মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী'। অর্থাৎ শুরু-শেষ মিলিয়ে আল্লাহর গুণ বা বৈশিষ্ট্যের ওপর ফোকাস করা হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা কমার; যার শেষ আয়াতে মুমিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "...তারা থাকবে বাগান ও ঝরনাধারায়, সন্তুষ্টির আসনে, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর সম্রাটের পাশে।" আর ঠিক পরের এই সূরাটির নাম ও প্রথম আয়াত হলো 'আর-রহমান'। যেন বলা হলো—নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর সেই সম্রাটই হলেন 'আর-রহমান/পরম করুণাময় সত্তা'।

শানে নুযুল

পুরো কুরআনে এটিই একমাত্র সূরা, যেখানে মানুষের পাশাপাশি জিনদেরকে-ও একইসাথে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের মতো জিনদেরকে-ও স্বাধীনতা দিয়েছেন—চাইলে ঈমানদার হতে পারো, আবার বেঈমানও হতে পারো। অনুগত বা অবাধ্য দুটোই হবার ক্ষমতা জিনরাও রাখে। মানুষ ও জিন—উভয় জাতিকে আল্লাহ তাআলা অগণিত নিয়ামাতের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। আর এই সূরাতে তাদেরকে বারংবার সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। আল্লাহ দেখতে চান, এই নিয়ামাত ব্যবহার করে কারা তাঁর আনুগত্য করে, আর কারা তাঁর অবাধ্য হয়। তিনি বারবার প্রশ্ন রেখেছেন—'তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিয়ামাতকে অস্বীকার করবে?' প্রতিটি নিয়ামাতের কথা উল্লেখ করেই আল্লাহ এই প্রশ্নটি করেছেন। আর সবচেয়ে সত্য কথা তো এটিই যে, আল্লাহর কোনো নিয়ামাতকেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না, পারবও না। তাই এসব নিয়ামাত ভোগ করার বেলায় আমাদের করণীয়—একমাত্র আল্লাহর-ই ইবাদাত করা, তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক না করা, এবং কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ্য না হওয়া। এই নিরেট সাদাসিধে সত্যটাকে যাতে আমরা মেনে নিই, সেজন্যই এই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৯/১৩৯, তাফহীমুল কুরআন, ১৬/৬১)

সেগমেন্ট

আল্লাহর অনুগ্রহ

বান্দার ওপর আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহ রয়েছে। তার মধ্যে কিছু অনুগ্রহের বিবরণ সূরার শুরুতেই আল্লাহ তুলে ধরেছেন।

মানুষ ও জিন

সূরার দ্বিতীয় অংশে আরও কিছু অনুগ্রহের বিবরণ এসেছে। সেই সাথে জানানো হয়েছে— আল্লাহই সবচেয়ে বড় ক্ষমতাবান। জিন-ইনসান কেউ-ই তাঁর নাগালের বাইরে যেতে পারবে না।

মুশরিকদের সমালোচনা

ক্ষমতার দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে বড় কেউ নেই। তা হলে ইবাদাত তো কেবল তাঁর জন্যই হওয়া উচিত। অথচ মুশরিকরা তাঁকে বাদ দিয়ে মূর্তির উপাসনা করে!

ফজিলত

কুরআনের সৌন্দর্য : নবি ﷺ বলেছেন, ‘প্রতিটি জিনিসেরই সৌন্দর্য থাকে। কুরআনের সৌন্দর্য হলো সূরা আর-রহমান।’

(সুয়ুতি, আল-জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু, ১০২০০, দঈফ)

জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশে বের হলেন। তিনি তাদের সামনে সূরা আর-রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। কিন্তু তারা চুপ করে রইলেন। তখন নবি ﷺ বললেন, ‘এ-সূরাটি জিনদের-সঙ্গে-সাক্ষাতের রাতে আমি তাদের সামনে পাঠ করেছি। তোমাদের তুলনায় তারা উত্তম জবাব দিয়েছে। যখনই আমি তিলাওয়াত করছি, “অতএব, তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" তখনই তারা বলেছে, ‘হে আমাদের রব! আমরা আপনার কোনো নিয়ামাতই অস্বীকার করছি না, আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।’

(তিরমিযি, ৩২৯১, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন; → এটি আপনার ইবাদাতের স্বাদ বাড়িয়ে দেবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
আল্লাহর করুণা বনাম ক্ষমতা

১. বৃষ্টির ন্যায় করুণা বর্ষণ
সূরাটি শুরুই হয়েছে একটি রিমাইন্ডার দিয়ে—আল্লাহ হলেন 'আর-রহমান' বা পরম করুণাময়। তিনি মানুষ ও জিন জাতির ওপর ভীষণ দয়াবান।

২. একমাত্র আল্লাহই অবিনশ্বর
এই জগতের যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আবার একদিন এ সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু টিকে থাকবেন মহান রব—আল্লাহ তাআলা।

৩. পরকালের চিত্র
অপরাধীদের জন্য পরকালটা হবে বেশ ভয়ানক। তারা জাহান্নাম ও উত্তপ্ত পানির মাঝে ছোটাছুটি করতে থাকবে।

৪. বিপরীত চিত্র
তবে দেখা যাবে বিপরীত চিত্রও। যারা আল্লাহর আনুগত্যে জীবন কাটাবে, তাদের জন্য থাকবে চিরসুখের জান্নাত।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
গোলামদের ওপর আল্লাহর বেশ কিছু নিয়ামাত বা অনুগ্রহের কথা আলোচনা করা হয়েছে।	১-২৫	পরকালে অপরাধীদের তাকদীরে যা আছে, সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।	৩৭-৪৫
চিরন্তন বা চিরস্থায়ী অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহর—এ ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছে।	২৬-৩০	সে-সময় মুত্তাকী বা সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা কেমন থাকবেন, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।	৪৬-৭৮
আল্লাহর ক্ষমতার সামনে জিন ও মানুষের সামর্থ্য যে অতি নগণ্য থেকেও নগণ্য—তা আবারও স্মরণ করানো হয়েছে।	৩১-৩৬		

কেইস-স্টাডি

সূরার ৪১ নং আয়াতটি নিয়ে গবেষণা করা যাক—"আলামত দেখেই অপরাধীদেরকে চেনা যাবে, তখন তাদের কপালের ওপরের চুল ও পা ধরে পাকড়াও করা হবে।" আমাদের উঠতি বয়সি ছেলেগুলোকে দেখলে মনটা কেঁদে ওঠে। এদের পড়াশুনার বালাই নেই, হাতে স্মার্ট-ফোন। এরা 'গ্যাং' কালচারে অভ্যস্ত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিল পাবেন 'হেয়ার-স্টাইল'-এ। প্রত্যেকের লম্বা চুল। তবে তা বাবরি নয়। এই চুল পেছনে যায় না, বরং সামনের দিকে ঝুলে থাকে আধহাত। অথচ এমন চুল কাদের 'সাইন' বহন করে, তা ওপরের আয়াতে আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন— অপরাধীদেরকে কপালের ওপরের চুল ও পা ধরে চ্যাংদোলা করে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে। দুনিয়াতে বসেই যদি আমরা জাহান্নামিদের 'লেবাস' শরীরে চাপিয়ে চলাফেরা করি, এর চেয়ে কষ্টকর আর কী হতে পারে! এই ছেলেপুলের দলকে বোঝাতে হবে—আমাদের সত্যিকারের আইডল কে। এছাড়াও, নবি ﷺ আমাদেরকে 'اَلْقَزَعُ' থেকে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ, মাথার কিছু অংশের চুল বড় রেখে, কিছু অংশ চেঁছে ফেলা যাবে না।

(দেখুন—বুখারি, ৫৯২১; মুসলিম, ২১২০)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"পরম করুণাময়; যিনি কুরআন শিখিয়েছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভিজাত প্রকাশভঙ্গি শিখিয়েছেন।" এভাবেই শুরু হয়েছে সূরাটি। সূরার পুরোটা জুড়ে রয়েছে মানুষ ও জিন জাতির ওপর আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামাতের বর্ণনা। তবে সবগুলোর আগে যে নিয়ামাতটির কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো—কুরআন শিক্ষা দেওয়া। এর কারণ কী? কারণ, এটিই হলো সব নিয়ামাতের সেরা, মর্যাদাপূর্ণ এবং সবচেয়ে বেশি উপকারী। কুরআন শেখার নিয়ামাতটিই মানুষকে পূর্ণতা দান করে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, এই নিয়ামাত বলার আগেও কুরআন শেখানোর কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআন না শিখলে, সে অনুসারে জীবন না সাজালে, কেউ পূর্ণ মানুষ হতে পারে না; এখানে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৪/৯৭)

যারা তাদের রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, তাদেরকে দুটি জান্নাত দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা তার বর্ণনা দিয়েছেন ৫৪ নং আয়াতে : "আর জান্নাত-দুটির ফল থাকবে একেবারে কাছে।" এখানে আমাদের মনোযোগ দিয়ে ভাবার বিষয় হলো—دَانٍ/ একেবারে কাছে", এই শব্দটি নিয়ে। জান্নাতের ফলগুলো জান্নাতিদের একেবারে হাতের নাগালে থাকবে। তারা শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে যখন যেভাবে যেখানেই থাকুক, ফল তাদের কাছেই থাকবে। তারা যখনই চাইবে, তখনই পাবে। হাত বাড়ালেই পাবে। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে, তাই না? আসলে জান্নাত স্বপ্নের চেয়েও বেশি সুন্দর। জান্নাতের সুখ এত ব্যাপক যে, কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার তাওফীক দান করুন, আ-মীন।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ২৯/৩৭৪)

সূরা ওয়াকিয়া

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪৬-তম সূরা। এর আগে সূরা ত্ব-হা ও পরে সূরা শুআরা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আর-রহমান এবং পরে সূরা হাদীদ।

এক নজরে ওয়াকিয়া

- নুবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর নাযিল
- সূরা নং: ৫৬
- আয়াত: ৯৬
- মাক্কি

নামের রহস্য

'ওয়াকিয়া' মানে ঘটনা। এখানে 'ঘটনা' দ্বারা 'কিয়ামাতের মহা ঘটনা'-কে বোঝানো হয়েছে। সূরার ১ নং আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'ওয়াকিয়া'।

মেজর থিম

০১ কিয়ামাত প্রসঙ্গ।

০২ পরকালে আমল অনুযায়ী মানুষের তিন ক্যাটাগরিতে অবস্থান।

০৩ আল্লাহর কিছু নিয়ামাত।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরা ওয়াকিয়ার শুরুতে আল্লাহ বলেন, কিয়ামাতের দিন সমগ্র মানব-জাতি তিনভাগে ভাগ হয়ে যাবে—আল্লাহর আদেশ পালনে অগ্রসর লোকজন, আল্লাহর অনুগত লোকজন ও অবাধ্য লোকজন। সূরাটির শেষ অংশে এই তিন প্রকার মানুষের পুরস্কার ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আর-রহমান; যার শেষ অংশে পরকালে জান্নাতি ব্যক্তিদের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ওয়াকিয়ার প্রথম অংশেও বর্ণিত হয়েছে জান্নাতে আল্লাহর নিকটভাজনদের পুরস্কারের কথা।

শানে নুযুল

মানুষের মৃত্যুর পর তাকে আবার জাগিয়ে তোলা হবে, তার হিসেব-নিকেশ হবে, তাকে হয় জান্নাতে আর না-হয় জাহান্নামে পাঠানো হবে—এই কথাগুলো মেনে নিতে কাফিররা একেবারেই নারাজ। আর তাই আখিরাত, তাওহীদ ও কুরআনের ওপর তাদের ভীষণ সংশয়। এই সংশয়-সন্দেহ দূর করতে এই সূরা নাযিল হয়। পরকালকে এখন অস্বীকার করলেও, যখন সত্যি সত্যি এসে পড়বে, তখন আর একে কেউ রুখতে পারবে না—এই চরম সত্যটি এই সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। সে-সময় মানুষ তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। প্রথম ভাগে থাকবে পাক্কা ঈমানদাররা। দ্বিতীয় ভাগে থাকবে সাধারণ নেককাররা। আর শেষ ভাগে থাকবে পাপীরা। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাওনা পাই-টু-পাই বুঝিয়ে দেবেন।

তাওহীদ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস আনতে বেশি-দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মহাকাশ চষে বেড়াতে হবে না। শুধু নিজের দেহটার দিকে তাকান। এরপর চিন্তা করুন, আপনি যে খাবার খান বা পানি পান করেন, তা আসে কোত্থেকে? এসব ছোটোখাটো বিষয়ের দিকে নজর দিলেও তো আখিরাতের সত্যতা টের পাওয়ার কথা। এতকিছু দেখার পরও যদি কেউ ঈমান না আনে, তা হলে একটু সময় অপেক্ষা করতে হবে—চোখ দুটো বন্ধ হলেই দিনের আলোর মতো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। এভাবে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরতেই এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৯/১৯৫; তাফহীমুল কুরআন, ১৬/৯৩)

সেগমেন্ট

তিন ক্যাটাগরির মানুষ

সূরার শুরুর দিকেই আল্লাহ তাআলা পুরো মানব-জাতিকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছেন। এরপর পর্যায়ক্রমে এগুলোর আলোচনা করেছেন।

আল্লাহর ক্ষমতা

সকল দিক দিয়েই মানুষ আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, চাষাবাদ করার জ্ঞান, পানি ও আগুন দিয়েছেন। আর এগুলোর ব্যবহার শিখিয়েছেন।

সন্দেহের জবাব

মৃত্যুর ব্যাপারে কাফিরদেরকে সূরার শেষ অংশে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে—পারলে মৃত-ব্যক্তির চলে-যাওয়া আত্মাকে ফিরিয়ে আনো। আর তা যদি না-ই পারো, তা হলে ঈমান গ্রহণের বেলায় এত অহংকার কেন?

ফজিলত

যে সূরা নবিজির চুলে পাক ধরিয়েছে: আবু বকর ﷠ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার তো চুল পেকে গিয়েছে!' রাসূল ﷺ বললেন, 'হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকভীর—এই সূরাগুলো আমার চুল পাকিয়ে দিয়েছে।' (তিরমিযি, ৩২৯৭, সহীহ)

প্রাচুর্যময় সূরা: নবি ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করবে, সে কখনো দারিদ্র্যের শিকার হবে না।"

(বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ২৪৯৮; ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইল, ৬৮০, দঈফ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কতগুলো ধাপ পেরিয়ে আমাদের সামনে খাবার হাজির হয় তা চিন্তা করলে: → আল্লাহর নিয়ামাতের ব্যাপকতা ও বিশালত্ব উপলব্ধি করা যায়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা

১. কিয়ামাতের বর্ণনা
কিয়ামাতের মহা ঘটনার সংবাদ দিয়ে সূরাটি শুরু হয়। সেদিন মানুষের অবস্থা কেমন হবে, সে-বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেয়।

২. আল্লাহর সৃষ্টিশীলতা ও নিদর্শন
পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে আল্লাহর বিস্ময়কর সব নিদর্শন। সৃষ্টিশীলতার দিক দিয়ে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

৩. কুরআন
কুরআন ভীষণ সুরক্ষিত এক কিতাব। এটি মানুষের জন্য রিমাইন্ডারের কাজ করে। মানুষকে বারবার তার করণীয় সম্পর্কে সজাগ করে তোলে।

৪. রবের মহিমা বর্ণনা
কুরআনে যেসব ঘটনা জানানো হয়েছে, সেগুলো নিশ্চিত সত্য। এ-কথা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন। আর মানুষকে আদেশ দিলেন—(এগুলো মেনে নিয়ে) তুমি তোমার মহান রবের মহিমা বর্ণনা করো।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাতের ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা।	১-১৪	আখিরাত সংঘটিত হবে ও ভালো বা মন্দ কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে—এই সরল-সত্যটির ব্যাপারে বিভিন্ন যুক্তি।	৫৭-৭৪
জান্নাতিদের আনন্দময় সময়ের বর্ণনা।	১৫-২৬	কুরআনের মহিমা প্রকাশ করার পাশাপাশি এর সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।	৭৫-৮৭
আল্লাহর অনুগতদের এবং আল্লাহর অবাধ্যদের মধ্যকার তফাত।	২৭-৫৬	আল্লাহর নিকটভাজন ও ডান দিকের লোকদেরকে দেওয়া হবে পুরস্কার। আর কাফির ও পথভ্রষ্টদের দেওয়া হবে আযাব।	৮৮-৯৬

কেইস-স্টাডি

কিয়ামাতের দিন আল্লাহ মানুষকে তিনটি দলে ভাগ করে ফেলবেন। একটি দল হবে ডান দিকের লোকদের—অর্থাৎ অনুগতদের। বাম দিকের লোকদের হবে একটি দল—যেটি অবাধ্যদের। আরেকটি দল হবে আল্লাহর হুকুম-পালনে-অগ্রসর ব্যক্তিদের। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—"তখন তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হবে: অনুগত লোকজন; কী চমৎকার অনুগত লোকদের পরিণতি! অবাধ্য লোকজন; কী নিকৃষ্ট অবাধ্যদের পরিণতি! আর (আল্লাহর আদেশ পালনে) অগ্রসর লোকজন; (পুরস্কারের দিক দিয়েও) তারা অগ্রসর।" এই তিনটি ক্যাটাগরি আল্লাহ তো আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা—কিয়ামাতের সেই ভয়াবহ সময়ে আমরা নিজেদেরকে কোন ক্যাটাগরির মধ্যে রাখতে চাই। মুমিনের জন্য উচিত সবচেয়ে ভালোটাই আশা করা। সেজন্য আল্লাহর হুকুম সামনে আসার সাথে সাথে পালন করতে হবে। অবস্থা হবে এই যে—শুনলাম ও মানলাম। কোনো টুঁ শব্দ করলাম না। তা হলেই আমরা পৌঁছুতে পারব আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২২/২৮৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলার নিকটভাজন এবং অনুগ্রহে-ভরপুর জান্নাতে কারা স্থান পাবে, সে সম্পর্কে এ-সূরার ১৩-১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "(তারা হবে) আগের লোকদের থেকে বেশিসংখ্যক আর পরবর্তীদের থেকে অল্পসংখ্যক লোক।" এই আয়াতে 'আগের লোক' বলতে এই উম্মতের প্রথমদিকের লোকদের বোঝানো হয়েছে, আর 'পরবর্তী' বলতে শেষদিকের মানুষজনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই উম্মতের প্রথম দিককার মানুষ হলেন—সাহাবি, তাবিয়ি, তাবি-তাবিয়িগণ। তাঁরা শেষ দিককার মানুষের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলার বেশি প্রিয় ও অধিক নিকটবর্তী। তাদের থেকেই বেশি লোক জান্নাতে যাবে। তাদের আমল ছিল আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের দেখানো পথেই আগানো। তা হলে তাদের সাথে আমরাও শামিল হতে পারব, ইন শা আল্লাহ।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/১৩০; শানকিতি, তাফসীর, ৭/৮২৩)

জান্নাতের নিয়ামাত সম্পর্কে ২০-২১ নং আয়াতে এসেছে, "(আরও থাকবে) তাদের পছন্দমতো ফলমূল, আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পাখির গোশত।" এখানে একটা বিষয় দেখুন—ফলমূলের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আর গোশতের কথা পরে। খাবারের আগে ফল খাওয়া চিকিৎসাশাস্ত্র-মতে বেশ স্বাস্থ্যকর একটি পন্থা। কারণ, এতে খাবার দ্রুত হজম হয় এবং খাবারের স্বাদও বেড়ে যায়। খাবারের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো—ভারী খাবারের আগে হালকা কিছু খেয়ে নেওয়া। ফলে বদহজম হয় না। স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

(দেখুন—যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ২৭/২৪৯; আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৪/১৩৭)

সূরা হাদীদ

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯৪-তম সূরা। এর আগে সূরা যিলযাল ও পরে সূরা মুহাম্মাদ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ওয়াকিয়া ও পরে সূরা মুজাদালা।

এক নজরে হাদীদ

- ৮ম হিজরির পর নাযিল
- সূরা নং: ৫৭
- আয়াত: ২৯
- মাদানি

নামের রহস্য

‘হাদীদ’ মানে ‘লোহা; সমরাস্ত্র’। আল্লাহর দুশমনের গোড়া যাতে কেটে দেওয়া যায়, আঘাতে আঘাতে তাদেরকে পর্যুদস্ত করা যায়, সেজন্যেই আল্লাহ পৃথিবীতে লোহা পাঠিয়েছেন। এ-সূরার ২৫ নং আয়াতে এসেছে এই আলাপ। সেখান থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয় ‘হাদীদ’।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর গুণগান।

০২ জিহাদের উদ্দেশ্য।

০৩ পরকালীন পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, "তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। মহাকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম ও শেষ, প্রকাশিত ও গোপন, তিনি সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।" সূরার শেষেও আল্লাহর গুণাবলি-ই এসেছে: "করুণা সবটুকুই আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে চান তাকে সেটা দেন; আল্লাহ বিপুল করুণার অধিকারী।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ওয়াকিয়া; যার শেষ আয়াতে আল্লাহ মানব-জাতিকে আদেশ দিয়েছেন, "অতএব তুমি তোমার মহান রবের নামের মহিমা বর্ণনা করো।" সেই একই সূত্র ধরে সূরা হাদীদের প্রথম আয়াতে এসেছে—"মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে; তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।"

শানে নুযুল

আল্লাহ তাআলার গুণসমূহ বর্ণনা করে সূরাটির সূচনা। এতে শ্রোতাদের হৃদয়ে এই উপলব্ধি তৈরি হবে—এক সুমহান সত্তার পক্ষ থেকে তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে। এরপর কয়েকটি আয়াতে ঈমানের মৌলিক দাবি জানানো হয়েছে। আর তা হলো—বান্দা তার সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা করবে না। কৃপণতা করা ঈমান পরিপন্থি কাজ। বাস্তবতার বিচারেও এটি তিরস্কারযোগ্য। কেননা, সম্পদ তো আল্লাহ তাআলারই দেওয়া। বান্দাকে শুধু ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল এ-সম্পদ অন্য কারও হাতে ছিল, আজ আমার হাতে এসেছে। ভবিষ্যতে অন্য কারও হাতে চলে যাবে। শেষমেশ বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস প্রকৃত মালিক আল্লাহর ভান্ডারেই জমা পড়বে। সুতরাং সম্পদ হাতে এলে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহর পথে দান-সাদাকা ও সম্পদ ব্যয়ের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিতেই আল্লাহ এ-সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৯/২৫০)

সেগমেন্ট

ঈমান ও সাদাকা

সূরার শুরুর অংশে বিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়—ঈমান আনার সাথে সাথে মুমিনদেরকে দান-সাদাকার হাতও প্রসারিত করতে হবে।

বিনয় ও তাকওয়া

মুমিনদেরকে হতে হবে বিনয়ী। সেই সাথে অবশ্যই থাকতে হবে আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া।

সন্ন্যাসবাদ মুমিনদের জন্য নয়

খ্রিষ্টানরা বৈরাগ্যবাদ শুরু করেছে। এটি আল্লাহর আদেশ ছিল না। তাই মুমিনদের জন্য এটি শোভনীয় নয় যে—তারা ঘর-সংসার ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

ফজিলত

সূরা হাদীদ মুসাব্বিহাত সূরাগুলোর একটি। যেগুলোর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে : তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন।' তিনি বললেন, '...মুসাব্বিহাত থেকে তিনটি সূরা পাঠ করো।'

(আবু দাউদ, ১৩৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দান-সাদাকা করার সময় শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখলে:

দান-সাদাকাকে আর বোঝা নয়, বরং পরকালের জন্য বিনিয়োগ মনে হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং ঈমানের পথে অবিচলতা

১. আল্লাহর মহিমা ও ক্ষমতা
আল্লাহ—পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। তিনিই শুরু, তিনিই শেষ। সবকিছুর ওপর তাঁর একক কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব রয়েছে।

২. দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা
দুনিয়ার জীবন ভীষণ ঠুনকো। যেকোনো সময় ধসে পড়বে। তাই সময় থাকতে ভালো কাজগুলো করতে হবে, আল্লাহর রাস্তায় দান করতে হবে।

৩. ঈমান ও ত্যাগ
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনতে হবে। দুনিয়ার চাকচিক্যের পেছনে না-ছুটে, ঈমানের পথে অটল থাকতে হবে—অসংখ্য বাধা যদি আসে, তবুও।

৪. আলো-আঁধার
ঈমান আনে আলো। আর যারা রাসূলের থেকে দলছুট হয়ে কুফর বা মুনাফিকিতে জড়ায়, তারা পড়ে থাকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মহাবিশ্বের সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।	১-৬	দ্রুত ভালো ভালো কাজ করে জান্নাতের জন্য প্রতিযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।	২১
যারা ঈমান এনে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।	৭-১২	কোনো কিছু না পেলে হতাশ, আর পাওয়া গেলে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার কিছু নেই। সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত।	২২-২৪
বিচার-দিবসে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে কথোপকথন হবে।	১৩-১৫	পৃথিবীতে নবি পাঠাবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। ঈমানের পথে অটল থাকলে মিলবে পুরস্কার।	২৫-২৭
আল্লাহর পথে খরচ করার আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিলে, আছে পুরস্কার। সাড়া না দিলে, রয়েছে শাস্তি।	১৬-১৯	আহলে-কিতাবরা রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান আনলে পাবে দ্বিগুণ পুরস্কার। এ ছাড়া আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাবেন, মাফ করবেন।	২৮
ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবী ও আখিরাতের মধ্যকার বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।	২০	নুবুওয়াত শুধু ইহুদি-বংশধরদের থেকেই আসতে হবে—তাদের এই দাবি মনগড়া, যুক্তিহীন।	২৯

কেইস-স্টাডি

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যে বিপর্যয়ই হানা দিক না কেন, তা বাস্তবে ঘটার আগেই লিখিত অবস্থায় রয়েছে। এই তথ্যটি আল্লাহ আমাদেরকে এই সূরার ২২ নং আয়াতে জানিয়েছেন। কেন জানিয়েছেন, সেটিও আল্লাহ বলে দিলেন তার পরের আয়াতেই—"যাতে তোমরা যা পাওনি, তার জন্য হতাশ না হও, আর তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার জন্য আনন্দে আত্মহারা না হও; আল্লাহ সেসব লোককে পছন্দ করেন না—যারা (আল্লাহর-দেওয়া জিনিস পেয়ে) দাম্ভিক হয়ে ওঠে, অহংকার করে।" আমাদের জন্য কুরআনের বার্তা এখানে পরিষ্কার। আমাদের জীবনে কঠিন পরিস্থিতি আসে। পছন্দের কোনোকিছু হাতছাড়া হয়ে যায়। আবার কখনো হয়তো ভীষণ ভালো-লাগার কিছু হাতের মুঠোয় পেয়ে যাই। এই দুই অবস্থাতেই যেন আমরা স্বাভাবিক থাকি—আল্লাহ আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দিলেন। হতাশ হওয়া বা আনন্দে আত্মহারা হওয়া যাবে না। কারণ আমার সাথে যা-কিছুই ঘটল না কেন—তা আগে থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা ছিল। এই একটি আয়াত নিয়ে গভীরভাবে ভাবলে, আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনার প্রান্তিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব, ইন শা আল্লাহ।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৫১৬, ২৬৪২; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৬৯৮৫)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ১০ নং আয়াতে জানানো হয়েছে, যারা মক্কা বিজয়ের আগে সম্পদ খরচ করেছে, আর যারা বিজয়ের পরে দান করেছে; এই দুই দল সমান নয়। কারণ, মক্কা বিজয়ের আগে ধন-সম্পদের প্রয়োজন ছিল বেশি। মুসলিমরাও ছিল দুর্বল; বিভিন্ন বাহন ও অস্ত্র কেনার জন্য সম্পদের প্রয়োজন হতো। মক্কা বিজয়ের পর সেরকম অভাব বা প্রয়োজন আর থাকেনি। তাই এ-দুদল সমান হতে পারে না। যারা আগে দান করেছে, তারা অনেক অনেক মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। যারা পরে দান করেছে, তারাও সাওয়াব পেয়েছে ঠিকই; কিন্তু আগের দলের সমান হতে পারেনি। এখান থেকে বোঝা যায়—যখনই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে, তখনই বেশি বেশি দান করা উচিত। কারণ, সেই অবস্থা পেরিয়ে যাওয়ার পর দান করলে আগের মতো প্রতিদান মিলবে না। যেটা আমরা এই সূরার ১০ নং আয়াত থেকে জানতে পারি—"তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে সম্পদ-খরচ ও যুদ্ধ করে (আর যারা তা পরে করবে) তারা সমান নয়।"

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/১৭৩)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিপুল ক্ষমতার অধিকারী।" এটি ২৫ নং আয়াতের শেষাংশ। এর আগে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন সুস্পষ্ট প্রমাণ, কিতাব এবং মানদণ্ড দিয়ে। উদ্দেশ্য—ইনসাফ কায়েম করা। কেউ যদি এগুলো না মানে, তাহলে আল্লাহ লোহা সৃষ্টি করে রেখেছেন, এর মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত বান্দারা অবাধ্যদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে—তা হলে কি আল্লাহ দুর্বল? না, ব্যাপারটা তেমন নয়। চোখের পলকেই আল্লাহ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি বরং মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য এই পন্থা গ্রহণ করেছেন। আর এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন বান্দাকে বাছাই করার জন্য। তবুও মানুষ বোঝে না!

(দেখুন—শানকিতি, তাফসীর, ৭/৮৭৩)

সূরা মুজাদালা
سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ

তারতীব বিন-নুযুল।

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০৫-তম সূরা। এর আগে সূরা মুনাফিকুন ও পরে সূরা হুজুরাত নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ।

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা হাদীদ ও পরে সূরা হাশর।

এক নজরে মুজাদালা

- ৫ম হিজরির দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৫৮
- আয়াত: ২২
- মাদানি

নামের রহস্য

‘মুজাদালা’ মানে ‘তর্ক করা’। প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—এক নারীকে তার স্বামী যিহার পদ্ধতিতে তালাক দিয়েছিল। এ-ব্যাপারে সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে তর্ক করেছিল। সেখান থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয় ‘মুজাদালা’।

মেজর থিম

- ০১ রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য।
- ০২ শয়তানের দল।
- ০৩ আল্লাহর দল।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

জাহিলি যুগের তালাকের একটি পদ্ধতি নিয়ে একজন মহিলা-সাহাবি নবিজির সঙ্গে তর্ক করেছিল। সূরা মুজাদালার প্রথম আয়াতে উঠে এসেছে সে-ঘটনা। আর সূরাটির শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবিদের কর্মকাণ্ডের ওপর নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন: "আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট, তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল"।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা হাদীদ; যার শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বিপুল করুণার অধিকারী। সূরা মুজাদালার শুরুতে আল্লাহর সেই করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এইভাবে যে, একজন তর্ককারী নারী সাহাবির কথা তিনি শুনেছেন। আর তার অনুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, আল্লাহ বিধান দিয়েছেন।

শানে নুযুল

জাহিলি যুগে অদ্ভুত কিছু রীতি-নীতির প্রচলন ছিল। যেমন—কেউ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইত, তা হলে সে তার স্ত্রীকে বলত, 'তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো'। ব্যস, স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সঙ্গে তুলনা করতে-না-করতেই তালাক হয়ে যেত! তালাক দেওয়ার এই পদ্ধতিকে 'যিহার' বলা হয়। হিজরতের পর মুসলিমদের কারও কারও মধ্যে তখনো এই জাহিলি রীতির প্রভাব রয়ে গিয়েছিল। একবার আউস ইবনুস সাবিত ﵁ তার স্ত্রী খাওলা ﵂-কে যিহার করে বসেন। খাওলা তখন নিজের ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এর পর ছুটে গেলেন নবিজির কাছে। সবকিছু শুনে রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছ'। খাওলা বললেন, কিন্তু আউস তো আমাকে তালাক দেয়নি। নবিজি তাকে একই উত্তর দিলে সে বলল, আমি আমার অনুযোগ আল্লাহর কাছে পেশ করছি। এভাবে তাদের মধ্যে একই কথা বারবার হতে থাকে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়—যেখানে এসেছে যিহার সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান। এ ছাড়া বেশ কিছু সামাজিক আইন এই সূরার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ইহুদি ও মুনাফিকদের চরিত্রও তুলে ধরা হয় এখানে। পাশাপাশি তাদের সাথে সাথে আরও যত ইসলাম-বিরোধী গোষ্ঠী আছে, তাদের ব্যাপারে মুমিনদের অবস্থান কী হওয়া উচিত—সেসব জানাতেই আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেন।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৪৭; হাকিম, ৩৭৯১)

সেগমেন্ট

বিধানদাতা কেবল আল্লাহ

এ-সূরাটি শুরুই হয়েছে জাহিলি যুগের একটি প্রথার কথা তুলে ধরে। ইসলাম আগমনের পর ওসব প্রথা মূল্যহীন। বরং আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর।

অপমানজনক শাস্তি

সূরার মধ্যভাগে আলোচনা করা হয়েছে—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অপমানজনক শাস্তি।

মুমিনের অবস্থান

সূরার একেবারে শেষ আয়াতে ইসলাম-বিরোধীদের প্রতি মুমিনদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, সে-বিষয়ে আল্লাহ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

ফজিলত

সূরা মুজাদালা মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, “মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।”

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মুসলিম ভাইদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে আলোচনা করলে; → নিজেরও ঈমান বাড়ে, সেই সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ওহির ভূমিকা

১. মানবজীবনে ওহির ভূমিকা
ভীষণ ঝামেলায় পড়ে গেলেন খাওলা ﵂। ছুটে গেলেন নবিজির কাছে। তখন ওহির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন সমাধান। এমনিভাবে মানুষের নানা প্রয়োজনে সাড়া দিয়েছে কুরআন।

২. আল্লাহর জ্ঞান
আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে। কারা মুনাফিকি ও চক্রান্ত করছে, তা-ও তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন।

৩. গোপন-আলাপে নিষেধাজ্ঞা
ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার উদ্দেশ্যে গোপন আলাপ করা যাবে না। তবে ভালো উদ্দেশ্যে গোপন আলাপ করতে বাধা নেই।

৪. মুমিনদের মিত্র কারা?
মুমিনদের মিত্র হবে তারাই, যারা কাফিরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের কথায় ওঠে-বসে না, তাদেরকে ঈমানের ওপর প্রাধান্য দেয় না। যারা এই কাজগুলো করে, তারা কখনো মুমিন হতে পারে না, মুমিনের বন্ধুও হতে পারে না।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
জাহিলি যুগে তালাক দেওয়ার পদ্ধতি—'যিহার'—ও এর কাফফারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১-৪	গোপন-আলাপ করার শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে।	৮-১৩
কাফিরদের প্রতি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।	৫-৬	কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার পরিণাম জানানো হয়েছে।	১৪-২২
সবকিছু রয়েছে আল্লাহর জ্ঞানের অধীনে।	৭		

কেইস-স্টাডি

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তাদেরকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও পরাজিত করা হবে, যেভাবে তাদের আগের লোকদেরকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও পরাজিত করা হয়েছিল।" ইসলাম-বিদ্বেষীদের জন্য এই সূরার ৫ নং আয়াতটি ভীষণ কঠিন এক বার্তা বহন করে। প্রতিটি সমাজে এমন লোকদের অহরহ দেখা মেলে। এরা সমাজ বা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। নিজেদেরকে মুক্তমনা, প্রগতিশীল আর বিজ্ঞানমনস্ক—কত কিছু বলে পরিচয় দেয়! তবুও তাদের আসল পরিচয় মুছে যায় না। কারণ এরা নিজেদের সমমনাদের নিয়ে গোপনে আঁতাত করতে থাকে। সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে কীভাবে ইসলামকে বাদ দেওয়া যায়—সেই চিন্তাতেই তাদের ঘুম হারাম। কিন্তু ইতিহাস থেকে আমরা এ-ধরনের লোকদের পরিণতি জানতে পারি। আজকের দুনিয়ায় আর কোন মোড়ল আছে! সেই প্রতাপশালী ফিরআউন-কারুনরাই টিকতে পারেনি! মিশরের 'রয়্যাল মিউজিয়াম'-এ থাকা ফিরআউনের লাশটা কিন্তু এখনো সকল প্রতাপশালী শাসক আর নেতাদের সাবধান করে যাচ্ছে। আসলে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে হম্বিতম্বি করে, দুদিন বাদে এদের বাড়াবাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। স্রোতের টানে খড়কুটো যেমন ভেসে যায়, তাদের অবস্থাও হয় ঠিক তেমন।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৭/২৮৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে আপনি তাকে কী বলে অভিবাদন জানান? 'শুভ সময়', 'শুভ সকাল', 'শুভ সন্ধ্যা', 'হ্যালো'—এগুলো? অথচ কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে, কী বলতে হবে আল্লাহ তা শিখিয়ে দিয়েছেন। সাক্ষাতের শুরুতে বলতে হবে—"আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ"; আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত আসুক। কত সুন্দর এই অভিবাদন। সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে যতবারই দেখা হতো, ততবারই তারা সালাম দিতেন। ফলে তাদের পরস্পরের সম্পর্কও ছিল ভালোবাসায় পূর্ণ। তাই সমাজে আমরাও সালামের প্রচার-প্রসার করব, বেশি বেশি সালাম দেবো।

(দেখুন—বুখারি, ১২; মুসলিম, ৩৯, ৫৪; তিরমিযি, ২৬৮৮, ২৬৯৯)

"যারা আল্লাহ ও পরকালকে সত্য বলে মানে, তাদেরকে তুমি সেসব লোককে ভালোবাসতে দেখবে না—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।" অর্থাৎ এমন একজনও খাঁটি মুমিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদের সমর্থন করে, ভালোবাসে। আল্লাহর শত্রুদেরকে ভালোবাসলে, তাদেরকে সমর্থন করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এখন কেউ যদি কাফির-মুশরিক-বেঈমানদের পছন্দ করে, তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পাতায়—তা হলে এটিই প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে ঈমান নেই। এখন এই আয়াতটির সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের খেলা-পাগল মানুষগুলোকে মেলান। ফুটবল বলেন আর ক্রিকেট বলেন; অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ইহুদি-খ্রিষ্টান, মুশরিক বা নাস্তিক। অথচ মুসলিম-নামধারী অনেকেই আজ তাদেরকেই আইডল মানে, হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসে। এ-সূরার ২২ নং আয়াতটি গভীর মনোযোগ দিয়ে তাদাব্বুর করে বারবার পড়ুন, বর্তমানে আমাদের ঈমান কতটা নড়বড়ে, চোখের সামনে তার একটা চিত্র ভেসে উঠবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/২১৩)

সূরা হাশর

سُوْرَةُ الْحَشْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০১-তম সূরা। এর আগে সূরা বাইয়্যিনা ও পরে সূরা নূর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৫৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুজাদালা ও পরে সূরা মুমতাহিনা।

এক নজরে হাশর

- ৪র্থ হিজরিতে নাযিল
- সূরা নং: ৫৯
- আয়াত: ২৪
- মাদানি

নামের রহস্য

'হাশর' মানে 'জমায়েত/জড়ো হওয়া'। ২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যুদ্ধের প্রথম জমায়েতেই 'বনু নাদির' নামক বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে; সেখান থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'হাশর'। এর আরেকটি নাম আছে : সূরা বনু নাদির; কারণ, তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর বেশকিছু অংশ নাযিল হয়েছে।

মেজর থিম

০১ যুদ্ধের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা।

০২ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

০৩ আল্লাহর গুণাবলি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে, "মহাকাশে যা আছে আর যা আছে পৃথিবীতে—সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে, তিনি অজেয় ক্ষমতার অধিকারী, মহাজ্ঞানী।" সূরাটির শেষ আয়াতেও মেলে একই কথার প্রতিধ্বনি, "মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছে, তিনিই অজেয় শক্তির অধিকারী, মহাজ্ঞানী"।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুজাদালা; যার শেষে ওই সমস্ত লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সূরা হাশরের শুরুতে বলা হয়, "আর যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।"

শানে নুযুল

ইতিহাস থেকে জানা যায়, রোমানরা ১৩৫ সালের দিকে ফিলিস্তিন থেকে ইহুদিরদেরকে বের করে দেয়। তখন অনেকগুলো ইহুদি গোত্র মদীনায় এসে বসতি গড়ে। আর তখনকার যেসব আরব গোত্র সেখানে থাকত, তাদের ওপর খবরদারি করা শুরু করে। পরে অবশ্য সেই খবরদারি ছুটে গেছে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার গুণগুলো আবহমান কাল থেকে ওদের রক্তে মিশে আছে। সুদি কারবার ও অতি মুনাফাখুরির মাধ্যমে সেখানকার মানুষগুলোর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল এরা। হিজরত করে নবিজি মদীনায় এলেন। সুদকে হারাম ঘোষণা করলেন। ইহুদিরা বুঝতে পারল—এখন থেকে তো আর সুদি কারবার চালাতে পারব না। 'এই লোক' থাকলে তো ভীষণ বিপদ! তাই নবিজি ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত করতে লাগল তারা। এমনকি তাদের এক গোত্র বনু নাদির নবিজিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। এ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে নবিজি বনু নাদির-কে মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। একুশ দিন তাদেরকে অবরোধ করে রাখার পর, তারা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সম্পদ ফেলে মদীনা থেকে বেরিয়ে যায়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই এই সূরাটি নাযিল হয়। এ ছাড়া ওই সময়ে মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড ও বনু নাদিরের ফেলে-যাওয়া সম্পদ কীভাবে বণ্টন করা হবে, এ-সূরাতে সেসব নিয়েও আলোচনা এসেছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৯/৪০২; তাফহীমুল কুরআন, ১৭/১)

সেগমেন্ট

বনু নাদির যুদ্ধ

মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইহুদি গোত্র বনু নাদির। এই অপরাধের সাজা হিসেবে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেন।

আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা

বনু নাদিরকে অবরুদ্ধ করে রাখলেও, তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস করেনি। তাদের মনের মধ্যে আল্লাহ তাআলাই ভীরুতা ও কাপুরুষতা ঢেলে দিয়েছিলেন।

মুনাফিক-ইহুদি আন্তঃসম্পর্ক

মুনাফিকরা ইহুদিদেরকে বিভিন্নভাবে আশ্বাস দেয়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তারা পাশে দাঁড়ায় না। কারণ মুনাফিকরা চরম মিথ্যুক।

ফজিলত

আবু উমামা বাহিলি ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি রাতে বা দিনে সূরা হাশরের শেষ অংশ পাঠ করবে এবং সেই রাতে অথবা দিনে মারা গেলে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।”

(বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ২৫০১, দঈফ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

গত সপ্তাহে আপনার করা তিনটি ভালো ও তিনটি মন্দ কাজের পর্যালোচনা করুন;

এই প্রক্রিয়াটি আপনার আত্ম-জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি করবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

নানা ঘটনা থেকে শিক্ষা

১. বনু নাদির থেকে শিক্ষা

বনু নাদির রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে শাস্তি হিসেবে তাদেরকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করলে কপালে জুটবে লাঞ্ছনা।

২. সম্পদ বণ্টন ও সামাজিক-দায়িত্ববোধ

আল্লাহ সম্পদ বণ্টনের রীতি শেখালেন। বুঝিয়ে দিলেন, সম্পদ কেবলমাত্র ধনীদের হাতে থাকার জিনিস নয়। এতে হক আছে সুবিধা-বঞ্চিতদেরও।

৩. মুনাফিকদের প্রতি সতর্কবার্তা

যারা মনে মনে নিফাকি পোষণ করে ও কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের প্রতি উচ্চারণ করা হয়েছে চরম হুঁশিয়ারি।

৪. মুমিনদের প্রতি উপদেশ

মুমিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। পরকালের জন্য সে অগ্রিম কী পাঠাচ্ছে, সে-বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মদীনা থেকে ইহুদি গোত্র বনু নাদিরকে বহিষ্কারের ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে।	১-৫	ইহুদিদের সাথে মুনাফিকদের খাতির ও তাদের বিশ্বাসঘাতকতার খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে।	১১-১৭
'ফাই'—তথা গনিমত বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ সম্পর্কিত বিধি-বিধান দেওয়া হলো।	৬-৭	মুমিনদের প্রতি দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে—জান্নাতিরাই প্রকৃত সফল।	১৮-২১
বর্ণিত হয়েছে মুহাজির ও আনসারদের গুণাবলি।	৮-১০	আল্লাহর চমৎকার কিছু গুণবাচক নাম (আল-আসমাউল হুসনা) উল্লেখ করা হয়েছে।	২২-২৪

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “এরা (মুনাফিক-ইহুদিরা) একজোট হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে (প্রকাশ্যে) যুদ্ধে নামবে না, এরা যুদ্ধ করবে কেবল দুর্গবেষ্টিত জনপদের ভেতরে থেকে অথবা প্রাচীরের পেছনে থেকে।” হিসেব মেলানো যাচ্ছে কি? বর্তমান দুনিয়ার দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন তো—কুরআনের এই কথাটি আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক কি-না। হ্যাঁ, ইহুদিদের স্বভাব এটাই। এরা দুর্গবেষ্টিত এলাকায় ‘আয়রন ডোম’ নিয়ে বসে থাকবে। অথবা প্রাচীরের পেছনে লুকিয়ে থাকবে, এরপর হুট করেই পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে মুসলিমদের ওপর। কিন্তু মুসলিমদের সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ করার সাহস এদের নেই। মুসলিমরা তাদের জনপদে ঢুকে তাদের লোকজনকে ধরে নিয়ে গেলেও, এরা গর্ত থেকে বের হবে না। কুরআন এই বিষয়টাকে কত শত বছর আগে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে দেখুন। তাই কুরআন নিয়ে আমাদের পঠন-পাঠন আরও বাড়াতে হবে। কুরআন অনুযায়ী চললে আমাদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত হবে, ইন শা আল্লাহ।

(দেখুন—যামাখশারি, আল-কাশশাফ, ৪/৫০৭; আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৪/২৫১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এই সূরার শুরুর দিকে ২ নং আয়াতে জানানো হয়েছে যে, বনু নাদির নামক বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্রকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তাদের বেশ মজবুত অনেকগুলো দুর্গ ছিল। তারা সেগুলোর ওপর ভরসা করেছিল যে, ওখানে আশ্রয় নিলে কেউ তাদেরকে হারাতে পারবে না। কিন্তু ঘটল তার উলটোটা। সেই দুর্গগুলোতে আটকা পড়েই তারা পরাজিত হলো। চরম অপমানিত হয়ে বহিষ্কৃত হলো। আমাদের তাদাব্বুরের জায়গাটা ঠিক এখানেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বা কারও ওপর ভরসা করলে দিনশেষে পরাজয় সুনিশ্চিত। জনবল, অর্থবল আর বুদ্ধিবল—সর্বশক্তিমান আল্লাহর সামনে সবই তুচ্ছ। দিনশেষে এগুলো তো তাঁরই দেওয়া।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ১৯/৪১১; কুশাইরি, তাফসীর, ৩/৫৫৭)

এ-সূরার ১৯ নং আয়াতটি দেখুন : “আর তোমরা সেসব লোকের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে যায়, ফলে আল্লাহও তাদের আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দেন।” এখানে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া মানে—আল্লাহর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করা। অর্থাৎ, যারা তাঁকে ভুলে যায়, তাঁর বিধি-নিষেধ মানে না—এমন লোকদের মতো হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন। বিধি-নিষেধ না মানার শাস্তি হবে; তিনি আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দেবেন। তখন আর মানুষ তার জন্য কোন জিনিস উপকারী, তা উপলব্ধি করতে পারবে না। যেসব কাজ তাকে পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে, সেগুলো সে করতে পারবে না। সে ইচ্ছাই তার জাগবে না। ঘুণাক্ষরেও মনে আসবে না পরকালের কথা। এভাবে সে নিজের আসল পরিচয় ভুলে থাকবে। তাই আল্লাহর বিধি-নিষেধের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিনিয়ত আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২২/৫৪৮; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ২৮/১০৫)

مَالِكٌ (মালিক) অর্থ: সার্বভৌম। মানে, এমন ক্ষমতা যার ওপরে আর কোনো ক্ষমতা নেই। যাকে বলে সর্বোচ্চ ও সামাহীন ক্ষমতা। অন্যদিকে মাঝে আলিফ-ছাড়া যে مَلِكٌ (মালিক), তার অর্থ ক্ষণিকের রাজত্ব। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের বেলায় পরেরটি প্রযোজ্য—মানে, তারা ক্ষণিকের রাজা-বাদশাহ। কিন্তু আল্লাহ হলেন সমস্ত বাদশাহর বাদশাহ। মহা-সম্রাট। 'মালিক' নামটির শেকড় তালাশ করলে দেখা যায়—শব্দটির অর্থ: শক্ত-করে-বাঁধা, একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া। এ কারণে স্বামীকেও মালিক বলা হয়। কেননা, স্ত্রীকে তার সাথে বেঁধে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জগৎকে তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। দুনিয়ার যত ক্ষমতাবান লোকই হোক, আল্লাহর রাজত্বের বাইরে সে যেতে পারবে না। আল্লাহর এ-নাম আমাদেরকে ভাবতে শেখায়—দুনিয়াতে আমরা যা-কিছুই পেতে চাই না কেন, সব তাঁর মালিকানায়। কাজেই, সব সময় আমাদের উচিত তাঁর দুয়ারেই ধরনা দেওয়া। কেবলমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া।

(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ৩০)

কিছু শব্দ জানতেই হয়

মালিক مَالِكٌ

কুদ্দূস قُدُّوْسٌ

قُدُّوْسٌ 'কুদ্দূস' নামটির অর্থ: দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও পবিত্র। এ কারণেই কিন্তু মসজিদে আকসার পবিত্র ভূমিকে ডাকা হয় 'আল-কুদস'। পুরনো আমলে আরবি ভাষায় বালতিকে বলা হতো 'কাদাস'। কেননা, বালতি থেকে পানি নিয়ে মানুষ অজু করে, পবিত্র হয়। তো সেখান থেকেই 'কুদ্দূস' নামটি এসেছে। আল্লাহ তাআলা সবরকম সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। তাঁকে ঘুমাতে হয় না, খাওয়া-দাওয়া করতে হয় না। তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি ভুল করেন না, জুলুম করেন না। মোটকথা, আমরা যত রকমের দোষ-ত্রুটির কথা চিন্তা করতে পারি, সবগুলো থেকে তিনি পবিত্র। আল্লাহ যখন আমাদের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর এই পবিত্রতার একটা অংশ আমাদের ভেতর ছুড়ে দেন। ফলে আমরা পাপ-মুক্ত হয়ে জন্ম নিই। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে দুনিয়াবি লোভ ও কামনা-বাসনা, আমাদের অন্তরকে কালো করে ফেলে। রবের-দেওয়া সেই পবিত্রতা থেকে আমরা দূরে সরে যাই। আল-কুদ্দূস নামটি আমাদের জন্য একটা রিমাইন্ডার।

(দেখুন—ঝাজ্জাজ, তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, ৩০)

সূরা মুমতাহিনা

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَة

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯১-তম সূরা। এর আগে সূরা আহযাব ও পরে সূরা নিসা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা হাশর ও পরে সূরা ছফ।

এক নজরে মুমতাহিনা

- মক্কা-বিজয়ের আগে নাযিল
- সূরা নং: ৬০
- আয়াত: ১৩
- মাদানি

নামের রহস্য

'মুমতাহিনা' শব্দের অর্থ 'পরীক্ষার-মুখোমুখি-হওয়া নারী'। সূরার ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কাফির রাষ্ট্র থেকে কোনো নারী হিজরত করে মুসলিম রাষ্ট্রে এলে, তাকে পরীক্ষার মুখোমুখি করতে হবে। সে আসলেই ঈমানের খাতিরে হিজরত করেছে, না-কি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে—তা খতিয়ে দেখতে হবে। সেখান থেকে এই সূরার নাম হয়েছে 'মুমতাহিনা'।

মেজর থিম

০১. কাফির-মুশরিকদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।

০২. ইবরাহীম ﷺ-এর ঘটনা।

০৩. ঈমানদার নারীদের পরীক্ষা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ সেসব লোকের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর মুমিন বান্দাদের শত্রু। এই শত্রুদের ওপর আল্লাহ ভীষণ রাগান্বিত। তাই সূরার শেষেও এসেছে একই রকম নির্দেশনা—"যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সেসব লোককে বন্ধু বানিয়ো না, যাদের ওপর আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা হাশর; যার শেষে আল্লাহর অবাধ্যদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এরা আল্লাহকে ভুলে যায় ও আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে অবাধ্যতার পথে ছোটে। আর সূরা মুমতাহিনার শুরুতেই মুমিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে—তারা যেন আল্লাহর অবাধ্য-দুশমনদেরকে বন্ধু না বানায়।

শানে নুযুল

হাতিব ইবনু আবী বালতাআ ﷺ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মধ্যে তিনিও একজন। কিছুদিন আগেই মক্কার মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের 'হুদাইবিয়া সন্ধি' হয়। তবে ক'দিন যেতে-না-যেতেই মক্কার কাফিররা সেই চুক্তি ভাঙতে লাগল। এজন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর এ-সিদ্ধান্তে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন হাতিব ﷺ। কারণ তখনও তার কিছু নিকট-আত্মীয় মক্কায় ছিল—যাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার কেউ ছিল না সেখানে। উদ্‌বিগ্ন হয়ে বিরাট এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন হাতিব। তড়িঘড়ি করে মক্কার নেতাদের উদ্দেশে একটা চিঠি লিখে ফেললেন। কাফিরদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শও দিলেন। আর এই তথ্য দেওয়ার বিনিময়ে মুশরিকদের কাছে চাইলেন তার পরিবারের নিরাপত্তা। তারপর এক মহিলাকে দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে আল্লাহ ওহির মাধ্যমে এই খবর নবিজিকে জানান। সাথে সাথে নবিজি সাহাবিদেরকে পাঠিয়ে সে-মহিলাকে পাকড়াও করেন, আর কাফিরদের হাতে চিঠিটা পৌঁছার আগেই সেটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে—এখন থেকে ইসলামের শত্রুদের সাথে মুসলিমদের কী রকম সম্পর্ক হবে, আল্লাহ তা জানাতে চাইলেন। আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি এই সূরাটি নাযিল করেন।

(দেখুন—বুখারি, ৩০০৭; মুসলিম, ২৪৯৪)

সেগমেন্ট

সম্পর্কের ভাঙা-গড়া

কারও সাথে মুমিনের সম্পর্ক থাকা বা না-থাকার বিষয়টি নির্ধারিত হবে ঈমানকে কেন্দ্র করে। কাফিরদের সাথে মুমিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে না।

নারীদের ব্যাপারে নির্দেশনা

যে-সকল নারী ঈমান এনে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছে, তাদের বিষয়ে আল্লাহর বিশেষ কিছু নির্দেশনা এসেছে।

নারীদের শপথের বিষয়বস্তু

নারীদেরকে শপথ করানোর জন্য নবিজিকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই শপথের বিষয়বস্তু কী হবে, তা-ও তিনি জানিয়ে দেন সূরার শেষ অংশে।

ফজিলত

সূরা মুমতাহিনা মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, “মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।”

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ তথা ন্যায়-বিচার করতে হবে;

কারণ, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা ইনসাফ করে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আল্লাহর আনুগত্যশীল এক সমাজ গড়ে তোলা

১. বন্ধু পাতানোর শর্ত
কারও সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে গেলে, সবার আগে দেখতে হবে—আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক কেমন। কোনো আল্লাহ-বিদ্বেষীর সাথে ঘুণাক্ষরেও বন্ধুত্ব করা যাবে না।

২. মুমিনদের উত্তম আদর্শ
মুমিনদের জন্য উত্তম আদর্শ ইবরাহীম ﷺ। হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি শির্ককে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর মুমিনদেরকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

৩. নারীদের পরীক্ষা নেওয়ার কারণ
ইসলাম প্রত্যেক মুমিনের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ। তবে কেউ মুমিন সেজে মুসলিমদের যাতে ধোঁকা দিতে না পারে, তাই এই পদক্ষেপ।

৪. ফলাফল
এই পরীক্ষায় যারা টিকে রইল, তাদের ব্যাপারে মুমিনদের মধ্যে আর সংশয় রইল না। ফলে নিজেদের মধ্যকার ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিলো।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। এখানে কাফিরদের প্রকৃত অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে।	১-৩	শুধুমাত্র ইসলামের কারণে যে-সকল নারী হিজরত করেছে, তাদের পরীক্ষা নিতে হবে।	১০-১১
ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের মাঝে আছে উত্তম আদর্শ। সত্যের পথে তাঁরা ছিলেন অবিচল। তাঁরা অনুসরণীয়।	৪-৬	একইসাথে সেসব নারীদেরকে রাসূল ﷺ-এর কাছে আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চলার ওয়াদা করতে হবে।	১২
কাফিরদের সাথে সম্পর্ক রাখার সীমা যতটুকু—তা জানানো হয়েছে।	৭-৯	আল্লাহর শত্রুদের সাথে সখ্যতা গড়া নিষেধ।	১৩

কেইস-স্টাডি

শানে নুযুল অংশে আমরা হাতিব ইবনু আবু বালতাআ ﷺ-এর ঘটনা জেনেছি। সেই ঘটনার ওপর ফোকাস করে এই সূরার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন, "কিয়ামাতের দিন তোমাদের রক্তসম্পর্কের আত্মীয় ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনো কাজে আসবে না: তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন (কৃতকর্মের ভিত্তিতে); তোমরা যা-কিছু করো, আল্লাহ তার ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন।" বিষয়টা নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবা দরকার। যারা পরিবার-পরিবার করে নিজের আখিরাতকে ভুলে আছি, তারা এই আয়াতটা থেকে শিক্ষা নিতে পারি। হ্যাঁ, আমার ওপর পরিবারের যে হক আছে, সেটা তো পালন করবই। তবে সেটুকু পালন করে নিজের জন্যও একটু সময় রাখা চাই—যাতে করে নিজের রবের সামনে দীর্ঘ সাজদা করার ফুরসত মেলে। দু-হাত তুলে রবের দরবারে মাফ চাইবার সময়টুকু পাওয়া যায়।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/২৪৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এই সূরার ৪-৬ নং আয়াতে ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের আলোচনা উঠে এসেছে। আল্লাহ জানালেন, আমাদের জন্য তাদের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। এই আদর্শটা হলো বিশ্বাসগত। তারা জাতির লোকদেরকে বলেছিলেন, 'আমরা তোমাদের ব্যাপারে দায়মুক্ত, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যেগুলোর দাসত্ব করো সেগুলোর ব্যাপারেও দায়মুক্ত, আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও ঘৃণা শুরু হলো, যতক্ষণ-না তোমরা একমাত্র আল্লাহকে (ইলাহ হিসেবে) মেনে নেবে।'

এই কয়েকটা বাক্যে আমাদের জন্য রয়েছে ভীষণ চিন্তার খোরাক। লক্ষ করে দেখুন, পুরো একটা জাতি আপাদমস্তক শির্কে ডুবে আছে। সমাজের সবাই রাজা ও পুরোহিতদেরকে খোদা হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা যা বলবে, তা-ই হবে। সেই সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, এমনকি নিজের বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও ইবরাহীম ﷺ তাওহীদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল—একজন মুমিন কখনো কোনো কাফির কিংবা ইসলাম-বিদ্বেষীর সাথে সম্পর্ক গড়ে না। বদরের যুদ্ধে রাসূলের সাহাবিরা কিন্তু সেই দৃশ্যই আমাদেরকে দেখিয়েছেন। আবার এক মুমিন আরেক মুমিনের প্রতি সদয় হবে, সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এটাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। এটাই 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র নীতি।

তবে হ্যাঁ, যারা সাধারণ অমুসলিম—ইসলামের বিরুদ্ধে যাদের কোনো ষড়যন্ত্র নেই, আবার মুমিনদেরও কোনো ক্ষতি করে না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে কোনো নিষেধ নেই। বরং তাদের সাথে ভালো আচরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াই একজন মুমিনের কর্তব্য।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/২৪৫)

সূরা ছফ

سُوْرَةُ الصَّفِّ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০৯-তম সূরা। এর আগে সূরা তাগাবুন ও পরে সূরা জুমুআ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুমতাহিনা ও পরে সূরা জুমুআ।

এক নজরে ছফ

- মক্কা-বিজয়ের আগে নাযিল
- সূরা নং: ৬১
- আয়াত: ১৪
- মাদানি

নামের রহস্য

'ছফ' শব্দের অর্থ 'সারি; কাতার; অটল অবস্থা'। ৪ নং আয়াতে আল্লাহর প্রিয়ভাজন যোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে—তারা আল্লাহর পথে সিসা-ঢালা প্রাচীরের মতো অটল থেকে যুদ্ধ করে। সেখান থেকে এ-সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'ছফ'।

মেজর থিম

০১. কথা দিয়ে কথা রাখার গুরুত্ব।

০২. মুসা ﷺ-এর সঙ্গীদের মতো আচরণ না-করার আদেশ।

০৩. ঈসা ﷺ-এর সঙ্গী বা 'হাওয়ারি'দের মতো আচরণ করার নির্দেশ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে এসেছে জিহাদের আলোচনা: “প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সেসব লোককে ভালোবাসেন—যারা তাঁর পথে (যুদ্ধ করার কথা দিয়ে) সিসা-ঢালা প্রাচীরের মতো অটল থেকে যুদ্ধ করে।” সূরার শেষেও এসেছে জিহাদের আলোচনা: “আর তোমরা নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুমতাহিনা; যা শেষ করা হয়েছে আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আর সূরা ছফের শুরুতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থেকে মুক্তির উপায়; আর তা হলো আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা ও জিহাদ।

শানে নুযুল

হিজরত করে মদীনায় আসার পর মুসলিমরা ভাবল—মক্কার মুশরিকদের হাত থেকে বাঁচা গেছে, এবার বুঝি একটু শান্তি পাওয়া যাবে। নিরিবিলি আল্লাহর ইবাদাত করা যাবে। তবে সেই ফুরসত আর পাওয়া যায়নি। মদীনায় আসতে-না-আসতেই যেতে হলো বদরের প্রান্তরে। মুশরিকরা গো-হারা হারল। একপ্রকার নাকে খত দিয়ে কোনোরকমে জীবন নিয়ে পালিয়েছিল তারা। কিন্তু এরপরেও ওরা ফন্দি আঁটছিল—কীভাবে মুসলিমদের চিরতরে খতম করে দেওয়া যায়। তাদের সেই চিন্তার পালে হাওয়া লাগায় মদীনার ইহুদিরা। সেই সাথে যোগ দেয় মুনাফিকরা। অর্থাৎ চারিদিক থেকে বেঈমানরা সব একজোট। লক্ষ্য একটাই— মুসলিমদের টুঁটি চেপে ধরা। বেধে গেল উহুদ যুদ্ধ। আর তখন মুসলিমদের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু মুনাফিকের আসল চেহারা বেরিয়ে এল। সবাই একজোট হয়ে ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চাইল। তবে আল্লাহ চাইলেন সকল জীবনাদর্শের ওপর ইসলাম জয়ী হবে। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতেই আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেন। সেই সাথে মুসলিমদেরকে কিছু নির্দেশনাও দেন—আল্লাহর রাস্তায় অটল থেকে যুদ্ধ করতে হবে, নিজেদের জান-মাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী হতে হবে, কোনোভাবেই মুনাফিকি করা যাবে না।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২০/১)

সেগমেন্ট

আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা

সূরাটি শুরু হয় এই বক্তব্য দিয়ে—মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে।

উহুদ যুদ্ধে শৃঙ্খলা-ভঙ্গ

উহুদ যুদ্ধে মুনাফিকরা চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেই সাথে দুর্বল ঈমানের কিছু মুমিনও যুদ্ধের ব্যাপারে অনীহা দেখায়। সূরার কেন্দ্রবিন্দুতে সেই দিকটির আলোচনা করা হয়।

জিহাদ: লাভজনক এক ব্যবসা

এই সূরার শেষ দিকে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে একটি লাভজনক ব্যবসার পথ দেখান। আর সেটি হলো: জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

ফজিলত

সূরা ছফ মুসাব্বিহাত সূরাগুলোর একটি। যেগুলোর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵄-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে : তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন।' তিনি বললেন, '...মুসাব্বিহাত থেকে তিনটি সূরা পাঠ করো।'

(আবু দাউদ, ১৩৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

নিজে ভালো কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পর;

অন্যকে নসিহত করলে, এর প্রভাব ইতিবাচক হয়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

ঈমানের পথে ঐক্য ও অবিচলতা

১. কথা-কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা

মুমিনের কথা-কাজে মিল থাকবে শতভাগ। সে মুখে বলবে একটা, আর কাজে পরিণত করবে আরেকটা—এমনটা কখনো হতে পারে না।

২. দায়িত্বহীনতার ক্ষেত্রে হুঁশিয়ারি

মুসা ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের ঘটনা তুলে ধরা হয়। তারা তাদের নবির ব্যাপারে দায়িত্বশীল আচরণ না-করায়, আল্লাহ তাদের অন্তর বাঁকা করে দিলেন।

৩. আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা

মুমিনরা যদি আল্লাহর রাস্তায় অটল থাকে, তা হলে আল্লাহ তাদেরকে দেবেন বিশাল পুরস্কার। পরকালে মুক্তির পাশাপাশি, তারা দুনিয়ার বুকেও জয় লাভ করবে।

৪. আল্লাহর সাহায্যকারী হবার আদেশ

ঈসা ﷺ ও তাঁর নির্ভেজাল অনুসারীদের ঘটনা তুলে ধরা হয়। যারা তাদের নবিকে সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের মতো নির্ভেজাল সাহায্যকারী হওয়ার আদেশ দিলেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
জিহাদ-সহ সব ব্যাপারে কথা ও কাজের মিল থাকা জরুরি।	১-৪	একটি লাভজনক ব্যবসার খোঁজ দেওয়া হয়েছে।	১০-১৪
রাসূলদের দাওয়াতের প্রতি কাফিরদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	৫-৯		

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ৮-৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা তাদের কথা ও মিথ্যা প্রচারণার জোরে আল্লাহর আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যানকারীদের খারাপ লাগলেও আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণ করে ছাড়বেন! তিনিই তাঁর বার্তাবাহককে সঠিক পথনির্দেশনা ও জীবনাদর্শ দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সকল জীবনাদর্শের ওপর জয়ী করে দিতে পারেন, মুশরিকদের অপছন্দ হলেও!" হাল আমলের দিকে এবার একটু নজর দেওয়া যাক। মিডিয়ার গলা সব সময় সরগরম—গণতন্ত্রের বুলি, মানবাধিকার, মানুষে মানুষে সাম্য ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে তারা দেখাতে চায়—পশ্চিমা দর্শন, চিন্তা-চেতনা কতটা উদার! কত চমৎকার তাদের জীবনাদর্শ! আর মুসলিমরা সব সময় উন্নয়ন-বিরোধী, সেকেলে-পশ্চাৎপদ! এ ছাড়া নানান প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে তারা 'ইসলামোফোবিয়া' তো ছড়িয়ে যাচ্ছেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইসলামের জীবনাদর্শকে বাকি সবকিছুর ওপর জয়ী দেখতে চান। তাই পশ্চিমা দর্শনের প্রতি কোনো দুর্বলতা রাখা চলবে না। বরং ইসলামকে কীভাবে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে-ব্যাপারে নিজের সর্বোচ্চটুকু বিনিয়োগ করতে হবে।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৮/৮৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৫ নং আয়াতে মুসা ﷺ-এর বিরোধিতা করে যারা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল, তাদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—"এরপর তারা যখন বাঁকা পথ ধরল, তখন আল্লাহও তাদের অন্তর বাঁকা করে দিলেন।" এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। যেসব লোক নিজেরা বাঁকা পথে চলতে চায়, তাদেরকে চাপ দিয়ে, সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া আল্লাহ তাআলার নিয়ম নয়। যারা নিজেরা আল্লাহর নাফরমানি করার জন্য বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আল্লাহ জোর করে হিদায়াতের পথে আনবেন না। এ থেকে স্পষ্ট হয়, কোনো ব্যক্তি বা জাতির গোমরাহির শুরুটা তারা নিজেরাই করে। অবশ্য যে লোক গোমরাহি পছন্দ করে, আল্লাহ তাদের জন্য গোমরাহির পথে চলার সুযোগ রেখে দেন। আবার কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য ও হিদায়াতের পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে আল্লাহ তাকে জোর করে গোমরাহি ও নাফরমানির দিকে ঠেলে দেন না। এখন নিজের দিকে একটু তাকান—আপনাকে কে বাধ্য করছে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে? কেউ না। বরং আপনি নিজেই নিজেকে ওই পথে ঠেলে দিচ্ছেন। তাই এখন ফিরে আসার দায়িত্বটাও আপনাকেই নিতে হবে।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ২৯/৫২৮)

সূরা জুমুআ

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১১০-তম সূরা। এর আগে সূরা ছফ ও পরে সূরা ফাতহ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ছফ ও পরে সূরা মুনাফিকুন।

এক নজরে জুমুআ

- হিজরতের পরপর নাযিল
- সূরা নং: ৬২
- আয়াত: ১১
- মাদানি

নামের রহস্য

'জুমুআ' শব্দের অর্থ 'জমায়েত হওয়া'। সূরার ৯-১১ নং আয়াতে জুমুআর নামাজের বিধান নিয়ে আলোচনা এসেছে। সেখান থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'জুমুআ'।

মেজর থিম

০১ গোটা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা।

০২ ইহুদি-পণ্ডিতদের উদাহরণ।

০৩ জুমুআর নামাজের নির্দেশনা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহর গুণের আলোচনা দিয়ে—"মহাকাশে যা আছে আর যা আছে পৃথিবীতে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে; যিনি সম্রাট, ত্রুটিমুক্ত, অজেয় শক্তির অধিকারী, মহাজ্ঞানী।" আর শেষও হয়েছে আল্লাহর গুণ বর্ণনার মাধ্যমে : "আর আল্লাহই সর্বোত্তম জীবিকাদাতা।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ছফ; যাতে মুমিনদের পারস্পরিক ঐক্যের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর সূরা জুমুআতে দেওয়া হয়েছে শুক্রবারের নামাজের বিধি-বিধান, যা জামাআতের মাধ্যমে মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এক অনন্য উদাহরণ।

শানে নুযুল

মাদানি যুগের শুরু থেকেই ইহুদিরা মুসলিমদের বিরোধিতা করে আসছিল। আল্লাহর রাসূলকে তারা কখনোই মেনে নিতে পারেনি। কারণ তাদের আশা ছিল—নবি-রাসূল যদি আসেন, তা হলে তাদের বংশ থেকেই আসবেন। যেহেতু নবিজি তাদের বংশ থেকে আসেননি, তাই শুরু থেকেই গোঁয়ার্তুমি করে গেছে তারা। নানাভাবে নবিজিকে হয়রানি করেছে। তারা যে কেবল গাধার মতো কিতাবের বোঝা বয়ে বেড়ায়, কিন্তু তা থেকে কোনোভাবে উপকৃত হতে পারে না, এ-সূরায় সেই বিষয়টি আল্লাহ তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া তাদের নানান অযৌক্তিক দাবির সমালোচনা করা হয়েছে এখানে। একইসাথে এই সূরার একেবারে শেষাংশে জুমুআর নামাজের কিছু বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়। মদীনায় একটা সময় খাবার ও অন্যান্য জিনিসপাতির দাম খুব বেড়ে গিয়েছিল। ঠিক ওই সময়ের এক জুমুআর দিন। আল্লাহর রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তো সেই খুতবা চলাকালেই মসজিদের পাশে একদল ব্যবসায়ী এসে হাজির। হাঁকডাক দিয়ে নানান জিনিসপত্র বেচতে লাগল তারা। খুতবা শোনা শেষ করে গেলে হয়তো কোনোকিছু পাওয়া যাবে না—এই ভেবে রাসূল ﷺ-কে খুতবারত অবস্থায় রেখেই প্রায় সবাই সেদিকে ছোটেন। এই কাজটি আল্লাহ অপছন্দ করেছেন। আর তাই, ভবিষ্যতে যাতে এমনটা না হয়, সে-ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে এ-সূরার শেষের কয়েকটা আয়াত তিনি নাযিল করেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, ২০/৪৪)

সেগমেন্ট

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাত

কুরআন এমন এক জাতির ওপর নাযিল হয়, যাদের কাছে আগে কখনো আসমানি কিতাব নাযিল হয়নি। এটি ছিল তাদের প্রতি এক বিশেষ নিয়ামাত।

ইহুদিদের সমালোচনা

ইহুদিরা কেবল গাধার মতো বুকে-পিঠে তাওরাত বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তা থেকে কোনো শিক্ষা নেয় না।

বিধান

আল্লাহ তাআলা এই সূরার একেবারে শেষ অংশে জুমুআর নামাজের বিধান জানিয়ে দেন।

ফজিলত

জুমুআর নামাজে তিলাওয়াত করা সুন্নাহ : আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ জুমুআর দিন ফজর নামাজে সূরা সাজদা ও সূরা দাহ্‌র পড়তেন। আর জুমুআর নামাজে পড়তেন সূরা জুমুআ ও সূরা মুনাফিকুন।’

(মুসলিম, ৮৭৭, ৮৭৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আমরা এমন এক সত্তার কাছে ফিরে যাব, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু জানেন;

তাই কারা বাইরে ভালো মানুষ সেজে থাকে, আর গোপনে আল্লাহকে ভুলে যায়—সে ব্যাপারেও তিনি ওয়াকিবহাল।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আসমানি বিধান কার্যকর করার গুরুত্ব ও মুমিনের দায়িত্ব

১. নবি এলেন রহমত নিয়ে

সকল প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর, যিনি ধরার বুকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠিয়েছেন। তাঁকে বানিয়েছেন বিশ্ববাসীর মুক্তির দূত।

২. ওহির পথ থেকে বিচ্যুতি

ইহুদিরা বংশপরম্পরায় আসমানি কিতাবকে শুধু বয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু এই কিতাবের বিধানকে তারা কার্যকর করেনি। তাদের এই কাজ গাধার কাজের মতো।

৩. জুমুআ

জুমুআর দিন নামাজের জন্য ডাকা হলে, সেদিকে ছুটে যেতে হবে। কোনো গড়িমসি করা চলবে না। নামাজ শেষে আবার দুনিয়াবি কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তে বাধা নেই।

৪. ক্ষণিক আনন্দ

দুনিয়ার জীবন মোটের ওপর কিছু সময়ের আনন্দ মাত্র। এর চেয়ে আখিরাতের জীবন ঢের উত্তম। সর্বোত্তম জীবিকাদাতা তো আল্লাহই।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
রাসূল ﷺ-কে নুবুওয়াত দিয়ে আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা।	১-৪	জুমুআর নামাজের বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে।	৯-১১
তাওরাতের সাথে নামধারী ইহুদিদের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। আর তাদের মনগড়া নানান দাবিকে মিথ্যা প্রমাণিত করা হয়েছে।	৫-৮		

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আদেশ দিলেন—“যারা ঈমান এনেছ, জুমুআর দিন নামাজের জন্য ডাকা হলে, তোমরা বেচাকেনা ছেড়ে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য ছুটে যেয়ো; এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে!” এবার নিজেদের অবস্থা নিয়ে একটু পর্যবেক্ষণ করি। শনি থেকে বৃহস্পতি—ঘুম থেকে উঠেই দৌড় শুরু

কাজকর্মের দিকে। এরপর আসে শুক্রবার—আহ্ শান্তি! লম্বা-চওড়া এক ঘুম দেবো, উঠে হেলতে-দুলতে বাজারে যাব। আস্তে-ধীরে মসজিদে যাব, এত তাড়া কীসের? আর যারা ব্যবসা করেন, তাদের তো কথাই নেই। জুমুআর দিনই তো ব্যবসার মোক্ষম সময়। ওদিকে জুমুআর নামাজের আযান পড়ে গেছে, মিম্বার থেকে ভেসে আসছে খতিব সাহেবের বয়ান। আরবিতে খুতবা হয়ে গেল, নামাজটা দাঁড়াবে দাঁড়াবে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটি মসজিদের দিকে। কোনোরকমে দু'রাকাআত ফরজ শেষ করেই আবার বাসায় দৌড়। এই রুটিন পরিবর্তন করা জরুরি। এখনই সময় রবের দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়ার।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২২/৫৪৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

প্রাচীনকাল থেকেই মালপত্র টানতে মানুষ গাধাকে ব্যবহার করে আসছে। এখনো আরব-সহ বিভিন্ন দেশে বেশিরভাগ জিনিস বহন করার কাজটা গাধাই করে থাকে। এবার একটু চিন্তা করি—একটা গাধার পিঠে রাজ্যের বই চাপিয়ে দিলাম আমরা। দুনিয়ার এমন কোনো জ্ঞান নেই, যা ওই বইগুলোর মধ্যে নেই। আচ্ছা, গাধাটার পিঠে যে পুরো জ্ঞানের সাগর উঠিয়ে দিলাম, তাতে কি ওর এক রত্তি জ্ঞানও বাড়বে? নাকি গাধা 'গাধা'ই থেকে যাবে? এত এত বই বয়ে বেড়িয়ে গাধার যেমন কোনো উপকার হয়নি, ঠিক তেমনি শতাব্দীর পর শতাব্দী আল্লাহর-দেওয়া কিতাব বয়ে বেড়ানো একটা জাতির কোনো উপকার হয়নি। তাদের ওপর আসমানি কিতাব তাওরাত নাযিল হয়েছিল। কিন্তু তাওরাতের সেই জ্ঞানকে তারা নিজেদের কোনো কাজে লাগায়নি। বরং তাওরাতের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে ইহুদিরা বিপথে হেঁটেছে বারংবার।

আর আমাদের কাছে আসমানি কিতাব এসেছে—সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব—আল-কুরআন। নিশ্চিত করে বলা যায়, এমন কোনো মুসলিমের ঘর পাওয়া যাবে না, যে-ঘরে কুরআনের একটা কপি নেই। তবে মজার ব্যাপার হলো—এই কুরআনকে আমরা এতটাই সম্মান করি যে, একে একেবারে সিন্দুকে ভরে রেখে দিই। অথবা সুন্দর একখানা গিলাফে মুড়িয়ে বড় আলমারিটার ওপরে উঠিয়ে রাখি। কুরআন বলে কথা! কী দরকার প্রতিদিন এটাকে নামিয়ে 'অসম্মান' করার! ওদিকে কুরআনের গায়ে ধুলোবালি পড়তে থাকে, কিন্তু আমাদের তাতে কিছু আসে-যায় না। হ্যাঁ, শুনতে খারাপ বা অদ্ভুত লাগলেও আমাদের অধিকাংশ মুসলিম পরিবারেই আজ এই চিত্র দেখা যায়। আমাদের দশাও আজ সেই তথাকথিত ইহুদিদের মতো হতে চলেছে। বংশ-পরম্পরায় কুরআনকে শুধু বয়েই বেড়াচ্ছি; কিন্তু এই কুরআনের মধ্যে যে কী অমূল্য রত্ন লুকিয়ে আছে, তা কোনোদিন খুঁজবার চেষ্টা করি না। কত পার্সেন্ট মুসলমান বলতে পারবে—জীবনে একবার হলেও আমি পুরো কুরআনটা অর্থসহ পড়েছি? তাই এখনই সময় কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়াবার। গাধা নয়, মানুষ হয়ে বাঁচা খুব প্রয়োজন।

(দেখুন—বুখারি, ৫০২৭; মুসলিম, ৭৯৮, ৮১৭; তিরমিযি ২৯২৬; আবু দাউদ ৪৮২৯)

সূরা মুনাফিকুন

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০৪-তম সূরা। এর আগে সূরা হাজ্জ ও পরে সূরা মুজাদালা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা জুমুআ ও পরে সূরা তাগাবুন।

এক নজরে মুনাফিকুন

- উহুদ ও বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর নাযিল
- সূরা নং: ৬৩
- আয়াত: ১১
- মাদানি

নামের রহস্য

'মুনাফিকুন' শব্দটি 'মুনাফিক' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ 'ঈমান থেকে চুপিসারে-বেরিয়ে-যাওয়া ব্যক্তি; কপট; দ্বিচারী'। সূরার ১-৮ নং আয়াতে লাগাতারভাবে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেখা ন থেকে এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'মুনাফিকুন'।

মেজর থিম

- ০১ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ঘটনা।
- ০২ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।
- ০৩ মুমিনদের জন্য আল্লাহর উপদেশ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরু হয়েছে আল্লাহর ইলম সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে : "আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন আপনি তাঁর রাসূল; তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন—নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা মিথ্যুক।" সূরার শেষটাও হয়েছে একই আলোচনা দিয়ে : "তোমরা যা করছো, সে-সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবে অবহিত আছেন।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা—সূরা জুমুআতে মুমিনদের পারস্পরিক ঐক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর এই সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে কারা সেই ঐক্য থেকে বেরিয়ে যায়—অর্থাৎ মুনাফিকদের আচরণ।

শানে নুযুল

হিজরতের আগে মদীনার দুই গোত্র—আওস ও খাযরাজের মধ্যে রেষারেষি ছিল। নিজেদের মধ্যে কোনো ধরনের বন্ধন ছিল না। কেউ কারও মাতবরি সহ্য করত না। এভাবে চলতে চলতে একপর্যায়ে এসে সেই বিরোধ থামে। তারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে—দুই গোত্রের নেতা হবে একজন। সবাই আওস গোত্রের আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নিল। গোত্রপতির মাথায় মুকুট উঠবে উঠবে এমন একটা সময়। আর তখনই এই দুই গোত্রের ৭৫ জন মান্যগণ্য ব্যক্তি নবিজির হাতে বাইআত নেন। তাঁকে মদীনায় আশ্রয় নেবার অনুরোধ জানান। আল্লাহর আদেশে একটা সময় নবিজি মদীনায় হিজরত করেন। চারিদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আবদুল্লাহ'র মাথায় মুকুট উঠবে কি, সবাই তো পারলে নবিজিকে মাথায় করে রাখে। আর এই বিষয়টা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই সহজে হজম করতে পারল না। নিজের হবু আভিজাত্য ও ক্ষমতাকে এভাবে চোখের সামনে দাফন হতে দেখে, সামলে রাখতে পারল না নিজেকে। নানাভাবে সে নবিজিকে কষ্ট দেবার পাঁয়তারা করল। উহুদ যুদ্ধে তো বিশ্বাসঘাতকতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল সে। এমনকি নবিজি ও সকল মুহাজির সাহাবিকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়ার হুংকারও দিয়েছিল একবার। এরকম নানা ক্ষেত্রে তার ও তার সঙ্গীদের যে মনোভাব—অর্থাৎ মুনাফিকদের চরিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতেই আল্লাহ তাআলা এ-সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২০/৭৩; তাফহীমুল কুরআন, ১৭/১৫১)

সেগমেন্ট

মুনাফিক পরিচিতি

সূরাটি শুরুই হয়েছে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। সূরার বড় একটি অংশ জুড়েও আছে এদের আলোচনা।

আতঙ্ক

মুনাফিকরা সব সময় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটায়—এই বুঝি তাদের নিয়ে কোনো গোপন কথা আল্লাহ ফাঁস করে দিলেন!

সাবধানতা

মুনাফিকদের ব্যাপারে সবসময় সাবধান থাকতে হবে। মুসলিম সমাজে পরিচয় গোপন রাখে বলে এদেরকে সহজে চেনা যায় না।

ফজিলত

জুমুআর নামাজে তিলাওয়াত করা সুন্নাহ : আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ জুমুআর দিন ফজর নামাজে সূরা সাজদা ও সূরা দাহ্‌র পড়তেন। আর জুমুআর নামাজে পড়তেন সূরা জুমুআ ও সূরা মুনাফিকুন।'

(মুসলিম, ৮৭৭, ৮৭৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মুনাফিকদের চক্রান্ত ও ইসলাম-বিদ্বেষের ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে দিলে;

সমাজ বিপথে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে আর, তৈরি হবে সামাজিক সুরক্ষা-বলয়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মুনাফিকির পরিচয় ও পরিণতি

১. মুনাফিকদের চরিত্র

মুনাফিকরা মুখে ঈমানের কথা বলে। কিন্তু তাদের অন্তরে কুফর। এরা প্রতারক। এদের অন্তর অহংকারে ভরতি—সব সময় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চায়।

২. মুসলিম সমাজে এদের ভূমিকা

মুনাফিকরা সব সময় সুযোগের খোঁজে থাকে—কীভাবে মুসলিম-সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়।

৩. আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া

মুমিনের উচিত—দুনিয়ার জীবনের ওপর পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া। ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে না রাখে, সেদিকে খেয়াল রাখা।

৪. হুঁশিয়ারি

নির্ধারিত সময় চলে এলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। মুনাফিকরা যতই মায়াকান্না জুড়ে দিক-না কেন, তাদেরকে আর কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মুনাফিকদের অবস্থা ও তাদের বিপরীতমুখী আচরণের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে।	১-৪	আল্লাহর রাসূলের পাশে যারা থাকে, তাদের পেছনে অর্থ-সম্পদ খরচ করতে মুনাফিকরা নিষেধ করে।	৭-৮
মুনাফিকদেরকে যদি ডাকা হয়—আসো, নবিজি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন, তা হলে তারা তাচ্ছিল্যভরে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যায়।	৫-৬	দুনিয়ার মায়ায় বিভোর না হয়ে, মৃত্যুর আগেই দান-সাদাকা করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।	৯-১১

কেইস-স্টাডি

সূরার ৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তুমি এদেরকে দেখলে এদের (নাদুসনুদুস) শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে, এরা কথা বললে এদের (মিঠা) কথা তুমি শুনতেই চাইবে, বাস্তবে এরা ভেতর-থেকে-ফোকলা-হয়ে-যাওয়া কাঠের গুঁড়ির মতো (অন্তঃসারশূন্য)।" আপনার চারপাশে এরকম কোনো চেহারা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে কি? নাদুসনুদুস চেহারার এসব লোক বিভিন্ন মহলের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেয়। ইনিয়ে-বিনিয়ে নানাকিছু বলে উম্মাহকে বোঝাবে—'এখন এটা করার সময় নয়, ওটা করা যাবে না।' এদের মুখে দু-চারটা ভালো শব্দ শুনে আপনিও ভাববেন—'কী দরকার এত মাথা ঘামানোর!' এভাবে এরা আপনাকে দ্বীনের মূল রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবে। আর ওদিকে ওসব মহলকে খুশি করে নিজের ফায়দা লুটবে।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩০/৫৪৭; মুহাম্মাদ আলি সাবুনি, সফওয়াতুত তাফাসীর, ৩/৩৬৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে এ-সূরার ৪ নং আয়াতে নবিজিকে সাবধান করেন—"এরা শত্রু, এদের ব্যাপারে সাবধান হও!" এখন নবিজি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু কুরআনের এই আয়াতের কাজ শেষ হয়ে যায়নি। আজও আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে হবে মুনাফিকদের ব্যাপারে। ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনদের ব্যাপারে মুমিনরা তো সাবধান থাকবেই, তবে মুনাফিকদের জন্য চোখ-কান বেশি করে খোলা রেখে পথ চলতে হবে। কারণ মুনাফিক এমন শত্রু, যাদের ব্যাপারে আমরা তেমন একটা মাথা ঘামাই না। অথচ এরা আমাদের সাথে থেকে একই আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠে, এরপর আমাদের সাথেই শত্রুতা করে!

এবার বর্তমান দুনিয়ার দিকে একটু তাকানো যাক। ছোট্ট একটা অবৈধ এলাকা ইসরাঈল। অথচ দখল করে নিয়েছে ফিলিস্তিনের সিংহভাগ। নারী-শিশু-বৃদ্ধ কেউ-ই ওদের টার্গেটের বাইরে নয়। অথচ ওর আশেপাশে কিন্তু কোনো কাফির রাষ্ট্র নেই। পুরো ইসরাঈলটাকে ঘিরে রেখেছে 'বাঘা বাঘা' সব 'মুসলিম দেশ!' কিন্তু ইহুদিদের সাথে 'শান্তিচুক্তি'র বাহানায় সেসব দেশ বসে বসে তামাশা দেখে। ইউরোপ-অ্যামেরিকাতে পর্যন্ত বিক্ষোভ হয়, অমুসলিমরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানায়। অথচ এই দেশগুলোর 'মুসলিম' জনগণ গো-বেচারার মতো বসে থাকে! আফসোস! এটা কি কোনো মুসলিমের আচরণ হতে পারে! মুসলমানের চরিত্র কি এ-ই—সে নিজের ভাইকে শত্রুর হাতে রক্তাক্ত হতে দেখে, চুপচাপ বসে থাকবে?

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩০/৫৪৭)

সূরা তাগাবুন سُوْرَةُ التَّغَابُنِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০৮-তম সূরা। এর আগে সূরা তাহরীম ও পরে সূরা ছফ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬৪ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুনাফিকুন ও পরে সূরা তালাক।

এক নজরে তাগাবুন

- মাক্কি অথবা মাদানি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ৬৪
- আয়াত: ১৮
- মাদানি

নামের রহস্য

‘তাগাবুন’ মানে ‘লাভ-লোকসান’। আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিনটিকে প্রকৃত লাভ-লোকসানের দিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সূরার ৯ নং আয়াতে উঠে এসেছে সেই আলোচনা। সেখান থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে ‘তাগাবুন’।

মেজর থিম

০১ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

০২ চূড়ান্ত সফলতা।

০৩ চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা, বিশালতা ও মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: "মহাকাশে যা আছে আর যা আছে পৃথিবীতে—সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে; রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" এমনটি এসেছে সূরাটির শেষ আয়াতেও: "আল্লাহ কৃতজ্ঞতার উত্তম পুরস্কার-দানকারী, অত্যন্ত সহনশীল, অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সব বিষয়ে জ্ঞানী, অজেয় শক্তির অধিকারী, বিচক্ষণ!"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুনাফিকুন; যার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা যা করছো, সে-সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবে অবহিত আছেন।" আল্লাহ যে সবার সমস্ত কাজ সম্পর্কে অবহিত আছেন সেটি উঠে এসেছে সূরা তাগাবুনের শুরুতেও, "তোমরা যা করছো, আল্লাহ সব দেখছেন।"

শানে নুযুল

মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহকে স্বীকার করে নেওয়া। মন আপনা-আপনিই সায় দেবে—চমৎকার এই আকাশ-বাতাস-মহাবিশ্ব, হুট করে এমনি এমনি-ই হয়ে যায়নি। আর এগুলো কারও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া একা-একা চলতে পারে না। তা-ও আবার নিখুঁতভাবে চলছে সবকিছু! তবে কিছু মানুষ আছে, যারা এগুলো দেখেও দেখে না। আল্লাহর এসব অপরূপ সৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, আসমান-জমিন এমনি এমনি চলছে না। এগুলো মালিকহীন নয়। বরং আল্লাহই এগুলোর মালিক। তিনিই এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন। অবাধ্যরা আরও মনে করত, মরে গেলে তো গেলামই। আবার জীবিত হব কীভাবে! এক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, আসমান-জমিন যেমন কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া বানানো হয়নি, ঠিক তেমনি তোমাদেরকেও কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া এত সুন্দর করে বানানো হয়নি। শুধু তা-ই না। তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে স্বাধীন-সত্তা। আল্লাহ দেখতে চান—কারা ঈমান আনে, আর কারা কুফরের পথে চলে। কারণ দিনশেষে তো আল্লাহর কাছেই ফিরতে হবে। মোটাদাগে মানুষকে ঈমান ও আল্লাহর ওপর আনুগত্যের আহ্বান জানিয়ে এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে। সেই সাথে ক্ষেত্রবিশেষে দেওয়া হয়েছে কিছু নৈতিক শিক্ষাও।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২০/৯৮; তাফহীমুল কুরআন, ১৭/১৬৭)

সেগমেন্ট

আল্লাহ

আল্লাহ এমন এক সত্তা—যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে চমৎকার আকৃতি দিয়েছেন। আর তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

সকলের প্রতি আদেশ

সূরার মাঝের অংশে মানুষকে ঈমান আনতে বলা হয়—আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও কুরআনের ওপর।

মুমিনের প্রতি সাবধানবাণী

কোনো কোনো স্ত্রী-সন্তান দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে শত্রুতে পরিণত হয়। তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

ফজিলত

সূরা তাগাবুন মুসাব্বিহাত সূরাগুলোর একটি। যেগুলোর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে : তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন।' তিনি বললেন, '...মুসাব্বিহাত থেকে তিনটি সূরা পাঠ করো।'

(আবু দাউদ, ১৩৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মুসলিমদের দোষত্রুটির ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব ক্ষমাশীল হতে হবে; → এতে আশা করা যায়—আল্লাহ-ও আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
প্রকৃত লাভ-লোকসান

১. আল্লাহর পরিচয়
আল্লাহ—এমন এক সত্তা, সবাই যাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় রত। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

২. প্রকৃত লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্ত
আগেকার জাতিগুলোর যারাই আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, তারাই দুনিয়ার বুক থেকে হারিয়ে গেছে। কিয়ামাতের দিন বোঝা যাবে—সত্যিকার অর্থে কারা লাভবান, আর কারা ক্ষতিগ্রস্ত।

৩. পরীক্ষা
সম্পদ ও পরিবার-পরিজন দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। এসবের ধোঁকায় পড়ে যেন মানুষ নিজেকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল না করে।

৪. মুমিনের প্রতি নির্দেশনা
আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা, কৃপণতা না করে দানশীল হওয়ার জন্য আল্লাহ মুমিনদেরকে নির্দেশ দেন। সেই সাথে জানিয়ে দেন তাদের পুরস্কারের কথা।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে।	১-৪	সফলতার পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে।	১১-১৩
যেসব মানুষ তাদের রবের বাণীকে অস্বীকার করেছিল, তাদের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।	৫-৬	সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ হলো আল্লাহর পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পাশ করার পথও আল্লাহ এখানে বাতলে দিয়েছেন।	১৪-১৮
পরকালের ওপর কাফিরদের অবিশ্বাস ও তাদের পরিণতি। একইসাথে দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা।	৭-১০		

কেইস-স্টাডি

মানুষ হিসেবে আমরা দুটো বিষয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করি। এর মধ্যে একটি হলো সম্পদ। আর অপরটি হলো সন্তান-সন্ততি। মারা যাওয়ার সময় এদেরকেই আমরা দুনিয়ায় রেখে যাই। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই দুটো বিষয়ের প্রতি আমাদের আবেগ-অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষা থাকে খুবই উঁচুতে। সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য আমরা সব করতে রাজি আছি। সাদাকে কালো আর কালোকে সাদা করতেও আমাদের হাত কাঁপে না। তাই তো আল্লাহ আমাদেরকে এই সূরার ১৫ নং আয়াতে জানালেন—“তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার উপকরণ, মহাপুরস্কার তো আল্লাহর কাছে।” অর্থাৎ এই ধন-সম্পদ ও ছেলেমেয়ের পেছনেই তোমার নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিয়ো না। বিচার দিবসে নিজেকে অপরাধী হিসেবে দাঁড় করিয়ো না। এগুলোর মাধ্যমে তোমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে কেবল।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/১৪৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

“যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের কোনো কোনো জীবনসঙ্গী ও সন্তান তোমাদের (দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে) শত্রু, সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান হও!” এ-সূরার ১৪ নং এই আয়াতটিতে সংসারী মানুষদের জন্য রয়েছে বেশ শক্ত একটা ধাক্কা। নিজের স্ত্রী-সন্তানও শত্রু হতে পারে! তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যেন, পেলেপুষে নিজের শত্রুকেই বড় করে তোলা! এখন কীভাবে বুঝব, আমার স্ত্রী-সন্তান আমার জন্য দ্বীনের সহায়ক নাকি শত্রু? দ্বীনের পথে তারা যদি আপনাকে এগিয়ে যেতে দেয়, তা হলে বুঝবেন, তারা আপনার দ্বীনের সহায়ক। আর যদি স্ত্রী-সন্তানের জন্য দ্বীন থেকে একটু একটু করে আপনি দূরে সরে যান, হারামে লিপ্ত হন, তা হলে তারা আপনার শত্রু। তাদের থেকে সাবধান থাকা জরুরি। পাশাপাশি তাদেরকে দ্বীনের পথে আনবার চেষ্টা করতে হবে। দ্বীনের বুঝ পেয়ে গেলে, তারা আপনা-আপনিই হয়ে উঠবে আপনার সহযোগী। তাদের আবদার মেটাতে তখন আর হারাম পথে পা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/২৯২)

“সুতরাং তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখো।” এ-সূরার ১৬ নং আয়াত এটি। এখানে একটি শব্দ লক্ষ্য করুন—مَا اسْتَطَعْتُمْ বা ‘তোমাদের সাধ্যানুযায়ী’; অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন পালনে মানুষকে ততটুকু সচেষ্ট থাকতে হবে, যতদূর পর্যন্ত করার সামর্থ্য তার আছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুমিন নিজের সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তাকওয়ার পথ অনুসরণ করবে। যদি সে অলসতা করে, আর অল্প একটু কষ্ট দেখেই কেউ যদি দ্বীন থেকে পিছপা হয়, তাহলে আখিরাতে তার জবাবদিহি হবে অত্যন্ত কঠিন। অবশ্য কোন জিনিস কার সাধ্যের বাইরে, তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তিনি যে অন্তর্যামী।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৮/১৬৫)

সূরা তালাক

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯৯-তম সূরা। এর আগে সূরা দাহ্র/ইনসান ও পরে সূরা বাইয়্যিনা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা তাগাবুন ও পরে সূরা তাহরীম।

এক নজরে তালাক

- মাদানি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৬৫
- আয়াত: ১২
- মাদানি

নামের রহস্য

‘তালাক’ অর্থ ‘বিবাহ-বিচ্ছেদ’। সূরার ১-৭ নং আয়াতে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর করণীয় কিছু বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকে এ-সূরার নামকরণ করা হয়েছে ‘তালাক’।

মেজর থিম

০১ ইদ্দত বা অপেক্ষার সময়কাল।

০২ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য বিধান।

০৩ তাকওয়া বা আল্লাহভীতির সুফল।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। শুধুমাত্র তাঁর কাছেই আছে ভবিষ্যতের জ্ঞান, আর এই বিষয়টিই উঠে এসেছে সূরাটির প্রথম দিকে, "তোমার এটা জানা নেই—হতে পারে আল্লাহ এরপর নতুন কিছু ঘটাবেন।" আল্লাহর জ্ঞানের এই বিশালতা উঠে এসেছে সূরাটির শেষ আয়াতেও, "আল্লাহ জ্ঞানের দিক দিয়ে সবকিছু বেষ্টন করে রেখেছেন।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা তাগাবুন; যার শেষ অংশে মুমিনদের প্রতি কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়। আল্লাহর ক্রোধের ব্যাপারে সাবধান করা হয়। সাবধানতার বাণী পাওয়া যায় সূরা তালাকের শুরুতেও, "তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো: (ইদ্দত চলাকালে) তাদের ঘর থেকে তাদেরকে বের করে দিয়ো না।"

শানে নুযুল

কুরআন মানুষের সাথে শুধু গুরুগম্ভীর আলোচনা করে না। বরং তার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও আলাপ করে। তার দাম্পত্য জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেয়। তেমনিভাবে, এ-সূরাটি নাযিল করা হয়েছে তালাক-সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা দিতে। একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে সর্বোচ্চ কয়টি তালাক দিতে পারবে, তালাক দিলে করণীয় কী, এরপর নতুন বিয়ে করতে চাইলে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে—এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন জানিয়ে আল্লাহ এ-সূরাটি নাযিল করেছেন। তালাক হয়ে গেলে তো স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারা হাঁটবে তাদের নিজেদের পথে। কিন্তু সন্তানের কী হবে? কোনো দুধের শিশু থাকলে, তাকে তো দুধ খাইয়ে বড় করতে হবে। মা'র বুকের দুধ তার জন্মগত অধিকার! সেই শিশুর দুধপানের ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে, সে-নির্দেশনা দিয়েও কয়েকটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। এ ছাড়া তালাকের পর কোন ক্যাটাগরির স্ত্রীকে কী পরিমাণ খরচাপাতি দিতে হবে, সেটিও জানানো হয়েছে। মোটকথা, এই সূরায় একদিকে রয়েছে তালাকের বিধান। অপরদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নারী ও শিশুর অধিকারের বিষয়টি।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৪/৩২৪)

সেগমেন্ট

বাতিলযোগ্য তালাকের বিধান

সূরার প্রথম অংশেই আল্লাহ তাআলা—তালাক ও এ-সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান নাযিল করলেন।

সতর্কতা, করণীয় ও সুখবর

আগেকার অবাধ্য জনপদের ধ্বংসের কথা মনে করিয়ে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে মুমিনদের করণীয় ও তাদের জন্য যেসব পুরস্কার আছে, তা-ও জানানো হয়েছে।

মহাবিশ্বের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে পুরো মহাবিশ্বকে ঘিরে রেখেছেন।

ফজিলত

কুরআনের সেরা অংশ : সূরা তালাক মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রতিটি বিষয়ের একটি সেরা অংশ থাকে। কুরআনের সেরা অংশ হলো মুফাস্‌সাল সূরাগুলো।”

(হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭/১৬২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহর বেঁধে-দেওয়া সীমারেখার বাইরে না-যাওয়ার জন্য সবাইকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে;

এটি নিজের জন্য একটি রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ করবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর নির্দেশনা মানার প্রয়োজনীয়তা

১. তালাক ও তালাক-পরবর্তী নির্দেশনা
নারীদেরকে তালাক দিতে চাইলে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ করে তালাক দিতে হবে। তালাক-পরবর্তী সময়ের জন্যও সেই নির্দেশনা মানতে হবে।

২. পারিবারিক-জীবনে তাকওয়ার সুফল
আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশনা মেনে নিলে, মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সকল সংকটে মিলবে দারুণ সমাধান।

৩. নারী ও শিশুর সুরক্ষা
আল্লাহ তাআলা নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে করণীয় ঠিক করে দিলেন। তাদেরকে দিলেন সেইফগার্ড।

৪. হুঁশিয়ারি ও সুসংবাদ
আল্লাহ বিধান দিয়েছেন। সুতরাং মানুষের করণীয় এগুলো মেনে নেওয়া। এক্ষেত্রে অবাধ্য হলে, মুখোমুখি হতে হবে ভয়ংকর শাস্তির। আর মেনে নিলে, মিলবে চোখ-জুড়ানো জান্নাত।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
তালাক ও এ-সম্পর্কিত বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১-৭	আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।	১২
একগুঁয়ে প্রকৃতির লোকদের জাহান্নামের ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে। পাশাপাশি মুমিনদের জন্য এসেছে জান্নাতের ওয়াদা।	৮-১১		

কেইস-স্টাডি

‘তাকওয়া’ বা হৃদয়ে আল্লাহ-ভীতির অনুভূতি থাকা মানুষের জন্য বিরাট এক নিয়ামাত। সেই হৃদয়ই তো চমৎকার, যে হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগ্রত আছে। কারণ আল্লাহর ভয় এমন এক ঢাল, যার মাধ্যমে মানুষ শয়তানের সকল তিরকে রুখে দিতে পারে। এই সূরার ২-৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকবে, আল্লাহ তার জন্য (সংকট থেকে) বের হওয়ার রাস্তা করে দেবেন এবং তাকে এমন-সব

দিক থেকে জীবিকা দেবেন, যা সে ধারণাও করতে পারবে না। যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" একটিবার চিন্তা করুন—স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে এই বলে অভয় দিচ্ছেন যে—তুমি আমার ওপর ভরসা করো, তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। সুবহানাল্লাহ! এই আয়াত-দুটি নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হবে। তা হলে আমরা বুঝতে পারব—অভাব বা যেকোনো সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহই রাখেন। আর এই মুক্তি পাওয়ার জন্য ছাড়তে হবে তাঁর অবাধ্যতার পথ।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩০/৫৮২; তিরমিযি, ২৩৪৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

ইসলামে নারী সম্পর্কিত বিধানসমূহ কতটা সূক্ষ্ম, তা ভাবলেই অবাক হতে হয়! তালাকের মতো একটা বিষয়কে আজকাল আমরা ডালভাত বানিয়ে ফেলেছি। অথচ এই বিষয়ে ইসলাম কতটা সেনসিটিভ! বিয়ের আগে ইসলাম আপনাকে যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু বিয়ের পরে মন চাইলেই তালাক দিয়ে দেবেন—ইসলাম কোনোভাবেই এটাকে সমর্থন করে না। কাগজে একখানা সই করে বলবেন, এই মুহূর্তে এখান থেকে বের হয়ে যাও—এই কথা বলার অধিকার ইসলাম পুরুষকে দেয়নি। বরং তালাক যদি দিতেই হয়, তবে তা হবে ধাপে ধাপে। সেই নারীর গর্ভে আপনার সন্তান আছে কি-না সেটা আগে নিশ্চিত হতে হবে। কারণ তার গর্ভে যদি সত্যিই কোনো বাচ্চা থেকে থাকে, তা হলে হয় সেই বাচ্চাটি বিড়ম্বনায় পড়বে, আর না-হয় তার নতুন স্বামী হবে প্রতারণার শিকার। এ-সময়টাতে, তাকে থাকতে দিতে হবে এমন বাসায়, যেমন বাসায় আপনি নিজে থাকেন। সে যদি গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তা হলে বাচ্চা হওয়ার আগ-পর্যন্ত তাকে সামর্থ্যমতো খরচাপাতি দিতে হবে। বাচ্চা হওয়ার পর বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার জন্য তাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। সে যদি নিজে দুধ খাওয়াতে না পারে, তা হলে আপনার পয়সায় অন্য কারও কাছে বাচ্চার দুধ-পানের ব্যবস্থা করতে হবে। মোটকথা, নারীকে সম্পূর্ণ রিজার্ভ রাখা হচ্ছে এখানে। হুট করে তাকে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়ার পথ ইসলাম খোলা রাখছে না। আর ওদিকে ধান্দাবাজ বেহায়ার দল নারীকে বানিয়েছে জাহিলি যুগের পণ্য। পদে পদে তাদেরকে অসম্মান করছে। নারী অধিকার আর সমতার নামে পুরুষের প্রতিপক্ষ হিসেবে মাঠে নামিয়ে দিচ্ছে। সেই সুযোগে নিজ নিজ আখের গোছানোর কাজটাও চলছে ষোলো আনা। ইসলাম নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ তো দূরে থাক, সমকক্ষও বানায়নি। বরং নারীকে দিয়েছে এক বিশেষ মর্যাদার স্থান, তাদের পায়ের নিচে রেখেছে সন্তানের বেহেশত!

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৩/২৪-২৬; ইবনু কাসীর, ৭/২৯৬)

সূরা তাহরীম

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০৭-তম সূরা। এর আগে সূরা হুজুরাত ও পরে সূরা তাগাবুন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা তালাক ও পরে সূরা মুলক।

এক নজরে তাহরীম

- ৭ম হিজরির দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৬৬
- আয়াত: ১২
- মাদানি

নামের রহস্য

'তাহরীম' শব্দের অর্থ 'কোনোকিছুকে হারাম করা; বন্ধ করা; কোনোকিছু থেকে দূরে থাকা'। একবার রাসূল ﷺ কোনো বৈধ জিনিস থেকে দূরে থাকার শপথ করেছিলেন। সূরার ১ নং আয়াতে উঠে এসেছে সেই আলাপ। সেখান থেকে এই সূরার নাম হয়েছে 'তাহরীম'।

মেজর থিম

০১. উম্মুল মুমিনীনদের নিয়ে একটি ঘটনা।

০২. মন্দ নারীদের উদাহরণ।

০৩. ভালো নারীদের উদাহরণ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে এসেছে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের আলোচনা। আর এ সূরাটির শেষ অংশে দু'জন নবির স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা তালাক; যাতে এসেছে সাধারণ নারীদের বিষয়ে আলোচনা। আর সূরা তাহরীমে এসেছে 'বিশেষ নারীগণ' অর্থাৎ নবি ﷺ-এর স্ত্রীদের আলোচনা।

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ একদিন আসরের পর তাঁর স্ত্রী যাইনাব বিনতু জাহশ ﵂-এর কাছে গেলেন। সেখানে তিনি অনেকক্ষণ বসলেন। কারণ, যাইনাবের ঘরে কিছু মধু হাদিয়া এসেছিল। নবিজি মিষ্টি জাতীয় খাবার পছন্দ করতেন; তখন ওখানে বসে মধুর শরবত পান করছিলেন। এতে করে অনেকটা সময় কেটে যায়। এ-বিষয়টা উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে কারও কারও কাছে ভালো লাগল না। তাই তারা মিলে পরামর্শ করলেন—তাদের যার কাছেই নবিজি আসবেন, সে-ই বলবে, 'আপনার মুখ থেকে মাগাফির-এর দুর্গন্ধ আসছে।' পরিকল্পনা-মতো তারা তা-ই বললেন। তখন নবিজি ভাবলেন, যাইনাবের ঘরে মধু খাওয়াটা তাহলে ঠিক হয়নি। এমনিতেই নবি ﷺ মুখে দুর্গন্ধ হওয়াকে খুবই অপছন্দ করতেন। তাই তিনি শপথ করলেন—ওই মধু তিনি আর কখনো পান করবেন না। এতে তার অন্য স্ত্রীরা খুশি হলেন বটে, কিন্তু আল্লাহ নারাজ হলেন। কারণ রাসূল ﷺ যদি কোনো হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেন, তা হলে তাঁর উম্মতও সেটিকে তাদের জন্য হারাম মনে করবে। তাই পরিষ্কারভাবে আল্লাহর একক কর্তৃত্বের বিষয়টি তুলে ধরতে এই সূরাটি নাযিল করা হয়। অর্থাৎ কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম করার এখতিয়ার কেবল আল্লাহর।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৮/১৭৭; মুসলিম, ১৪৭৪)

সেগমেন্ট

মৃদু তিরস্কার

সূরার শুরুতেই 'ও নবি,' বলে সম্বোধন করে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মৃদু তিরস্কার করলেন। তিনি কেন হালাল কোনো বিষয়কে নিজের জন্য হারাম করলেন, সেই প্রশ্ন করলেন।

মুমিনদের প্রতি নির্দেশনা

মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—তারা যাতে নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়। আর খাঁটি তাওবা করে।

নারীদের আইকন

কাফির নারীদের জন্য উদাহরণ হলো নূহ ও লূত ﷺ-এর স্ত্রী। আর ঈমানদার নারীদের জন্য উদাহরণ ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া ও ইমরান পরিবারের মেয়ে মারইয়াম ﷺ।

ফজিলত

সূরা তাহরীম মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

গুনাহের পরিমাণ বাড়লে অন্তর দুর্বল হয়, আল্লাহর রহমত দূরে সরে যায়;

ফলে সামান্য কারণেই পরিবারে দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা

১. ভারসাম্যপূর্ণ জীবন

মুহাম্মাদ ﷺ একজন মানুষ ছিলেন। মানুষ হিসেবে তাঁর ব্যক্তিজীবন ছিল। তবে এর চেয়ে বড় পরিচয় হলো—তিনি আল্লাহর রাসূল। নবিজির জীবনে ছিল অনন্য ভারসাম্য।

২. জাহান্নাম থেকে বাঁচা

জাহান্নাম খুবই ভয়াবহ জায়গা। প্রত্যেকের উচিত, সেখান থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। এজন্য করতে হবে আন্তরিক অনুশোচনা। পাশাপাশি জাহান্নাম থেকে পরিবারকেও বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।

৩. কাফির-মুনাফিকদের ব্যাপারে করণীয়

আল্লাহ তাআলা কাফির-মুনাফিকদের ব্যাপারে রাসূলকে কঠোর হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন—ওদের ঠিকানা জাহান্নাম।

৪. যার হিসেব, সে দেবে

প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজ নিজ আমলের হিসেব দেবে। আল্লাহ তাদেরকে সে-অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন। এখানে কে কার স্বজন বা সঙ্গী, তা দেখা হবে না।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
অন্যায্য কোনো শপথ করে ফেললে, তা ভাঙা যাবে।	১-২	কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।	৯
পারিবারিক গোপনীয়তা ফাঁস করার পরিণাম সম্পর্কে জানানো হয়েছে।	৩-৫	নারীদের জন্য কিছু উদাহরণ সেট করা হয়েছে।	১০-১২
ঈমানদার ও বেঈমান—উভয় দলকে সম্বোধন করে ভিন্ন ভিন্ন কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে।	৬-৮		

কেইস-স্টাডি

“যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচাও।” সূরার ৬ নং আয়াতে ঈমানদারদেরকে এই আদেশ দেওয়া হচ্ছে। কোনো কাফির-মুশরিককে নয়। অথচ আমরা তো নিশ্চিন্তে আছি—‘আরে কলেমা পড়েছি না! তা হলে আর চিন্তা কী? বেহেশতে তো যাবোই।’ ব্যাপারটাকে আমরা যতটা সহজ ভাবছি, ততটা কিন্তু না। আবার, শুধু নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে হবে না, পুরো পরিবারের দায়িত্বও আপনার। আপনার স্ত্রী-কন্যা যদি বেপর্দা হয়ে বাইরে ঘোরে, সেই দায় কিন্তু আপনার ওপর পড়বে। ঢাউস সাইজের টিভি কিনে ঘরটাকে সিনেমা হল বানিয়েছেন—এর হিসেব কিন্তু আপনাকেই দিতে হবে। একটু ভেবে দেখুন—ব্যাপারটা কতটা ভয়াবহ! তাই আসুন, আজ থেকেই নিজেদেরকে সংশোধন করে নিই। নিজে তো সব গুনাহ ছেড়ে দেবোই, সেই সাথে পরিবারের সকলকে গুনাহ ছাড়ার জন্য উপদেশ দেবো।

(দেখুন—সা'লাবি, তাফসীর, ২৭/৪৮; বাগাবি, তাফসীর, ৮/১৬৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরার শুরুতেই ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “স্মরণ করো—যখন নবি তার এক স্ত্রীর কাছে গোপনে একটা কথা বললেন;” এই আয়াত থেকে একটা বিষয় আমরা জানতে পারি: যার প্রতি আমরা আশ্বস্ত হই, যাকে বিশ্বস্ত মনে করি—যেমন: স্ত্রী বা বন্ধু—তার কাছে ব্যক্তিগত বা গোপন কোনো বিষয় জানানো দোষের কিছু নয়। এতে গুনাহ হবে না। তবে যার কাছে গোপন বিষয়টা বলা হবে, তার উচিত—বিষয়টির গোপনীয়তা বজায় রাখা। কারও কাছে প্রকাশ না করা। কারণ, যে শুনল তার কাছে এটা আমানত। আর আমানত রক্ষা করা আবশ্যক।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৪/৩৪৬)

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ “রব আমার, তুমি তোমার পাশে জান্নাতে আমার জন্য একটা ঘর বানিয়ে দাও।” ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুআটি করেছিলেন। দুআটি আমরা এ-সূরার ১১ নং আয়াতে পাই। আল্লাহ দুআটি এতই পছন্দ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখ করে দিয়েছেন। এখানে দেখুন—عِنْدَكَ/ ‘তোমার পাশে’ শব্দটিকে আগে আনা হয়েছে। আর بَيْتًا/’একটি ঘর’ শব্দটি এসেছে পরে। আসিয়া জান্নাতে একটি ঘর চাচ্ছেন, তবে তার আগে প্রার্থনা করছেন—তা যেন হয় আল্লাহর পাশে। এখান থেকে যে জিনিসটা ভাবনার, সেটা হলো: ঘর-বাড়ি বানানোর আগে দেখতে হবে, আশপাশে কারা বাস করে। প্রতিবেশীগুলো কেমন। কাদের সাথে আমাকে নিত্যদিন ওঠাবসা, চলাফেরা করতে হবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৩২৬)

সূরা মুলক

سُوْرَةُ الْمُلْكِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭৭-তম সূরা। এর আগে সূরা তূর এবং এরপরে সূরা হাক্কাহ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা তাহরীম ও পরে সূরা কলম।

এক নজরে মুলক

- মাক্কি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ৬৭
- আয়াত: ৩০
- মাক্কি

নামের রহস্য

'মুলক' শব্দটির অর্থ 'রাজত্ব; ক্ষমতা'। সূরার ১ নং আয়াতে আল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—সকল রাজত্ব আল্লাহর হাতে। সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে 'মুলক'।

মেজর থিম

০১ বিশ্ব-জগতের একমাত্র মালিক আল্লাহ।

০২ জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে।

০৩ কাফিরদের পরিণতি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই জীবন-মৃত্যুর ওপর আল্লাহর ক্ষমতার কথা বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি, পানি আমাদের জীবন ও অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই বিষয়টির ওপর লক্ষ রেখে সূরার শেষে আল্লাহ বললেন—"বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—তোমাদের পানি যদি মাটির গভীরে নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদের নাগালের মধ্যে পানি নিয়ে আসবেন?"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা তাহরীম; যা শেষ হয়েছে একদলের ধ্বংস ও আরেক দলের উচ্চ-মর্যাদার বিষয়টি উল্লেখ করে। তো এই ধ্বংস বা মর্যাদা দেওয়ার সক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে, যাঁর হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব, মালিকানা ও ক্ষমতা। সুতরাং সূরা মুলক সেই রাজত্ব ও ক্ষমতার আলোচনা দিয়েই শুরু হয়েছে।

শানে নুযুল

সূরার প্রথম অংশেই আল্লাহ মানুষকে গোটা সৃষ্টি জগতের দিকে চোখ ফেরাতে বলেছেন । সেগুলোতে কোনো খুঁত আছে কি-না তা-ও খুঁজে দেখতে বললেন। খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও, কেউ কোনো খুঁত খুঁজে পাবে না। কারণ আল্লাহ সবকিছুকে নিঁখুত করেই বানিয়েছেন। আর বিশাল এই সাম্রাজ্যের একক মালিক আল্লাহই। তিনি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। মানুষকেও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে—তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে। আর কারা আল্লাহর ইবাদাত করে, সেটি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন তিনি। আর এজন্যেই দুনিয়াতে আমাদের আগমন। অর্থাৎ দুনিয়াটা একটা পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে ভালো কাজ করলে পরীক্ষায় পাশ, আর না-করলে ফেইল—সহজ হিসেব। আর এই পরীক্ষার সিলেবাস হলো কুরআন। এ ছাড়া সারা দুনিয়ার সবকিছুকে মানুষের উপকারের জন্য তৈরি করা হয়েছে—যাতে তার পরীক্ষাটা সহজ হয়। এই পরীক্ষা চলবে প্রত্যেকের মরণ অবধি। তো, এই পরীক্ষায় কৃতকার্যরা পাবে চিরস্থায়ী শান্তির আবাস—জান্নাত। আর অকৃতকার্যদের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী শাস্তি—জাহান্নাম। আসলে ইসলামি শিক্ষার মূল বিষয়গুলো জানাতে এবং যারা বেপরোয়া কিংবা আল্লাহর প্রতি অমনোযোগী, তাদেরকে সতর্ক করতেই এ-সূরাটি নাযিল করা হয়েছে ।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২০/২১৫)

সেগমেন্ট

আল্লাহর সৃষ্টিশীলতা

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন—কেউ তাঁর সৃষ্টিজগতের কোনো অসংগতি খুঁজে পাবে না।

কুফরের পরিণতি

সূরার পরবর্তী অংশে মনে করিয়ে দেওয়া হয়—যারা আল্লাহর অবাধ্য হবে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি।

কাফিরদের উদ্দেশে বার্তা

মুসলিমরা দুনিয়ার বুকে বিজয়ী হোক বা না-হোক, কাফিরদের শাস্তি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সূরাটির শেষদিকে উচ্চারিত হয়েছে এমন হুঁশিয়ারি।

ফজিলত

ক্ষমা মিলবে যার সুপারিশে: আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'কুরআনে তিরিশ আয়াত-বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে, একপর্যায়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে—সেটি হলো সূরা মুলক।' (তিরমিযি, ২৮৯১, হাসান)

জান্নাতে প্রবেশ করাবে: আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'কুরআনের একটি সূরা তার তিলাওয়াত-কারীর পক্ষে যুক্তি-তর্ক পেশ করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে; সেটি হলো সূরা মুলক।' (তাবারানি, আওসাত ৩৬৫৪, হাসান)

ঘুমের আগে তিলাওয়াত: জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ সূরা সাজদা ও সূরা মুলক পড়ার আগে ঘুমাতেন না।' (তিরমিযি, ২৮৯২, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কীভাবে এই পৃথিবীকে বিছানার মতো বিছিয়ে দেওয়া হলো, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলে; → আল্লাহর অপার ক্ষমতা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব

১. সৃষ্টিজগতের ওপর কর্তৃত্ব

আল্লাহ এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা। এখানকার সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি। তাঁরই গোলাম। সবার ওপর ও সবকিছুর ওপর তাঁর রয়েছে একক কর্তৃত্ব।

২. কাফিরদের প্রতি হুঁশিয়ারি

যারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের ভয়ানক সব শাস্তি। জাহান্নাম অত্যন্ত নিকৃষ্ট জায়গা। সেখান থেকে ফেরার আর কোনো পথ নেই।

৩. আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

প্রকৃতির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন। তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, আর তিনিই জোগান পুরো সৃষ্টিজগতের জীবিকা।

৪. কিয়ামাতের অনিবার্যতা

কিয়ামাত আসবেই। তা ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাই সময়-সুযোগ থাকতেই ফিরতে হবে আল্লাহর দিকে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১-৫	অবিশ্বাসীদের প্রতি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।	১৬-২২
আল্লাহর অবাধ্যদের জন্য আছে ভীষণ শাস্তি। আর আল্লাহভীরুদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।	৬-১২	সকল মাখলুকের ওপর আল্লাহর কর্তৃত্ব অটুট। বিচারের জন্য তিনিই সবাইকে একত্রিত করবেন।	২৩-২৭
আল্লাহর জ্ঞান ও তাঁর দয়া সম্পর্কে আলোচনা এসেছে।	১৩-১৫	কিয়ামাতের দিন শাস্তি থেকে বাঁচানো বা দুনিয়াতে বান্দার যাবতীয় রিযিক—সবকিছুই একমাত্র মহান আল্লাহর হাতে।	২৮-৩০

কেইস-স্টাডি

আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু চিন্তাশীল হওয়া দরকার। আমরা বিভিন্ন খাবার খাই। এসব খাবার নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিরাট নিয়ামাত। কিন্তু একবার ভাবুন তো—দুনিয়ার বুকে আমরা কত পাপ করি! এসব পাপের শাস্তি হিসেবে, আল্লাহ যদি আমাদের জীবিকা আটকে রাখেন, তা হলে কী অবস্থা হবে? আর কি কারও সাধ্য আছে সেই জীবিকা দেওয়ার? পানির কথাটাই চিন্তা করা যাক। পানির স্তর নিয়ে বিজ্ঞানীরা বারবার সতর্কতা জানাচ্ছেন। এই পানির স্তর যদি সত্যিই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তা হলে দুনিয়ার কারও কি সাধ্য আছে—সেই পানি আমাদের সামনে এনে দেবে? সূরা মুলকের ২১ ও ৩০ নং আয়াতে এই দুটি প্রশ্নই আল্লাহ আমাদেরকে করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—পৃথিবীর সকল কিছুর ওপর একক কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। তাই মানুষেরও উচিত—মিথ্যে উপাস্য ও নিজেদের বড়াই-অহংকার বাদ দেওয়া। কেবল তাঁরই ইবাদাতে মনোনিবেশ করা। একক ক্ষমতাবান হিসেবে আল্লাহকেই স্বীকার করে নেওয়া।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৩৩৫; আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/২৪৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরার ২ নং আয়াতটি দেখুন : "...যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন—তোমাদের মধ্যে কে কত অধিক সুন্দরভাবে (তাঁর আনুগত্যের) কাজ করে।" এখানে আল্লাহ তাআলা এ-কথা বলেননি, কে কত অধিক আমল করতে পারে। অধিক আমল করার চেয়ে আমল কীভাবে সুন্দর করা যায়, সবটুকু নিবেদন ঢেলে দেওয়া যায়, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিয়ামাতের দিন আমলের ওজন মাপা হবে কী দেখে, জানেন? ইখলাস অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার ভিত্তিতে। তাই ত্রুটিযুক্ত হাজার আমলের চেয়ে ত্রুটিহীন-সুন্দর অল্প আমলও অধিক মর্যাদার।

(দেখুন—সা'লাবি, তাফসীর, ২৭/৯১; রাযি, তাফসীর, ৩০/৫৮০; বুখারি, ৭৫৬৩)

"তারপর আবার দৃষ্টি ফেরাও। আবার। আবার। তোমার দৃষ্টি পরাজিত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে!" এ-সূরার ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বারবার আসমানের দিকে দৃষ্টি দিতে বললেন, ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য। কারণটা উপলব্ধি করেছেন? মানুষ কোনো জিনিসে একবার দৃষ্টি দিলে তার দোষত্রুটি খুব একটা ধরতে পারে না। বারবার যখন দেখা হয়, একসময় তার ত্রুটিগুলো বেরিয়ে আসে। আল্লাহ জানালেন, মানুষ যতবার ইচ্ছা আকাশ পানে দৃষ্টি মেলুক, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে এর বিচ্যুতি খুঁজুক। সবশেষে তার দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে ফেরত আসবে—একতিল অসংগতিও কোথাও খুঁজে পাবে না। কত নিখুঁত আল্লাহর কার্যক্রম! কত নিপুণ তাঁর সৃষ্টি!

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৮/২০৯)

সূরা কলম

سُوْرَةُ الْقَلَمِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪র্থ/২য় সূরা।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুলক ও পরে সূরা হাক্কাহ।

এক নজরে কলম

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- আয়াত: ৫২
- সূরা নং: ৬৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

'কলম' শব্দের অর্থ 'লিখবার উপকরণ; কলম'। সূরার ১ নং আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে 'কলম'।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর অবাধ্যদের খেয়ালখুশির সামনে নতি-স্বীকার করা যাবে না।

০২ দুনিয়াতে কাফিরদেরকে ছাড় দেওয়ার কারণ।

০৩ ইউনুস ﷺ-এর জীবন থেকে ধৈর্যের শিক্ষা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, “তোমার রবের দয়ায় তুমি পাগল নও।” কুরআনের কথা বলায় তবুও যারা তাঁকে পাগল মনে করে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। আর সেই বিষয়টিই উঠে এসেছে সূরাটির শেষে, “আর তারা (কাফিররা) বলে, ‘কোনো সন্দেহ নেই—ও একটা পাগল!’”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুলক; যা শেষ করা হয়েছে কাফিরদেরকে সতর্ক-বাণী শুনিয়ে: “অতএব তোমরা অচিরেই জানতে পারবে—কারা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে পড়ে আছে।” সূরা কলমও শুরু করা হয়েছে তাদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা জানানোর মাধ্যমে: “সুতরাং তুমি শীঘ্রই দেখবে—আর তারাও দেখতে পাবে...।”

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে দিনের-পর-দিন দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের মতিগতির তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। নবিজি বারবার তাদেরকে দাওয়াত দেন, আর তারাও বরাবরের মতোই উপেক্ষা করতে থাকে। অবশ্য মুহাম্মাদ ﷺ যে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছেন—এ-ব্যাপারে ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এক আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিলে তাঁর কথামতো চলতে হবে। তখন আর খামখেয়ালি করে জীবন পার করা যাবে না। তাই শত সাবধানবাণী কানে না তুলে, তারা তাদের মতোই চলতে লাগল। আর নিজেদেরকে এই বলে বুঝ দিতে লাগল—ভালো লোকদের যা হবে, আমাদেরও তা-ই হবে। অত মাথা ঘামানোর দরকার কী! পাশাপাশি ওরা রাসূলের বিরোধিতাও শুরু করতে লাগল। কেউ যাতে তাঁর কাছে না ঘেঁষে, সবসময় সেই চেষ্টাই করত। মানুষের কাছে বলতে লাগল—মুহাম্মাদ পাগল হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ)। তার ধারে-কাছে যেও না। আর এই পরিস্থিতিতে মানুষ হিসেবে নবিজির মনে কষ্ট লাগাটাই স্বাভাবিক। তাই এ-সূরাটি নাযিল করে আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিলেন, নবিজি পাগল নন। সেই সাথে এই হুঁশিয়ারিও দিলেন—সত্যিকারের পাগল কে, তা শিগগিরই টের পাবে। আর তোমাদের পরিণতি কাদের মতো হবে, সেটা দেখার জন্য আর ক’টা দিন সবুর করো!

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২০/২৭২)

সেগমেন্ট

মহান চরিত্র

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাঁর রাসূলের মহান চরিত্র তুলে ধরেছেন—‘তুমি পাগল নও, তোমার জীবনাচরণও অত্যন্ত মহান।’

সম্পদ ও সন্তান

প্রচুর ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি কাফিরদেরকে অহংকারী করে তোলে। অথচ বিপদের সময় এগুলোর কিছুই তাদের কাজে আসবে না।

কুরআনের প্রকৃতি

সূরার শেষে আল্লাহ কুরআনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। আর তা হলো—এই কুরআনকে কাফিররা সহ্য করতে পারে না।

ফজিলত

সূরা কলম মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, “মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।”

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দুনিয়ায় নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সামনে নত না হলে; → কিয়ামাতের দিন আল্লাহকে সাজদা করার সৌভাগ্য হবে না।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

শত প্রতিকূলতার মাঝেও সত্যকে আঁকড়ে ধরা

১. রাসূলের মহান চরিত্রের স্বীকৃতি

রাসূলের চরিত্র ও রুচিবোধ অত্যন্ত মহান। স্বয়ং আল্লাহ এই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে যারা এই মহান মানুষটির ওপর নানা অপবাদ দেয়, তাদের জন্যও আল্লাহ দিয়েছেন হুঁশিয়ারি।

২. নত না-হওয়া

কাফির-মুনাফিকদের খেয়ালখুশির সামনে নতি-স্বীকার করা যাবে না। কারণ এদের চিন্তা ও বোধশক্তি অতি নিচু স্তরের।

৩. বাগান মালিকদের উপমা

একদল বাগান মালিক আল্লাহর নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় না করে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখান থেকে মানুষকে শিক্ষা নিতে হবে।

৪. বিপদের মুখে ধৈর্য

বিপদ বা বাধা-বিপত্তির মুখে ধৈর্য ধরতে হবে। আর যারা দ্বীনের পথে চলতে বাধা দেয়, তাদের পতন অনিবার্য।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
রাসূল ﷺ-এর সুউচ্চ মর্যাদার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।	১-৭	মুত্তাকীদের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতি কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে।	৩৪-৪৩
কাফিরদের বিশ্বাসের বিরোধিতা ও তাদের নৈতিকতার সমালোচনা করা হয়েছে।	৮-১৬	আল্লাহর ক্রোধের ব্যাপারে কাফিরদেরকে সাবধান করার পাশাপাশি বিপদের মুখে রাসূল ﷺ-কে ধৈর্য ধরার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।	৪৪-৫২
বাগান-মালিকদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।	১৭-৩৩		

কেইস-স্টাডি

“তোমার জীবনাচরণ অত্যন্ত মহান”—মুহাম্মাদ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ এই মন্তব্যটি করেন। এটি এই সূরার ৪ নং আয়াত। সারাবিশ্বের অধিপতি তাঁর একজন বান্দার চারিত্রিক সার্টিফিকেট নিজেই দিচ্ছেন। তা হলে যাঁর ব্যাপারে এই মন্তব্যটি করা হচ্ছে, সেই মানুষটা আসলেই কতটা মহান! কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে—কতগুলো অজ্ঞ লোক এই মানুষটিকে নিয়ে কটূক্তি করে যেন পৈশাচিক আনন্দ পায়! তাঁর ব্যাপারে অহেতুক মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ বয়ান তৈরি করতে এদের বিবেকে একটুও বাধে না। ওরা জানে, মুসলিমদের কাছে তাদের নবি নিজের জীবনের চাইতেও বেশি প্রিয়। রাসূলের অপমান তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। আর এই সুযোগটিকে কাজে লাগায় সেই মূর্খের দল। উদ্দেশ্য একটাই—সত্যিকারের মুমিনদেরকে কষ্ট দেওয়া। সেসকল অজ্ঞদের এই আয়াতটি দেখা উচিত। তাদের জানা উচিত—তারা যতই লম্ফঝম্প করুক, এতে রাসূলের সম্মান বাড়বে ছাড়া কমবে না। কারণ এই সম্মান যে আল্লাহ তাআলাই তাঁকে দিয়েছেন!

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৩৪২; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩০৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরার শুরুতেই কলমের শপথ করা হয়েছে। আর কুরআনে যেসব বিষয়ের শপথ করা হয়েছে, সেগুলোর রয়েছে একটা বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা। এ কলম দিয়ে পবিত্র কুরআন লেখা হয়, কুরআনের পয়গাম ছড়িয়ে দেওয়া হয় বিশ্বের আনাচে-কানাচে। এ-জন্য আল্লাহ তাআলা কলমের কসম করলেন। এর গুরুত্ব তুলে ধরলেন মানুষের কাছে। সুতরাং কলম ব্যবহারে সাবধানী হতে হবে। কলম দিয়ে আলোও ফেরি করা যায়, অন্ধকারও ছড়ানো যায়। আল্লাহ আপনাকে দুনিয়ার বুকে সেই স্বাধীনতাটুকু দিয়েছেন। কিন্তু বেলা ফুরোলে আপনার কলম থেকে-বের-হওয়া প্রতিটা শব্দ ও বাক্যের পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, তার হিসেব নেওয়া হবে। এই সূরাটি পড়তে এসে কলম নিয়ে একটু পর্যবেক্ষণ করুন— কলমের সঠিক ব্যবহার করছেন, নাকি কলমের কালিতে নিজেকেই কলঙ্কিত করে চলেছেন!

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩০/৫৯৯)

এ-সূরার ১৭-৩২ নং আয়াতে একটি বাগানের কয়েকজন মালিকের ঘটনা এসেছে। তাদের বাগানের সব ফল তখন পেকে গেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল, আগামীকালই সমস্ত ফল পেড়ে আনা হবে। কিন্তু তাদের বাগানে কোনো অসহায়-মিসকীনকে ঢুকতে দেবে না। অনেক ফলফলাদিতে ঘর ভরে উঠবে, এই আনন্দে তাদের অহংকার দেখে কে! কিন্তু সকালবেলা বাগানে পৌঁছে তারা বিস্মিত হয়ে যায়। তাদের পুরো বাগানটা যে ধ্বংস হয়ে গেছে! এখানে তাদাব্বুরের একটা বিষয় আছে—তারা কিন্তু তখনো কোনো গরিব-অসহায়কে বঞ্চিত করেনি, বঞ্চিত করার নিয়ত করেছে কেবল। তখন আল্লাহই উলটো তাদেরকেই চরম বঞ্চিত করে ছাড়লেন। সুতরাং আপনার নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ আপনার সাথে আচরণ করবেন।

(দেখুন—বুখারি, ১; তাবারানি, ৫৯৪২; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৬৮৫৯)

সূরা হাক্কাহ

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭৮-তম সূরা। এর আগে সূরা মুলক ও পরে সূরা মাআরিজ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৬৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কলম ও পরে সূরা মাআরিজ।

এক নজরে হাক্কাহ

- হিজরতের কয়েক-বছর আগে নাযিল
- সূরা নং: ৬৯
- আয়াত: ৫২
- মাক্কি

নামের রহস্য

'হাক্কাহ' অর্থ 'সত্য-প্রকাশকারী'। সূরার ১-২ নং আয়াতে কিয়ামাতকে সত্য-প্রকাশকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন সকল সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। মানুষের কোনো ভালো বা মন্দ কাজ আর গোপন থাকবে না। তো সেই 'হাক্কাহ' শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

মেজর থিম

০১. আদ ও সামুদ জাতির ইতিহাস।

০২. শিঙায় প্রথম ফুঁ—কিয়ামাত শুরু।

০৩. অনুগত ও অবাধ্য লোকদের পরিণতি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

নবির সতর্কবাণী ও আল্লাহর শাস্তিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল আদ ও সামুদ জাতি। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি ঠিকই তাদেরকে পাকড়াও করেছিল। সূরার শুরুতেই আল্লাহ এ-বিষয়টি তুলে ধরলেন। সূরাটির শেষেও এরূপ অবিশ্বাসীদের সতর্ক করা হলো: “আমি ভালোভাবে জানি—তোমাদের মধ্যে কিছু লোক (কুরআনকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, তবে এটা আল্লাহর পয়গাম-প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য চরম আফসোসের কারণ হবে।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা কলম; যেখানে আল্লাহ ‘কলম’-এর শপথ করেন। সত্য উন্মোচনের মাধ্যম হিসেবে কলমের ভূমিকাকে তিনি তুলে ধরলেন। আর এই সূরার প্রথম আয়াতেই চূড়ান্ত সত্য-প্রকাশকারীকে আল্লাহ নিজে চিনিয়ে দিলেন। আর সেটি হলো কিয়ামাত।

শানে নুযুল

কিয়ামাতের ভয়াবহতার সামগ্রিক একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলতে এবং আখিরাতের ব্যাপারে মক্কার মানুষদের লাগাতার সন্দেহ দূর করতে এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে। কিয়ামাত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে, এবং সবাইকে আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে, খুব জোর দিয়ে আল্লাহ তাআলা সে-কথা এখানে তুলে ধরেছেন। সেই সাথে আগেকার জাতিগুলোর পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আদ ও সামুদ জাতি, ফিরআউনের জনগোষ্ঠী, এবং নূহ ﷺ-এর জাতির ভয়ানক পরিণতি সকলের সামনে এনেছেন। আল্লাহর অবাধ্য হলে শাস্তি থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। মক্কার কাফিরদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তারা এই কুরআনকে অস্বীকার করতে গিয়ে বহু হাবিজাবি কথা বলে বেড়াত। ‘কবির কাব্য’ বা ‘গণকের গণনা’, আরো কত কী! এই সূরার দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ নাযিল করলেন—আল্লাহর রাসূল কোনো কবি বা গণক নন। আর এই কুরআনও কোনো কবি বা গণকের সৃষ্টি নয়। এটি এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে। এই কুরআনে রাসূল যদি তাঁর নিজের মনগড়া কোনো কথা যুক্ত করতেন, তা হলে তাঁকেও ছাড় দেওয়া হতো না। বরং কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো। সব মিলিয়ে এই সূরা নাযিল করে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন কু-যুক্তি খণ্ডন করেছেন। কিয়ামাতের সত্যতা ও ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেছেন। নবি হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্যায়ন করেছেন এবং কুরআন যে একমাত্র আল্লাহর বাণী—তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২০/৩৩৭)

সেগমেন্ট

কিয়ামাতের ভয়াবহতা

সূরাটি শুরুই হয়েছে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। যেখানে কিয়ামাত কতটা ভয়াবহ হবে, তার কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামাতের দৃশ্য

কিয়ামাত শুরু হলে তখনকার পরিস্থিতি কেমন হবে, সূরার পরের অংশে তা তুলে ধরা হয়েছে।

কুরআনের সাথে মানুষের আচরণ

কুরআন সত্য কিতাব এবং এটি কিয়ামাত ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়। তবে কুরআনের এই নিশ্চয়তাকে সবাই মেনে নিতে পারে না।

ফজিলত

সূরা হাক্কাহ মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, “মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।”

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহর কাছে অবিরত দুআ করুন—আপনার আমলনামা যেন ডান হাতে দেওয়া হয়;

তাহলে সেই ভয়ংকর বিপদের দিনে আপনার মুক্তি মিলবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাতের অনিবার্যতা ও পরকালীন জবাবদিহিতা

১. কিয়ামাতের ভয়াবহতা

কিয়ামাত খুবই ভয়াবহ একটি বিষয়। সেদিন সকল পাপীরা ধরা খেয়ে যাবে। দুনিয়াতেও তাদের ধ্বংস, পরকালেও আছে ধ্বংস।

২. কিয়ামাত দিবসের চিত্র

কিয়ামাত শুরুর সাথে সবকিছু তছনছ হতে আরম্ভ করবে। আকাশটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পাহাড়-পর্বতগুলোকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে।

৩. অনুগত ও অবাধ্য

আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সেদিন কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। আর পাপীরা আমলনামা পাবে বাম হাতে। তাদের বিপর্যয়ের কোনো সীমা থাকবে না।

৪. কুরআনের সত্যতা

কুরআন কোনো মানুষের বানানো কিতাব নয়। এমনকি নবির নিজের কথাও নয়। এটি কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব। একে প্রত্যাখ্যান করলে ভীষণ পস্তাতে হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাতের ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।	১-৩	ডান দিক ও বাম দিকের লোকদের মধ্যকার পার্থক্য দেখানো হয়েছে।	১৯-৩৭
কিয়ামাতকে অস্বীকার করায় কিছু লোক দুনিয়াতেই যেসব শাস্তি পেয়েছে, সেসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এসেছে।	৪-১২	কুরআন বিশেষ সম্মানিত এবং স্পষ্ট একটি কিতাব। আর এটি এসেছে বিশ্ব-জগতের একমাত্র মালিক আল্লাহর কাছ থেকে।	৩৮-৫২
কিয়ামাতের ভয়াবহতার ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে।	১৩-১৮		

কেইস-স্টাডি

অতীত ইতিহাস থেকে মানুষ সঠিক উপদেশ পেয়ে থাকে। ইতিহাস হলো প্রামাণিক দলিল। ইতিহাসের নিরিখে যেন আমরা বর্তমানকে সুন্দর করতে পারি। কুরআন তাই বারবার আমাদেরকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কুরাআনকে একটু ভালোভাবে স্টাডি করলে সহজেই এই প্যাটার্নটি ধরা যায়। কুরআন বারবার অতীতের অবাধ্য কিছু জাতির কথা তুলে ধরেছে। এই সূরার ৪-৮ নং আয়াতে যেমন ঠাঁই পেয়েছে আদ ও সামুদ জাতির ইতিহাস। তাদের অহংকার ও অবাধ্যতার পরিণতি কী হয়েছিল, তা এখানে জানানো হয়েছে। এই আয়াতগুলো নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। আল্লাহ এমনি এমনি বারবার তাদের ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেননি। বরং তাদের শাস্তি এবং সেই শাস্তির পেছনের সব কাহিনি যেন আমরা জানি, আতশি-কাচের নিচে রেখে তাদের কর্মকাণ্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করি, এরপর সিদ্ধান্ত নিই—আমরা কোন পথে পা বাড়াব!

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৩৬৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কোনো মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবে এ-সূরার ৩৩-৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে—"(কারণ) সে মহান আল্লাহর ওপর ঈমান রাখত না, অভাবী লোকদেরকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ দিত না।" আসলে, মানুষের সৌভাগ্য অর্জনের ভিত্তি মূলত দুটি—আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা; যার মূল হলো আল্লাহর ওপর ঈমান। আর দ্বিতীয় হলো আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া; যার মাঝে সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার বিষয় হচ্ছে—অভাবী মানুষের দারিদ্র্য দূর করার জন্য সম্পদ জোগাড় করে দেওয়া, আর ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা মেটানোর ব্যবস্থা করা। ওপরের আয়াতে এই দুটি গুণ না-থাকার দরুন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানোর কথা বলা হয়েছে। দেখুন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তারা অভাবী লোকদেরকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ দিত না। যারা খাওয়াতে উৎসাহ দিত না, তারা সেসব লোকের কোনো খবরও রাখত না। তাই, আমাদের ঘরের আশপাশটায় যাদের বসতি, সেসব প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া জরুরি। কেউ হয়তো না-খেয়ে আছে, কেউ হয়তো পোশাক কিনতে পারছে না, কারও জরুরি একটা কাজ অল্পকিছু টাকার জন্য হয়তো আটকে আছে। আপনি একটু খবর নিন, তাদের পাশে দাঁড়ান, সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করুন। হতে পারে, আখিরাতের বিভীষিকাময় সময়ে এই দৌড়ঝাঁপগুলোই আপনার নাজাতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

(দেখুন—ইবনু জুযাই, আত-তাসহীল লি-উলূমিত তানযীল, ২/৪০৭)

সূরা মাআরিজ

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭৯-তম সূরা। এর আগে সূরা হাক্কাহ ও পরে সূরা নাবা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা হাক্কাহ ও পরে সূরা নূহ।

এক নজরে মাআরিজ

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝিতে নাযিল
- সূরা নং: ৭০
- আয়াত: ৪৪
- মাক্কি

নামের রহস্য

'মাআরিজ' শব্দটি 'মি'রাজ' শব্দের বহুবচন; যার অর্থ 'সিঁড়ি; ওপরে ওঠার পথ'। সূরার ৩ নং আয়াতে এই শব্দটি এসেছে। সেখান থেকে এই সূরার নাম হয়েছে 'মাআরিজ'।

মেজর থিম

০১. দুনিয়া ও পরকালের সময়ের মধ্যে তুলনা।

০২. কিয়ামাতের দিন বন্ধুত্বের অসারতা।

০৩. যেকোনো মূল্যে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা।

৪ সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু করা হয়েছে কিয়ামাতের দিন কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে। সূরার শেষেও এসেছে ওই একই বিষয়ের আলোচনা: “এদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, এদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে এক মহা-অপমান। সেই দিনের ওয়াদা-ই এদেরকে বারবার দেওয়া হচ্ছে।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা মাআরিজ হলো সূরা হাক্কাহ’র পরিপূরক সূরা। অর্থাৎ সূরা হাক্কাহ’য় কিয়ামাত দিবস ও জাহান্নামের যে আলোচনা এসেছে, তা এই সূরায় এসে শেষ হয়েছে।

শানে নুযুল

সূরা মাআরিজ এমন পরিবেশে নাযিল হয়, যখন চারিদিক থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর ক্রমাগত অবিশ্বাস ও হাসি-ঠাট্টার রোল উঠছে। মক্কাবাসী এই বলে হাসতে হাসতে ঢলে পড়ত—‘অ্যাই, তোমাকে অস্বীকার করে আমরা নাকি জাহান্নামের উপযুক্ত হচ্ছি! তা তুমি সাচ্চালোক হলে—যেটার ভয় দেখাও, সেটা শিগগির নিয়ে আসো তো দেখি! খালি তো কিয়ামাত কিয়ামাত করো—কই সেটা?’ তারা এভাবে তামাশার ছলে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করে, চ্যালেঞ্জ জানায়। আর তাদের এই দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জের জবাব দিতেই এ-সূরাটি নাযিল করা হয়েছে। কিয়ামাতও আসবে, শাস্তিও আসবে। অত ব্যস্ত হয়ো না! তোমাদের ভালোর জন্য শাস্তিটা আল্লাহ একটু রয়ে-সয়ে পাঠান। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আল্লাহ কারও ওপর বিন্দু-পরিমাণও অবিচার করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেবেন। আর সেদিন সব তামাশা পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ-সূরাটি অনেকটাই সূরা হাক্কাহ-এর সারকথাকে ধারণ করে; যেখানে পরকালের বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২০/৩৮৫)

সেগমেন্ট

কাফিরদের তাড়াহুড়া

সূরার শুরুর অংশে দেখানো হয়েছে—কাফিরদের অহংকার আর ঔদ্ধত্য এত বেশি যে, তারা আল্লাহর শাস্তি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য রাসূলের কাছে আবদার করে।

মানুষের বৈশিষ্ট্য: চরম অস্থির

সূরার মধ্যভাগে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন চরম অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য দিয়ে।

কাফিরদের প্রতি বার্তা

আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যান করে কোনোভাবেই জান্নাতে যাওয়া যাবে না। সূরার শেষভাগে স্পষ্ট করে আল্লাহ এই ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

ফজিলত

নবি ﷺ মাঝে মাঝে এক রাকআতে একই রকমের দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। এরকমভাবে জোড়া মিলিয়ে তিনি এক রাকআতে তিলাওয়াত করতেন—সূরা মাআরিজ ও সূরা নাযিয়াত।

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

ফরজ নামাজগুলো জামাআতের সাথে আদায় করব;

তা হলে আল্লাহর হুকুম পালনের পাশাপাশি মুসলিমদের সাথে সম্পর্কও দৃঢ় হবে।

গতিপথ

১. কাফিরদের তাড়াহুড়া, মুমিনদের ধৈর্য
সূরার শুরুতেই দেখানো হয়—কিয়ামাতের ব্যাপারে কাফিরদের ব্যাপক তাড়াহুড়া! এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিলেন। তার মানে কাফির হবে অধৈর্য, আর মুমিন হবে ধৈর্যশীল।

২. পরীক্ষার মুখে মানুষের প্রতিক্রিয়া
খারাপ মানুষ অল্পতেই অস্থির হয়ে পড়ে। আল্লাহর পরীক্ষা হিসেবে কোনো বিপদ এলে, সে বিলাপ শুরু করে। এই বৈশিষ্ট্য দূর করতে হলে, মানতে হবে কুরআনের উপদেশ।

সেন্ট্রাল থিম

মানুষের প্রকৃত স্বভাব ও পরিণতি

৩. বংশীয় আভিজাত্য
কিয়ামাতের দিন বংশীয় আভিজাত্য বা অন্য কোনোকিছু মানুষের কাজে আসবে না। তাদেরকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

৪. আল্লাহর কর্তৃত্ব
অবাধ্যরা আপাতত ছাড় পাচ্ছে। তার মানে এই নয় যে, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বেখবর। বরং সাময়িক সময়ের জন্য ছাড় দেওয়া হচ্ছে কেবল। আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই ধরবেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাতের ভয়াবহতার কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	১-১৮	মুমিনদের বৈশিষ্ট্য, কাফিরদের কর্মকাণ্ড ও উভয় দলের প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।	২২-৪৪
মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—সে ভীষণ অস্থির প্রকৃতির।	১৯-২১		

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ১৯-২০ নং আয়াতে মানুষের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো—মানুষ চরম অস্থির প্রকৃতির। তাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে অধৈর্য হয়ে বিলাপ শুরু করে। আবার তার জীবনে ভালো কিছুর পরশ লাগলে, তার ভাগ সে অন্যদেরকে দিতে চায় না। কুরআনের এই কথার সাথে নিজেদেরকে একটু মিলিয়ে দেখি। আসলেই তো আমরা এমন। রাজ্যের পেরেশানি আমাদের ওপর ভর করে থাকে। একটুখানি অভাবের মধ্যে পড়েছে—অমনি হা-হুতাশ শুরু। কীভাবে ইনকাম বাড়ানো যায়, মাথায় শুধু সেই চিন্তা বনবন করে ঘোরে। সেটা হালাল না হারাম, তা বিবেচনার সময় নেই। সামান্য বিপদে পড়লেই মানুষ পুরো বেসামাল হয়ে যায়। কুরআনে মানুষের এই স্বভাবের নিন্দা করা হয়েছে। সেই সাথে এখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ কুরআন-ই আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে। নামাজে মনোযোগ, অভাবীদেরকে দান-খয়রাত, পরকালের ওপর বিশ্বাস, আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে মানুষ এই অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/২২৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কিয়ামাতের বিভীষিকা কেমন হবে তা এই সূরা থেকে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব। সূরার ১০-১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আরেক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, অথচ তাদেরকে রাখা হবে পরস্পরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে! অপরাধীর একান্ত কামনা হবে—সে যদি তার নিজের সন্তানাদি, স্ত্রী, ভাই, আপন জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও দুনিয়ার সব লোককে দিয়ে হলেও সেদিনের শাস্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে বা বাঁচাতে পারত!"

একবার চিন্তা করুন আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডের কথা। পড়ালেখা, আড্ডা, পিকনিক—তাকে ছাড়া কোনোকিছুই আপনি একা একা করতে পারেন না। সেই আপনি কিয়ামাতের দিন তাকে দেখেও দেখবেন না! তাকে কোনো কথাও জিজ্ঞেস করবেন না। বরং ফেরেশতাদের হাতে আপনার নিজের জায়গায় তাকেই উঠিয়ে দিতে চাইবেন! একবার কল্পনা করুন আপনার কলিজার টুকরো শিশু সন্তানটির কথা। যতক্ষণ বাইরে থাকেন, তার চেহারাটা বারবার আপনার হৃদয়ে ভেসে ওঠে। কখন তার কাছে ফিরবেন, তাকে কোলে নিয়ে আদর করবেন, এই চিন্তাই করেন সারাক্ষণ। কিংবা আপনার জন্মদাত্রী মা, প্রিয়তমা স্ত্রী, রক্তের ভাই বা আপন জ্ঞাতিগোষ্ঠী—সেদিন কারও কথাই আপনি ভাববেন না। শুধু ভাববেন নিজেকে নিয়ে। এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মানুষের বদলে হলেও ওই ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি চাইবেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো—নিজের পাওনা শাস্তি থেকে কেউ-ই সেদিন বাঁচতে পারবে না। অবাধ্যদের জন্য আল্লাহ রাখবেন আগুনের লেলিহান শিখা, যা হাড্ডি থেকে চামড়া আর মাংস টেনে টেনে বের করে আনবে। তাই এখনই সময় নিজেকে বদলে দেবার, সব ধরনের গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রাখবার।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/২২২)

সূরা নূহ

سُوْرَةُ نُوْحٍ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭১-তম সূরা। এর আগে সূরা নাহ্‌ল ও পরে সূরা ইবরাহীম নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মাআরিজ ও পরে সূরা জিন।

এক নজরে নূহ

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ৭১
- আয়াত: ২৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

'নূহ' ﷺ আল্লাহর একজন নবির নাম। এই সূরার পুরোটা জুড়ে তাঁর দাওয়াতি কাজের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি দিনে-রাতে, গোপনে-প্রকাশ্যে নিজ জাতির কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তবু তাঁর জাতি সত্যকে সত্য বলে মেনে নেয়নি। গোটা সূরায় নূহ ﷺ-এর কাহিনি বিবৃত হওয়ায়, সূরাটির নামকরণ হয়েছে তাঁর নামানুসারেই।

মেজর থিম

০১ নুবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় নূহ ﷺ-এর আগমন।

০২ গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর দিকে ডাকা।

০৩ কাফিরদের পক্ষ থেকে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও আল্লাহর গযব।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ্ বলেন, "আমি নূহকে তার জাতির কাছে এ-বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম: 'তোমার জাতির ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগেই তাদেরকে সাবধান করে দাও!'" তবে সাবধানবাণী গ্রহণ না করায়, সেই শাস্তি নেমে আসে। সূরার শেষে সে-বিষয়ে আলোচনা এসেছে: "তাদের অন্যায়ের দরুন তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে তাদেরকে আগুনে ঢোকানো হবে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মাআরিজ; যার শেষ অংশে অবিশ্বাসীদেরকে অপমানজনক শাস্তির ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়। তবে শাস্তি পাঠানোর আগে আল্লাহ প্রতিটি জাতির কাছে বার্তাবাহক পাঠান—তাদেরকে সাবধান করতে। নূহ ﷺ ছিলেন এমনই একজন সতর্ককারী, যার পরিচয় এই সূরাটির প্রথম আয়াতে এসেছে।

শানে নুযুল

সূরা নূহ এমন একটি সূরা যেখানে আল্লাহর একজন সত্যনিষ্ঠ বান্দা, নবি নূহ ﷺ-এর কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘ সাড়ে ন'শ বছর আল্লাহর দিকে নিজ জাতিকে তিনি অবিরাম ডেকেছেন। শত-শত বছর ধরে লাঞ্ছনা-বঞ্চনা সহ্য করেছেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে সে-রকম কোনো সাড়া না-পাওয়ায় যারপরনাই কষ্ট পান তিনি। আর শেষ-পর্যন্ত যখন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন—এ জাতি আর কিছুতেই আল্লাহর দিকে ফিরবে না, বরং দুনিয়াতে কেবল হট্টগোলই পাকাবে—তখন আল্লাহর কাছে তিনি ফরিয়াদ জানালেন। নিজের জন্য ও মুমিনদের জন্য ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাইলেন। আর কাফিরদের জন্য কামনা করলেন ধ্বংস। তখন আল্লাহ ভীষণ এক বন্যা দিয়ে কাফিরদেরকে চিরতরে বিলীন করে দেন। এ-সূরাটি নাযিল করে আল্লাহ তাআলা নূহ ﷺ-এর কাহিনি শোনাতে চাননি কেবল। বরং তিনি মক্কার কাফির-মুশরিকদের একটি বার্তা দিতে চাইলেন। নূহ ﷺ-এর জনগোষ্ঠী তাদের নবির অবাধ্য হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরাও যদি তোমাদের নবিকে অস্বীকার করো বা তার অবাধ্য হও, তা হলে কিন্তু তোমাদের পরিণতিও ভিন্ন কিছু হবে না। অর্থাৎ এই সূরাটি আগেকার সকল নবি ও তাঁদের জাতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানায়। আর এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ সূরাটি নাযিল করেন।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/৭৫; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ২৯/১৩৩)

সেগমেন্ট

নূহ ﷺ-এর বার্তা

আল্লাহ তাআলা নূহ ﷺ-কে তাঁর জাতির কাছে একটি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন—তোমার জাতির ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগেই তাদেরকে সাবধান করে দাও।

প্রতিবেদন পেশ

নূহ ﷺ তাঁর জাতির কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রতিবেদন পেশ করেন।

নূহ ﷺ-এর দুআ

অবাধ্যদের ধ্বংস কামনা ও মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে নূহ ﷺ দুআ করলেন।

ফজিলত

সূরা নূহ মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দাওয়াতি কার্যক্রমের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখুন; → এটি আপনাকে আত্মিকভাবে শক্তিশালী করবে।

গতিপথ

১. অবিরাম ডেকে চলা

এই সূরাতে নূহ ﷺ-এর ধৈর্যশীলতার চিত্র আঁকা হয়েছে। তিনি তাঁর জাতির পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মিথ্যা মূর্তিগুলোকে ছুড়ে ফেলে এক আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সেন্ট্রাল থিম

নূহ ﷺ-এর অধ্যবসায়; আর অবাধ্য জাতির পরিণতি

২. জাতির অবাধ্যতার মুখে প্রচেষ্টা

অবিরত এই পরিশ্রমের পরও তাঁর জাতির লোকেরা কথা শোনেনি। বরং আরও বেশি করে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে। তবে তিনি হাল ছাড়েননি। সব ধরনের চেষ্টা করে গেছেন।

৩. জাতির বিরুদ্ধে দুআ

শত-শত বছরের প্রচেষ্টার পরও তাঁর জাতির লোকেরা শির্‌ক ছাড়েনি। নবির দাওয়াত কবুল করেনি। ভগ্ন হৃদয়ে নবি নূহ ﷺ আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। জানালেন মনের আকুতি।

৪. অবাধ্যদের ধ্বংস ও মুমিনদের নিরাপত্তা

নবির দুআয় আল্লাহ সাড়া দিলেন। যারা ক্রমাগত আল্লাহ ও তাঁর নবির অবাধ্যতা করে গেছে, ভয়াবহ বন্যায় তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আর মুমিনদেরকে আল্লাহ মাফ করে দেন ও নিরাপত্তা প্রদান করেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ তাআলা নূহ ﷺ-কে তাঁর নিজ জাতির কাছে নবি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, দাওয়াত দেওয়ার জন্য।	১	নূহ ﷺ-এর আহ্বানে তাঁর জাতির লোকদের প্রতিক্রিয়া ও তাদের পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	২১-২৭
নূহ ﷺ নিজ জাতিকে এক আল্লাহর দিকে ডেকেছিলেন।	২-২০	আল্লাহর কাছে নূহ ﷺ-এর আকুতির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।	২৮

কেইস-স্টাডি

আল্লাহর কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে নূহ ﷺ বলেছিলেন, 'তুমি তাদেরকে মাফ করে দেবে—এ-উদ্দেশ্যে যখনই তাদেরকে ডেকেছি, তখনই তারা তাদের কানে আঙুল দিয়েছে, কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে নিয়েছে, চরম ঔদ্ধত্য ও অহংকার দেখিয়েছে।' সূরা নূহের ৭ নং আয়াতে অবাধ্য জাতির কাজ-কারবারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পরে আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখনো আপনার আশেপাশে কারও সাথে ঈমানের আলাপ করতে যান। দেখবেন, বলে উঠবে—'আমাকে ঈমানের কথা বলা লাগবে না। আমার ভেতর কী আছে, তা আল্লাহ ভালো জানেন।' মুসলমান দেখে হয়তো কানে আঙুল দেবে না, কিন্তু আপনার কথাগুলো ভালোভাবে নেবেও না। নামাজের জন্য ডাকুন—বলে উঠবে, 'আমার হিসাব আমি দেবো। আমাকে নিয়ে তোমার অত চিন্তা করতে হবে না। তোমার নামাজ তুমি পড়ো।' আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহর পথে আহ্বান এলে সাথে সাথে সাড়া দিতে হবে। কোনোরকম অহংকার দেখানো যাবে না।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩০/৬৫১; তাবারি, তাফসীর, ২৩/২৫১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

নূহ ﷺ তাঁর জাতিকে আল্লাহর দিকে ডাকতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তোমরা ক্ষমা চাইলে তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে করুণা বর্ষণ করবেন, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য রকমারি বাগানের ব্যবস্থা করে দেবেন, আর তোমাদেরকে দেবেন অনেক ঝরনাধারা।' অর্থাৎ দুনিয়াতে একজন মানুষের সুখী হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন, তা-ই সূরা নূহের ১০-১২ নং আয়াতে আল্লাহ দেওয়ার কথা বললেন। আল্লাহর করুণা, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ফল-ফলাদির জন্য বাগান, পান করার জন্য ঝরনা। এরপর একজন মানুষের আর কীসের অভাব বা চাহিদা থাকতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয়—একজন নবির কাছ থেকে এত এত প্রতিশ্রুতি পেয়েও কিন্তু অবাধ্য জাতি আল্লাহর দিকে ফিরে আসেনি। বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে তারা বরং পাপের সাগরে আগে যেমন ডুবে ছিল, পরেও ঠিক তেমনই রইল। আসলে তারা বুঝতে পেরেছিল, তাদের নবি সত্য। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বার্তা নিয়ে এসেছেন, তা-ও সত্য। তবুও মেনে নেয়নি, কারণ—এতে করে তাদের মন যা চায়, তারা তা-ই করতে পারবে না। অন্যের ওপর জুলুম করার যে পৈশাচিক আনন্দ, সেটা ভোগ করতে পারবে না। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই কিন্তু তারা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। এই ঘটনা থেকে আমাদের শেখার খোরাক আছে। নূহ ﷺ-এর জাতির মতো আমরাও যাতে গোঁ ধরে বসে না থাকি। বরং কোনো বিষয়ে আল্লাহর আদেশ জানবার সাথে সাথে, তা যেন মাথা পেতে মেনে নিই। ক্ষমা চেয়ে যেন তাঁর দিকেই ফিরে আসি।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৩৮৮)

সূরা জিন

سُوْرَةُ الْجِنِّ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৪০-তম সূরা। এর আগে সূরা আ'রাফ ও পরে সূরা ইয়া-সীন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা নূহ ও পরে সূরা মুযযাম্মিল।

এক নজরে জিন

- হিজরতের দুই-এক বছর আগে নাযিল
- সূরা নং: ৭২
- আয়াত: ২৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

'জিন' মানুষের মতোই আল্লাহর এক ধরনের মাখলুক বা সৃষ্টি। কিয়ামাতের দিন মানুষের মতো তাদেরও বিচার-আচার হবে। সূরার ১-১৫ নং আয়াতে কুরআন শুনে কিছু জিনের ঈমান আনার ঘটনা ও তাদের উপলব্ধির কথা আলোচনা করা হয়েছে। সেখান থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে 'জিন'।

মেজর থিম

০১ ইসলামের ব্যাপারে জিনদের আলোচনা।

০২ দ্বীন গ্রহণ করার জন্য জিনদের এক দলের প্রতি আরেক দলের আহ্বান।

০৩ মানুষের মতো জিনদেরও দুই ক্যাটাগরি: বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “বলো, ‘আমাকে ওহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে—জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনে বলেছে...।’” অর্থাৎ, যখন জিনরা শুনছিল তখন নবিজি তাদেরকে দেখতে পাননি। মানে, জিন-বিষয়ক জ্ঞান হলো অদৃশ্য-জগতের জ্ঞান। আর এমন জ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহ সূরাটির শেষে বলেন, “...অদৃশ্য-জগতের জ্ঞান তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তবে তিনি যাকে বার্তা-বাহক মনোনীত করেন তার বিষয়টি আলাদা।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা নূহ। সূরা নূহ থেকে বোঝা যায়, নূহ ﷺ-এর জাতির খুব অল্প-সংখ্যক লোকই তাঁর কথায় ঈমান এনেছিল। আর রাসূল ﷺ-এর তিলাওয়াত শুনেও যে অল্প কয়েকজন জিন ঈমান এনেছিল, তা সূরা জিন থেকে পরিষ্কার।

শানে নুযুল

রাসূল ﷺ-এর নুবুওয়াতের আগে—আসমানে জিনদের আনাগোনা লেগেই থাকত রাতদিন। ফেরেশতারা নানা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন। আর জিনেরা সেগুলো আকাশে আড়ি পেতে শুনত। তবে হঠাৎ একদিন তারা দেখতে পেল—আকাশে কঠোর পাহারা বসানো হয়েছে। আর আকাশের দিকে উঠতে গেলেই তাদের দিকে ছুটে আসছে উল্কাপিণ্ড! অবস্থা বেগতিক দেখে সেখান থেকে কেটে পড়ে সবাই। কিন্তু এরপরও বারকয়েক চেষ্টা করে তারা। তবে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। তখন এরা বুঝতে পারল, নিশ্চয় পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটেছে—যার জন্য আসমানে যাওয়া যাচ্ছে না। তারা নেমে পড়ল অভিযানে। সারা পৃথিবী চষে বেড়াতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছল ‘নাখলা’ নামক এলাকায়। জায়গাটি মক্কা থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। সেখানে পৌঁছে তারা নবিজির কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পায়। আর সাথে সাথেই তাদের মন এই বলে সায় দিলো যে, এই বাণী অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। আর এই তিলাওয়াতকারী নিশ্চয়ই আল্লাহর বার্তা-বাহক। দ্রুত নিজ জাতির কাছে ফিরে গেল তারা। সবকিছু খুলে বলল। সেই সাথে নিজেদের ঈমান আনার ঘোষণাও দিলো। সেই জিনদের ঈমানের কথা, তাদের দাওয়াতের কথা জানাতেই আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেছেন। তাদের নিজেদের মধ্যকার আলাপগুলো তুলে ধরেছেন।

(দেখুন—বুখারি, ৭৭৩, ৪৯২১; মুসলিম, ৪৪৯)

সেগমেন্ট

জিনদের উপলব্ধি

রাসূল ﷺ-এর কণ্ঠে কুরআন শোনে জিনরা। আর সাথে সাথে তারা তা সত্য বলে মেনে নেয় এবং নবিজির ওপর ঈমান আনে।

আনুগত্যের পুরস্কার

সামষ্টিকভাবে আল্লাহর পথে অটল থাকলে—আল্লাহ জীবিকায় প্রাচুর্য দেন।

অদৃশ্যের জ্ঞান

সূরার শেষ অংশে জানানো হয়, অদৃশ্য বা গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

ফজিলত

সূরা জিন মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এসব সূরা সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কুরআন তিলাওয়াত করে দুষ্ট জিন-সহ সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে,

এটি যেমন মনের জোর বাড়াবে, তেমনি মনে করিয়ে দেবে—আল্লাহই প্রকৃত আশ্রয়দাতা।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

হিদায়াতের ক্ষেত্রে কুরআনের ভূমিকা

১. কুরআনের ব্যাপারে জিনদের প্রতিক্রিয়া

প্রথমবারের মতো কুরআন শুনল একদল জিন। কুরআনের সৌন্দর্য ও সত্যতায় অভিভূত হয়ে পড়ল তারা। আর সাথে সাথে ঘোষণা দিলো—তারা আর আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না।

২. জিনদের মধ্যে অবাধ্য গোষ্ঠী

যদিও ওই দলটি সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিল, কিন্তু তারা এটিও বলেছিল যে—তাদের মধ্যে সবাই ঈমানদার নয়। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত।

৩. রাসূল ﷺ-এর ভূমিকা

রাসূল ﷺ কেবল মানুষকে সতর্ক করতে পৃথিবীতে আসেননি। বরং মানুষের সাথে সাথে জিন জাতিকে দাওয়াত দেওয়াও ছিল তাঁর দায়িত্ব। তিনি সেই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন।

৪. আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা

আল্লাহর রাসূল ﷺ সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরআনের প্রতি জিনদের ঈমান ও ঈমান গ্রহণের পথে তাদের অভিযানের বিবরণ। জিনদের মধ্যেও আছে দলগত বিভাজন। তাদের প্রত্যেক দলের আছে ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি।	১-১৭	আল্লাহ ছাড়া অদৃশ্য বা গায়েবের খবর আর কেউ-ই জানে না।	২৬-২৮
আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে কিছু দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।	১৮-২৫		

কেইস-স্টাডি

আল্লাহর গোলাম হিসেবে মানুষ কেবল আল্লাহর সামনেই মাথা নোয়াবে—এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহও মানুষকে সে-রকমই আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু কিছু পথভ্রষ্ট মানুষের কাছে এই বিষয়টি অপছন্দের। তারা চায় না যে, মানুষ মূর্তি বা প্রবৃত্তি পূজা ছুড়ে ফেলে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করুক। কুরআনে এই বিষয়টি আল্লাহ এভাবে তুলে ধরেছেন—"অথচ যখনই আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য উঠে দাঁড়ায়, তখনই ওরা দলবেঁধে তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার চেষ্টা করে।" রাসূলের সাথে তখনকার কাফিরদের আচরণ সে-সময় এমনই ছিল। আজও আপনি কুরআনের এই আয়াতের সাথে বর্তমানকে মিলিয়ে নিন। দেখুন তো—আজকের দিনেও যদি কেউ একমনে আল্লাহর গোলামি করতে চায়, আল্লাহর বাণীর কোনো হেরফের না-করে মানুষের মাঝে পৌঁছে দিতে চায়, তা হলে তার দশা কেমন হয়? তাই এই সূরার ১৯ নং আয়াতটি নিয়ে আমাদের চিন্তার দুয়ারকে প্রসারিত করা উচিত। বর্তমানের সাথে মিলিয়ে নিজেদের করণীয় ঠিক করা উচিত।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৪০১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এই সূরার শুরুতেই ১-২ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে—"জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনে বলেছে, 'নিঃসন্দেহে আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি; যা সঠিক পথ দেখায়। তাই আমরা একে সত্য বলে মেনে নিয়েছি, আমরা কিছুতেই আমাদের রবের সঙ্গে কাউকে শরিক করব না।" সুবহানাল্লাহ, মাত্র একবার এবং অল্প কিছু আয়াত শুনেই কুরআনের মিষ্টতা আর ঈমানের স্বাদ তারা পেয়ে গেল। আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে নিজ সম্প্রদায়কেও সে-পথে আহ্বান করতে শুরু করল। এই ঘটনাটা মানুষের মধ্যে যারা কুফরি করে, তাদের জন্য চরম শিক্ষণীয়। জিনরা তাদের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ফেলল—এটা আল্লাহ কালাম। আর মানুষ মহাকাশে যাবার যন্ত্র আবিষ্কার করেও কিনা বুঝতে পারল না, মহাবিশ্ব চলছে আল্লাহর নির্দেশে! আফসোস তাদের জন্য! জিন-জাতি উপকৃত হতে পারল, কিন্তু কুফরে-আচ্ছন্ন মানুষগুলো কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারল না।

(দেখুন—শাওকানি, ফাতহুল কাদীর, ৫/৩৬৪)

"তারা সঠিক পথে অটল থাকলে অবশ্যই আমি তাদেরকে বিপুল পরিমাণ পানি পান করাব।" ১৬ নং আয়াতটি খেয়াল করুন—তারা দ্বীনের পথে অবিচল থাকলে 'প্রচুর নিয়ামাত' দেওয়ার কথা না বলে, 'প্রচুর পানি' পান করানোর কথা বলা হয়েছে। কারণটা হলো জীবিকা এবং যাবতীয় কল্যাণ পানির ওপর নির্ভরশীল। পানি থাকলেই তো নিয়ামাতে নিয়ামাতে ভরে উঠবে জমিন। গড়ে উঠবে জনপদের-পর-জনপদ। যদি পানি না থাকে, সবকিছু বেকার হয়ে পড়বে। যেখানেই দেখবেন কাঁড়ি কাঁড়ি সম্পদ, সেখানেই দেখবেন পানির জোগান রয়েছে ঢের। পানি ছাড়া জীবন অর্থহীন। আয়াতে 'প্রচুর পানি' শব্দটি আসলে 'জীবিকার প্রাচুর্য' বোঝাতে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আপনি যদি বাড়ি বানাতে চান, কিংবা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়তে চান, তা হলে পানির জোগান যেখানটায় সবচেয়ে ভালো, প্রথম পছন্দ হিসেবে সেই জায়গাটা বেছে নিতে পারেন।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৯/১৮)

সূরা মুযযাম্মিল

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩য় সূরা। এর আগে সূরা আলাক ও কলম-এর কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা জিন ও পরে সূরা মুদ্দাসসির।

এক নজরে মুযযাম্মিল

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ৭৩
- আয়াত: ২০
- মাক্কি

নামের রহস্য

'মুযযাম্মিল' মানে 'চাদর-মুড়ি-দেওয়া ব্যক্তি'। প্রথম ওহি আসার পর নবি ﷺ শরীরে বেশ কম্পন অনুভব করেন, তাঁর জ্বর এসে যায়। তিনি ঘরে এসে খাদিজা -কে বলেন, 'زَمِّلُوْنِيْ، زَمِّلُوْنِيْ/ আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' আর ঠিক নবিজির-বলা এই শব্দ ধরেই আল্লাহ নবিজিকে পরে সম্বোধন করলেন 'ইয়া আইয়্যুহাল মুযযাম্মিল/ ওহে চাদর-মুড়ি-দেওয়া ব্যক্তি'। নবিজিকে সম্বোধন করতে গিয়ে, গোটা কুরআনের কোথাও আল্লাহ তাঁকে সরাসরি নাম ধরে ডাকেননি। ডেকেছেন বিভিন্ন উপাধি ধরে। তাঁকে সম্মান জানাতেই এমনটা করা হয়েছে।

(দেখুন—বুখারি, ৪৯৫৭; মুসলিম, ১৬০)

মেজর থিম

০১. তাহাজ্জুদের মহত্ত্ব; তারতীল-সহ কুরআন পাঠ।

০২. লাগামহীন ভোগ-বিলাসের পরিণতি; কিয়ামাতের বিভীষিকা।

০৩. নামাজ, যাকাত ও দান-সাদাকা; ভালো-কাজের বহুগুণ বাড়তি প্রতিদান।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে নবিজিকে রাত জেগে তাহাজ্জুদ ও কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেটা নুবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে একরকম শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ। সূরার মাঝে এসে দিনের বেলা সেই প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন—তথা নামাজ, যাকাত, দান-সাদাকা ও অন্যান্য ভালো কাজ করতে বলা হয়েছে। আর সূরার শেষে এসে এসব স্যাক্রিফাইসের প্রতিদান ঘোষণা করা হয়েছে—১. ক্ষমা, ২. রবের করুণা তথা জান্নাত।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরাটি হলো—সূরা জিন; যার শেষ আয়াত মূলত ওহি সম্পর্কে। তাতে বলা হয়েছে: ওহি নাযিলের সময় সামনে-পেছনে বিপুল-সংখ্যক পাহারাদার নিয়োগ করা হয়। আর এ-সূরার শুরুতে, সেই ওহির বার্তা গভীরভাবে বোঝার জন্য, তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

শানে নুযুল

এই সূরাটি নাযিলের প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন আয়িশা ﵂। তাতে আগা-গোড়া একটা চিত্র পাওয়া যায়। বর্ণনাটি মোটামুটি এরকম: নুবুওয়াতের একেবারে শুরুর দিকের কথা। তখনো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়নি। তবে নবিজির জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ওয়াজিব ছিল। সারারাত জেগে তাঁকে ইবাদাত করতে হতো। ভোর হওয়া পর্যন্ত নামাজ আর তিলাওয়াতে ডুবে থাকতেন। তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও এসে যোগ দিতে লাগল তাহাজ্জুদে। এমনকি এক সাহাবি তো ঘুম তাড়াতে নিজেকে দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলেন। নবিজি চিন্তায় পড়ে গেলেন—তাহাজ্জুদ আবার উম্মতের ওপর ফরজ হয়ে যায় কিনা! অন্যদিকে এভাবে রাত জেগে ইবাদাত করাটা সাহাবিদের জন্য তো বটেই, নবিজির জন্যও ছিল ভীষণ কষ্টের। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা বেশ ফুলে যেত। পরিস্থিতি যখন এ-ই, আল্লাহ তখন সূরা মুযযাম্মিলের শুরুর অংশ নাযিল করে ব্যাপারটা সহজ করে দিলেন। সারারাত আর জাগতে হবে না, রাতের অর্ধেক বা তিনভাগের একভাগ জাগাই যথেষ্ট। পরে এসে সূরার শেষ অংশ নাযিলের মাধ্যমে তাহাজ্জুদকে নফল করে দেওয়া হয়। এর বদলে ফরজ করা হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। আর সূরার মাঝের অংশটা নাযিল হয়েছে নবিজিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। মক্কার নেতা-গোছের কিছু লোক কুরআন ও রাসূলকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—ওদের কথায় পেরেশান হবার কিছু নেই। ওদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। ওদের শায়েস্তা করার জন্য আমিই যথেষ্ট।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৯/৩৪)

সেগমেন্ট

দাঈ

সূরার প্রথম অংশে একজন দাঈ'র বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলাপ করা হয়েছে।

দুই ক্যাটাগরির অডিয়েন্স

তারপর শ্রোতাদেরকে দু-দলে ভাগ করা হয়েছে—১. দাঈ'র চরম বিরোধিতা করবে। ২. দাঈ'র ডাকে সাড়া দিয়ে ভালো কাজে এগিয়ে আসবে।

পরিণতি

অডিয়েন্স ১—তথা বিরোধিতা-কারীদের জন্য আছে দুঃখজনক পরিণাম। আর দাঈ ও অডিয়েন্স ২—তথা মুমিনদের জন্য আছে পুরস্কার।

ফজিলত

একটি হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ বলেন: নবি ﷺ মাঝে মাঝেই একই রাকাআতে দুটি সূরা একসঙ্গে তিলাওয়াত করতেন। এরকম এক জোড়া সূরা হলো—সূরা মুযযাম্মিল ও মুদ্দাসসির।

(দেখুন : আবু দাউদ, ১৩৯৬, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কুরআন পাঠ করতে হবে ধীরে-সুস্থে, থেমে থেমে ও সুন্দরভাবে;

তা হলে কুরআনের বার্তাগুলো তত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আর ঠোঁট ছাপিয়ে হৃদয়ে নাড়া দেবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

নববি মিশন সফল করার প্রস্তুতি

১. আত্মিক পরিশুদ্ধতায় রাতের নামাজ

তাওহীদের ওপর অটল থাকতে হলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জরুরি। রাতের বেলা তাহাজ্জুদ ও তারতীল-সহ কুরআন পাঠ—এগুলো একজন দাঈ'র অমূল্য সম্বল। রাত যেন এক জাদুর কাঠি!

২. নুবুওয়াত: বিশাল এক দায়িত্ব

নুবুওয়াত সহজ কোনো ব্যাপার নয়। বিশাল এক দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয় এর মাধ্যমে। দাঈকে মুখোমুখি হতে হয় শত ঝড়-ঝাপটার।

৩. অবাধ্যদের পরিণতি

নবিদের অবাধ্যতার পরিণাম খুবই খারাপ। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ : ফিরআউনের পরিণতি।

৪. ইবাদাত সহজীকরণ

মহান রব আল্লাহ জানেন—তাঁর বান্দারা দুর্বল। তাই তিনি বিধান সহজ করে দিলেন। আখিরাতের পাশাপাশি তারা যেন দুনিয়ার কাজেও ছুটতে পারে, তাই ইবাদাতে এনে দিলেন ব্যালেন্স।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
গভীর রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জেগে ওঠার আহ্বান জানানো হয়েছে।	১-৩	ফিরআউনের পরিণতি ও তা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা।	১৫-১৬
রাতের নামাজের তিলাওয়াত হবে ধীরে-সুস্থে—সুন্দরভাবে। কেননা, কুরআন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির জন্য স্থিরতা জরুরি।	৪-৫	কিয়ামাতের প্রচণ্ডতায় আকাশ ফেটে চৌচির হবে। এখন যার মন চায়, সে যেন সত্যের পথে ফিরে আসে।	১৭-১৯
দিনের বেলা মানুষ থাকে ব্যস্তমুখর। তাই নফসের সঙ্গে লড়াই এবং কুরআনের বার্তা বোঝার জন্য রাতের সময়টাই বেশি উপযোগী।	৬-৭	তাহাজ্জুদের নামাজ নফল ঘোষণা। যার যেটুকু সহজ মনে হয়, কুরআন থেকে সে ততটুকু পড়বে।	২০
তাহাজ্জুদ হলো ধৈর্যশীলতা শেখার এক মহা-ঔষধ। এটা আল্লাহকে স্মরণ করার এক চমৎকার উপলক্ষ্যও বটে।	৮-১০	নামাজ কায়েম, যাকাত আদায় আর রবের বিধি-নিষেধ মেনে চলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।	২০
ধন-দৌলতের অহংকার দেখিয়ে যারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করে, তাদের এই সুখ অল্প সময়ের। অচিরেই আল্লাহ ওদেরকে পাকড়াও করবেন।	১১-১৪	ভালো কাজ কখনো হারিয়ে যায় না। ভালো কাজ যত অল্পই হোক, তার বিনিময়ে আছে মহা-পুরস্কার।	২০

কেইস-স্টাডি

মক্কার নেতা-টাইপের কিছু লোকজন কুরআন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত আর রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যা রটাত। প্রাচুর্যের গরিমায় ওরা যেন মাটিতে পা রাখতে চাইত না। বলত—আমাদের জনবল আছে। বংশের দিক দিয়েও আমরা উঁচু দরের। আমাদের আর আটকায় কে? আল্লাহ ওদের অহংকারের জবাব দিলেন: এর আগে ফিরআউনও তোমাদের মতো অহংকার করেছিল। দলবল বলো আর শক্তি-সামর্থ্য বলো—কোনো দিক দিয়েই ফিরআউন তোমাদের চাইতে কম ছিল না। সেই ফিরআউনকেও আমি ডুবিয়ে মেরেছি। সেখানে তোমরা আর কী! আল্লাহ ইঙ্গিত দিলেন—প্রত্যেক জালিমের জন্য ফিরআউনের ঘটনায় ভাবনার খোরাক আছে। ক্ষমতাবান প্রতিটি মানুষের উচিত ফিরআউনি-আচরণগুলো নিয়ে কেইস-স্টাডি করা। ফিরআউনের জীবন-যাপন নিয়ে গবেষণা করলে একজন শাসক কখনো জালিম হয়ে উঠবে না।

(দেখুন—ওয়াহিদি, আত-তাফসীরুল বাসীত, ৪/৩৭৬; বাগাবি, তাফসীর, ৮/২৫৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কিয়ামুল লাইল তথা রাতের নামাজে কুরআন পড়তে হয় ধীরে ধীরে। এমনটা করা জরুরি। আর অন্যান্য নামাজের বেলায় সাধারণ-গতিতে পড়লেও কোনো দোষ নেই। তার মানে, তারতীল-সহ পাঠ করার বিধানটা বিশেষভাবে রাতের নামাজের জন্যই এসেছে। রমাদান মাসে রাতের নামাজকে আমরা বলি 'তারাবীহ'। তো, রাতের নামাজের জন্যই বিশেষভাবে যেখানে 'তারতীল'-এর বিধান জারি হলো, সেখানে তারাবীহতেই আমরা করি পুরোপুরি উলটো কাজ। জেনে রাখুন—কুরআনের প্রতিটি হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করা আবশ্যক। এর কোনো রকম বিচ্যুতি করলে নামাজ হওয়া তো দূরের কথা, কুরআন আপনাকে বরং অভিশাপ দেবে।

(দেখুন—বুখারি, ৭৫২৭; তিরমিযি, ২৯২৭, ৩৫১৭; ইবনু মাজাহ, ২৮০)

এ-সূরার ২০ নং আয়াতে আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে, 'কর্জে হাসানা' আসলে কী? কাউকে যখন সাধারণভাবে ঋণ-দেওয়া হয়—মানে, ঋণ দেওয়ার সময়, ফেরত দেবার দিন-তারিখ ঠিক করে দেওয়া হয়—তখন ওটাকে বলে কর্জ। আর যখন কোনো দিন-তারিখ ঠিক করে দেওয়া হয় না—মানে তোমার যখন সুবিধে হয় দিও, ভাই। তখন ওটাকে বলা হয় কর্জে হাসানা। তো, আল্লাহ আমাদের কাছে কর্জ চাননি, চেয়েছেন কর্জে হাসানা। তার মানে দাঁড়ায়, আমরা দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে আল্লাহকে যে সময়, শ্রম, মেধা ও টাকাকড়ি 'ঋণ' দিই—তার প্রতিদানটা নগদ চাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেমতো সময়ে আমাদেরকে উত্তম বিনিময় দিয়ে দেবেন। কখনো হয়তো এই দুনিয়াতেই দেবেন, না-হয় দেবেন পরকালে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৪১৫)

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন: তারতীল মানে স্পষ্ট করে ও পরিষ্কারভাবে তিলাওয়াত (بَيِّنْهُ بَيَانًا)। মুজাহিদ ﵀ বলেন: তারতীল মানে ধীরে ধীরে ও স্পষ্টভাবে পাঠ করা। তিলাওয়াতের সময় আয়াতের মর্মকথা বোঝার চেষ্টা করা। আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবিজি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন? তিনি বললেন—টেনে টেনে (كَانَتْ مَدًّا مَدًّا)। এ ব্যাপারে সবচেয়ে চমৎকার করে বলেছেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ। তিনি বলেন—গাছ-তলায় যেভাবে খেজুরগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, ওরকম বিচ্ছিন্নভাবে কুরআন পড়ো না। কবিতার মতো করে খুব তাড়াতাড়িও পড়তে যেও না। কুরআনের পরতে পরতে বিস্ময়ের-যে মুক্তো ছড়ানো, থেমে থেমে তা আহরণ করো। তিলাওয়াতের সময় দিলটাকে পুরোপুরি কুরআনের সঙ্গে বেঁধে ফেলো—যাতে তোমার হৃদয় কেঁপে ওঠে, ইমোশন ও আধ্যাত্মিকতা তোমার হৃদয়টাকে জাগিয়ে তোলে।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৫/১৬৬)

কিছু শব্দ জানতেই হয়

তারতীল تَرْتِيلًا

তাবাত্তুল تَبْتِيلًا

"আর আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করো"। 'বাত্তালা' মানে কোনোকিছু কেটে আলাদা করে ফেলা। যেভাবে জন্মের পর শিশুর নাড়ি কেটে মায়ের কাছ থেকে আলাদা করা হয়। আল্লাহ এ আয়াতে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করার কথা বলতে গিয়ে এই বাত্তালা শব্দটিই এনেছেন। তার মানে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা মানে হলো—আল্লাহকে পাওয়ার জন্য দুনিয়া ও এর যাবতীয় জিনিসপত্র থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা; দুনিয়াবি ঠুনকো নাম-যশ, ধন-দৌলত ইত্যাদি বয়কট করা। এখান থেকেই মারইয়াম ﷺ-এর একটি উপাধি পড়ে—আল-বাতূল; কেননা, তিনি দুনিয়ার সব ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে একমাত্র আল্লাহর দিকেই পূর্ণ মনোনিবেশ করে তাঁর পুরোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৫/১৬৯, তাবারি, তাফসীর, ৬/৪০০)

সূরা মুদ্দাসসির

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭৪ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুযযাম্মিল ও পরে সূরা কিয়ামাহ।

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২য়/৪র্থ সূরা।

এক নজরে মুদ্দাসসির

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ৭৪
- আয়াত: ৫৬
- মাক্কি

নামের রহস্য

'মুদ্দাসসির' শব্দের অর্থ 'চাদর-মুড়ি-দেওয়া ব্যক্তি'। ১ নং আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা মুযযাম্মিলের মতো এই সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপটও অনেকটা একই রকম। আর এখানেও রাসূল ﷺ-কে সেই একই অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়। সরাসরি নাম ধরে ডাকা হয়নি। যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি—নবিজিকে আল্লাহ কতটা সম্মানিত করেছেন!

মেজর থিম

০১. মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর প্রতি নির্দেশনা।

০২. অহংকারীর পরিণতি।

০৩. জাহান্নামের শাস্তি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু হয়েছে ভীতি-প্রদর্শনের মাধ্যমে: "যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখনকার সময়টি হবে নিদারুণ কষ্টের—যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য কঠিন।" আর শেষও হয়েছে আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যানের আলোচনার মধ্য দিয়েই—"এরপরও তাদের কী হলো! তারা স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার এই পয়গাম এড়িয়ে যাচ্ছে!"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুযযাম্মিল। সূরা মুযযাম্মিল ও মুদ্দাসসির দুটি সূরাই শুরু হয়েছে নবি ﷺ-কে সম্বোধন করে। এর শুরুর অংশও নাযিল হয়েছে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই।

শানে নুযুল

হেরা গুহায় আল্লাহর রাসূল ﷺ নুবুওয়াত পান। সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে নেমে আসেন জিবরীল ﷺ। ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে যান নবিজি। এরপর অনেকদিন ওহি আসা বন্ধ থাকে। যাতে করে নবিজি ধকল কাটিয়ে ওঠার সময় পান। এরপর একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে পথ চলছিলেন। হঠাৎ ওপরের দিক থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পান। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পান—জিবরীল ﷺ মহাশূন্যে একটি চেয়ার পেতে বসে, তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন। এই দৃশ্য দেখে নবিজি ভীষণ ভয় পেয়ে যান। দ্রুত বাড়ির দিকে ছোটেন। বাড়ি পৌঁছেই ঘরের লোকদের বলতে থাকেন—'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তখন তাঁকে চাদর-মুড়ি দিয়ে দেওয়া হয়। সে-সময়েই জিবরীল ﷺ সূরা মুদ্দাসসির-এর প্রথম সাত আয়াত নিয়ে তার কাছে হাজির হন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আদেশ নিয়ে আসেন যে, 'হে চাদর-মুড়ি দেওয়া ব্যক্তি! উঠে লোকদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে সাবধান করে দাও।' সূরা আলাক-এ নবিজির ওপর কোনো আদেশ-নিষেধ আসেনি। শুধুমাত্র আল্লাহর সামান্য কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন ওহি এল, তখন রাসূলের দায়িত্ব ও কাজ কী—তা বলা হয়েছে। কারণ তাঁকে যে তাঁর রবের-পক্ষ-থেকে-দেওয়া বিশাল দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে।

(দেখুন—বুখারি, ৪৯২৫)

সেগমেন্ট

রাসূল ﷺ -এর প্রতি আহ্বান

‘হে চাদর-মুড়ি-দেওয়া ব্যক্তি’—সূরার শুরুতেই নবিজিকে এভাবে সম্বোধন করা হয়। এরপর তাঁকে একজন সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সাময়িক ছাড়

এরপর নবিজিকে বলা হয়—যারা জেনে-বুঝে আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহর দায়িত্বেই ছেড়ে দাও।

চরম সতর্কবার্তা

আল্লাহর অবাধ্যদের প্রতি উচ্চারণ করা হয় চরম সতর্কবার্তা।

ফজিলত

নবি ﷺ মাঝে মাঝে এক রাকআতে একই রকমের দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। এরকম এক জোড়া সূরা হলো—সূরা মুযযাম্মিল ও সূরা মুদ্দাসসির; যা তিনি এক রাকআতে তিলাওয়াত করতেন। (দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

অভাবী ও দরিদ্রকে খাবার খাওয়াতে হবে;	কারণ এই কাজটি আল্লাহ তাআলা অনেক পছন্দ করেন।

গতিপথ

১. দাঈ'র বৈশিষ্ট্য হবে যেমন :
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণাকারী, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব, কৃতজ্ঞতা আদায় ও ধৈর্য ধারণকারী—দ্বীনের দাঈদের এসকল বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি।

সেন্ট্রাল থিম
দ্বীনের দাওয়াত ও তা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম

২. আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যানের পরিণতি
কিয়ামাত শুরু হওয়ার সাথে সাথে কাফিররা নিদারুণ কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে। আল্লাহর পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি।

৩. অহংকারীর বাস্তব উদাহরণ
রাসূল ﷺ-এর ঘোরতর বিরোধী ছিল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। আল্লাহ তাকে প্রচুর দুনিয়াবি সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু কুরআনকে 'জাদু' বলে আখ্যায়িত করে সে এই সম্পদের না-শুকরিয়া করেছে।

৪. অবাধ্যদের দুর্ভাগ্য
সূরার শেষভাগে 'সাকার' জাহান্নামের বিবরণ তুলে ধরা হয়। সেখানে কোনো অজুহাত মেনে নেওয়া হবে না। দেওয়া হবে ভীষণ শাস্তি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
নুবুওয়াতের মিশন শুরু করার প্রাথমিক কিছু দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এখানে।	১-১০	আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে ১৯ (জন) ফেরেশতা নিয়োগ দিয়েছেন। এর পেছনে তাঁর হিকমাহ বা প্রজ্ঞাও তুলে ধরেছেন তিনি।	৩১-৩৭
মুশরিক নেতাদের প্রতি দেওয়া হয়েছে চরম হুঁশিয়ারি।	১১-৩০	ডান দিকের লোক—অর্থাৎ অনুগত লোকদের সাথে অপরাধীদের তুলনা করা হয়েছে।	৩৮-৫৬

কেইস-স্টাডি

এই সূরার শুরুর দিকে ৪-৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবির কাছে যে-বার্তা পাঠালেন, তা আমরা একটু লক্ষ করি—"তোমার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচ্ছন্ন রাখো—সব ধরনের নোংরামি ও গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকো।" ব্যাপারটা এমন নয় যে, নবিজির কর্মকাণ্ড অপরিচ্ছন্ন ছিল। আসলে আল্লাহ তাআলা এখানে বোঝাতে চাইলেন—এখন থেকে আরও বেশি সাবধানে থেকো। কারণ তুমি বিরাট এক দায়িত্ব কাঁধে নিতে চলেছ। মানুষ তোমার কথার চেয়ে, তোমার কাজকে বেশি মূল্যায়ন করবে। তাই এই আয়াত আমাদের সকল দাঈ'র জন্য কেইস-স্টাডি। কুরআনের দৃষ্টিতে নেতিবাচক কোনো কাজে দাঈরা জড়ালে, তাদের দাওয়াতি কর্মকাণ্ডই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৩/৪০৫-৪০৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৬ নং আয়াত : "ভালো কাজ করে (আল্লাহর ওপর) বিরাট দয়া করছো এ-কথা মনে করো না।" অর্থাৎ তুমি যার প্রতি ইহসান বা অনুগ্রহ করবে, নিঃস্বার্থভাবে করবে। তোমার অনুগ্রহ, বদান্যতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। ইহসান বা মহানুভবতার বিনিময়ে কোনো-প্রকার পার্থিব স্বার্থ লাভের বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষাও যেন তোমার মনে না থাকে। কিন্তু বর্তমানে সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। এখন যতটা-না দান করা হয়, তার চেয়ে বেশি দেখানো হয়। পৃথিবীর পাওয়াটাই যেন সব। বাহবা আর হাততালি পেতে এখন ভূরি-ভূরি দান করা হয়। অথচ সত্যিকারের কোনো অভাবী এলে, তাকে শূন্য-হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৩/৪১২)

এ-সূরার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ জানালেন, জাহান্নামের দেখভালকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা হবে ১৯। ফেরেশতাদের সংখ্যার তথ্যটি আল্লাহ আমাদেরকে জানালেন। কেন জানালেন, সেই ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াতে আল্লাহই দিলেন—"যাতে যারা আল্লাহর (এই) পয়গামকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাদের ঈমান আরও বাড়ে।" এ-আয়াত থেকে বোঝা যায়—মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলা হবে সব মাথা পেতে নেবে। দেখুন, ওপরের আয়াতে শুধু ১৯ বলা হয়েছে—জন, শত, হাজার, লাখ নাকি কোটি; কিছুই বলা হয়নি। '১৯ না হয়ে ২২ হলো না কেন? আল্লাহ তো একাই পারতেন, তা হলে আবার ১৯ ফেরেশতার প্রয়োজন কেন!' ইত্যাদি হেনতেন 'কেন'-র জবাব আল্লাহ তাআলা দেননি। বরং এতটুকু বলেছেন, এতে মুমিনদের ঈমান আরও বাড়বে। সুতরাং, প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য হবে "سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا/ শুনলাম এবং মানলাম"।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/১৪১)

সূরা কিয়ামাহ سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩১-তম সূরা। এর আগে সূরা কারিআ ও পরে সূরা হুমাযা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুদ্দাসসির ও পরে সূরা দাহ্‌র/ইনসান।

এক নজরে কিয়ামাহ

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- আয়াত: ৪০
- সূরা নং: ৭৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘কিয়ামাহ’ শব্দের অর্থ ‘পুনরুত্থান’। সূরার শুরুর দিকের অর্ধেকটা জায়গা-জুড়ে কিয়ামাতের আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে সে-সময়কার বিভীষিকা। সেদিকে লক্ষ রেখেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে ‘কিয়ামাহ’।

মেজর থিম

০১. মৃত্যুর পর মানুষের আবার জেগে ওঠা।

০২. কিয়ামাতের নিদর্শন: চাঁদ-সূর্যের অবস্থা।

০৩. মানুষের অসহায়ত্ব।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

কাফিররা বলে—মরে গেলে দেহ পচে যায়, তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এই সূরাটির শুরুতে আল্লাহ নিশ্চয়তা দিয়েছেন, "মানুষ কি মনে করছে—আমি কিছুতেই তার হাড্ডিগুলো একত্র করতে পারব না? কেন পারব না? আমি তার আঙুলের অগ্রভাগগুলোও যথাযথভাবে ফিরিয়ে আনতে পারব।" সূরাটির শেষ আয়াতেও শোনা যায় একই কথার প্রতিধ্বনি, "(যিনি এতকিছু করলেন) তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে পারবেন না?"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুদ্দাসসির। সূরা মুদ্দাসসির ও সূরা কিয়ামাহ'য় কিয়ামাতের দিনের ভয়াবহতা এবং তাতে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করা হয়েছে। সূরা-দুটি যেন একই সুতোয় বোনা।

শানে নুযুল

দীর্ঘ বিরতির পর সূরা মুদ্দাসসির দিয়ে ওহি আসা শুরু হয়। এরপর অবিরত ধারায় কুরআন নাযিল হতেই থাকে। রাসূলও তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দিতে থাকেন। আর সে-সময়কার সূরাগুলোর মধ্যে একটি হলো সূরা কিয়ামাহ। রাসূলের প্রচার-প্রচারণা তখন সারা মক্কায় হইচই ফেলে দিয়েছে। কাফির-মুশরিকরা দেখল—ক্ষমতা তো আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। তাই জরুরি ভিত্তিতে সম্মেলন ডাকল। সামনেই হজ্জের মওসুম। গোটা আরব থেকে হাজারো মানুষ আসবে। মুহাম্মাদ যদি তাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম থেকে বের করে নিজের দলে নিয়ে নেয়, তা হলে তো সব ভেস্তে যাবে! তাই শক্তপোক্ত একটা ফন্দি আঁটা চাই। যাতে তাঁর কাছ থেকে মানুষদেরকে দূরে রাখা যায়। বহু চিন্তা-ফিকির শেষে আইডিয়া বেরোল—'জাদুকর' বলা হবে নবিজিকে। অথচ তারা খুব ভালো করেই জানত—মুহাম্মাদ ﷺ না-কোনো জাদুকর, আর না-কোনো গণক। কেবল নিজেদের ভেতরকার পশুকে খুশি রাখতেই এরা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখত। গোঁ ধরে অন্যদিকে হাঁটা শুরু করত। কিয়ামাতকে সরাসরি অস্বীকার করত। শুধু অস্বীকার-ই নয়, পাশাপাশি চলত তাদের ঠাট্টা-তামাশা। রাসূলের কাছে জানতে চাইত—'তা কিয়ামাতের দিনটা যেন কবে?' তাদের এই মজার কী সাজা, এই সূরাটি নাযিল করে তা জানানো হয়েছে। সেই সাথে দেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি কু-যুক্তি ও অভিযোগ-আপত্তির জবাব।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/৮১)

সেগমেন্ট

পরকালীন জবাবদিহিতা

মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা মানুষকে আবারও জীবিত করবেন। এরপর তাদের হিসাব-নিকাশ নেবেন। এটিকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

তিরস্কার

যারা কিয়ামাত বা পরকালকে অস্বীকার করে, সূরার পরবর্তী অংশে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

কেন নয়?

কোনো নমুনা ছাড়াই মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করা হলো। যিনি প্রথম দফায় এভাবে সৃষ্টি করলেন, তিনি কেন আবার তাদেরকে জীবিত করতে পারবেন না?

ফজিলত

নবি ﷺ মাঝে মাঝে এক রাকআতে একই রকমের দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। এরকম এক জোড়া সূরা হলো—সূরা দাহর ও সূরা কিয়ামাহ; যা তিনি এক রাকআতেই তিলাওয়াত করতেন। (দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

গুনাহ হয়ে গেলে নিজেকে ভীষণ তিরস্কার করব, নিজেকে দাঁড় করাব অপরাধীর কাঠগড়ায়

এতে করে ভবিষ্যতে গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে আমাদের বিবেক বাধা দেবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
ও
পুনরুত্থানের বাস্তবতা

১. আত্মসমালোচনা খুব জরুরি

জীবনে চলার পথে আমাদের সবারই কিছু-না-কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে। তবে সেই ভুল আঁকড়ে না ধরে, নিজের দোষগুলো বের করে তা সংশোধন করে নিতে হবে।

২. মানুষের অক্ষমতা

কিয়ামাত অবশ্যই আসবে। গোটা দুনিয়া তছনছ হয়ে যাবে। মানুষের তথাকথিত আধুনিকতা, নিরাপত্তা-বলয়—সবকিছু নিমেষে ধুলোয় মিশে যাবে।

৩. মানুষ ভীষণ তাড়াহুড়া-প্রবণ

তাড়াহুড়ো করা মানুষের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সে সবকিছুই আগে আগে পেতে চায়। বিশেষত অবিশ্বাসীরা—যত পারো জলদি জলদি করে দুনিয়ার জীবনটা ভোগ করে নাও, মরে গেলে তো সবই শেষ!

৪. সতর্কতার সাথে পথচলা

কিয়ামাতের দৃশ্যগুলো যখন বাস্তবে ধরা দেবে, যখন মানুষ চূড়ান্ত হিসেবের মুখোমুখি হবে, তখন সব বিভ্রম কেটে যাবে। তাই সময় থাকতেই নিজেদেরকে সংশোধন করতে হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
বিচার দিবসের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। তখন সবার চোখে থাকবে ভীষণ আতঙ্ক আর পেরেশানি।	১-১৫	মানুষের মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	২৬-৩৫
ওহির প্রতি রাসূলের ভীষণ আগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।	১৬-১৯	দুনিয়াতে অস্বীকার করলেও, সামনা-সামনি দেখার পর পরকাল ও পুনরুত্থানের ওপর সবাই-ই ঈমান আনবে।	৩৬-৪০
কিয়ামাতের দিন দু-ধরনের মুখ দেখা যাবে- একদলের মুখ হবে উজ্জ্বল। আরেকদলের মুখ থাকবে শুকনো মলিন, বিষণ্ণতার আঁধারে ঢাকা।	২০-২৫		

কেইস-স্টাডি

কাফির-মুশরিক ও সংশয়বাদীরা কিয়ামাত নিয়ে সব সময় সন্দেহ পোষণ করে। কিয়ামাতের সত্যতার ব্যাপারে এদের সংশয় যেন কিছুতেই কাটে না। এদের এই সংশয়-সন্দেহের জবাব আল্লাহ এই সূরার শুরু থেকেই দিয়েছেন। কিয়ামাত ঘটানোর ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতার কথা সবাইকে জানিয়েছেন। আর এরপর এ-সূরার ২০-২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "না, তোমরা বরং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনই পছন্দ করো, আর পরকালকে (চিন্তা থেকে) বাদ দিয়ে রাখো!" অর্থাৎ যারা কিয়ামাত নিয়ে ঘোর সন্দেহে ভোগে, তাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো: তারা দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দেয়। এই দুনিয়ার সাময়িক ভোগ-বিলাসই তাদের কাছে শেষ-কথা। এই আয়াত-দুটি আসলে আমাদের সকলকেই নাড়িয়ে দেয়। আমরাও কি পরকালকে নিজেদের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছি? দুনিয়াতে কীভাবে আরও বেশি আরাম-আয়েশে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়—এই চিন্তা নিয়েই কাটাচ্ছি রাতদিন?

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/১৫৭)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"তাড়াহুড়া করে এসব (পয়গাম) আয়ত্ত করার জন্য দ্রুত জিহ্বা নাড়িয়ো না।" ১৬ নং এই আয়াতটিতে তালিবুল ইলম, অর্থাৎ ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য একটি বিশেষ আদব রয়েছে। তা হলো—শিক্ষকের আলোচনা শেষ হওয়ার আগেই তা আয়ত্ত করার জন্য অস্থির হওয়া যাবে না। বরং প্রথমে পুরো আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এরপর আসবে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করার পালা। শিক্ষককে আলোচনার মাঝে থামিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এতে আলোচনার ব্যাঘাত ঘটে, অন্যদেরও কষ্ট হয়। ওহি নাযিলের প্রথম-দিকে নবি ﷺ দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য জিবরীল ﷺ যা বলতেন, তিনিও সাথে সাথে তা বলার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ তাআলা এমনটি করতে নিষেধ করলেন—আগে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। পরে তা স্মৃতিতে গেঁথে দেওয়া এবং আয়ত্ত করানোর দায়িত্ব আমার।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৪৩৫; ইবনুল কাইয়িম, আত-তিবইয়ান ফী আইমানিল কুরআন, ২৪৫)

সূরার ২৬-৩৩ নং আয়াতে, অবাধ্য লোকদের মৃত্যুকালীন অবস্থা দেখানো হয়েছে। সেখানকার প্রথম ক'টি আয়াত দেখা যাক—"সাবধান! যখন (প্রাণ) কণ্ঠনালীর কাছে চলে আসবে, (তখন আশেপাশের লোকদের পক্ষ থেকে কাতর-স্বরে) বলা হবে, 'কোন ডাক্তার পারবে (তার) রোগ সারাতে!' এদিকে সে নিশ্চিত হয়ে যাবে—এটাই চিরবিদায়। আর (এখনকার) ভয়াবহতার সাথে যোগ হবে (পরকালের) ভয়াবহতা। সে-সময় (তাকে) হাঁকিয়ে নেওয়া হবে তোমার রবের কাছেই! (অথচ বেঁচে থাকতে) সে আল্লাহর বার্তাকে সত্য বলে মানেনি, নামাজও পড়েনি।" এ-জায়গাটাতেই আমরা থামি। শুধু শেষের শব্দ-দুটিতে আমরা আবারও চোখ বোলাই—'নামাজও পড়েনি'! অর্থাৎ যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং নামাজ পড়েনি—তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

(দেখুন—বুখারি, ৫২৮; মুসলিম, ৮২; তিরমিযি, ৪১৩)

সূরা দাহর

سُوْرَةُ الدَّهْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯৮-তম সূরা। এর আগে সূরা আর-রহমান ও পরে সূরা তালাক নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কিয়ামাহ ও পরে সূরা মুরসালাত।

এক নজরে দাহর

- মাক্কি বা মাদানি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ৭৬
- আয়াত: ৩১
- মাক্কি মাদানি

নামের রহস্য

'দাহর' মানে 'মহাকাল', আর 'ইনসান' মানে 'মানুষ'। সূরার প্রথম আয়াতেই এ-শব্দ দুটি পাওয়া যায়। সেখান থেকে এ-সূরার নাম হয়েছে 'দাহর/ইনসান'।

মেজর থিম

০১ অনস্তিত্ব থেকে মানুষের অস্তিত্ব লাভ।

০২ কাফিরদের শাস্তি: শেকল ও দাউদাউ করা আগুন।

০৩ মুমিনদের পুরস্কার: সুগন্ধি মিশ্রিত পানীয়, হাতের নাগালে ঝুলন্ত ফল।

৩ সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ বান্দাদের আলোচনা করা হয়েছে: "আমি তাকে (সঠিক ও ভুল উভয়) পথ দেখিয়ে দিয়েছি; এখন সে কৃতজ্ঞ হবে, অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।" আর তা শেষ করা হয়েছে এর পরিণতির আলোচনা দিয়ে: "যে চায়, তাকে তিনি তাঁর দয়ায় প্রবেশ করান, আর যারা অন্যায়ে লিপ্ত থাকে, তিনি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা কিয়ামাহ; যার শেষে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, মানুষ-সৃষ্টির সূচনা হয় একফোঁটা বীর্য থেকে। আর সেই আলোচনা দিয়েই সূরা দাহর শুরু করা হয়েছে—"আমিই মানুষকে মিশ্রিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি তার পরীক্ষা নেবার জন্য।"

শানে নুযুল

মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে আল্লাহকে তার রব হিসেবে মেনে নেবে। ধরা যাক, একজন মানুষ জন্ম থেকেই বধির আর বোবা। সে নির্জন কোনো জঙ্গল বা দ্বীপে বাস করে। 'আল্লাহ এক'—এই কথাটি কেউ তাকে আকার-ইঙ্গিতেও কোনোদিন বোঝায়নি, তবুও তার মনের মধ্যেই এ-কথা আপনা-আপনিই বেজে উঠবে—'অবশ্যই দুনিয়ার সবকিছু কেউ একজন বানিয়েছেন; তাঁর কোনো শরিক থাকতে পারে না।' অথচ নবিজি কুরআনের বাণী দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকছেন, আর কতগুলো লোক অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে রাখছে! তারা কী করে অহংকার করে! তাদেরকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে এক ফোঁটা বীর্য থেকে। মানুষের সাথে অহংকার কোনোভাবেই মানায় না। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য। তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে। মেনে চললে পুরস্কার, আর অবাধ্য হলে শাস্তি। তবে কেউ-ই যদি তাঁর ইবাদাত না করে, তবুও তাঁর রাজত্বে কোনোকিছু কমবে না। কিন্তু কেউ যদি ঈমান এনে অল্পকিছু হলেও ভালো আমল করে, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে চলে—তার জন্য এমন কিছু আছে, যা কোনো চোখ জীবনে কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি। মোটাদাগে এসব বিষয়কে কেন্দ্র করেই এ-সূরাটি নাযিল করা হয়েছে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/১২০)

সেগমেন্ট

মানুষের উৎপত্তি ও পরীক্ষা

সূরার শুরুর অংশেই মানুষের উৎপত্তির উৎস আল্লাহ জানিয়ে দিলেন। আরও জানালেন— মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য।

কৃতজ্ঞতা-বোধ

আল্লাহর প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা-বোধ থাকা জরুরি। এর মাধ্যমে সঠিক পথে চলা সহজ হয়ে যায়।

নবিজির প্রতি নির্দেশনা

ধৈর্য, আল্লাহর স্মরণ, রাতের নামাজ এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাসবীহ পাঠ করতে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ফজিলত

জুমুআর দিন ফজরের নামাজে পড়া সুন্নাহ : আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ জুমুআর দিন ফজর নামাজে সূরা সাজদা ও সূরা দাহ্র পড়তেন।

(বুখারি, ৮৯১; মুসলিম, ৮৭৭)

নবি ﷺ মাঝে মাঝে এক রাকআতে একই রকমের দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। এরকম এক জোড়া সূরা হলো—সূরা দাহর ও সূরা কিয়ামাহ; যা তিনি এক রাকআতে তিলাওয়াত করতেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সকাল-সন্ধ্যায় নিবিষ্ট মনে আল্লাহকে স্মরণ করুন;

দেখবেন, আপনার জীবন-জুড়ে এসেছে আত্মিক প্রশান্তি ।

গতিপথ

১. উদ্দেশ্য ছাড়া মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি

মানুষকে আল্লাহ সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন শোনার ও দেখার ক্ষমতা। এরপর তাকে ভুল-সঠিক উভয় পথই দেখিয়েছেন। এখন সিদ্ধান্ত মানুষের—সে কোন পথে যাবে।

২. অনুগত বান্দার পুরস্কার

যারা সঠিক পথ বেছে নেবে—অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত বান্দা হবে—তাদের জন্য থাকবে অগণিত পুরস্কার।

সেন্ট্রাল থিম

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহর প্রতিদান-নীতি

৩. অনুগত বান্দাদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর অনুগত বান্দারা ভীষণ ধৈর্যশীল হন। তাদের ইবাদাতগুলো হয় আন্তরিকতায় ভরপুর। তারা তাদের রবের প্রতি প্রচণ্ড কৃতজ্ঞ। কঠিন সময়েও তারা আল্লাহর পথ থেকে সরে যান না।

৪. আল্লাহর দয়া ও শাস্তি নীতি

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সেট করে দিয়েছেন। যে আল্লাহর দয়া পেতে চায়, আল্লাহ তাকে নিজের দয়ায় প্রবেশ করান। আর যারা অন্যায়ে লিপ্ত থাকে, তাদের জন্য তিনি বরাদ্দ রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করে দুটি পথ খুলে দিয়েছেন। তারপর, যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে বলেছেন।	১-৩	রাসূল ﷺ ও তাঁর উম্মতের জন্য কিছু পথ-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।	২৩-৩১
পরকালে কাফিরদের শাস্তি ও সঠিক পথে-চলা ব্যক্তিদের পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।	৪-২২		

কেইস-স্টাডি

"আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, সুঠাম দেহ দিয়েছি, আবার যখন চাইব, তখন তাদের বদলে অনুরূপ (সুঠামদেহী) অন্যদেরকে নিয়ে আসব (যাদের কর্মকাণ্ড তাদের মতো হবে না)।" এই সূরার ২৮ নং আয়াত এটি। যুগে যুগে আল্লাহর নীতি এমনই। ইতিহাসের পাতায় চোখ বোলালে আমরা দেখতে পাই—নূহ ﷺ-এর জাতি, আদ, সামুদ ও সাদুম জাতি এবং ফিরআউনের জাতির অবাধ্যতার কারণে তাদের সবার সাথে একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আর তা হলো—এসব জাতি যখন ভীষণভাবে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর তিনি আবার নতুন কোনো জাতির উত্থান ঘটিয়েছেন। এই আয়াতটি আমাদের জন্য একটি রিমাইন্ডার। 'আধুনিকতা' আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে আল্লাহর মুখোমুখি দাঁড় করানো যাবে না। ধ্বংস সেক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠবে।

(দেখুন—ওয়াহিদি, আত-তাফসীরুল বাসীত, ২৩/৬৫)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

যারা এতিম ও অসহায় মানুষকে খাবার খাওয়ায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের কথা উল্লেখ করে এ-সূরার ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বললেন, "(আর তাদের অন্তরে থাকে এই ভাবনা:) আমরা তোমাদেরকে খাবার খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য: তোমাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না।" যারা কাউকে কিছু দান করে, তাদের কাছ থেকে আবার ফায়দা নিতে চায়—তারা এই আয়াতের নেক বান্দাদের দলে শামিল হবে না। কেননা, এই নেক বান্দাদের উদ্দেশ্য থাকে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, আর কিছু নয়। সুতরাং এবার থেকে দান করার সময় বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। আপনার দৃষ্টি থাকবে শুধুই আসমানের দিকে।

(দেখুন—ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ১১/১১১)

এ-সূরার ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, জান্নাতের অধিবাসীদের খেদমত করার জন্য আল্লাহ তাআলা অল্প বয়স্ক শিশু-কিশোরদের নিয়োগ দেবেন। এখন একটা প্রশ্ন জাগে মনে, খেদমতের জন্য বড়দের বাদ দিয়ে শিশু-কিশোরদের কেন নিযুক্ত করা হবে? এর রহস্যটা জানলে আপনিও চমৎকৃত হবেন! আসলে খেদমত করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হলো শিশু-কিশোররাই। কারণ, তারা সহজেই এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করতে পারে, দ্রুত সবকিছুর আঞ্জাম দিতে পারে। আবার তাদের কাছে যে-কোনোকিছু সহজেই চাওয়া যায়। আবার কিছু বাদ দিতে বলতেও মেহমানদের তেমন সংকোচ লাগে না। দুনিয়ার এই বিষয়টা আল্লাহ আখিরাতেও ঠিক রাখলেন। যাতে জান্নাতের নিয়ামাত-প্রাপ্তিতে সামান্যতম অপূর্ণতাও না থাকে।

(দেখুন—ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ২৯/৩৯৭)

সূরা মুরসালাত

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩৩-তম সূরা। এর আগে সূরা হুমাযা ও পরে সূরা ক্বফ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা দাহ্‌র/ইনসান ও পরে সূরা নাবা।

এক নজরে মুরসালাত

- নুবুওয়াতের ৪র্থ বছর নাযিল
- সূরা নং: ৭৭
- আয়াত: ৫০
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘মুরসালাত’ মানে ‘প্রেরিত; যা পাঠানো হয়েছে’। এর দ্বারা ‘কুরআনের বার্তা পাঠানো’কে বোঝানো হয়েছে। সূরার ১ নং আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয় ‘মুরসালাত’।

মেজর থিম

০১ কিয়ামাতের সত্যতা।

০২ জাহান্নামের বিবরণ।

০৩ জান্নাতের বিবরণ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

এই সূরার শুরুতে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে শপথ করা হয়েছে। আল্লাহর শপথের পরও অবাধ্যরা এই কিয়ামাতকে অস্বীকার করে। তাই সূরার শেষে এসব অবিশ্বাসীদের পরিণতি দেখানো হয়েছে—"যারা আমার পয়গামকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, সেদিন তাদেরকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা দাহর; যার শেষ: "যে (দয়া পেতে) চায়, তাকে তিনি তাঁর দয়ায় প্রবেশ করান, আর যারা অন্যায়ে লিপ্ত থাকে, তিনি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।" আর সূরা মুরসালাতের শুরুতে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি পূরণের নিশ্চয়তা দেওয়া হলো।

শানে নুযুল

কিয়ামাতের ব্যাপারে কাফিরদের লাগাতার সন্দেহ-অবিশ্বাস দূর করতেই আল্লাহ তাআলা এ-সূরাটি নাযিল করেন। দুনিয়াতে আল্লাহর ওপর ঈমান এনে ভালো কাজ করলে কী প্রতিদান, আবার তাঁর অবাধ্য হয়ে মন্দ কাজ করলে কী শাস্তি—সে-সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই সূরায়। উদ্দেশ্য একটাই—মানুষকে সচেতন করা। এ ছাড়া মক্কাবাসীদের নানান আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে এখানে। আল্লাহ তাআলা জানালেন, পৃথিবীকে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া বানানো হয়নি। এখানকার প্রতিটি ভালো-মন্দ কাজের হিসেব অবশ্যই নেওয়া হবে। দুনিয়া সৃষ্টি বা ধ্বংস কোনো খেলা নয় যে, কেউ এসে কিয়ামাত আনতে বললেই তা এসে পড়বে। বরং সেটি আসার সময় আগে থেকেই ঠিক করা আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যখন কিয়ামাত সত্যিই চলে আসবে—তখন হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না তাদের। তাই যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, তাদের সব আমোদ-ফুর্তি কেবল এই জীবনেই। পরকালে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভীষণ শাস্তি। আসলে এই কুরআনের মাধ্যমেও যে হিদায়াত পাবে না, দুনিয়ার কোনো জিনিসই আর তাকে হিদায়াত দিতে পারবে না। সে আজীবন গোঁয়ার্তুমি-ই করে বেড়াবে।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/১৬৪; তাফহীমুল কুরআন, ১৮/১৬৭)

সেগমেন্ট

আল্লাহর ওয়াদা সত্যি হবেই

সূরার শুরুতেই আল্লাহ কুরআনের বার্তার ওপর শপথ করেন। এই শপথের সাথে সাথে তিনি মানুষকে নিশ্চয়তা দেন—তোমাদেরকে যেসব ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

অনুগত বান্দাদের পুরস্কার

আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য কী কী পুরস্কার থাকবে, তা সূরার এই অংশে বর্ণিত হয়েছে।

অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে বিস্ময়

অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে আল্লাহ এ-সূরার শেষ আয়াতে বলেন, "(আমার কথাই যদি বিশ্বাস না করে,) তা হলে এরপর তারা আর কোন কথা বিশ্বাস করবে?"

ফজিলত

যে সূরা নবিজির চুল পাকিয়েছে : একদিন আবু বকর ﵁ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার তো চুল পেকে গিয়েছে!' রাসূল ﷺ বললেন, 'হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকভীর—এই সূরাগুলো আমার চুল পাকিয়ে দিয়েছে'।

(তিরমিযি, ৩২৯৭, সহীহ)

অর্থাৎ এই সূরাগুলোতে কিয়ামাতের এমন ভয়াবহতার কথা এসেছে, যা হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। মুক্তি মিলবে, কি মিলবে না—এই চিন্তায় চুল পেকে যায়।

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সুযোগ পেলে আশেপাশের কোনো কবরস্থানে নিরিবিলি কিছু সময় কাটান;

এটি আপনাকে দুনিয়ার বাস্তবতা মনে করিয়ে দেবে। পরকালের ব্যাপারে মনোযোগী করে তুলবে।

গতিপথ

১. শপথ
সূরার শুরুতেই আল্লাহ শপথ করলেন। আর এরপর জানালেন, তোমাদেরকে যা ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে (অর্থাৎ কিয়ামাতের), তা অবশ্যই ঘটবে। এরপর তিনি কিয়ামাতের শুরুর সময়কার চিত্র কেমন হবে, তার বিবরণ দিলেন।

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাতের ভয়াবহতা ও আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে সাবধান করা

২. অবাধ্য-অহংকারীদের পরিণতি
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র একফোঁটা বীর্য দিয়ে। সেই মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতা করে, অহংকার দেখায়! এমন সব অহংকারীদের পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

৩. আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন
পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তিনি বানিয়েছেন। তাদের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করছেন। এসবের পরতে পরতে তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

৪. অনুগতদের পুরস্কার
তবে যারা আল্লাহর অনুগত বান্দা, তাদের জন্য পরকালে আছে সুন্দর জীবনের ওয়াদা। তারা সেখানে স্বচ্ছন্দে খাবে, পান করবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাতের দৃশ্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। দৃশ্যগুলো হবে খুবই ভয়াবহ।	১-১৫	কিয়ামাত দিবসের বিভীষিকার ব্যাপারে কাফিরদের প্রতি সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।	২৯-৪০
অহংকারীদের পতন ও অপরাধীদের সাথে আল্লাহর আচরণ কেমন হবে, তা জানানো হয়েছে।	১৬-১৯	নেককারদের পুরস্কার আর অস্বীকার-কারীদের প্রতি আযাবের ঘোষণা এসেছে।	৪১-৫০
মানুষ ও মহাবিশ্ব সৃষ্টির মাঝেই রয়েছে আল্লাহর বিরাট নিদর্শন।	২০-২৮		

কেইস-স্টাডি

এ-সূরার ২০-২৩ নং আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে স্টাডি করুন—আল্লাহ আপনাকে কত চমৎকার করে সৃষ্টি করলেন! কত সুন্দর চেহারা, হাত-পা, নাক-কান-চোখ—আপনি না-চাইতেই আল্লাহ আপনাকে দিলেন! আরও ভাবুন—আপনার সৃষ্টি কি সামান্য একফোঁটা বীর্যের মাধ্যমে নয়? আপনার মায়ের গর্ভে কত দারুণভাবে আল্লাহ আপনাকে সুরক্ষিত রাখলেন! এরপর দুনিয়ার আলো-বাতাস প্রাণভরে উপভোগ করার সুযোগ দিলেন! কিন্তু এমন সুন্দর আকৃতির সুনির্দিষ্ট কারণ কী? এর উত্তর মিলবে এই সূরার ২৪ নং আয়াতে—“যারা আমার পয়গামকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, সেদিন তাদেরকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে।” অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে—তাঁর সব আদেশ-নিষেধ আপনি সুন্দরভাবে পালন করবেন, মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবেন না।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩০/৭৭২)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ২৫-২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “আমি কি জমিনকে সংরক্ষণাগার বানাইনি, জীবিত ও মৃতদের জন্য?” অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় পৃথিবীর উপরিভাগ আর মৃত্যুর পর পৃথিবীর অভ্যন্তর হলো মানুষের আশ্রয়স্থল। এখান থেকে বোঝা যায়—মৃত মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও দাফন করা জরুরি। কারও মাথা, হাত-পা আলাদা হয়ে গেলে, সেগুলোকেও কবর দিতে হবে। কেননা, জমিন হলো সংরক্ষণাগার।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৯/১৬১)

“(তাদেরকে বলা হবে,) ‘তোমাদের কাজের প্রতিদান হিসেবে তোমরা স্বচ্ছন্দে পানাহার করো।’” এ সূরার ৪৩ নং আয়াত অনুসারে জানা যায়, বান্দা তার দুনিয়াতে-করা আমলের কারণে জান্নাতের সুখ-শান্তি লাভ করবে। কিন্তু একটি হাদীসে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।” এ-দুটো বিষয়কে আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী মনে হয়। আসলে গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী কিছু নেই। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহর দয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করাটা নির্ভর করবে আল্লাহর দয়ার ওপর। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের পর কে কতটুকু নাজ-নিয়ামাত, সুখ-শান্তির অধিকারী হবে, তা নির্ভর করবে তার আমলের ওপর। আপনার আমল যেমন হবে, আপনার জান্নাতও হবে তেমন।

(দেখুন—বুখারি, ৬৪৬৪; শানকিতি, তাফসীর, ৮/৪০৪)

সূরা নাবা

سُوْرَةُ النَّبَإِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮০-তম সূরা। এর আগে সূরা মাআরিজ ও পরে সূরা নাযিয়াত নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুরসালাত ও পরে সূরা নাযিয়াত।

এক নজরে নাবা

- মাক্কি যুগের শেষ-দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৭৮
- আয়াত: ৪০
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘নাবা’ শব্দের অর্থ ‘সংবাদ’। সূরার দ্বিতীয় আয়াতে এসেছে কিয়ামাতের সেই ‘মহাসংবাদ’-এর কথা, যা নিয়ে কাফির-মুশরিকদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ নেই। সেখান থেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয় ‘নাবা’।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর বিশেষ কিছু নিদর্শন।

০২ কিয়ামাতের দিন মানুষকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্তকরণ।

০৩ কিয়ামাতের দিন কাফিরদের অনুতাপ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

মক্কার মুশরিকরা কিয়ামাতের ব্যাপারে নিজেদের সন্দেহ-সংশয়ে ভোগে। এ-ব্যাপারটিকে আল্লাহ সূরাটির শুরুতেই তুলে ধরেন। তবে একদিন সত্যিই কিয়ামাত হাজির হবে। কাফির-মুশরিকদের সেদিনকার অনুভূতি সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ এভাবে তুলে ধরছেন, “আর যে আমার পয়গাম প্রত্যাখ্যান করছে, সে তখন বলে উঠবে: ‘হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!’”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুরসালাত; যার শেষে আল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ করেন। কেননা, (কিয়ামাতের ব্যাপারে) কাফিররা আল্লাহর কথা বিশ্বাস করতে পারে না! আর তাই এ-ব্যাপারে নিজেরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে। তাদের এই সংশয়বাদিতার বিষয়টি জানিয়েই এই সূরাটি শুরু হয়।

শানে নুযুল

এই সূরাটি প্রধানত কিয়ামাতের কথা আলোচনা করতেই নাযিল করা হয়েছে। প্রথমেই জানানো হয়েছে ‘নাবায়ে আযীম’ বা মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়ার সেই মহাসংবাদের কথা। একদিন এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। ছোট-বড় কিছুই থাকবে না। সবকিছুর শেষে শুরু হবে নতুন এক জগৎ। সেখানে আগে-পরের সব মানুষকে আবার জীবিত করে ওঠানো হবে। তারপর নেওয়া হবে তাদের বিশ্বাস ও কাজের হিসেব। যারা ঈমানদার ও ভালো কাজ করেছিল, তারা আজীবনের জন্য চিরসুখের জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা দুনিয়ায় অবাধ্যতা করেছিল—তারা চিরদিনের জন্য প্রবেশ করবে চিরশাস্তির জাহান্নামে। আখিরাতের জবাবদিহিতার বিষয়টি এ-সূরায় স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/৫; বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/১৮৯)

সেগমেন্ট

ঘোরতর সন্দেহ

পরকালের ব্যাপারে কাফিররা ঘোরতর সন্দেহে ভোগে। তাই এই বিষয়ে তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে। তবুও তারা সন্দেহমুক্ত হতে পারে না।

সন্দেহ দূরকারী নিদর্শন

বসবাসের উপযুক্ত পৃথিবী, মজবুত পাহাড়, ঘুম, রাত, দিন—আল্লাহর কিছু বিশেষ নিদর্শন, যা পরকালের সত্যতাকে নিশ্চিত করে।

হুঁশিয়ারি

বিচার-দিবসের পরিস্থিতি হবে খুবই ভয়াবহ। সেদিন কেউ-ই আল্লাহর সামনে কথা বলার সাহস করবে না।

ফজিলত

যে সূরা নবিজির চুলে পাক ধরিয়েছে : একদিন আবু বকর ﵁ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার তো চুল পেকে গিয়েছে!' রাসূল ﷺ বললেন, 'হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকভীর—এই সূরাগুলো আমার চুল পাকিয়ে দিয়েছে'।

(তিরমিযি, ৩২৯৭, সহীহ)

নবি ﷺ মাঝে মাঝে এক রাকআতে একই রকমের দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। এরকম এক জোড়া সূরা হলো—সূরা মুরসালাত ও সূরা নাবা; যা তিনি এক রাকআতে তিলাওয়াত করতেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

রাত না জেগে, তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে; → তা হলে দিনভর প্রফুল্ল থাকা যাবে, তাহাজ্জুদের জন্য জাগাও সহজ হবে।

গতিপথ

১. মহাসংবাদের ব্যাপারে সংশয়

পরকালের মহাসংবাদের ব্যাপারে মানুষ সংশয়ে ভোগে। তাই তারা একে-অন্যের কাছে এ-বিষয়ে জানতে চায়।

২. পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা

সব সংশয় ঝেড়ে ফেলতে হবে। চমৎকার পৃথিবী, সুদৃঢ় পাহাড়, দিনের প্রাণ-চঞ্চলতা—এগুলোই তো আল্লাহর ক্ষমতাকে চিহ্নিত করে। এমন ক্ষমতাবান সত্তার পক্ষে পুনরুজ্জীবন ঘটানো কঠিন কোনো কাজ নয়।

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাতের মহাসংবাদ

৩. যা যা ঘটবে সেদিন

শিঙায় ফুঁ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই দলবেঁধে ছুটবে হাশরের মাঠে। পাহাড় মরীচিকায় পরিণত হবে। অবাধ্যদেরকে ভীষণভাবে পাকড়াও করা হবে।

৪. নেককারদের পরিণতি

অবাধ্যদের পাকড়াও করা হবে। আর আল্লাহর অনুগত লোকদের জন্য থাকবে চমৎকার সব নিয়ামাত।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাত ও পরকালের ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে।	১-৫	পরকালের কিছু দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।	১৭-৩০
তাদের জন্য আছে আল্লাহর অগণিত নিদর্শন—পৃথিবী, পাহাড়, ঘুম, রাত, দিন, সূর্য, মেঘমালা ইত্যাদি।	৬-১৬	অনুগত লোকদের জন্য আছে পুরস্কারের বার্তা।	৩১-৪০

কেইস-স্টাডি

এ সূরার ৩৮ নং আয়াতে এসেছে, "যেদিন সকল মানুষ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, সেদিন তারা কেউ কথা বলতে পারবে না, তবে তার বিষয়টি আলাদা—যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং যে (দুনিয়ায়) মহাসত্যের কথা বলেছে।" সেদিন এই সুযোগটা পাবেন খুবই অল্পকিছু ব্যক্তি। কেবল আল্লাহর একান্ত অনুগত কিছু বান্দা তাঁর সামনে কথা বলার অনুমতি পাবেন। তাই একটা ব্যাপারে আমাদেরকে সব সময় চোখ-কান খোলা রাখতে হবে—কারও দ্বারা যেন আমরা ধোঁকায় না-পড়ি। কাউকে অনুসরণ করলে, সে আমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে—এমন কথা যেন আমরা বিশ্বাস না করি। কারণ কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না—সে সেদিন সুপারিশ করার অনুমতি পাবে কি-না। বরং সেদিন তো প্রায় সকলে নিজেকে নিয়েই আফসোস করতে থাকবে। 'ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী' আর্তনাদ উঠবে চারিদিকে। অনুসারীদের দিকে তাকানোর সময় কোথায়!

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/২২০)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ২১ নং আয়াতে এসেছে—"জাহান্নাম অপেক্ষায় আছে!" এই আয়াতটিকে বুঝতে হলে সূরা মারইয়ামের ৭১ নং আয়াতটি দেখতে হবে। সেই আয়াতের সারকথা হলো—সব মানুষকেই জাহান্নাম অতিক্রম করে যেতে হবে। মানুষের মধ্যে যারা নেককার, তারা সহজেই তা অতিক্রম করবে। আর যারা অবাধ্য, তাদেরকে সেখানে ফেলে দেওয়া হবে। কখনো কি ভেবেছেন—জান্নাতিদেরও কেন ভয়াবহ সেই জাহান্নামের ওপর দিয়ে যেতে হবে? পুলসিরাত পাড়ি দিতে হবে? তাদেরকে তো সোজা জান্নাতে পাঠিয়ে দেওয়া যেত! আসলে আমরা চোখে না-দেখা জিনিসকে কল্পনায় সেভাবে আঁকতে পারি না। জান্নাতিরা যখন জাহান্নামের শাস্তি স্বচক্ষে দেখে জান্নাতে যাবে, তারপর জান্নাতের রকমারি অনাবিল শান্তি গায়ে মাখবে, তখন তারা বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারবে—আরেকটা দল কতটা কষ্টে আছে। এই তুলনাটুকু তাদেরকে আরও কৃতজ্ঞ বানাবে। ফলে তাদের শান্তির স্বাদ বেড়ে যাবে আরও বহুগুণ।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, ৮/৩০৫)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ বলেন, 'জাহান্নামিদের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক আয়াত হলো এ-সূরার ৩০ নং আয়াত—"...শাস্তির মজা ভোগ করো: এখন আমি তোমাদের শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বাড়াব না!" একবার উপলব্ধি করুন—কেউ যখন জানবে, সামনের সময়গুলোতে তার জন্য অপেক্ষা করছে কেবলই শাস্তি আর শাস্তি, তখন তার অবস্থাটা কেমন হবে? তখন আফসোস করে হাত কামড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। তাই আসুন, এখনই সেই অবস্থা থেকে বাঁচার পথ খুঁজি। রবের অবাধ্যতা থেকে নিজেও বাঁচি, অপরকেও বাঁচাই।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/১৬৯)

সূরা নাযিয়াত

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮১-তম সূরা। এর আগে সূরা নাবা ও পরে সূরা ইনফিতার নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৭৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা নাবা ও পরে সূরা আবাসা।

এক নজরে নাযিয়াত

- মাক্কি যুগের শেষ সময়ে নাযিল
- সূরা নং: ৭৯
- আয়াত: ৪৬
- মাক্কি

নামের রহস্য

'নাযিয়াত' মানে 'টানার ফলে যা লম্বা হতে থাকে; (তির নিক্ষেপের জন্য) ধনুকের রশি টেনে লম্বা করা' বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আকাশের তারারা সন্ধ্যা-রাতে দিগন্তের একদিকে উদিত হয়ে শেষ রাতে আরেক দিকে অস্ত যায়—এই দৃশ্যটি ধনুকের রশি লম্বা করার দৃশ্যের সঙ্গে তুলনীয়। তারকার এই চিত্র বোঝাতে ১ নং আয়াতে 'নাযিয়াত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; সেখান থেকেই এ-সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

মেজর থিম

০১ কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ কাঁপুনি।

০২ মুসা ﷺ-এর কাহিনি।

০৩ কিয়ামাতের সামগ্রিক পরিস্থিতি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন কিয়ামাতের সংবাদ, "যেদিন ভয়ংকর কম্পন (পুরো পৃথিবী) কাঁপিয়ে তুলবে—কম্পনের পর কম্পন—সেদিন হৃৎপিণ্ডগুলো ধড়ফড় করতে থাকবে"। কিন্তু কিয়ামাতে অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিকরা তাচ্ছিল্যভরে নবিজিকে প্রশ্ন করত, কবে আসবে সেই দিন? সূরাটির শেষে আল্লাহ তাঁর নবির মাধ্যমে কাফিরদের প্রশ্নের জবাব দিলেন, "সেটি তোমার বলার সুযোগ কোথায়? এর সীমারেখা তো কেবল তোমার রবই জানেন"।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা নাবা; যার শেষে পুনরুত্থান ও কিয়ামাত দিনে প্রতিদান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা নাযিয়াতের শুরুতে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে মর্মে আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযুল

মক্কায় কাফিররা নবিজিকে বারবার একটি প্রশ্ন করতে থাকে—কিয়ামাত কবে আসবে? এর জবাবে এই সূরার একেবারে শেষ অংশটুকু নাযিল করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামাত কবে হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। রাসূলের কাজ হচ্ছে কিয়ামাত যে অবশ্যই হবে, এ সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেওয়া। এখন যার ইচ্ছা কিয়ামাত-দিনের বিচারের ভয়ে নিজের কর্মকাণ্ড শুধরে নিতে পারে। আবার যার ইচ্ছা লাগামহীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। তবে হঠাৎ করেই চূড়ান্ত সময়টি এসে যাবে। তখন দুনিয়ার জীবনকেই যারা সবকিছু মনে করত, তারা অনুভব করতে থাকবে—দুনিয়ার বুকে তারা সামান্য একটুখানি সময় অবস্থান করেছিল। দুনিয়ায় অবাধ্যতা করার কারণেই তারা এখন চিরস্থায়ী আযাবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মোটকথা আল্লাহর সর্বব্যাপী ক্ষমতা, কিয়ামাতের ভয়াবহতা, কিয়ামাত সংঘটিত হবার সময়, কিয়ামাতের দিন নেককার আর বদকারের পরিণতি ইত্যাদি বিষয় জানিয়ে দিতেই আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/২১৭)

সেগমেন্ট

অবিশ্বাসীর পরকাল-ভাবনা ও বাস্তবতা

মৃত্যুর পর সবাইকে আবার জীবিত করা হবে—এই বিষয়টা অবিশ্বাসীদের ভাবনাতেই আসে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো—নিশ্চিতভাবে আল্লাহ আবার সবাইকে জাগিয়ে তুলবেন।

ফিরআউনের পরিণতি

আল্লাহর আদেশকে অবজ্ঞা করে ফিরআউন দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জায়গাতেই লাঞ্ছিত হয়েছে।

বোধোদয়

পরকালের দৃশ্য যখন অবাধ্যরা নিজ চোখে দেখবে, তখন তাদের বোধোদয় হবে। তাদের মনে হবে, দুনিয়াতে তারা খুব সামান্য সময় ছিল।

ফজিলত

নবি ﷺ মাঝে মাঝে এক রাকআতেই একই রকমের দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। এরকম এক জোড়া সূরা হলো—সূরা মাআরিজ ও সূরা নাযিয়াত; যা তিনি এক রাকআতে তিলাওয়াত করতেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

প্রতি রাতে সারাদিনের কাজগুলোর ব্যাপারে পাই-টু-পাই হিসেব নিন;

তা হলে, কোনো ভুল-ত্রুটি হলে, ঘুমানোর আগেই তাওবা করার সুযোগ মিলবে।

গতিপথ

১. আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ
গোটা বিশ্ব-জগৎ কী সুচারুরূপে আল্লাহ পরিচালনা করছেন! সেই মহা-ক্ষমতাধর শাসক বারবার কিয়ামাতের সত্যতার ব্যাপারে মানুষকে সাবধান করছেন।

২. ফিরআউনের পরিণতি থেকে শিক্ষা
ফিরআউন তার অবাধ্যতার দরুন দুনিয়ার বুক থেকে অপমানিত হয়ে বিদায় নিয়েছে। পরকালেও তার জন্য অপেক্ষা করছে ভীষণ শাস্তি।

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাতের সত্যতা ও মানুষের জন্য শিক্ষা

৩. মানুষের বোধশক্তি
সুউচ্চ আকাশ, অন্ধকারে ঢাকা রাত, দিনের উজ্জ্বলতা—এরকম হাজারো নিদর্শন ছড়িয়ে আছে ধরার বুকে। যিনি এত-এত নিদর্শন সৃষ্টি করলেন, তিনি কেন মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না? মানুষের বোধশক্তি কোন পর্যায়ের!

৪. অবাধ্য ও অনুগত
আগেকার সূরাগুলোর ধারাবাহিকতায়—এখানেও তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহর অবাধ্য ও অনুগত লোকদের শেষ পরিণতির চিত্র।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মহাবিশ্ব কীভাবে মহাশূন্যে চলছে, তার একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	১-৫	কিয়ামাত দিবসের কিছু ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	৩৪-৪১
কিয়ামাতের ভয়ংকর সূচনার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।	৬-১৪	কিয়ামাত দিবসের সময়ক্ষণ সম্পর্কে মুশরিকরা তাচ্ছিল্যভরে প্রশ্ন করে—'কখন শুরু হবে সেটা?'	৪২
ফিরআউন ও মুসা ﷺ-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।	১৫-২৬	কিয়ামাতের দিনক্ষণ কেবল আল্লাহ-ই জানেন। আর কারও পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।	৪৩-৪৬
আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার নিদর্শন হিসেবে—সৃষ্টিজগতের সাতটি বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।	২৭-৩৩		

কেইস-স্টাডি

আল্লাহ তাআলা চাইলেন—ফিরআউনের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেবেন। আর এই কাজে বেছে নিলেন মুসা ﷺ-কে। তখনকার সময়টাতে চারিদিকে চলছিল জাদুবিদ্যার জয়-জয়কার। তাই মুসা ﷺ-কে এমন নয়টি নিদর্শন দিয়ে আল্লাহ পাঠালেন যে, বড় বড় সব জাদুকরও তাজ্জব বনে গেল। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবি-রাসূলকে এমন সব নিদর্শন দিয়ে পাঠাতেন, যা সেই যুগের দম্ভ-অহমিকাকে মাটিতে ধসিয়ে দিত। এখন প্রশ্ন—তা হলে আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিদর্শন কী? আমাদের নবিজির ওপর সবচেয়ে বড় যে নিদর্শনটি এসেছে, সেটি হলো আল-কুরআন। আসলে নবিজির সময়টা ছিল আরবি সাহিত্যের যুগ। তাই আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানান—যদি সামর্থ্য থাকে, কুরআনের মতো সাহিত্য রচনা করো। তখন তারা নিজেদের অপারগতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। সত্যিকার অর্থেই কুরআন অলৌকিক এক কিতাব। এর প্রতিটি বাক্য আপনাকে ভাবাবে। আপনার সাথে কথা বলবে। তত্ত্ব নামক নানা তন্ত্র-মন্ত্র থেকে আপনাকে মুক্তি দেবে।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৯০৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

জবাবদিহিতার ভয় থাকলে সব কাজ সুন্দর হয়। অত্যাচার-অবিচার দূর হয়। এ-সূরার ১৮-১৯ নং আয়াতে একটা বিষয় খেয়াল করুন—আল্লাহ তাআলা মুসা ﷺ-কে ফিরআউনের কাছে পাঠালেন দাওয়াত দিতে। ফিরআউনকে তিনি বললেন, "তোমার কি পরিশুদ্ধ হবার আগ্রহ আছে? তা হলে আমি তোমাকে তোমার রবের পথ দেখাব; এর ফলে তোমার মনে (তাঁর) ভয় জাগবে।" নিজেকে সবচেয়ে বড় 'রব' দাবি করার পেছনে ফিরআউনের কারণ ছিল একটাই—ভয়শূন্য হওয়া। আজকেও যাদের অর্থকড়ি আর ক্ষমতা আছে, কিন্তু জবাবদিহিতার ভয় নেই; দেখবেন, তারাও ফিরআউনের মতো আচরণ করছে। দুর্বলদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন করছে। তাই ফিরআউনের পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে, অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে হবে। কিয়ামাতের দিনের সেই জবাবদিহিতার কথা স্মরণ রাখতে হবে।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩১/৪০)

আমরা তো এখনো নিকটতম আকাশের-ই হদিস করতে পারিনি। এত বিশাল বিস্তৃত এ-আকাশ। অনেক দূরে দেখলে মনে হয়, আকাশটা বুঝি ওখানটায় গিয়ে থেমেছে। কিন্তু ওখানে গেলে দেখা যায়, তা আরও অনেক দূর ছড়ানো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরকম সাতটা আকাশ বানিয়েছেন—যার কূল-কিনারা করা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলোর রহস্য কেবল তাঁরই জানা। যিনি এত বিশালকায় আকাশ বানালেন, সাড়ে তিন হাত মানুষ বানানো কি তাঁর জন্য কঠিন কিছু? মোটেও নয়। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দেওয়া তো তাঁর জন্য মামুলি ব্যাপার। অকল্পনীয় উচ্চতায় যিনি খুঁটি ছাড়াই শূন্যে দাঁড় করালেন একেকটা আকাশ। অথচ তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ চিন্তাভাবনাই করে না! উলটো পরকালের পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বসে। তাই এ সূরার ২৭-৩৩ নং আয়াতগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩১/৪৪; আলি মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ৫৯০৫)

সূরা আবাসা

سُوْرَةُ عَبَسَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২৪-তম সূরা। এর আগে সূরা নাজ্‌ম ও পরে সূরা কদর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা নাযিয়াত ও পরে সূরা তাকভীর।

এক নজরে আবাসা

- মাক্কি যুগের শুরুর দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৮০
- আয়াত: ৪২
- মাক্কি

নামের রহস্য

'আবাসা' মানে 'সে ভ্রু কুঁচকাল'। এখানে 'সে' দ্বারা রাসূল ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। সূরার ১ নং আয়াতে 'আবাসা' শব্দটি রয়েছে। সেখান থেকেই এর নাম রাখা হয়েছে 'আবাসা'।

মেজর থিম

০১. অন্ধ সাহাবির আগমনে বিরক্তি।

০২. মানুষের স্বভাব—অকৃতজ্ঞতা।

০৩. নিজের সৃষ্টি-রহস্য ও খাবারের দিকে মনোযোগ দেওয়ার উপদেশ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে এসেছে 'আবাসা/সে ভ্রু কুঁচকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল'—এটি হলো চেহারার একটি বৈশিষ্ট্য। এ সূরার শেষেও চেহারার বৈশিষ্ট্য নিয়েই আলাপ এসেছে—"সেদিন কিছু চেহারা থাকবে উজ্জ্বল, হাসিমাখা, সুসংবাদে আনন্দিত। আর কিছু চেহারা সেদিন থাকবে ধূলিমলিন, যার ওপর ছেয়ে যাবে (দুশ্চিন্তা ও হতাশার) অন্ধকার।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা নাযিয়াত; যার শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমার কাজ কেবল তাদেরকে সাবধান করা, যারা একে ভয় পায়।" এই কাজে কারও থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। তাই সূরা আবাসার প্রথমেই নবিজিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হলো।

শানে নুযুল

ইসলামের একেবারে শুরুর দিকের ঘটনা। নবিজির সামনে সেদিন মক্কার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বসা। মুশরিকদের নেতা টাইপের লোক ছিলেন তারা। বলা যায়, ইসলামের ঘোরতর শত্রুদেরকে নবিজি দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এ কথা স্বীকার করতেই হবে—কোনো সমাজের নেতারা যখন কোনো বিষয় মেনে নিতে একমত হয়, তখন বাদবাকি সাধারণ মানুষের কাছে সেটি অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। সে-জন্য তাদের সাথে একান্তে কথা বলছিলেন নবিজি। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান জানাচ্ছেন। ঠিক এমন সময় একজন অন্ধ সাহাবি সেখানে উপস্থিত হলেন। নাম আবদুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুম ﷺ। তিনি এসেই নবিজিকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আয়াতটির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। নবিজি যেহেতু মুশরিক নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন, তাই এই সাহাবির সাথে তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। আর এদিকে তিনি নবিজিকে বারবার বলেই যাচ্ছিলেন। এতে করে নবিজি কিছুটা বিরক্ত হন এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যদিও এমন পরিস্থিতিতে মানুষ হিসেবে খানিকটা বিরক্তি আসা স্বাভাবিক; তবে আল্লাহর রাসূলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। আর তাই তাঁর এই আচরণের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ এ-সূরাটি নাযিল করেন। যেখানে দাঈদের করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা এসেছে।

(দেখুন—তিরমিযি, ৩৩৩১; ইবনু আবী হাতিম, ১৯১২৫; বাগাবি, তাফসীর, ৮/৩৩২)

সেগমেন্ট

মৃদু তিরস্কার

সূরার শুরুতেই রাসূল ﷺ-এর বিরক্তির ঘটনা তুলে ধরেন আল্লাহ। এর পর তাঁর নবিকে জানিয়ে দেন—এমনটা যেন আর কখনো না হয়।

জাগরণ ও সতর্কতা

মানুষের সৃষ্টি একফোঁটা বীর্য থেকে। তাই তার উচিত—অহংকার না করে আল্লাহর অনুগত হওয়া, কৃতজ্ঞ হওয়া। আর তা না হলে কপালে জুটবে পরকালের শাস্তি।

কিয়ামাতের আলোচনা

সূরার একেবারে শেষ অংশে কিয়ামাতের ব্যাপারে আলোচনা উঠে এসেছে। যেখানে কিয়ামাত-দিবসের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ফজিলত

নবি ﷺ মাঝে মাঝে এক রাকআতে একই রকমের দুটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। এরকম এক জোড়া সূরা হলো—সূরা আবাসা ও সূরা মুতাফফিফীন; যা তিনি এক রাকআতে তিলাওয়াত করতেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

শারীরিকভাবে অক্ষম বা অসুস্থ কোনো ব্যক্তিকে দেখতে যান; → এতে অসুস্থ ব্যক্তি যেমন প্রফুল্ল হবেন, আল্লাহও খুশি হবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর সমতা-নীতি

১. বিরক্তির মুহূর্ত ও সমতার শিক্ষা

অন্ধ সাহাবির ওপর বিরক্তির ঘটনা তুলে ধরে, আল্লাহ আমাদেরকে শেখালেন—ইসলামের চোখে সবাই সমান। ইসলামের প্রতি যে-ই আগ্রহ দেখাবে, তার দিকেই পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

২. সবার কাছে নির্দেশনা পৌঁছাবার দায়িত্ব

রাসূল ও মুমিনদের দায়িত্ব হলো—তাঁরা সকলের কাছে আল্লাহর নির্দেশনাগুলো পৌঁছে দেবেন। লোকদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

৩. মানুষের অবাধ্যতা বড্ড বেমানান

আল্লাহর অবাধ্যতা মানুষের অকৃতজ্ঞ-স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলে। তার উচিত নিজের খবর নেওয়া। তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র একফোঁটা বীর্য থেকে।

৪. মানুষের মৃত্যু ও হিসেব-নিকেশ

মানুষকে অবশ্যই মরতে হবে। এর পর আল্লাহ তার হিসেব নেবেন। সেদিন কারও প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়বিচার।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চায়, কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করতে চায়—তার দিকে অধিক মনোযোগ দিতে হবে।	১-৪	মানুষের জন্য আল্লাহর অবাধ্য হওয়া খুবই বেমানান। সে কিছুতেই আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করতে পারে না।	১৭-২৩
অপরদিকে যে কুরআনকে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে না, তাকে পরিশুদ্ধ করার দায় রাসূলের নেই।	৫-১০	আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁর কিছু অনুগ্রহের কথা আলোচিত হয়েছে।	২৪-৩২
কুরআনের মিশন নিঃসন্দেহে অসাধারণ।	১১-১৬	পরকালের একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে—যেখানে মানুষ তার আপনজনদের কাছ থেকে পালাবে।	৩৩-৪২

কেইস-স্টাডি

ইবাদাত করে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। মনে মনে নিজেকে বিরাট কিছু ভাবি। মনে করি—আমি অনেক ইবাদাত করি! নিশ্চয়ই এতদিনে আল্লাহর হক আদায় হয়ে গেছে! এবার কুরআনের পাতায় চোখ বোলানো যাক। এই সূরার ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "না, (মানুষ যা ভাবছে,) তা নয়! তিনি তাকে যে আদেশ দিয়েছেন, এখনো সে তা পুরোপুরি পালন করেনি।" আল্লাহ তাআলা নিজে বলছেন—মানুষ তাঁর আদেশ পুরোপুরি পালন করেনি। আর করবেই-বা কীভাবে? আমরা যা কিছুই করি না-কেন, আল্লাহর আদেশ নিঁখুতভাবে পালন করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। আমরা কেবল আমাদের আমলগুলোকে সুন্দর করার চেষ্টা করতে পারি। শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদাত করতে পারি। তাই, সব সময় এই আয়াতটি মাথায় রাখার চেষ্টা করুন; তা হলে ইবাদাত নিয়ে কখনো আত্মতৃপ্তি আসবে না।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৩২৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কেউ কি চাইবে—তাকে তিরস্কার করা হোক হাজারো মানুষের সামনে? না, এটা কেউ-ই চাইবে না। আর যদি এমন হয় পরবর্তীতেও লোকজন জেনে যাবে, তাহলে তো ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা সে চালাবে। এবার দেখুন সূরা আবাসার শুরুতেই নবিজিকে সাবধান করা হয়েছে। কুরআনের বাণী যদি নবিজি নিজে থেকেই বানিয়ে বলতেন, তাহলে সূরা আবাসা তিনি এতে লিপিবদ্ধ করতেন না। আসলে আল্লাহর বাণী বলেই কুরআনে কোনো পক্ষপাত নেই। তাই আমাদের উচিত—কুরআনের ব্যাপারে সব ধরনের সংশয় থেকে দূরে থাকা। কুরআনের নির্দেশনা মেনে জীবন যাপন করা।

(দেখুন—ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, ১৩/৩৩৬)

এ-সূরার ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের 'খাবার'-এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বললেন। আচ্ছা ভাবুন তো, আপনার খাবারটা কোত্থেকে আসে? কীভাবে আসে? প্রতিবেলার ভাতের কথাই ধরুন—ভাত আসে চাল থেকে, চাল আসে ধান থেকে, ধান আসে তার চারাগাছ থেকে, চারাগাছ হয় জমিনে, জমিন প্রস্তুত হয় পানি দিয়ে, আর পানি আসে আসমান থেকে। আল্লাহ যদি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন, জমিন প্রস্তুত হবে না; আর ধানও হবে না। আল্লাহ তাআলাই আপনাকে-আমাকে জীবিকা দিচ্ছেন। খেয়ে-পরে থাকার সম্বলটুকু তাঁরই সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় উৎপন্ন হচ্ছে। তবুও আমরা কীভাবে অকৃতজ্ঞ হই, ভুলে থাকি পরম করুণাময় রবকে?

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৩২৩)

সূরা তাকভীর

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৭ম সূরা। এর আগে সূরা লাহাব ও পরে সূরা আ'লা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আবাসা ও পরে সূরা ইনফিতার।

এক নজরে তাকভীর

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ৮১
- আয়াত: ২৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

'তাকভীর' শব্দের অর্থ 'কোনোকিছু মুড়িয়ে নেওয়া'। সূরার ১ নং আয়াতে 'তাকভীর' শব্দটির মাধ্যমে জানানো হয়েছে—সেদিন সূর্যকে অন্ধকারে মুড়িয়ে নেওয়া হবে, আলোহীন হয়ে পড়বে পুরো পৃথিবী। সেখান থেকেই সূরাটির নাম হয়েছে 'তাকভীর'।

মেজর থিম

০১. কিয়ামাতের কিছু দৃশ্য।

০২. কুরআনের সত্যতা নিশ্চিতকরণ।

০৩. কুরআনকে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর ভূমিকা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরু হয়েছে কিয়ামাতের বিভীষিকার বর্ণনা দিয়ে। তবে এই কিয়ামাত কবে সংঘটিত হবে, সেই তথ্য আল্লাহ তাআলা জানাননি। ওদিকে কিয়ামাতের ওপর বিশ্বাস না থাকায়, কাফিররা রাসূলের কাছে বারবার কিয়ামাত নিয়ে আসার দাবি জানায়। তাই এই সূরার শেষে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—“তোমাদের চাওয়া নয়, কেবল মহাবিশ্বের অধিপতি আল্লাহর চাওয়া” অর্থাৎ আল্লাহ যখন চাইবেন, তখনই কিয়ামাত সংঘটিত হবে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আবাসা; যা শেষ হয়েছে কিয়ামাতের কান-ফাটানো আওয়াজের দিন সম্পর্কে কাফিরদেরকে সাবধান করে দিয়ে। সেই আলোচনাকে পূর্ণতা দিয়েই শুরু হয়েছে সূরা তাকভীর। সেই ভয়াবহ দিনটি কেমন হবে, এই সূরাটিতে তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

শানে নুযুল

কিয়ামাতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির বর্ণনা তুলে ধরতে এই সূরার শুরুর অংশ নাযিল হয়েছে। প্রথম ছয়টি আয়াতে এসেছে কিয়ামাতের প্রথম পর্বের বিবরণ। কিয়ামাত শুরু হওয়ার সাথে সাথে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে, তার এক পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠেছে। পরের সাত আয়াতে আল্লাহ কিয়ামাতের দ্বিতীয় পর্বের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। সকলকে কীভাবে জীবিত করা হবে, আর তাদের কার সাথে কী আচরণ করা হবে, সে-কথাগুলো এখানে তুলে ধরেছেন তিনি।

এই সূরার বাকি আয়াতগুলোর আলোচনা কুরআন ও রাসূলকে নিয়ে। এখানে মক্কাবাসীকে জানানো হয়েছে—এই কুরআনের বাণী কোনো পাগলের প্রলাপ নয়, আর তোমাদের নবিও পাগল নন। তাঁর কাছে এগুলো শয়তানের ওয়াসওয়াসা হিসেবে আসে না। বরং এই কুরআনের বাণী স্বয়ং জিবরীল ﷺ বহন করে নিয়ে আসেন—যিনি আল্লাহর একজন সম্মানিত ফেরেশতা।

অর্থাৎ মোট দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে—আখিরাত ও রিসালাত।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/২৭৪)

সেগমেন্ট

কিয়ামাত

সূরার শুরু থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা কেবল কিয়ামাতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়েছেন।

কিয়ামাতের সত্যায়নকারী

পরবর্তী অংশে কিয়ামাতের সত্যতা নিশ্চিতকারী—কুরআন, সম্মানিত ফেরেশতা জিবরীল ﷺ ও রাসূল ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য

মহামহিম এই কুরআন কেবল তাকেই পথ দেখায়—যে সঠিক পথে চলতে চায়।

ফজিলত

যে সূরা কিয়ামাতের দৃশ্য দেখায় : ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কিয়ামাত-দিনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিকাক পড়ে।'

(তিরমিযি, ৩৩৩৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

ছোটদের প্রতি স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে;

এতে তাদের ভেতরও গড়ে উঠবে মানুষকে ভালোবাসার একটি সুন্দর চর্চা।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাতের সূচনা ও শেষ বিচারের বাস্তবতা

১. কিয়ামাত
কিয়ামাত যখন শুরু হবে, তখন চারিদিকে ব্যাপক বিপর্যয় শুরু হয়ে যাবে।

২. মানুষের অবস্থা
কিয়ামাতের দিন মানুষ তার আমল নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। সেদিন সে জানতে পারবে—দুনিয়া থেকে সে কী কী ভালো বা মন্দ আমল নিয়ে এসেছে।

৩. ওহির নিরাপত্তা-বলয়
কুরআন নিয়ে দুনিয়াতে নেমে আসতেন জিবরীল ﷺ-এর মতো বিশ্বস্ত ফেরেশতা। আর বহু ফেরেশতা তাঁর সামনে-পেছনে পাহারায় থাকতেন।

৪. রাসূল ও গণমানুষ
রাসূলকে পাঠানো হয়েছে মানুষকে সতর্ক করতে। আর মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। চাইলে সে সত্য গ্রহণ করতে পারে, আবার মুখ ফিরিয়েও নিতে পারে। তবে মুখ ফিরিয়ে নিলে আছে শাস্তির ব্যবস্থা।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
বিভীষিকাময় কিয়ামাতের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।	১-৭	তিনটি বিষয়ের শপথ করে আল্লাহ তাআলা কুরআনের সত্যতার ঘোষণা দিলেন।	১৫-২১
সেদিন মানুষের আমলের খাতাগুলো মেলে ধরা হবে। তাদেরকে করা হবে চূড়ান্ত জিজ্ঞাসাবাদ।	৮-১১	মুহাম্মাদ ﷺ পাগল নন। তিনি কুরআন বানিয়ে বলেন না। আবার কুরআনের বাণী লুকিয়েও রাখেন না।	২২-২৪
অবাধ্যদের জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করা হবে। আর অনুগত লোকদের কাছে নিয়ে আসা হবে জান্নাতকে।	১২-১৪	সকল ধরনের ত্রুটি থেকে কুরআন মুক্ত। বিশ্ববাসীকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।	২৫-২৯

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ২৭-২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "এ (কুরআন) তো বিশ্ববাসীকে স্মরণ-করিয়ে-দেওয়ার পয়গাম কেবল: তোমাদের যে সঠিক পথে চলতে চায়, তার জন্য।" আয়াতটি আমাদেরকে চরম সত্য একটি বার্তা দেয়। আসলে তো তা-ই! কুরআনের কাজ তো কেবল মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আলো-আঁধারের পথ দেখিয়ে দেওয়া। এবার মানুষ নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে। বহু মানুষ এই কুরআনকে সরল মনে গ্রহণ করেছে। আবার অনেক মানুষ এই কুরআনের অপব্যাখ্যা বা নিজের মনমতো ব্যাখ্যা করে বিপথগামীও হয়েছে। নিজের সাথে সাথে অন্যদেরকেও ঠেলে দিয়েছে শাস্তির মুখে। কারণ সে শুরু থেকে ইচ্ছে করেই আলোর পথে যেতে চায়নি। কুরআন তাকেই সঠিক পথ দেখায়, যে সত্যের আলো খোঁজে।

(দেখুন—নাসাফি, তাফসীর, ৩/৫০৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"সকল মানুষকে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে" এই সূরার ৭ নং আয়াতটির মর্মার্থ খুব ভালো-করে রপ্ত করা প্রয়োজন। যাদের সাথে আপনার ওঠাবসা ও অন্তরের আকর্ষণ—কিয়ামাতের দিন তাদের সাথেই আপনাকে মেলানো হবে। আল্লাহ-ওয়ালা মানুষগুলোর সাথে যদি হয় আপনার হৃদ্যতা, তবে আপনার জন্য সুখবর। পরকালেও আপনি হবেন তাদের সঙ্গী। আর যদি আপনার বন্ধু হয় আল্লাহর দুশমন কেউ, তাদেরকেই আপনার ভালো লাগে, তবে আপনার জন্য বড়ই দুঃসংবাদ। তাদের সাথেই হয়তো আপনাকে জাহান্নামে থাকতে হবে। সুতরাং কাকে বন্ধু বানাবেন, কার লাইফ-স্টাইলে জীবন গড়বেন, ভাবুন। পরকালে কিন্তু ভাবার সুযোগ মিলবে না।

(দেখুন—ইবনু কাসির, তাফসীর, ৭/৪৯২; আবু দাউদ, ৪৮৩৩; তিরমিযি, ২৩৭৮)

আজকাল দেখবেন অনেক মানুষেরই চাওয়া—একটা ছেলে-সন্তান যেন হয়। মেয়ে-সন্তান হলে তারা কেমন মন খারাপ করে। তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়। এটা জাহিলিয়াতের স্বভাব। বর্তমানেও হাসপাতালের ময়লার বাক্সে, ডাস্টবিনে বা নর্দমায় জীবন্ত-নবজাতক-মেয়েশিশু পাওয়া যায়। হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও সেই বর্বর মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। অথচ ইসলাম এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এই সূরার ৮-৯ নং আয়াত দেখুন—"জীবন্ত-পুঁতে-ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল!" হত্যাকারীদের কতটা ভয়ংকর শাস্তিতে ভুগতে হবে, এই প্রশ্ন থেকেই তার কিছুটা আঁচ করা যায়। কেননা, নবজাতকের আবার অপরাধ কী? তার অপরাধ শুধু এটুকুই—সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে!

(দেখুন—ইবনু কাসির, তাফসীর, ৭/৪৯৪)

সূরা ইনফিতার

سُوْرَةُ الْإِنْفِطَارِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮২-তম সূরা। এর আগে সূরা নাযিয়াত ও পরে সূরা ইনশিকাক নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা তাকভীর ও পরে সূরা মুতাফফিফীন।

এক নজরে ইনফিতার

- মাক্কি যুগের শেষদিকে নাযিল
- সূরা নং: ৮২
- আয়াত: ১৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

'ইনফিতার' শব্দের অর্থ 'কোনোকিছু ফেটে যাওয়া'। সূরার প্রথম আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিয়ামাতের আগে আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। খসে খসে ছিটকে পড়বে মহাকাশ ব্যবস্থা; চাঁদ-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র সব। সেখান থেকেই এর নাম হয়েছে 'ইনফিতার'।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর করুণা।

০২ মানুষ সৃষ্টি।

০৩ মানুষের কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ করে রাখা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার প্রথমেই আল্লাহ তাআলা শেষ বিচারের আলোচনায় বলেন: "তখন প্রত্যেকে জেনে যাবে—সে (পরকালের জন্য) আগাম কী করেছে, আর কী না-করে পেছনে ফেলে এসেছে"। আর সেই কঠিন বিচারের দিন আল্লাহ ছাড়া আর কারও সাহায্য মিলবে না। সেই বিষয়টিই উঠে এসেছে সূরাটির শেষ আয়াতে: "সেদিন একজন আরেকজনের কোনো কাজে আসবে না; সেদিন কর্তৃত্ব চলবে কেবল আল্লাহর"।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা তাকভীর। সূরা তাকভীর ও সূরা ইনফিতার—উভয় সূরাতেই কিয়ামাত দিনের বিভিন্ন লক্ষণ ও দৃশ্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে।

শানে নুযুল

সূরা তাকভীরের মতো এই সূরাটিও নাযিল হয়েছে—মানুষকে কিয়ামাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানাতে। তবে এখানে শুধু কিয়ামাতের বিবরণ তুলে ধরা হয়নি। বরং খুব দরদ নিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে বুঝিয়েছেন। ডেকে ডেকে বলেছেন—তোমার রব তোমাকে কত সুন্দর আকৃতি দিলেন! তোমার মতো সুন্দর করে আর কোনো মাখলুককে বানানো হয়নি। তারপরও কোন জিনিস তোমায় ধোঁকায় ফেলে রাখল যে, তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে আসছো না? এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। সেই উত্তরটি হলো—'পরকালের প্রতি অবিশ্বাস'। পরকালে অবিশ্বাস করে বলেই মানুষ তাদের রবের কাছে ফিরে আসে না। অবশ্য এভাবে বেশিদিন পার পাওয়া যাবে না। কারণ কিয়ামাত অবশ্যই হবে। আর প্রত্যেকের কাঁধে-থাকা ফেরেশতারা যা লিখছেন, তা অনুযায়ী সেদিন সকলের বিচার হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করে এলে পাবে জান্নাত, আর মন্দ কাজ করলে মিলবে জাহান্নাম।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/২৯৮; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/৫১)

সেগমেন্ট

বিদীর্ণ আকাশ

‘যখন আকাশ ফেটে যাবে, তারকাগুলোর পতন ঘটবে, সাগরগুলো ভীষণভাবে প্লাবিত হবে’—কিয়ামাতের এরকম বর্ণনার মধ্য দিয়ে সূরাটি শুরু হয়।

মানুষকে সম্বোধন

সূরার পরের অংশে আল্লাহ তাআলা মানুষকে ‘ও মানুষ’ বলে ডাক দেন। এরপর তাদেরকে যেসব নিয়ামাত দিয়েছেন, তা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

পরিণতি

সূরার শেষ অংশে দেখানো হয়—আল্লাহর অনুগত ও অবাধ্য লোকদের পরিণতি।

ফজিলত

যে সূরা কিয়ামাতের দৃশ্য দেখায় : ইবনু উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কিয়ামাত-দিনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিকাক পাঠ করে।’

(তিরমিযি, ৩৩৩৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

নিজের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত;

এই কৃতজ্ঞতা-বোধ স্মরণ করিয়ে দেবে—যে আল্লাহ এত সুন্দর অবয়ব দিয়েছেন, তাঁর অবাধ্য হওয়া বিরাট অন্যায়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাত ও পরকালের চিত্র

১. কিয়ামাতের কিছু দৃশ্য

কিয়ামাত শুরু হবার সাথে সাথে আকাশটা ফেটে পড়বে, তারাগুলো ঝরঝর করে খসে পড়বে, সাগরের পানি ভীষণভাবে প্লাবিত হবে, আর কবরগুলো উলটে দেওয়া হবে।

২. ধোঁকা কেটে যাবে

মানুষ পরকালকে মিথ্যা মনে করে ধোঁকায় পড়ে আছে। অথচ কবর থেকে বেরিয়ে যখন চোখের সামনে পরকালের বাস্তবতা দেখতে পাবে, তখন সব ধোঁকা কেটে যাবে।

৩. ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই

দুনিয়াতে দুর্নীতি করে বা অন্য কোনো অপকর্ম করে পার পাওয়া যায়। কিন্তু ফেরেশতারা সব লিখে চলেছেন। তাই সেদিন কোনোভাবেই ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

৪. ভিন্ন ভিন্ন প্রতিদান

সেদিন সকল মানুষ দুটি দলে ভাগ হয়ে যাবে—অনুগত ও অবাধ্য। আর এ-দুটি দলের প্রতিদান হবে আলাদা আলাদা।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাতের সূচনার দৃশ্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।	১-৫	মানুষ বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। এর কারণ হলো—তারা পরকালের প্রতিদানকে মিথ্যা মনে করে।	৯-১৬
মানব-জাতিকে সতর্ক করা হয়েছে—তারা যেন কেবল দুনিয়াবি বিষয় নিয়েই মগ্ন না থাকে।	৬-৮	শেষ বিচারের দিনটি হবে ভীষণ ভয়ানক। সেদিন কেউ কারও কাজে আসবে না।	১৭-১৯

কেইস-স্টাডি

এই সূরার সর্বশেষ আয়াতে এসেছে—"সেদিন কর্তৃত্ব চলবে কেবল আল্লাহর।" অর্থাৎ দুনিয়ার যত কর্তৃত্ববাদী আছে, কিয়ামাতের দিন তাদের কোনো খবরদারি থাকবে না। আপনি হয়তো বড়সড় কোনো নেতার ছত্রছায়ায় আছেন। সবকিছুতে সে আপনাকে 'প্রোটেকশন' দিয়ে যাচ্ছে। বিনিময়ে সে বসতে বললে, বসছেন। চলতে বললে, চলছেন। মানুষের ওপর জুলুম করতে দ্বিতীয়বার ভাবছেন না। কারণ আপনি জানেন, দেশের আইন আপনার কিছুই করতে পারবে না। আপনার ওপর নেতার ছায়া আছে! এভাবে আপনি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করেই যাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন মৃত্যু এসে আপনার কাছে হাজির হবে। এরপর কিয়ামাতের দিন ছুটতে হবে হাশরের মাঠের দিকে। এবার বলুন, আপনার নেতা তখন আপনাকে বাঁচাতে আসবে? না, আসবে না। সেখানে কর্তৃত্ব চলবে শুধু আল্লাহর। সুতরাং এখনই জীবন নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন—কী করার কথা, আর কী করছি!

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/১৮৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"ও মানুষ, তোমার মহান রবের ব্যাপারে তোমাকে কীসে ধোঁকায় ফেলল?" ৬ নং আয়াতে এ-কথা বলার পর, আল্লাহ তাআলা যেসব নিয়ামাত দিয়ে মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তার কয়েকটা উল্লেখ করেছেন। এই স্টাইলে কথা বলাটা ভয়াবহ শাস্তির ইঙ্গিত দেয়। অতশত নিয়ামাত পেয়েও যেসব মানুষ মহান রবের ব্যাপারে উদাসীন, দিন-যাপন করে মনের খায়েশমতো! এদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করে, তারা ধোঁকায় পড়ে না। তারা উপলব্ধি করে তাদের করণীয় কী। ফলে আগেই সতর্ক হয়ে যায়।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/৩০২)

এ-সূরার ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে—"নিশ্চিত, আল্লাহর অনুগত লোকজন থাকবে রকমারি অনুগ্রহের ভেতর, আর খারাপ লোকেরা থাকবে দাউদাউ করা আগুনের ভেতর।" আপনি ভাববেন না যে, এটা কেবল আখিরাতে ঘটবে। বরং জীবনের যতগুলো ঘাঁটি আছে—দুনিয়া-কবর-আখিরাত—সবখানেই এর বাস্তবায়ন হবে। নেককার মানুষগুলোর অন্তরে থাকবে প্রশান্তি। আর অন্তরের প্রশান্তিই সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ! অন্যদিকে পাপীদের অন্তরে থাকবে ভয়, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি আর সংকীর্ণতা। এগুলোও কঠিন শাস্তির চেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়!

(দেখুন—ইবনুল কাইয়িম, আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়া, ১৮৫)

সূরা মুতাফফিফীন

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮৬-তম সূরা। এর আগে সূরা আনকাবুত ও পরে সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ইনফিতার ও পরে সূরা ইনশিকাক।

এক নজরে মুতাফফিফীন

- মাক্কি যুগের শেষ-দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৮৩
- আয়াত: ৩৬
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘মুতাফফিফীন’ শব্দটি ‘মুতাফফিফ’-এর বহুবচন, যার অর্থ ‘যে অন্যকে ঠকায়’। অন্যকে ঠকানো ভীষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। সূরার প্রথম আয়াতেই এ-শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

মেজর থিম

০১ মানুষের সাথে প্রতারণার বর্ণনা।

০২ কুরআনের আয়াত নিয়ে কাফিরদের হাসি-ঠাট্টা।

০৩ মুমিনদের জন্য জান্নাতি আপ্যায়ন।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু করা হয়েছে, যারা ঠকায় তাদের ধ্বংস কামনা করার মাধ্যমে। এই ধরনের মানুষ আসলে পরকালে বিশ্বাস রাখে না এবং মুমিনদেরকে নিয়ে সব সময় হাসি-ঠাট্টা করে। আর সূরাটির শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমন অকৃতজ্ঞ-প্রতারকদের পরকাল কেমন হবে, সে-ব্যাপারে ইঙ্গিত দিলেন—"যারা আল্লাহর পয়গাম প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের কর্মকাণ্ডের যথাযথ পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তো?"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ইনফিতার; যার শেষে বলা হয়েছে, "সেদিন একজন আরেকজনের কোনো কাজে আসবে না। সেদিন কর্তৃত্ব চলবে কেবল আল্লাহর।" এটি অবাধ্যদের জন্য বিরাট সতর্কবার্তা। সূরা মুতাফফিফীনের শুরুতেও এরূপ সতর্কবার্তা এসেছে, "ধ্বংস তাদের—"যারা (মানুষ) ঠকায়।"

শানে নুযুল

কুরআন সত্যিকার অর্থে এক মিরাকল। প্রতিটি বিষয়ের একটি সঠিক কারণ আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করে। আগেকার ব্যবসায়ীদের মাঝেও একটা মন্দ দিক ছিল। তারা অন্যের থেকে যখন কিছু নিত, তখন ঠিকঠাক মেপে নিত। কিন্তু কাউকে কোনো পণ্য দেওয়ার বেলায় করত ঠিক তার উলটোটা। কাস্টমারকে তখন ওজনে হোক কিংবা কোয়ালিটিতে হোক—কোনো-না-কোনোভাবে ঠকানোর চেষ্টা করতই। আর এর পেছনে কুরআন একটি কারণ দেখিয়েছে। যেসব মানুষ আখিরাতের ব্যাপারে অমনোযোগী, কেবল তারাই এই জঘন্য কাজ করতে পারে। কোনো মানুষ যদি আখিরাতে বিশ্বাস করে, তা হলে তার মাথায় এটা থাকবে যে—আল্লাহর সামনে আমাকে এই সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে। তখন তার পক্ষে আর লোক-ঠকানো সম্ভব হবে না। 'সততাই ব্যবসার মূলধন'—এমন স্লোগান দিয়ে কেউ হয়তো সাময়িক সময়ের জন্য সৎ থাকতে পারে। কিন্তু লোক-ঠকানোর মাঝে যে তাৎক্ষণিক বিরাট লাভ দেখা যায়, সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে সৎ থাকা অসম্ভব ব্যাপার। তাই সৎ থাকতে হলে, সততাকে স্রেফ স্লোগানে পরিণত না-করে, 'আল্লাহর-দেওয়া নির্দেশনা' মনে করতে হবে। এ-বিষয়টির রিমাইন্ডার দেওয়ার পাশাপাশি আখিরাতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী—উভয় শ্রেণির পরিণতি বিস্তারিত জানিয়ে দিতেই এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে।

(দেখুন—ওয়াহিদি, আসবাবুন নুযুল, ৪৭৫; বাগাবি, তাফসীর, ৮/৩৫৮)

সেগমেন্ট

হুঁশিয়ারি

যারা লোক ঠকায় বা প্রতারণা করে, সূরার শুরুতেই তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

ইল্লিয়্যুন, সিজ্জীন

যারা অপরাধী, তাদের আমলনামা রাখা আছে ভীষণ সংকীর্ণ জায়গা সিজ্জীনে। আর যারা আল্লাহর অনুগত, তাদের আমলনামা রাখা আছে সুউচ্চ মর্যাদার জায়গা ইল্লিয়্যূনে।

এ-কাল ও পরকালের দুটি দৃশ্য

দুনিয়াতে মুমিনদেরকে দেখে কাফিররা হাসাহাসি করে। পরকালে এই দৃশ্য পুরোপুরি উলটে যাবে। সেদিন মুমিনরা কাফিরদের পরিণতি দেখে হাসবে।

ফজিলত

নবি ﷺ মাঝে মাঝে একই রকমের দুটি সূরা এক রাকআতে তিলাওয়াত করতেন। এরকম এক জোড়া সূরা হলো—সূরা আবাসা ও সূরা মুতাফফিফীন; যা তিনি এক রাকআতেই তিলাওয়াত করতেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৬, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

ঈমান-আমলের দিক দিয়ে এগিয়ে আছে, এমন কাউকে অনুসরণ করুন ও তার সাথে প্রতিযোগিতায় নামুন;

কেননা, ভালো কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আমাদের মধ্যে দারুণ গতি আনবে, ইবাদাত করার ক্ষেত্রে অধিক শক্তি জোগাবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

লোক ঠকানোর কারণ ও পরিণাম

১. ব্যবসায় প্রতারণার সমালোচনা

ব্যবসা-বাণিজ্যে লোক ঠকানো ভীষণ অন্যায় কাজ। মাপে বা ওজনে কম দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্য থেকে পারস্পরিক বিশ্বাস উঠে যায়।

২. ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড

অন্যকে দেওয়ার বেলায় ঠকালেও, নিজের বেলায় ষোলো-আনা বুঝে নেওয়া—আখিরাতের ব্যাপারে অবিশ্বাসী হওয়ার আলামত।

৩. অন্তরে তালা

খারাপ কাজ লাগাতার করে যেতে থাকলে, মানুষের অন্তরে তালা পড়ে যায়। তখন আর মানুষ ভালো-মন্দের মধ্যে তফাত করতে পারে না।

৪. কাফিরদের হাসি-ঠাট্টা

মুমিনদেরকে নিয়ে কাফিররা হাসি-ঠাট্টা করে। চোখ টিপে টিপে ইশারায় বলে—'এরা কোনো কথা খুঁজে পায় না। খালি কয় আল্লাহর কথা মানো, তাঁর সামনে মাথা নোয়াও। এদের দৌড় ওই মসজিদ পর্যন্তই।' কাফিরদের এই হাসি-ঠাট্টার পরিণাম বেশ ভয়াবহ।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
যারা ওজনে কম দিয়ে লোক ঠকায়, তাদের পরিণতি—ধ্বংস।	১-৬	সৎ লোকদেরকে দেওয়া হয়েছে বিরাট পুরস্কারের খোশ-খবর।	১৮-২৮
পাপীদেরকে দেওয়া হয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুঁশিয়ারি।	৭-১৭	কিয়ামাতের দিন মুমিনদেরকে করা হবে সম্মানিত, আর অপরাধীরা ভোগ করবে ভীষণ যন্ত্রণা।	২৯-৩৬

কেইস-স্টাডি

একটি সমাজ টিকে থাকার অন্যতম উপকরণ হলো—অর্থনৈতিক ভারসাম্য। কিন্তু পরস্পরে ওজনে কম দেওয়া শুরু হলে, অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। দেশ ও রাষ্ট্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কারণ, সততাই অর্থনীতি টিকে থাকার মাধ্যম। যারা মানুষের কাছ থেকে নিজেদের পাওনা আদায় করার সময় পুরোপুরি বুঝে নেয়, অথচ অন্যের পাওনা দিতে গেলে কম দেয়—তাদের ব্যাপারে আল্লাহ এ-সূরার শুরুতেই "وَيْلٌ" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ 'ধ্বংস'। এবার আমরা একটু চিন্তা করি—আমাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসার আর কতটা সময় বাকি। শুধু যে মাছওয়ালা-তরকারিওয়ালা কিংবা দর্জিরাই কারচুপি করে, তা নয়; বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানেও পণ্যের মান, শ্রমিকের মজুরি—ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষ ঠকানোর পলিসি গ্রহণ করা হয়। তাই সময় থাকতেই নিজেদের শুধরে নেওয়া উচিত।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ১৯/২৫০)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আপনার বসত-বাড়ি বা মহল্লার আশেপাশে একটু চোখ বুলিয়ে নিন। নিশ্চয় এমন কিছু মানুষকে দেখতে পাবেন—যারা সারাক্ষণ গুনাহে ডুবে থাকে। অন্যের হক নষ্ট করা, দুর্বলকে আঘাত করা, গালাগালি করা, প্রকাশ্যে মাদক গ্রহণ থেকে শুরু করে এমন কোনো অপকর্ম নেই, যা তারা করে না। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে, সবাইকে জানিয়ে-শুনিয়ে, এরা অপরাধ করে যায় দিনের-পর-দিন। এদের লাগাতার খারাপ কাজে লিপ্ত থাকার কারণ ওঠে এসেছে এ-সূরার ১৪ নং আয়াতে, "...বরং এদের এতদিনকার কর্মকাণ্ড এদের হৃদয়কে পরাজিত করে ফেলেছে।" এবার একটি হাদীস শুনি—আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা কোনো গুনাহ করলে তার হৃদয়ে একটা কালো দাগ পড়ে, এরপর সে (তা থেকে) সরে এসে ক্ষমা-প্রার্থনা ও অনুশোচনা করলে তার হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়, আর ওই কাজের পুনরাবৃত্তি করলে অন্তরে কালো দাগের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে একপর্যায়ে সেগুলো পুরো হৃদয়কে ঢেকে ফেলে। এই ঢেকে ফেলার কথাই এ-আয়াতে বলা হয়েছে। এবার তাহলে বুঝতে পারছেন—কেন ওই লোকগুলোর মনে কোনো অনুতাপ জাগে না। তাদের হৃদয় কালশিটে হয়ে যাওয়ার কারণে, আসলে সেখানে ভালো-মন্দের অনুভূতি থাকে না। সুতরাং, এই আয়াতটি নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা জরুরি। কোনো গুনাহ হয়ে গেলে—গোঁ ধরে বসে না-থেকে লজ্জিত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে, তাওবা করতে হবে। অন্তরে সর্বদা গুনাহের শাস্তি ও পরিণতি জাগরূক রাখতে হবে।

(দেখুন—তিরমিযি, ৩৩৩৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৬; মুনযিরি, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩/২৮৮)

সূরা ইনশিকাক

سُوْرَةُ الْإِنْشِقَاقِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮৩-তম সূরা। এর আগে সূরা ইনফিতার ও পরে সূরা রূম নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮৪ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মুতাফফিফীন ও পরে সূরা বুরূজ।

এক নজরে ইনশিকাক

- মাক্কি যুগের শেষ-দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৮৪
- আয়াত: ২৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘ইনশিকাক’ শব্দের অর্থ ‘ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া’। সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত اِنْشَقَّتْ-এর শব্দমূল থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘ইনশিকাক’।

মেজর থিম

০১ কিয়ামাতের বর্ণনা।

০২ মানুষের ক্ষেত্রে কষ্টের পথ পাড়ি দেওয়ার অনিবার্যতা।

০৩ পরকাল ও কুরআনের ব্যাপারে কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

"যখন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে"—আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এমন আয়াত দিয়ে সূরাটির শুরু হয়। এর দ্বারা কিয়ামাতের সূচনা-সময়ের ব্যাপারে আল্লাহ ধারণা দিলেন। কিন্তু না-দেখা জিনিসে কাফিররা বিশ্বাস আনবে না। আবার ওরা যা দেখেছে, সত্য বলে বুঝেছে—সেই কুরআনের ওপর ঈমান আনতেও ওরা নারাজ। তাই সূরার শেষদিকে আল্লাহ বললেন, "না, বরং কাফিররা (কুরআনকেও) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মুতাফফিফীন। যেখানে অবাধ্য ও অনুগত বান্দাদের পরিণতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই সূরার শুরুতেই আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আসা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে—আকাশ যেমন বিভক্ত হয়ে যাবে, তেমনি পাপী ও নেককাররাও সেদিন বিভক্ত হবে।

শানে নুযুল

সূরা তাকভীর ও সূরা ইনফিতারের মতো সূরা ইনশিকাকও একই বিষয় নিয়ে নাযিল হয়েছে। আর সেই আলোচনার বিষয় হলো কিয়ামাত ও আখিরাত। তবে এখানে শুধু কিয়ামাতের অবস্থা তুলে ধরা হয়নি। বরং কিয়ামাত যে অবশ্যই হবে, তার প্রমাণও দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আসমান-জমিন সবকিছু বানিয়েছেন। আবার তাঁর হুকুমেই সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা কী হবে, তা তুলে ধরা হয়েছে। ওইদিন সকল মানুষ দুটি দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল অনুগত। আরেক দল অবাধ্য। অনুগত লোকজন সেদিন ডান হাতে আমলনামা পেয়ে ভীষণ আনন্দিত হবে। আর অবাধ্যদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। তখন তারা চাইবে—কোনোভাবে যদি আবার মরে যাওয়া যেত! কিন্তু তারা সেখানে মরবে না। বরং তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হবে জাহান্নামে।

মোটকথা, এই সূরাটি নাযিল করে কিয়ামাতের সত্যতা যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি অবাধ্যদের পরিণতি জানিয়ে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে। আর যারা আল্লাহর অনুগত হয়ে জীবন পার করবে, তাদেরকে দেওয়া হয়েছে অফুরন্ত সুখের সুসংবাদ।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/৩৩৫)

সেগমেন্ট

প্রতিটি বস্তু-ই আল্লাহর বাধ্যগত

সূরার শুরুতেই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন—যখন আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, আর সেটি তার রবের আদেশ মানবে ও মানতে বাধ্য থাকবে।

রবের দিকে ছুটে চলা

দুনিয়াতে মানুষ ভালো বা খারাপ—যে আমল-ই করুক না কেন, সকলেই তার রবের দিকে ছুটে চলেছে। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

শাস্তি থেকে বাঁচার উপায়

যারা আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মানবে আর ভালো কাজ করবে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই দিয়ে, দান করবেন অফুরন্ত পুরস্কার।

ফজিলত

যে সূরা কিয়ামাতের দৃশ্য দেখায় : ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কিয়ামাত-দিনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিকাক পাঠ করে।'

(তিরমিযি, ৩৩৩৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সারাদিনের ভালো কাজগুলো ডান হাত দিয়ে শুরু করার চেষ্টা করুন;

কেননা, এটি সুন্নাহ পালনের পাশাপাশি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে—কিয়ামাতের দিন আমি ডান হাতে আমলনামা নিতে চাই।

গতিপথ

১. মহাবিশ্বের বিপর্যয়
কিয়ামাত যখন শুরু হবে, তখন পুরো মহাবিশ্বে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসবে। প্রাকৃতিক যত নিয়ম-শৃঙ্খলা আজ অবধি ঠিকঠাক চলছে, তার পুরো কাঠামো সেদিন ভেঙে পড়বে।

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাতের নিশ্চয়তা

২. জবাবদিহিতার সময় এগিয়ে আসছে!
একটু একটু করে আমরা আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পাপী হই আর নেককার—এই রাস্তা থেকে কেউ সরতে পারব না।

৩. মুক্তির আনন্দ ও বন্দির অনুতাপ
যে ব্যক্তি ডান হাতে আমলনামা পাবে, সে তার পরিবারের লোকদের কাছে ছুটে যাবে। আর তার মুক্তির বার্তা তাদেরকে দেখাতে থাকবে। অন্যদিকে আমলনামা যাকে বাম হাতে দেওয়া হবে, অনুতাপ ও বিষণ্ণতায় সে কুঁকড়ে যাবে।

৪. মৃত্যুই শেষ কথা নয়
অবাধ্যরা ভাবে—মৃত্যুই বুঝি সবশেষ কথা। এরপর আর কোনো জীবন নেই। কিন্তু মৃত্যুই শেষ নয়। এরপর এক অনন্তকালের পথচলা শুরু হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাত শুরু হলে—পৃথিবী তার মধ্যকার সবকিছু বাইরে ছুড়ে ফেলে, খালি হয়ে যাবে।	১-৫	মানুষকে অবশ্যই তার রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন।	১৩-১৫
মানুষের প্রতিটি কাজের প্রতিদান পরকালে দেওয়া হবে। সেদিন কেউ হবে ভীষণ আনন্দিত। কেউ হবে অনুতপ্ত।	৬-১২	দুনিয়ার জীবনে মানব-জাতির অবস্থা কেমন, তা তুলে ধরা হয়েছে।	১৬-২৫

কেইস-স্টাডি

এ-সূরার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "ও মানুষ, তুমি কাজ করতে করতে তোমার রবের দিকে ছুটে চলছো, সেখানে গিয়ে সেসব কাজের দেখা পাবে!" এই কথাগুলো বলার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আসলে আমাদেরকে নেককাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কারণ যে ব্যক্তি এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তার কাজগুলো মনিবের সামনে পেশ করা হবে—তখন সে নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়েই কাজ করে। যাতে মনিব তার প্রতি বেশি সন্তুষ্ট হন, তাকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ—সকল মনিবের মনিব। তাঁর কাজ করার বেলাতে মানুষের তো সর্বোচ্চ মন লাগানো উচিত। সুতরাং, এখন নিজের কাজের দিকে দৃষ্টি দিন। দেখুন, সেগুলো আল্লাহর প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত নাকি নিন্দার? নিন্দার উপযুক্ত হলে তো অবশ্যই তা সংশোধন করে নেওয়া জরুরি।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/২৮৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন: মুমিন আখিরাতে আনন্দিত হবে; কারণ দুনিয়াতে সে কষ্টে ছিল। আর কাফির আখিরাতে কষ্টে থাকবে; কারণ দুনিয়াতে সে ছিল আনন্দিত। এখন গভীরভাবে তাদাব্বুর বা পর্যবেক্ষণের বিষয় হলো, আপনি কোনটা চান—দুনিয়ার এই ক'টা দিন কষ্ট করে ঈমান-আমলের পুঁজি নিয়ে পরকালের অফুরান আরাম-আয়েশ? নাকি আখিরাতের অনন্তকালীন শাস্তি? অথচ দুনিয়ায় একটু সুখে থাকতে মানুষ কাজের জন্য বিদেশে পাড়ি জমায়। কষ্ট সহ্য করে বেলা পার করে। খেয়ে না-খেয়ে দুটো পয়সা জমায়। এত কষ্টের পরও সে নিজেকে মানিয়ে নেয়। নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়—'এই তো, আর ক'টা দিন! এরপর এই কষ্ট আর থাকবে না। এই টাকাগুলো দিয়ে দেশে বাড়ি বানাব। একটা ব্যবসা নিয়ে বসে পড়ব। শেষ বয়সে তাহলে আর কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না।' তো, দুনিয়ার কিছু সময়ের জন্য যদি আমরা এত খাটুনি খাটতে পারি, পুরো যৌবনটাকে বিলিয়ে দিতে পারি; তা হলে অনন্তকালের এক জীবনের জন্য কত খাটুনি দরকার! আসলে ঈমান-আমল না থাকলে, পরকালীন সুখ এমনি এমনি লাভ করা যাবে না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। এই সূরার ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তোমাদেরকে অবশ্যই বহু কষ্টের স্তর বেয়ে উঠতে হবে।"

(দেখুন—ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ, ৬৪০; তিরমিযি, ১৬৩৯)

সূরা বুরূজ

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২৭-তম সূরা। এর আগে সূরা শামস ও পরে সূরা তীন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ইনশিকাক ও পরে সূরা তারিক।

এক নজরে বুরূজ

- মাক্কি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ৮৫
- আয়াত: ২২
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘বুরূজ’ শব্দটি ‘বুরজ’-এর বহুবচন, যার অর্থ ‘খুঁটি; প্রাসাদ; ঘর; বড় বড় নক্ষত্র’। আকাশকে আল্লাহ সাজিয়েছেন নিজের মতো করে, বিশাল বিশাল বড় বড় নক্ষত্রের প্রদীপ দিয়ে। তাই তো আকাশ দেখতে আমাদের এত ভালো লাগে। সূরার প্রথম আয়াতে ‘বুরূজ’ শব্দটি এসেছে। সেখান থেকেই সূরাটির এই নাম হয়েছে।

মেজর থিম

০১ সুসজ্জিত আকাশ, রাসূল ﷺ ও কিয়ামাত দিবসের শপথ।

০২ ‘আসহাবে উখদুদ’-এর কাহিনি।

০৩ অতীত থেকে শিক্ষা নেবার প্রতি গুরুত্বারোপ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নক্ষত্রপুঞ্জ-বিশিষ্ট আসমানের কসম করা হয়েছে। আর এটি আল্লাহর অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। সূরাটির শেষ অংশে কুরআনকে চির-সুরক্ষিত কিতাব হিসেবে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন: "এটি (মানুষের বানানো নয়,) বরং মহিমান্বিত কুরআন, যা সুরক্ষিত ফলকে (সংরক্ষিত) আছে।" আর এটিও আল্লাহ তাআলার অনন্য ক্ষমতার নিদর্শন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ইনশিকাক; যার শেষ অংশে কাফিরের পরিণতি ও মুমিনদের পুরস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর মুমিনদের ওপর কাফিরদের অত্যাচারের একটি উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি শুরু করেছেন।

শানে নুযুল

১. এই সূরার শুরুর দিকে আল্লাহ তাআলা 'আসহাবে উখদুদ' বা 'গর্তওয়ালা'দের কথা উল্লেখ করেন। ওরা সবাই ছিল এক কাফির সম্রাটের অনুচর। ওই সময়ে যারাই আল্লাহর ওপর ঈমান আনত, তাদেরকেই ওরা অমানুষিক শাস্তি দিত। আগুনের গর্তে ফেলে পুড়িয়ে মারত। এজন্য রাস্তাঘাট আর মাঠের বিভিন্ন জায়গায় ওরা বিরাট বিরাট গর্ত বানিয়েছিল। আগুন-ভরতি সেসব গর্তই হতো মুমিন বান্দাদের ঠিকানা। আল্লাহ তাআলা কয়েকটি বিষয়ের ওপর কসম করে, ওদের নিশ্চিত ধ্বংসের ঘোষণা দিয়ে এই সূরাটি নাযিল করেছেন।

২. তাওহীদের বাণী নিয়ে রাসূল ﷺ-এর আগমন হলো। আর সাথে সাথে পালটে গেল মক্কার পরিস্থিতি। যারাই রাসূলের ওপর ঈমান আনার ঘোষণা দিচ্ছে, তাদেরকেই নানা ধরনের শাস্তি দিচ্ছে কাফিররা। তপ্ত মরুভূমিতে শুইয়ে বুকের ওপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখত। জ্বলন্ত কয়লার ওপর ফেলে টানা-হেঁচড়া করত। অত্যাচারের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল মুশরিকরা। আগের যুগে মুমিনদের ওপর অত্যাচার করে 'গর্তওয়ালারা' যেমন নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল, তেমনি আজকের মুশরিকদের জন্যও ওই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। তাদের কোনো দলবাজি কাজে আসবে না। যেমনটা কাজে আসেনি ফিরআউন বা সামুদ জাতির বেলায়। অপরদিকে যারা জুলুম সহ্য করেও ঈমানের ওপর অটল থাকবে, তাদের জন্য আছে মহা-পুরস্কার।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/২৭১)

সেগমেন্ট

'আসহাবে উখদুদ' ও মুমিনদের পরিণতি

অত্যাচারী বাহিনী 'আসহাবে উখদুদ' মুমিনদের ওপর চরম অত্যাচার চালায়। ওদের জন্য আছে আগুনে পোড়ার শাস্তি। মুমিনদের জন্য আছে জান্নাত।

ভীষণ কঠোর ও পরম ক্ষমাশীল

অন্যায়কারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ ভীষণ কঠোর। আবার তিনিই নেককার লোকদের জন্য পরম ক্ষমাশীল।

ফিরআউন ও সামুদ জাতি থেকে শিক্ষা

মানুষের সামনে ফিরআউন ও সামুদ জাতির ইতিহাস আছে। তারা চাইলেই এদের থেকে শিক্ষা নিতে পারে। কিন্তু অবাধ্যরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না।

ফজিলত

জাবির ইবনু সামুরা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ যুহর ও আসরের নামাজে সূরা তারিক, সূরা বুরূজ ও এ-ধরনের সূরা পড়তেন।

(আবু দাউদ, ৮০৫; তিরমিযি, ৩০৭, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কাফিরদের মাধ্যমে বিপদের মুখে পড়লে—ধৈর্য ধরতে হবে;

কারণ, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় অটল থাকলে নিশ্চিত মিলবে মহা-পুরস্কার।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
ঈমানের বিজয় ও প্রতিদান

১. মহিমান্বিত শপথ
আল্লাহ তাআলা নক্ষত্রপুঞ্জ-বিশিষ্ট বিশাল আকাশ ও কিয়ামাত দিনের শপথ দিয়ে সূরাটির সূচনা করেছেন। এই শপথ মানুষের সামনে মহাবিশ্বের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

২. জুলুমের মুখে অবিচলতা
শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অপরাধে বহু মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে 'গর্তওয়ালারা'। সেসব মজলুম মুমিনরা তবুও আল্লাহর পথে অবিচল ছিলেন।

৩. আল্লাহর ক্ষমতা
আল্লাহ তাআলার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। যারা জুলুম-নির্যাতন করেছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার সকল অধিকার ও সক্ষমতা তাঁর আছে, সেটি মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. ঐতিহাসিক প্যাটার্ন
ফিরআউন ও সামুদ জাতিও এই সীমালঙ্ঘনে মেতে ছিল। সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আজও যারা সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়িতে ব্যস্ত, তারাও ধ্বংসের দিকেই এগোচ্ছে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
'আসহাবুল উখদুদ' বা গর্তওয়ালাদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।	১-৯	ফিরআউন ও সামুদ জাতি নবিদের বিরুদ্ধে নিজেদের বাহিনী প্রস্তুত করেছিল।	১৭-১৮
মুমিনদের ওপর নির্যাতনকারীদের জন্য আছে ভীষণ শাস্তি। আর ঈমান এনে ভালো কাজ করার প্রতিদান হলো জান্নাত।	১০-১১	তবে সেই বাহিনী তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। আজকের দিনের অবাধ্যদের জন্য এতে রয়েছে বিরাট শিক্ষা।	১৯-২০
কাফিরদেরকে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।	১২-১৬	মহিমান্বিত কুরআন মানুষের বানানো নয়, বরং একমাত্র আল্লাহর বার্তা। তিনিই এর সংরক্ষণকারী।	২১-২২

কেইস-স্টাডি

আসহাবে-উখদুদ মুমিনদেরকে কেন অপছন্দ করত, তার কারণ জানাচ্ছে এই সূরার ৮ নং আয়াত—"ওরা তাদের অপছন্দ করেছে কেবল এ-কারণে যে, তারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিল—যিনি অপরাজেয় শক্তির অধিকারী, মহাপ্রশংসিত।" পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যত মুসলিম আজ মার খাচ্ছে, দিনের-পর-দিন নির্যাতিত হচ্ছে, এর পেছনেও কিন্তু ওই একই কারণ। অর্থাৎ মুমিনরা জাহিলি সমাজ-সভ্যতার সাথে আপস করে না। একমাত্র রব আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কারও কাছে মাথা নত করে না। এই বিষয়গুলো শাসক-শ্রেণির কাছে ভালো লাগে না। তাই সারা বিশ্বে মুসলিম-নির্যাতনের বৈধতা দেয় তারা। তবে যত বিপত্তিই দেখা দিক না-কেন, মুসলিমদের উচিত—আল্লাহর পথে অবিচল থাকা। নির্যাতন থেকে বাঁচার কোনো উপায় না থাকলে, হিজরত করা। সেটারও সুযোগ না থাকলে, ধৈর্য ধরা। আল্লাহই উত্তম পরিকল্পনাকারী।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৩৮৭)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে একদল কাফিরের কথা, যারা মুমিনদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। এরপর হত্যাকারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ওপর অত্যাচার করেছে, তারপর অনুশোচনা করে সঠিক পথে ফিরে আসেনি—তাদের জন্য আছে জাহান্নামের (রকমারি) শাস্তি, (মুমিনদেরকে পোড়ানোর দরুন) আছে আগুনে পোড়ার শাস্তিও।" দেখুন আল্লাহ তাআলার কত দয়া! মুমিনদেরকে যারা পুড়িয়ে মেরেছে, যদি তারাও তাওবা করত, আল্লাহ তাদেরকেও মাফ করে দিতেন। আসলে আল্লাহর দয়ার আলোচনা করে কোনোদিন শেষ করা যাবে না। বান্দারা তাঁর দিকে দুহাত মেলে ধরবে, এরপর অঝোরে চোখের পানি ফেলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে—আর তিনি মাফ করবেন না, এ-তো হতেই পারে না। তাই, আমরা এখনো যারা কোনো-না-কোনো পাপে ডুবে আছি, শিগগির তাঁর দিকে ফিরে আসি। তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা চাই। তিনি কখনোই আমাদের নিরাশ করবেন না। কারণ, তিনি পরম করুণাময়, অশেষ দয়ালু।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৫৩৪)

"এটি বরং মহিমান্বিত কুরআন, যা সুরক্ষিত ফলকে রয়েছে।" এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়—আল্লাহ তাআলার কাছে কুরআনের মহত্ত্ব অনেক বেশি। কারণ কুরআন যেখানে রাখা হয়—লাওহে মাহফুজ—তা যেনতেন কোনো জায়গা নয়; সেটি সবধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন থেকে সংরক্ষিত। শয়তান এর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সেখানে সবকিছু লিখে রেখেছেন। সুতরাং, কড়া নিরাপত্তায় যা রাখা হয়, তা তো সর্বোচ্চ দামি হবেই।

(দেখুন—সা'দি, তাফসীর, ৯১৮)

সূরা তারিক

سُوْرَةُ الطَّارِقِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩৬-তম সূরা। এর আগে সূরা বালাদ ও পরে সূরা কমার নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা বুরূজ ও পরে সূরা আ'লা।

এক নজরে তারিক

- নুবুওয়াতের ৪র্থ বছর নাযিল
- আয়াত: ১৭
- সূরা নং: ৮৬
- মাক্কি

নামের রহস্য

'তারিক' মানে 'যা রাতের বেলা দৃশ্যমান হয়'—অর্থাৎ নক্ষত্র। সূরার প্রথম আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে সূরার নাম হয়েছে 'তারিক'।

মেজর থিম

০১ প্রতিটি মানুষের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তি।

০২ মানুষের সৃষ্টি-রহস্য।

০৩ আল্লাহর পরিকল্পনা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরা তারিক শুরু করা হয়েছে রাতে-দৃশ্যমান বস্তু অর্থাৎ উজ্জ্বল তারকারাজির কথা বর্ণনা করে, যা দিগন্তের মাঝে সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়। আর শেষ করা হয়েছে কাফিরদেরকে শাসানো ও তিরস্কার করার মাধ্যমে। আল্লাহর এই তিরস্কারও রাতের আকাশে তারকারাজির অস্তিত্বের মতোই সুস্পষ্ট।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা বুরূজ; যা শেষ করা হয়েছে লাওহে মাহফুজের আলোচনায়। আর সূরা তারিকের শুরুতে আসমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আসমান সংরক্ষিত থাকার সাথে লাওহে মাহফুজ সংরক্ষিত থাকার সম্পর্ক। আর এ-দুটিই আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার নিদর্শন।

শানে নুযুল

আখিরাতের ওপর কাফিরদের ক্রমাগত অবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে এ-সূরাটি নাযিল করা হয়। আল্লাহ এক্ষেত্রে মানুষকে তার নিজ অস্তিত্ব নিয়ে ভাবার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষকে এক ফোঁটা অতি তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে—এ কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। প্রথমবারই যিনি এভাবে বানাতে পারেন, তিনি কেন পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না? আর সে-সময় তিনি প্রত্যেকের ভালো-মন্দ সব কাজের হিসাবও নেবেন। হিসাব-নিকাশ শেষে প্রত্যেককে তার কাজের বদলা দেওয়া হবে। যদি বদলা দেওয়া না-ই হয়, তা হলে তো দুনিয়ার সবকিছুই অনর্থক হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ কোনো কাজই অনর্থক করেন না। তাই কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতনে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে ধৈর্য ধরার আদেশ দিয়েছেন। আর ওদেরকে কিছু দিনের জন্য দুনিয়া উপভোগের সুযোগ দিয়েছেন। ক'দিন বাদে ওদেরকে তো আল্লাহর কাছেই ফিরতে হবে। সেদিন তিনি ওদেরকে সব শাস্তির মজা একসাথে বোঝাবেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাজমুদ দুরার, ২১/৩৭০)

সেগমেন্ট

আল্লাহর দয়া

মানুষের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের শেষ নেই। মানুষ অগণিত অনুগ্রহে ডুবে আছে।

মানুষের নাজুকতা

কিয়ামাতের দিন মানুষের অবস্থা ভীষণ নাজুক হবে। বিশেষত যারা আল্লাহর অবাধ্য, তাদের কোনো শক্তি থাকবে না, সাহায্যকারীও পাবে না তারা।

কুরআন

কুরআনকে আল্লাহ নাযিল করেছেন ভুল-সঠিক আলাদা করার মানদণ্ড হিসেবে।

ফজিলত

জাবির ইবনু সামুরা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ যুহর ও আসরের নামাজে সূরা তারিক, সূরা বুরূজ ও এ-ধরনের সূরা পড়তেন।

(আবু দাউদ, ৮০৫; তিরমিযি, ৩০৭, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কোনো গোপন গুনাহ থাকলে, দেরি না করে এই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিন;

কারণ, গোপন গুনাহের ব্যাপারে তাওবা করলে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা ও বিচারের মুখোমুখি করা

১. উজ্জ্বল তারকা

আকাশের তারকারাজির অধিকাংশই আমাদের কাছে অজানা-রহস্য। অজানা বা রহস্য হলেও এগুলো যেমন মিথ্যে নয়, ঠিক তেমনি শেষ বিচারের দিনক্ষণ অজানা বলে তা-ও কিছুতেই মিথ্যে নয়।

২. পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতা

শত-সহস্র বছর ধরেও মানুষ তারকাপুঞ্জের কুল-কিনারা করতে পারছে না। আবার মানুষকে কি নিখুঁত গড়নেই-না সৃষ্টি করলেন আল্লাহ! এমন স্রষ্টার জন্য মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা জটিল কিছু নয়।

৩. সার্বক্ষণিক নজরদারি

মানুষ ২৪ ঘণ্টাই আল্লাহর মনিটরিংয়ের মধ্যে থাকে। এ নজরদারির জন্য বিদ্যুৎ থাকার প্রয়োজন হয় না।

৪. বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতা

অপরাধীদেরকে যেকোনো সময় বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষমতা আল্লাহর আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে, তিনি মানুষের ওপর দয়া করছেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আকাশ ও তারকারাজির শপথ। মানুষের প্রতিটি কাজ লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন।	১-৪	কুরআন সত্য—এ-ব্যাপারে আল্লাহ শপথ করেছেন।	১১-১৪
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে একফোঁটা বীর্য থেকে। পরকাল অস্বীকার করার আগে এটা তার ভেবে দেখা দরকার।	৫-৭	কাফিরদের প্রতি হুঁশিয়ারি জানানো হয়েছে।	১৫-১৭
প্রথমবারের জীবন যদি অবাস্তব না হয়, তা হলে পুনরুজ্জীবন কী করে অবাস্তব হয়! এটা করার ক্ষমতাও আল্লাহর আছে।	৮-১০		

কেইস-স্টাডি

“শপথ মেঘবাহী আকাশের ও উদ্ভিদে-বিদীর্ণ-হওয়া পৃথিবীর!” এ-সূরার ১১-১২ নং আয়াতে আল্লাহ এই দুটো বিষয়ের শপথ করলেন। এবার আসুন এই দুটো বিষয়ের মধ্যকার মিলটা দেখি। আকাশ মেঘ বহন করে। মেঘ ধরে রাখে পানি। আল্লাহর হুকুমে জমিনে টুপটাপ বৃষ্টি ঝরে। সে-পানিতে উর্বর হয় জমিন; পৃথিবীর বুক চিরে বেরিয়ে আসে লতা-গুল্ম-ফুল-ফলের চারা। বিপরীতভাবে, ঠিকঠাক বৃষ্টি না হলে দেখা দেয় খরা। জমিন শুকিয়ে মরে যায়। গাছপালা মরে বিরান মরুভূমিতে পরিণত হয় কোনো এলাকা। তবে আবার যখন বৃষ্টি নামে, জমিনটা তখন প্রাণ ফিরে পায়। তরতর করে বেড়ে ওঠে সব শস্য-লতা। যেই আল্লাহ মৃত জমিনকে প্রাণচঞ্চল করে দিতে পারেন, তিনি মৃত মানুষকেও আবার জীবিত করে তুলতে পারেন।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/৩১১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

‘এই ভবনটি সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত’,—অফিস, বাড়ি বা বহুতল ভবনে এমন সতর্কবার্তা এখন প্রায়ই দেখা যায়। যাতে কেউ কোনো দুষ্কর্ম করার আগে, একবার অন্তত ভেবে দেখে যে, তার সকল নড়াচড়া নজরদারি করা হচ্ছে। যেখানে সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকে সেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই তুলনামূলক কম হয়। কারণ সবকিছু রেকর্ড হয়ে থাকবে, যেকোনো সময় তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে—এই ভয়ে মানুষ সাধারণত সেখানে অপরাধ করতে সাহস করে না। আল্লাহ তাআলাও কিন্তু আমাদেরকে নজরদারিতে রেখেছেন, একদিন সব গোপনীয়তা সামনে আনা হবে। এ-সূরার ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “সেদিন সকল গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া হবে।” সুতরাং ভাবুন, সেদিন যেন মন্দ কাঠগড়ায় আপনাকে দাঁড়াতে না হয়। কোনো অপকর্ম করার আগে এই আয়াতটা যেন মাথায় থাকে। নতুবা পাপাচার প্রকাশের দিন লাঞ্ছনায় চেহারাটা কালো হয়ে যাবে।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩১/১২১)

এ-সূরার ৫-৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চিন্তা-করার একটা খোরাক দিলেন—“সুতরাং (পরকালকে অস্বীকার করার আগে) মানুষের ভেবে দেখা উচিত—কী থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবলবেগে-নির্গত পানি থেকে।” এক ফোঁটা তুচ্ছ নাপাক দুর্গন্ধযুক্ত পানি থেকে যাদের সৃষ্টি, তাদের কি বড়াই করা সাজে? সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়া কি মানুষের জন্য মানানসই? না, মোটেও না। কারণ মানুষ নিতান্তই দুর্বল।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৫৩৭)

সূরা আ'লা
سُوْرَةُ الْأَعْلٰى

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৮ম সূরা। এর আগে সূরা তাকভীর ও পরে সূরা লাইল নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা তারিক ও পরে সূরা গাশিয়া।

এক নজরে আ'লা

- মাক্কি যুগের শুরুর দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৮৭
- আয়াত: ১৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

'আ'লা' মানে 'মহান; সমুন্নত'। সূরার ১ নং আয়াতে এসেছে—"তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো।" তো, সেখান থেকেই এই সূরার নাম হয়েছে 'আ'লা'।

মেজর থিম

০১ রাসূল ﷺ-এর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ।

০২ সফল হবার টিপস্।

০৩ ব্যর্থতার কারণ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা আমাদের আদেশ দিয়েছেন : "তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো।" আর শেষ আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন : "নিঃসন্দেহে এ (বার্তা) আগের আসমানি কিতাবেও ছিল।" অর্থাৎ, প্রথম ও শেষ আয়াত-দুটি থেকে বোঝা যায়, আগেকার আসমানি কিতাবগুলোতেও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার আদেশ ছিল।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা তারিক; যেখানে কাফিরদের ব্যাপারে রাসূলকে তাড়াহুড়া করতে বারণ করা হয়েছে। আর সূরা আ'লা শুরু করা হয়েছে এই বাণী দিয়ে—"তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো।" আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার আদেশই যেন কাফিরদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না-করে ছাড় দেওয়ার বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলে।

শানে নুযুল

ওহি নাযিলের শুরুর দিককার কথা। জিবরীল ﷺ নবিজিকে ওহি শোনাতেন। শোনানো শেষ না-হতেই নবিজি দ্রুত পড়ার চেষ্টা করতেন। সাথে সাথে না-পড়লে ভুলে যেতে পারেন, এরকম একটা ভয় ছিল নবিজির মনে। এই সূরায় আল্লাহ তাঁর নবিকে বললেন, 'আমি তোমাকে শেখাব, ফলে তুমি তা আর ভুলবে না।' একইসাথে নবিজির মধ্যে আরেকটি বিষয় দেখা যেত। তিনি মক্কাবাসীকে দিনরাত দাওয়াত দিতে লাগলেন। নিজের কথা তো ভুলেই গেছেন, সেই সাথে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে-ও সেভাবে সময় দিতে পারছিলেন না। কোনো মানুষ ঈমান না-এনে মারা যাবে, আর তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে—এ-বিষয়টি তাঁকে খুব কষ্ট দিত। এজন্য কাফিরদের পেছনে প্রচুর সময় দিতেন তিনি। তবু কাফিররা তাঁর কথায় ভ্রুক্ষেপ করত না। তখন আল্লাহ তাঁর নবিকে জানিয়ে দেন, যারা উপদেশ মানতে চায়, তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও। যারা মানতে চায় না, তাদেরকে শুধু আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দাও। এবার মানা না-মানা তাদের নিজেদের ব্যাপার। মানলে তো ভালো; আর না মানলে, এর ফল নিজেরাই দেখতে পাবে। বাস্তবতা হচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষই দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিয়েই মত্ত থাকতে চায়। অথচ তাদের দরকার ছিল আখিরাত নিয়ে চিন্তা করা। মোটাদাগে তিনটি বিষয়ের নির্দেশনা দিয়ে এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে—১. তাওহীদ, ২. নবিজিকে উপদেশ দান, ৩. আখিরাত।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২১/৩৪৭; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/৮৬)

সেগমেন্ট

আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলি

সূরার শুরুতেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করার হুকুম এসেছে। সেই সাথে তাঁর কিছু গুণাবলিও তুলে ধরা হয়েছে।

উপদেশ গ্রহণ করবে যারা

যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করবে।

কুরআনকে অস্বীকার করার কারণ

মানুষ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এজন্য তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

ফজিলত

ঈদ ও জুমুআর নামাজে তিলাওয়াত : নুমান ইবনু বাশীর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ দুই ঈদ ও জুমুআর নামাজে সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পড়তেন।'

(মুসলিম, ৮৭৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আপনার পছন্দের কোনো জিনিস আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করে দিন;

দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের জীবনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ—এই উপলব্ধি অর্জন করা সহজ হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর মহিমা ঘোষণা
ও
ওহির অনুসরণ

১. স্রষ্টার প্রতি বান্দার দায়িত্ব

সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব একমাত্র স্রষ্টারই। তাই মানুষের উচিত—যথাযথভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা ও তাঁর আদেশ মেনে চলা।

২. ওহির ভূমিকা

ওহি মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। আর এই ওহি আসে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে। তাই দৃঢ়ভাবে এই ওহিকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

৩. পরকালের কথা স্মরণ করানো

রাসূল ﷺ ও মুমিনদেরকে আল্লাহ আদেশ করেছেন—তারা যেন একে-অন্যকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৪. ওহির লেগাসি বা পরম্পরা

রাসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছেন। এই বার্তা ইবরাহীম ও মুসা ﷺ-এর ওপর নাযিল-হওয়া কিতাবেও ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর মৌলিক বিধানগুলো সব যুগেই অপরিবর্তিত ছিল।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মানুষকে মহান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হলো।	১-৫	যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ স্মরণ রাখে এবং সে-অনুযায়ী জীবন সাজায়, তারাই সফল।	১৪-১৫
গোপন ও প্রকাশিত—আল্লাহ সবই জানেন। আল্লাহ-ভীরু বান্দাদের গুণ হলো: তারা মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।	৬-৯	আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী, তাই একেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পৃথিবীতে-আসা সমস্ত নবি-রাসূলের দ্বীন ছিল এক—ইসলাম।	১৬-১৯
যে আল্লাহকে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যারা হতভাগা, তারা এর থেকে দূরে থাকবে।	১০-১৩		

কেইস-স্টাডি

"আমি তোমার জন্য সহজ করে দেবো" এ-সূরার ৮ নং আয়াত থেকে বোঝা যায়—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য দ্বীন ও শরিয়ত অনেক সহজ করে দিয়েছেন। নবিজির জন্য যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন, তা শুধু নবিজির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তাঁর উম্মাহকেও তা দান করেছেন। নবিজিকে আল্লাহ তাআলা যা-কিছু দিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো—শরিয়ত বা ইসলামি জীবন-ব্যবস্থা। তাই এই সহজ-সুন্দর দ্বীন পেয়েও আমরা যেন অবহেলা না করি; শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যেন নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দিই। কারণ, আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাকে ছেড়ে দিলে, আমাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/৩১৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ১৪ ও ১৫ নং আয়াত-দুটি পর্যবেক্ষণ করুন : "সে-ই সফল—যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, নিজের রবের নাম স্মরণ রাখে আর নামাজ পড়ে।" এখানে 'তাযকিয়া' বা অন্তরের পরিশুদ্ধিকে যিকির ও নামাজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-থেকেই আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব কতখানি তা অনুধাবন করা যায়। যখন অন্তর পবিত্র হয়, তখন ইসলামের সব ধরনের বিধি-নিষেধ মেনে চলাও সহজ হয়। আর যদি কারও অন্তর কলুষিত হয়, তখন সে পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যদিও সে কখনও নামাজ পড়ে, তবুও গুনাহ তাকে ঘিরে রাখে চারদিক থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, অন্তরে পরিশুদ্ধতা না এলে, সত্যিকার অর্থে মুমিন হওয়া যায় না। তবে, অন্তর পরিশুদ্ধির অজুহাতে বাকি সব আমল ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। বরং নিত্যকার আমলগুলো চালিয়ে যেতে হবে, ফরজ ইবাদাত তো কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না। আর এর পাশাপাশি অন্তর-পরিশুদ্ধির কাজও অব্যাহত রাখতে হবে। এতে করে একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে মুমিন হয়ে উঠবে।

(দেখুন—ইবনু আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, ৩০/২৮৮)

সূরা গাশিয়া

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬৮-তম সূরা। এর আগে সূরা যারিয়াত ও পরে সূরা কাহ্ফ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আ'লা ও পরে সূরা ফাজর।

এক নজরে গাশিয়া

- মাক্কি যুগের মাঝামাঝি নাযিল
- সূরা নং: ৮৮
- আয়াত: ২৬
- মাক্কি

নামের রহস্য

'গাশিয়া' শব্দের অর্থ 'আচ্ছন্নকারী'। সূরার প্রথম আয়াতেই কিয়ামাতকে 'সবকিছু আচ্ছন্নকারী' হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখান থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয় 'গাশিয়া'।

মেজর থিম

০১ শঙ্কিত চেহারার লোকদের আলোচনা।

০২ আনন্দিত ও আলোকিত চেহারার লোকদের আলোচনা।

০৩ রাসূল ﷺ-এর মিশন।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি সবকিছু আচ্ছন্নকারী অর্থাৎ কিয়ামাতের আলোচনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। আর শেষ অংশে বলা হয়েছে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া এবং হিসাব দেওয়া-নেওয়ার কথা; যা আসলে কিয়ামাত দিবসকেই বোঝায়।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আ'লা; যার শেষে দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখিরাতের জীবনকে উত্তম ও স্থায়ী বলা হয়েছে। এরপর সূরা গাশিয়ায় শুরু থেকেই আখিরাতের জীবনের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে সফলদের নিয়ামাত ও ব্যর্থদের বঞ্চনার বিবরণ। এসেছে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা।

শানে নুযুল

"সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এমন কিয়ামাতের খবর তোমার কাছে পৌঁছেছে"—আচমকা এমন একটি কথা দিয়েই এই সূরাটির সূচনা। এরপর আল্লাহ এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছেন। সেদিন সব মানুষ দুটি দলে ভাগ হয়ে যাবে। আর এদের পরিণামও হবে ভিন্ন। একটা দলের জন্য থাকবে জাহান্নাম। তারা কী কী শাস্তি পাবে, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর আরেকটি দল যাবে জান্নাতে। তাদেরকে কী কী নিয়ামাত দিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্ট করবেন, সেসবের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। এরপর প্রসঙ্গ পালটে তাওহীদ ও আখিরাতে অবিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছোড়া হয়। কীভাবে আকাশটা শূন্যে ভেসে থাকে? আর পাহাড়-জমিন—এগুলো কি এমনি এমনি হয়ে গেছে? যদি মনে করো, এগুলো কেউ একজন বানিয়েছেন, তা হলে আল্লাহকে একক রব হিসেবে মেনে নিচ্ছ না কেন? আর যিনি এগুলো সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি কি তোমাদেরকে আবার জীবিত করে তুলতে পারবেন না? মোটকথা, এই সূরাটি নাযিল করে তাওহীদ ও আখিরাতের সত্যতার ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি দেওয়া হয়েছে। এরপরও যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, রাসূল যাতে তাদের নিয়ে চিন্তিত না হন, সেই পরামর্শও আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/১)

সেগমেন্ট

অবাধ্য লোকদের পরিণতি

আল্লাহর অবাধ্য লোকেরা পরকালে কতটা ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে পড়বে, তা সূরার শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে।

অনুগত বান্দার পুরস্কার

তার পরের অংশেই অনুগত বান্দাদের পুরস্কারের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

দাঈ'র করণীয়

রাসূলের মতো দাঈ'দেরও করণীয়—মানুষকে কেবল আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এবার মেনে নেওয়া বা না-নেওয়া যার যার ব্যক্তি-স্বাধীনতা।

ফজিলত

ঈদ ও জুমুআর নামাজে তিলাওয়াত : নুমান ইবনু বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ দুই ঈদ ও জুমুআর নামাজে সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পড়তেন।'

(মুসলিম, ৮৭৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

মুমিনদের উচিত—একে অন্যকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া;

কেননা, এতে সমাজের মধ্যে সামষ্টিকভাবে দ্বীনের চর্চা হবে, দ্বীনি চেতনা জাগ্রত থাকবে সবার অন্তরে।

গতিপথ

১. পরকালের ভয়ংকর একটি দৃশ্য

কিয়ামাতের দিন কিছু লোকের চেহারা থাকবে অবনত, আতঙ্কিত। ভীষণ উত্তপ্ত আগুনে পুড়বে তারা। তাদেরকে পান করানো হবে টগবগে ফুটন্ত ঝরনার পানি, খাবার হিসেবে থাকবে তেতো কাঁটা।

২. হাস্যোজ্জ্বল কিছু মুখ

এর বিপরীতে থাকবে কিছু হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। যারা থাকবে সুউচ্চ মর্যাদার জান্নাতে। তারা পান করবে প্রবহমান ঝরনাধারা থেকে।

সেন্ট্রাল থিম

পরকালের ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো

৩. ভাবনার খোরাক

উটের দেহের মেক্যানিজম দেখে অবাক না-হয়ে পারা যায় না। সুবহানাল্লাহ! তপ্ত ওই মরুভূমিতে কীভাবে জীবটা অবলীলায় টিকে থাকে! আল্লাহর এই অপার নিদর্শন দেখে তাঁকে অস্বীকার করার উপায় কোথায়!

৪. বার্তা-বাহক হিসেবে রাসূলের ভূমিকা

আল্লাহর বার্তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করাতে রাসূল কারও সাথে জোরাজুরি করবেন না। যে মানবে, সে মুক্তি পাবে। আর যে মানবে না, তার জন্য আছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শাস্তি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
অবাধ্য লোকদের শাস্তি ও অনুগত লোকদের পুরস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১-১৬	দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবি ﷺ-এর ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।	২১-২৬
মৃত্যু দেওয়ার পর আবারও জীবিত করার ক্ষমতা আছে কেবল আল্লাহর। সেই ক্ষমতার কিছু নিদর্শন দেখানো হয়েছে।	১৭-২০		

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ২১-২২ নং আয়াতে রাসূল ﷺ -কে আল্লাহ বলেন, "অতএব তুমি স্মরণ করিয়ে দাও, তোমার কাজ কেবল স্মরণ করিয়ে দেওয়া; (আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে বিশ্বাস করানোর জন্য) তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করা তোমার কাজ নয়।" এখান থেকে আমরা ঈমানদারদের করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা পাই—তারা মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। দিল খুলে তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবেন। ভালো কাজের আদেশ দেবেন, মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেবেন। কিন্তু তারা যদি ডাক না-শোনে বা এড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে যার দায় সে-ই বহন করবে। আবার, তার দাওয়াত কেউ কবুল করবে কি না, বা তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে—এই ভয়ে একজন ঈমানদার কখনো দাওয়াতের পথ থেকে সরে আসবে না। বরং ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে তিনি মানুষকে ডাকতে থাকবেন। হিদায়াত তো কেবল আল্লাহর হাতে।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩১/১৪৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা সূরার শুরুতেই ২-৪ নং আয়াতে বললেন—কিয়ামাতের দিন কিছু লোকের চেহারা থাকবে অবনত ও উদ্‌বিগ্ন। তারা জাহান্নামের ভীষণ উত্তপ্ত আগুনে পুড়বে। কারা হবে সেসব লোক, তা ভাবনার বিষয়। এখানে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়নি। দুনিয়াতেও আমরা দেখি—অনেকেই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। রাতদিন কাজ করে। কিন্তু বেলাশেষে তারা সফল হয় না। কারণ, তারা নিয়ম মেনে পরিশ্রম করে না। মন যা চায়, তা-ই করতে থাকে। ফলে ব্যর্থতা এসে ঘিরে ধরে তাদেরকে। আখিরাতে গিয়েও এমন একদল লোকের দেখা মিলবে, যারা ভুল-পন্থায় অনেক ইবাদাত করে ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের আমল-ইবাদাত সবই ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের-দেওয়া নির্দেশনার বাইরে। তাই উদ্‌বিগ্ন ও অবনত চেহারা নিয়ে অবশেষে তাদেরকে জাহান্নামের পথ ধরতে হবে। সুতরাং, এ-সূরার শুরুর আয়াতগুলো নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে; আমাদের কাজগুলো আল্লাহর-দেওয়া নিয়মে হচ্ছে কি না!

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৯৫৯)

জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামাতের একটি হলো জান্নাতিদের জন্য থাকবে 'উন্নত উঁচু আসন'; যেমনটা এই সূরার ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আসন উঁচু হবার কারণ কী? যাতে মুমিন বান্দা উঁচুতে বসে জান্নাতের নিয়ামাতগুলো দেখতে পারে; আল্লাহ তাআলা যেসব আরাম-আয়েশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা দেখে যেন তাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/৩৩৬)

সূরা ফাজর

سُوْرَةُ الْفَجْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০ম সূরা। এর আগে সূরা লাইল ও পরে সূরা দুহা নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৮৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা গাশিয়া ও পরে সূরা বালাদ।

এক নজরে ফাজর

- মাক্কি যুগের শুরুর দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৮৯
- আয়াত: ৩০
- মাক্কি

নামের রহস্য

'ফাজর' মানে 'ভোর'। আল্লাহ তাআলা সূরার একেবারে শুরুর আয়াতে ছড়িয়ে-পড়া-ভোরের আলোর শপথ করেছেন। সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে 'ফাজর'।

মেজর থিম

০১ আদ জাতি ও ফিরআউনের কাহিনি।

০২ মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্য।

০৩ আল্লাহর-আনুগত্যে-অবিচল আত্মার প্রতিদান।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অবাধ্য-অবিশ্বাসীদের ওপর যেকোনো সময় শাস্তি নামিয়ে আনার ক্ষমতা তাঁর আছে। আর সূরাটির শেষ অংশে এসেছে মুমিনদের জন্য পুরস্কারের কথা। অর্থাৎ সূরাটির শুরু-শেষ মিলিয়ে কাফির ও মুমিন উভয় দলের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা গাশিয়া; যার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, সৃষ্টির সকল জীবকেই একদিন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। সৃষ্টিকুলের মধ্যে অবাধ্য কাফিররাও শামিল। আর পরকালে এই কাফিরদের যে কঠোর হিসাব নেওয়া হবে, সেই কসম দিয়েই সূরা ফাজর শুরু করা হয়েছে।

শানে নুযুল

এই সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা ভোরের আলো, দশ রাত, জোড়-বিজোড় ও ফুরিয়ে-আসা রাতের কসম করেছেন। এই বিষয়গুলোর ওপর কসম করার বিশেষ কারণ আছে। আর তা হলো—এগুলো আল্লাহর অপার নিদর্শন। রাত-দিনের যে ব্যবস্থাপনা, তা খেয়াল করলে সত্যিই বড় অবাক হতে হয়। যেকোনো বিবেকবান মানুষ এই নিদর্শনগুলো দেখে আল্লাহকে চিনতে পারে। তবে যারা অবাধ্য, তাদের কথা আলাদা। এদের জন্যও আল্লাহ উদাহরণ সামনে রেখেছেন। আদ, সামুদ আর ফিরআউনের জাতির দিকে তাকানোই যথেষ্ট। এরা আল্লাহর অবাধ্য জাতি ছিল। এদেরকে আল্লাহ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যেকোনো যুগের অবাধ্যদের তিনি সেভাবেই শিক্ষা দিতে পারেন। সেই সাথে অবাধ্যদের একটা কমন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন—এদের শুধু 'যত পাই, তত চাই' স্বভাব। আর এই স্বভাবের দাবিই হলো—যেভাবে পারো সম্পদ সঞ্চয় করো। তাই এতিমদের সম্পদ কেড়ে নিতেও এরা দু'বার ভাবে না। আখিরাতে এসব অবাধ্য লোকদের পরিণাম কী হবে, সেই সাথে যারা আল্লাহর অনুগত, তাদের পরিণতি কেমন হবে—তা জানিয়ে দিতেই আল্লাহ এই সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/২১)

সেগমেন্ট

আল্লাহর শপথ

কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের ওপর শপথ করে আল্লাহ এই সূরাটির সূচনা করেছেন। সেই গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলো বিবেকবানদের জন্য ভাবনার খোরাক জোগায়।

সম্মান-অসম্মানের মাপকাঠি

অর্থ-বিত্ত-প্রাচুর্য সম্মানের কিংবা অসম্মানের মাপকাঠি নয়। আসল সম্মান ও অপমান নির্ভর করে আল্লাহর অনুগত হওয়া ও না-হওয়ার মধ্যে।

কিয়ামাত ও বিচার

নিশ্চিতভাবেই কিয়ামাত-দিবস মানুষের সামনে সমাগত। সেদিন সবার ভালো-মন্দ কাজের হিসেব নেওয়া হবে।

ফজিলত

সূরা ফাজর মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে;

এই দুআ আপনাকে, আল্লাহর পছন্দনীয় কাজগুলো করতে এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে উদ্‌বুদ্ধ করবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

নৈতিক জবাবদিহিতা, মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও আল্লাহর পথে অবিচল থাকার পুরস্কার

১. ক্ষমতা, দম্ভ, পতন

আদ, সামুদ, ফিরআউন ও তার জাতিকে আল্লাহ বিপুল ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এই ক্ষমতার দম্ভে তাদের অবাধ্যতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২. পরীক্ষার মুখে বান্দার অবস্থা

সম্পদ থাকা বা না-থাকা—এই দু-অবস্থাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ দেখতে চান, উভয় অবস্থায় তাঁর বান্দা কী করে।

৩. সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখার পরিণতি

ইসলাম সব সময়ই মানুষকে অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেয়। প্রয়োজনের সময় অভাবীকে সাহায্য না-করে, সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখলে, কিয়ামাতের দিন ভীষণ আফসোস করতে হবে।

৪. অনুগত বান্দার পুরস্কার

যেসকল আত্মা আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকবে, কিয়ামাতের কঠিন সময়ে আল্লাহ সেসকল আত্মাকে জান্নাতে প্রবেশ করার আহ্বান জানাবেন—তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ তাআলা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শনের ওপর শপথ করেছেন। বিবেকবানদের জন্য এসব নিদর্শন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।	১-৫	অনেক ধন-সম্পদ পেলে মানুষ নিজেকে সম্মানিত মনে করে; অন্যথায় অসম্মানিত। কারণ, মানুষ সম্পদকে অত্যধিক ভালোবাসে।	১৫-২০
শিক্ষা নিতে হবে ইতিহাস থেকে—ইরাম, সামুদ আর ফিরআউনের জাতির পরিণতি কেমন হয়েছিল।	৬-১৪	পরকালে দুর্দশায়-থাকা ব্যক্তি, আর আনন্দে-থাকা ব্যক্তির তফাত দেখানো হয়েছে।	২১-৩০

কেইস-স্টাডি

"হায়! আমি যদি (দুনিয়ায় থাকতে) আমার (এই) জীবনের জন্য আগাম কিছু করতাম!" এ-সূরার ২৪ নং আয়াতে পরকালে আফসোসের এমন একটি চিত্র উঠে এসেছে। হাশরের মাঠে যখন ঘোর বিপদ—তখন প্রত্যেকেই এই আফসোসটা করবে। কিন্তু তখনকার অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না। মানুষ এতটাই চিন্তিত হয়ে পড়বে যে, ওপরে উল্লেখিত আয়াতটি বলতে থাকবে। এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো—সময় থাকতেই অর্থাৎ—দরজায় মৃত্যু হাজির হবার আগেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। পরকালীন জীবনের জন্য সবকিছুই আগাম পাঠাতে হবে। নামাজ, রোযা, দান-সাদাকাসহ ইবাদাতের সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৫৬৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

১৩ নং আয়াতটি দেখুন: "তোমার রব তাদের ওপর ভয়ংকর শাস্তির কশাঘাত করলেন।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ফিরাউনকে যে শাস্তি দিয়েছেন, সেটিকে তিনি 'চাবুকের আঘাত' বলেছেন। তরবারি বা সেরকম কিছু বলেননি। এর মধ্যে একটা হিকমাহ আছে। চাবুক দিয়ে বারবার আঘাত করা যায়। কিন্তু তরবারি বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তা করা যায় না। এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, ফিরআউন ও তার দলবলকে আল্লাহ একবার নয়, বারবার শাস্তি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে যামাখ্শারি ﷺ বলেছেন—চাবুকের আঘাত বলে বোঝানো হয়েছে যে, এই শাস্তি হলো আখিরাতের শাস্তির তুলনায় হালকা। যেমন তরবারির আঘাতের তুলনায় চাবুকের আঘাত অনেক হালকা। তেমনিভাবে, দুনিয়ায় হালকা শাস্তি ভোগ করার পর, আখিরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

(দেখুন—ইবনু জুযাই, আত-তাসহীল লি-উলূমিত তানযীল, ২/৪৭৯)

দুনিয়াতে অঢেল ধন-সম্পদ পাওয়া মানেই সম্মান; আর লাগাতার অভাব-অনটন মানেই অপমান। এ-ধরনের ভুল ধারণা ভেঙে যায় এ-সূরার ১৫-১৭ নং আয়াত পাঠ করলে। আসলে মূল বিষয় হলো, আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকা। কেউ যদি ধন-সম্পদ পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, আর অভাবে পড়ে সবর করে—তবে দুটোই নিয়ামাত হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সম্পদ পেয়ে অহংকার করে, অভাবে পড়ে হা-হুতাশ করে, তা হলে দুটোই হবে শাস্তির উপকরণ। সম্পদ থাকা বা না-থাকা সম্মান বা অপমানের কারণ নয়। এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ২০/৫১)

সূরা বালাদ

سُوْرَةُ الْبَلَدِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩৫-তম সূরা। এর আগে সূরা ক্বফ ও পরে সূরা তারিক নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ফাজর ও পরে সূরা শামস।

এক নজরে বালাদ

- মাক্কি যুগের শুরুর দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৯০
- আয়াত: ২০
- মাক্কি

নামের রহস্য

'বালাদ' মানে 'ভূখণ্ড; শহর'। সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ মক্কা-নগরীর ওপর শপথ করেন—"না, আমি শপথ করছি এ-ভূখণ্ডের।" তো সেখান থেকেই এই সূরার নাম হয়েছে 'বালাদ'।

মেজর থিম

০১. একটি ভূখণ্ড, পিতামাতা ও সন্তানের শপথ।

০২. অহংকারী মানুষের নমুনা।

০৩. সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে কিছু করণীয়।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়তা দিয়েছেন, মানব-জাতিকে দুনিয়ার বিপদাপদ ও কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। তো, যারা এই বিপদাপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুমের ওপর নিজেকে অটল রাখতে পেরেছে, তাদের পরিণতি কেমন আর যারা নিজেকে এতে অটল রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের পরিণতি কী হয়েছে—সেই আলোচনা এসেছে সূরাটির শেষ অংশে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ফাজর; যা শেষ হয়েছে আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল আত্মার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে। আল্লাহ তার জন্য যে জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কারণ সে সম্মানিত সৃষ্টি। এরপর সূরা বালাদের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানিত স্থান—মক্কার কথা। সম্মানের দিক দিয়ে দুটোই সেরা।

শানে নুযুল

দুনিয়ায় মানুষের সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা কী—সেসব বিষয় নিয়ে এই সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের জন্য আল্লাহ দুটি পথ খুলে রেখেছেন। তার একটি পথ খুবই সহজ। কষ্টের প্রয়োজন নেই, শুধু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লেই হয়। সেই পথটি হলো অন্ধকার ও গুনাহের পথ। জীবনটাকে পুরোপুরি উপভোগ করার পথ। আরেকটি পথ হলো ভীষণ কষ্টের। খাড়া পাহাড়ি রাস্তার মতো। প্রতিটি কদম যেখানে দেখে-শুনে ফেলতে হয়। আর এই পথটি হলো আল্লাহর আনুগত্যের পথ। তবে বাস্তবতা হলো, সহজ পথ বেছে নেওয়াটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাই সে গুনাহের সহজ রাস্তা বেছে নেয়। কিন্তু কঠিন পথে চলার জন্যই আল্লাহ মানুষকে কষ্ট-সহিষ্ণু করে বানিয়েছেন। আমাদের সামনে রাসূলের জীবনকে মডেল হিসেবে সামনে রাখা হয়েছে, যেন দ্বীনের পথে চলাটা অতটা কঠিন মনে না হয়। যারা কষ্ট করে আল্লাহর পথ আঁকড়ে থাকবে, তাদেরকে তিনি মহা-পুরস্কার দেবেন। আর যারা তা করবে না, তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/৪৫; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/১১২)

সেগমেন্ট

মানুষের প্রকৃতি

মানুষকে আল্লাহ কষ্ট-সহিষ্ণু করে বানিয়েছেন।

মনের গোপন খবর

মানুষ কোন কাজ কী উদ্দেশ্যে করছে, তার মনের গহিনে কী বোঝাপড়া চলছে—আল্লাহ সবকিছুই ভালোভাবে জানেন।

অনুগ্রহে করণীয়

আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর অগণিত নিয়ামাত বর্ষণ করেছেন। তাই আল্লাহর প্রতি বান্দারও কিছু করণীয় আছে। সূরার শেষ অংশে এ-বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

ফজিলত

সূরা বালাদ মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, “মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।”

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহর আনুগত্য করা, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা ও অন্যের প্রতি দয়ালু হতে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে;

এতে এই গুণগুলো নিজের জন্যও আয়ত্তে আনা সহজ হবে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হবে।

গতিপথ

১. জীবনে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ আসবে
মানুষের জীবনে অতি অবশ্যই চ্যালেঞ্জ ও বাধা-বিপত্তি আসবে। এটা জীবনেরই একটি অংশ। আর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মনোবল দিয়েই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

২. সম্পদ ও ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ
সম্পদ ও ক্ষমতা মানুষের জীবনে বড় রকমের একটি চ্যালেঞ্জ। সম্পদ ও ক্ষমতা পেলে মানুষ নিজেকে জাহির করতে চায়। নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে।

৩. সাহস জোগানো
এসব চ্যালেঞ্জ আল্লাহর পথে চলার রাস্তাটাকে একটু কঠিন করে তোলে। তবে এই পথে চলার ক্ষেত্রে বান্দাকে আল্লাহ নিজেই সাহস জুগিয়েছেন।

৪. পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা
দুটি পথ—ভালো ও মন্দ। অবারিত স্বাধীনতা—যে-পথ খুশি বেছে নাও। তবে আল্লাহ এটিও জানিয়ে দিলেন—শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে চলতে হবে তাঁর মনোনীত পথেই।

সেন্ট্রাল থিম

মানব-জীবনে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ ও আল্লাহর অনুগ্রহ

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ওঠার ক্ষমতা দিয়েই আল্লাহ মানুষকে বানিয়েছেন।	১-৪	আল্লাহ তো তাকে আরও অনেক অনেক নিয়ামাত দান করে রেখেছেন। তাকে ভালো-মন্দ পথ দেখিয়েছেন।	৮-১২
তাই বলে সে অহংকার করবে, এটা বড্ড বেমানান। মানুষ কী উদ্দেশ্যে দান বা ভালো আমল করে, আল্লাহ তা জানেন।	৫-৭	আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাঁর কিছু অনুগ্রহের কথা আলোচিত হয়েছে।	১৩

কেইস-স্টাডি

মানুষকে দুঃখকষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা দিয়েই আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। এ-সূরার ৪ নং আয়াতে এটি জানানোর পর, ৫ নং আয়াতেই আল্লাহ আমাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—"(তাই বলে) সে কি ভাবছে যে, তার ওপর ক্ষমতাবান কেউ নেই?" অর্থাৎ মানুষকে দুঃখ-কষ্টের ক্ষেত্রে সহনশীল করে তৈরি করা হলেও, তার মধ্যে অবশ্যই কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাকে সে কোনোদিন টপকে যেতে পারবে না। সে কখনো রোগ-শোক থেকে দূরে থাকতে পারবে না। প্রিয়জন কিংবা নিজের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা তার পক্ষে অসম্ভব। একদিন তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতেই হবে। তাই দুনিয়ার বুকে সে যতই প্রাচুর্য বা ক্ষমতা অর্জন করুক না-কেন, তাকে অবশ্যই হিসেবের মুখোমুখি হতে হবে। তাই কোনো অবস্থাতেই অহংকার দেখানো যাবে না।

(দেখুন—সা'লাবি, তাফসীর, ২৯/৩৮৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

যারা অলসতা করেন, উপার্জনের কষ্ট সহ্য করতে চান না, তাদের জন্য এ-সূরার ৪ নং আয়াতটাতে ভাবনার যথেষ্ট খোরাক আছে—"আমি মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছি।" অর্থাৎ দুনিয়ায় শুধু আনন্দ উপভোগ করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এ দুনিয়া হলো পরিশ্রম ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জায়গা। এগুলো অতিক্রম না-করে কোনো মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। পবিত্র মক্কা শহর এর এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইবরাহীম ﷺ এক সময় কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বলেই আজ তা পরিণত হয়েছে আরবের কেন্দ্রভূমিতে। তা হলে বেকার বসে থাকার সুযোগ কোথায়? এই আয়াতটা কি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে না?

(দেখুন—সা'দি, তাফসীর, ৯২৪)

يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا সে বলে, 'আমি তো প্রচুর সম্পদ খরচ করেছি!' এ আয়াতে কাফির-মুশরিকদের সম্পদ খরচ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা 'أَهْلَكْتُ/আমি ধ্বংস করেছি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আসলে সম্পদ-খরচ তাদের উপকারের বদলে বরং ধ্বংস ডেকে আনে। প্রবৃত্তি ও আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে খরচ করা মানেই নিজেদের ধ্বংস করা। এগুলো তাদের কোনো উপকার তো করবেই না, বরং চরম ক্ষতি ডেকে আনবে। আমাদেরও ভেবে দেখা উচিত—আমরা কোন পথে সম্পদ খরচ করছি। আমাদের খরচ-করা সম্পদগুলো আল্লাহর কাছে জমা থাকছে, নাকি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে?

(দেখুন—সা'দি, তাফসীর, ৯২৪)

সূরা শামস

سُوْرَةُ الشَّمْسِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২৬-তম সূরা। এর আগে সূরা কদর ও পরে সূরা বুরূজ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা বালাদ ও পরে সূরা লাইল।

এক নজরে শামস

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ৯১
- আয়াত: ১৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘শামস’ মানে ‘সূর্য’। সূরার শুরুতেই আল্লাহ সূর্যের ওপর শপথ করেছেন—“শপথ সূর্য ও তার প্রখর আলোর।” তো সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে ‘শামস’।

মেজর থিম

০১ সফলতা অর্জনের জন্য শর্ত : আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে পরিচ্ছন্ন থাকা।

০২ ধ্বংস হওয়ার কারণ।

০৩ সামুদ জাতির উদাহরণ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু হয়েছে আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শনের ওপর শপথের মাধ্যমে। যেমন: সূর্য, চাঁদ, দিন, রাত, নফস ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটিই বিশাল বিশাল সৃষ্টি, যা সর্বশক্তিমান এমন এক সত্তার কথা বলে, যিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি চাইলেই অপরাধীদেরকে সমূলে উপড়ে ফেলতে পারেন। সূরার শেষে সামুদ জাতির পরিণতি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে এই বার্তাটিকেই তিনি জোরদার করেছেন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা বালাদ; যার শেষ অংশে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের আলোচনা করা হয়েছে। আর সূরা শামসেও এই দুই দলের আলোচনা এসেছে। তবে এখানে এসেছে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

শানে নুযুল

আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করে—চাঁদ-সূর্য, দিন-রাত ও আসমান-জমিনের কসম করেছেন। এই জোড়াগুলো দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন—এই বস্তুগুলো যেমন আকার-আকৃতি ও কাজের দিক দিয়ে এক রকম নয়, আর কখনো এক হতেও পারবে না, ঠিক তেমনি সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ, সাওয়াব-গুনাহও কখনো এক হতে পারে না। আবার এসবের পার্থক্য বোঝার জন্য আল্লাহ সকল মানুষকে বিবেক দিয়েছেন। এখন তারা চাইলে ভালো কাজ করতে পারে, আবার চাইলে মন্দ কাজও করতে পারে। তবে মানুষকে মন্দকাজে নিরুৎসাহিত করতে, আল্লাহ পাঠালেন সামুদ জাতির বিবরণ। ওরা ছিল ভীষণ শক্তিশালী জাতি। নবির অবাধ্য হয়ে আল্লাহর-পাঠানো উষ্ট্রীকে হত্যা করল, ফলে তাদের ওপর নেমে এল ভয়ংকর আযাব। এই সূরায় কোথাও মক্কার মুশরিকদের লক্ষ্য করে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। কিন্তু সামুদ জাতির এই কাহিনি আল্লাহ এমন সময় তুলে ধরলেন, যখন মক্কার কাফিররা নবিজির তুমুল বিরোধিতা করছিল। এই কাহিনি সামুদ জাতির সাথে কুরাইশদের অবস্থাকে পুরোপুরি মিলিয়ে দিলো। তাদেরকে যেন এই কথাই বলা হলো—সামুদ জাতি তাদের নবির অবাধ্য হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা যদি তোমাদের নবির অবাধ্য হও, তা হলে তোমরাও কিন্তু বাঁচতে পারবে না।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/৬৯; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/১২৫)

সেগমেন্ট

বিস্ময়কর নিদর্শন

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা কিছু বিস্ময়কর নিদর্শনের কসম করেন।

পথ দেখানো

এসব নিদর্শনের ওপর শপথ করে আল্লাহ মানুষকে চিনিয়েছেন আনুগত্য আর অবাধ্যতার পথ।

সামুদ জাতির পরিণাম

সামুদ জাতি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে সমূলে উপড়ে ফেলেন।

ফজিলত

নবি ﷺ একবার মুআয -কে উপদেশ দেন—মুআয, তুমি যখন নামাজ পড়াবে, তখন সূরা আ'লা, শাম্‌স, লাইল বা এ-ধরনের ছোট ছোট সূরা দিয়ে পড়াবে। কারণ, তোমার পেছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও প্রয়োজন-ফেলে-আসা লোকও নামাজ আদায় করে থাকে।

(দেখুন—বুখারি, ৭০৫; মুসলিম, ৪৬৫)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

অহংকার ও খাই-খাই স্বভাবের কারণে মানুষ তার নিজ আত্মাকে চাপা দিয়ে রাখে;

তাই আল্লাহর কাছে সঠিক পথের সন্ধান চাওয়ার পাশাপাশি নিজের অনিষ্টতা থেকেও মুক্তি চাইতে হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মানুষের মধ্যে দুটি বিপরীত সত্তা: ভালো এবং মন্দ

১. আলো-আঁধার

আলো ও আঁধার—আল্লাহর দুইটি বিপরীতধর্মী নিদর্শন। তেমনি মানুষের মাঝেও তিনি দুটি বিপরীত সত্তা দিয়েছেন। সে চাইলে ভালো-মন্দ যেকোনো কিছু গ্রহণ করতে পারে।

২. মনের লড়াই

মানুষের মন যেন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে ভালো ও মন্দ—এই দুটি পক্ষ সব সময় নিজেদের মধ্যে বিরোধে জড়িয়ে থাকে। এর মাঝে যারা এই বিরোধ কাটিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।

৩. সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পরিণতি

অতীতের যে জাতিই স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও মন্দ পথে হেঁটেছে, আল্লাহ তাদেরকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৪. আসল সফলতা

'সফলতা' টার্মটি শুধুমাত্র দুনিয়াবি অর্জনের সাথে মেলালে হবে না। বরং আসল সফলতা হলো আত্মিক উন্নতি ও পরকালীন মুক্তি।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ তাআলা তাঁর অনেক বড় বড় সৃষ্টির ওপর শপথ করেছেন এখানে।	১-৭	সামুদ জাতির অবাধ্যতা ও তাদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।	১১-১৫
আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখলে, সফলতা নিশ্চিত। নয়তো অবাধ্যতার ফলে আসবে চরম ব্যর্থতা।	৮-১০		

কেইস-স্টাডি

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا "কিন্তু তারা তাকে মিথ্যুক বলে উড়িয়ে দেয়, এবং তারা উষ্ট্রীটিকে পেছনের পা খোঁড়া করে হত্যা করে।" এ সূরার ১৪ নং আয়াতে অলৌকিক উষ্ট্রী হত্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটিই উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ হত্যার দায় দিলেন তাদের সবাইকে। কারণ, তারা সবাই হত্যা না করলেও যে হত্যা করেছে, তার কাজে বাকিরা সন্তুষ্ট ছিল। এ-থেকে বোঝা যায়—পাপ করার সম্মতি দেওয়া এবং তাতে খুশি থাকাও পাপে লিপ্ত হবার মতোই গুরুতর অপরাধ। শাস্তির বিচারে দুটোই সমান। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে হাজারো পাপের ছড়াছড়ি চারদিকে। আর এই পাপ কাজগুলো যদি কেউ সমর্থন করে, তবে সে-ও হবে সমান অপরাধী।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ২০/৭৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কিছু মানুষের মনে পাপ কাজের ভীষণ তাড়না জাগে। আবার কারও কারও মনে ভালো কাজ করার প্রচণ্ড আগ্রহ তৈরি হয়। এ-সূরার ৮ নং আয়াত থেকে জানতে পারি—আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য ভালো-মন্দ দুটি পথই খোলা রেখেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। এখন দেখার বিষয় হলো বান্দা কোন দিকে অগ্রসর হবে? কারণ, এরপরই আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন—যে নিজেকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখবে, তার সফলতা অনিবার্য; আর যে নিজের আত্মাকে আল্লাহর অবাধ্যতার নিচে চাপা দেবে, তার ব্যর্থতা অবধারিত।

(দেখুন—যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ৩০/২৬০; বুখারি, ৬৪৯১; মুসলিম, ১৩১)

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা শপথ করলেন সূর্য ও তার প্রখর আলোর। এরপর তিনি তুলে ধরলেন সূর্য ও চাঁদের নিয়ম-মাফিক আসা-যাওয়া। তো, এই শপথের ধরন থেকে আমরা বুঝতে পারি—পৃথিবীর সবকিছুই একটা নির্ধারিত শৃঙ্খলার মধ্যে চলছে। আর সেই শৃঙ্খলা আল্লাহই ঠিক করে দিয়েছেন। সকল সৃষ্টিই আল্লাহর বেঁধে-দেওয়া নিয়ম-কানুনের মাঝে আবর্তিত হচ্ছে। কোথাও কোনো বিরোধ নেই, অবাধ্যতার লেশমাত্র নেই। কিন্তু মানুষ লাগাতারভাবে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। এ সূরার শপথের বিষয়গুলো মানুষকে মনে করিয়ে দেয়—তোমরাও বিনা বাক্যে আল্লাহর আদেশ মেনে নাও। তাঁর অবাধ্যতা করো না।

(দেখুন—শানকিতি, তাফসীর, ৮/৫৩৬)

সূরা লাইল | سُوْرَةُ الَّيْلِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯ম সূরা। এর আগে সূরা আ'লা ও পরে সূরা ফাজর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা শামস ও পরে সূরা দুহা।

এক নজরে লাইল

- মাক্কি যুগের শুরুর দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৯২
- আয়াত: ২১
- মাক্কি

নামের রহস্য

'লাইল' শব্দের অর্থ 'রাত'। সূরার ১ নং আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অন্ধকার এসে যখন রাতকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আল্লাহ তখনকার সময়ের কসম করেছেন, আর সেখান থেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে 'লাইল'।

মেজর থিম

০১. মানুষের উপকারী স্বভাব।

০২. মানুষের অপকারী স্বভাব।

০৩. একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালো কাজগুলো করা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরা লাইলের শুরুতেই এসেছে রাতের আলোচনা, যখন তা চারিদিক আচ্ছন্ন করে নেয়। এরপর দিনের আলো, যখন তার উজ্জ্বলতা চারপাশে ছেয়ে যায়। এর মাধ্যমে দুটি অবস্থা ও রঙের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করেছেন—দুর্ভাগা ও আল্লাহভীরু। সূরাটির শেষে এই দুই দলের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা শামস; যেখানে সূর্য ও চাঁদের ওপর শপথ করা হয়। সূর্য ঝলমলে দিনের সূচনা করে। আর চাঁদ নিয়ে আসে রাত। সূরা লাইলেও রাত ও দিনের ওপর আল্লাহ শপথ করেছেন। উভয় সূরার মাধ্যমেই তিনি মানুষের ভেতরকার (ভালো ও মন্দ) দুটি সত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

শানে নুযুল

এই সূরাটি অনেকটাই সূরা শামস-এর মূলভাবকে ধারণ করে। অপর কথায় বলা যায়—এই সূরা-দুটি একটি আরেকটির ব্যাখ্যা; যেখানে মানুষের জীবনের দুটি আলাদা পথ ও এদের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। এই সূরাতেও আল্লাহ তাআলা বোঝালেন—দিন ও রাতের মাঝে তফাত আছে। পার্থক্য আছে নারী ও পুরুষে। ঠিক তেমনি, মানুষের কাজের মধ্যেও ভালো-মন্দের ব্যবধান রয়েছে। আর তার ভিত্তিতেই মানুষের কাজগুলোকে দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। একদিকে আছে তিনটি কাজ, আরেক দিকেও রাখা হয়েছে ভিন্নধর্মী তিনটি কাজ। একদিকে—দান করা, তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করে চলা, এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। আর অন্যদিকে—কৃপণতা করা, কোনোকিছুতে আল্লাহর পরোয়া না করা, এবং সত্য-সুন্দর কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা। এই কাজগুলো যেমন একে অপরের বিপরীত, তেমনি এদের ফলাফলও হবে ঠিক বিপরীত। প্রথম ক্যাটাগরির লোকদের জন্য সরল পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। আল্লাহ তাদেরকে ভালো কাজ করার সুযোগ দেবেন, এবং গুনাহ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ক্যাটাগরির লোকেরা সহজে ভালো কাজ করতে পারবে না, বরং গুনাহের কাজ করাই তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর এই পথ-দুটির পার্থক্য চেনাতেই আল্লাহ মানুষের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। তাই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে—মানুষের উচিত রাসূলকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে আসা।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/৮৫; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/১৩৬)

সেগমেন্ট

কাজের ভিত্তিতে প্রতিদান

এই পৃথিবীর সকল মানুষের কাজ এক নয়। তাদের কাজের মধ্যে আছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। তাই তাদের প্রতিদানের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাবে।

আল্লাহর সাহায্য

আল্লাহর নির্দেশমতো কাজ করলে, তাঁর সাহায্য মিলবে।

মুক্তির উপায়

জাহান্নাম থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়—তাকওয়া; অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

ফজিলত

নবি ﷺ একবার মুআয ؓ-কে উপদেশ দেন—মুআয, তুমি যখন নামাজ পড়াবে; তখন সূরা আ'লা, শাম্‌স, লাইল বা এধরনের ছোট ছোট সূরা দিয়ে পড়াবে। কারণ, তোমার পেছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও প্রয়োজন-ফেলে-আসা লোকও নামাজ আদায় করে থাকে।

(দেখুন—বুখারি, ৭০৫; মুসলিম, ৪৬৫)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

নিজের সম্পদ থেকে অল্প পরিমাণে হলেও দান করুন, → এতে সম্পদ ও অন্তর দুই-ই পরিশুদ্ধ হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

মানুষের কর্মের প্রকৃতি ও তার সম্পদ

১. কর্মে পরিচয়
দীপ্তিময় প্রখর আলোর সূর্য, মিষ্টি আলোর চাঁদ। তাদের কর্মই তাদের পরিচয় বহন করে। মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য।

২. সম্পদের ভূমিকা
সম্পদকে মানুষ ভালো কাজ বা প্রয়োজনে যেমন ব্যবহার করতে পারে, ঠিক তেমন আল্লাহর অবাধ্যতার কাজেও খরচ করতে পারে। এর মাধ্যমে মূলত তার পরীক্ষা নেওয়া হয়।

৩. নিজের সাথে সংগ্রাম
সম্পদ যত আসে, ততই কাজে লাগে। ইসলাম আমাদেরকে এই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত হওয়ার উপদেশ দেয়। মনের সাথে লড়াই করে হলেও, সম্পদকে কেবলই ভোগ-বিলাসের বস্তু বানানো যাবে না।

৪. ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা
সম্পদের ক্ষেত্রে নিজের কাছেই নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে—আমি কি স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিতে পেরেছি? এই জবাবদিহিতা স্বচ্ছ হলে, শেষ পরিণতিটা ভালোই হবে আশা করা যায়।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টা হলো বিচিত্র। আর এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে আল্লাহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শপথ করেছেন।	১-৪	কিছু সতর্কতা ও সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে এখানে।	১৪-২১
মানুষ সৃষ্টির পেছনে একটি উদ্দেশ্য আছে। আর সেই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাওয়াকে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন।	৫-১৩		

কেইস-স্টাডি

এ-সূরার ৯-১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “আর উত্তম প্রতিদানের বিষয়টিকে সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়—আমি তার জন্য খারাপ কাজ করা সহজ করে দেবো, আর তার পতনের সময় তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।” এখানে উত্তম প্রতিদান হলো জান্নাতের ওয়াদা। পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার ওয়াদা। মানুষ যখন আল্লাহর হুকুম মেনে জীবন পরিচালনা করবে, পরকালে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে অনেক অনেক পুরস্কার দেবেন। আর এটিই হলো উত্তম প্রতিদান। এখন, কেউ যদি এই ‘উত্তম প্রতিদান’-এর বিষয়টিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, তার ওপর দুইটি খারাপ প্রভাব পড়বে—১. তার জন্য খারাপ কাজ করাটা সহজ হবে। ২. তার ধ্বংসের সময় তার ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ২০/৮২-৮৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলা এ-সূরার ১৩ নং আয়াতে বললেন, “পরকাল ও ইহকাল উভয়ের নিয়ন্ত্রণ আমার কাছেই।” এতে আমাদের জন্য চিন্তার খোরাক আছে। আমরা অনেকেই মনে করি—দুনিয়ার কোনো জিনিস বুঝি আল্লাহর কাছে চাইতে হয় না। কেবল জান্নাত বা পরকাল-ই চাওয়ার জিনিস। না, এটা গলদ চিন্তা। আসলে দুনিয়া যেমন আল্লাহর, তেমনি আখিরাতও তাঁর। সুতরাং দুনিয়ায় যা প্রয়োজন, তা চাইতে হবে আল্লাহর কাছে। আর পরকালও চাইতে হবে তাঁর কাছেই। বান্দাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর ভান্ডার উন্মুক্ত রেখেছেন। তাই আল্লাহর কাছেই সবকিছু চাইতে হবে মনখুলে।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৪৪৭; তিরমিযি, ৩৩৭৩; ইবনু মাজাহ, ৩৮২৭)

“সে নিজের সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য।” সূরাটির এই ১৮ নং আয়াত থেকে বোঝা যায়—দুনিয়ার কিছু পাওয়ার আশা বাদ দিয়ে দান করলে অন্তরের প্রশান্তি মেলে। নিজের পরিশুদ্ধি আসে। ভেতর থেকে পবিত্রতা লাভ হয়। সুতরাং ভীষণ মন-খারাপের দিনে কিছু টাকা দান করুন, দেখবেন—হৃদয়টা প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে। খারাপ-লাগাটা কমে যাবে অনেকখানি। এতে মনও ভালো হবে, আল্লাহও খুশি হবেন। কিন্তু মন ভালো করার জন্য কেউ যদি গান শোনে অথবা হারামে লিপ্ত হয়, তবে বিষণ্ণতা তার অন্তরে এসে আরও জেঁকে বসে।

(দেখুন—নাসাফি, তাফসীর, ৩/৬৫১; তিরমিযি, ২৬২৬; ইবনু মাজাহ, ৩৯৭৩)

সূরা দুহা

سُوْرَةُ الضُّحٰى

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১১-তম সূরা। এর আগে সূরা ফাজ্‌র ও পরে সূরা আলাম নাশরাহ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯৩-তম সূরা। এর আগে আছে সূরা লাইল ও পরে সূরা আলাম নাশরাহ।

এক নজরে দুহা

- নুবুওয়াতের শুরুর দিকে নাযিল
- সূরা নং: ৯৩
- আয়াত: ১১
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘দুহা’ মানে সকালের উজ্জ্বল আলো। সকাল ৯টা-১০টার দিকে সূর্য যখন তেজ ছড়াতে শুরু করে, আলো-ঝলমলে হয়ে ওঠে চারিপাশ—তখনকার সময়কেই বলা হয় দুহা। এ-সূরার শুরুতেই আল্লাহ ‘দুহা’ তথা দিনের বিশেষ একটা সময়ের কসম করেছেন। আর আল্লাহ যখন সূরার শুরুতেই কোনোকিছুর কসম করেন, তখন সূরার নামও হয় কসমের বিষয়টি ধরে। সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে ‘দুহা’।

মেজর থিম

০১. আল্লাহর ওয়াদা, নবিজিকে সান্ত্বনা।

০২. শুরুর চেয়ে শেষটা উত্তম, প্রতিদানও হবে চমৎকার।

০৩. আল্লাহর অনুগ্রহ, বান্দার করণীয়।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে রাসূল ﷺ-কে জানানো হলো—"তোমার রব তোমাকে ছেড়ে যাননি, অপছন্দও করেননি।" অর্থাৎ ওহি আসা সাময়িক বন্ধ থাকলেও, নবিজি আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের মধ্যেই ছিলেন। এটি তাঁর প্রতি বিরাট এক অনুগ্রহ। আর এই অনুগ্রহের শুকরিয়া হিসেবে সূরার শেষে এসে তাঁকে আদেশ দিলেন, তিনিও যেন এতিম, অভাবীদের ওপর অনুগ্রহ করেন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরাটি হলো—সূরা লাইল; যার শেষ দিকে বলা হয়েছে: "(সে দান করে) কেবল তার মহামহিম রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য; আর এমন ব্যক্তি অচিরেই (আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।" আর এ-সূরায় এসে সেই অনুগ্রহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী সুখ।

শানে নুযুল

এ-সূরার শানে নুযুল উঠে এসেছে জুনদুব ইবনু সুফিয়ান ﷺ-এর বর্ণনায়। তিনি বলেন—অসুস্থতার কারণে রাসূল ﷺ দুই বা তিন রাত তাহাজ্জুদে জাগতে পারেননি। তখন এক মহিলা এসে বলল, 'ও মুহাম্মাদ, আমার মনে হয় তোমার ওই (জিবরীল) শয়তানটা তোমাকে ছেড়ে গেছে। দু-তিন দিন হয়ে গেল, আমি তাকে তোমার আশপাশে দেখছি না যে!' তখন নবিজিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা সূরা দুহা নাযিল করেন।

তার মানে, অল্প ক'দিন ওহি নাযিল বন্ধ থাকায় মক্কার মুশরিকরা এটাকে একটা ইস্যু বানায়। তারা রটাতে থাকে—'মুহাম্মাদকে তার রব ভুলে গেছে। আর জিবরীলও তাকে ছেড়ে গেছে। এখন তার আর কেউ নেই, সে ভীষণ একা।' মুশরিকদের এসব অপপ্রচারের জবাব দিতেই সূরা দুহা সঙ্গে নিয়ে আসমান থেকে নেমে আসেন জিবরীল ﷺ।

(দেখুন—বুখারি, ৪৯৫০)

সেগমেন্ট

দুইটি শপথ

সূরার প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলা গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের ওপর শপথ করেছেন: উজ্জ্বল দিনের ও অন্ধকার রাতের।

তিনটি সুসংবাদ

এরপরের তিন আয়াতে নবি ﷺ-কে তিনটি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে—(১) তাঁর রব তাঁকে ছেড়ে যাননি, (২) তাঁর শুরুর চেয়ে শেষটা হবে উত্তম, (৩) তাঁকে এমন-কিছু দান করবেন, যা হবে তাঁর পছন্দনীয়।

তিনটি অনুগ্রহ

এরপরের তিন আয়াতে নবিজিকে-দেওয়া আল্লাহর তিনটি অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—(১) এতিম অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেওয়া, (২) সঠিক পথ দেখানো, (৩) অভাব থেকে মুক্ত করা।

তিনটি দায়িত্ব

এরপরের তিন আয়াতে নবিজিকে তিনটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে—(১) এতিমের প্রতি কঠোর না হওয়া, (২) ভিক্ষুককে তিরস্কার না করা, (৩) আল্লাহর অনুগ্রহের কথা আলোচনা করা।

ফজিলত

মুআয ইবনু জাবাল ﷺ-কে নবিজির-দেওয়া উপদেশ: যখন নামাজে মানুষের ইমামতি করবে, তখন তাদের জন্য সহজ করবে। মানে, লম্বা সূরা তিলাওয়াত করবে না। আর সহজ করার জন্য এ-সূরাগুলো পাঠ করবে: আ'লা, দুহা ও ইনফিতার।

(দেখুন—নাসাঈ, ৯৯৭, সহীহ)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কষ্টের সময়গুলো ধৈর্যের সঙ্গে কাটান; → এতে আপনার সুখের সময়টা আনন্দের হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

সুদিনের আশ্বাস; বান্দার করণীয়

১. জীবনের পালা-বদল

দিন-রাতের মতো মানুষের জীবনেও পালা-বদল আসে। অনিশ্চয়তার মধ্যেই আশার আলো জ্বলে ওঠে। তাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে হবে। কিছুতেই নিরাশ হওয়া যাবে না।

২. বিপুল অনুগ্রহের ওয়াদা

আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা করা হয়—তিনি তাঁর রাসূলকে নিয়ামাত দিয়ে খুশি করে দেবেন।

৩. আগের অনুগ্রহ স্মরণ করানো

নবিজি এতিম, পথহারা ও অভাবী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন এবং অভাব দূর করেছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি ভীষণ দয়াবান।

৪. কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা

অনুগ্রহধন্য হয়েছ। এবার তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। নিজেকে গড়ে তোলো 'আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার (Socio-economic justice)' প্রতিষ্ঠার রোল-মডেল হিসেবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
দিন ও রাতের শপথ! মানুষের জীবনে উত্থান-পতন থাকবেই—ঠিক যেভাবে ঝলমলে দিন শেষে রাতের আঁধার নামে।	১-২	আল্লাহ নবিজিকে অভাবী অবস্থায় পেয়েছেন। এরপর তাঁর অভাব দূর করেছেন।	৮
কাফিরদের কথা পুরোপুরি অযৌক্তিক। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ছেড়ে যাননি। তাঁকে অপছন্দও করেননি।	৩	আর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ রাসূলকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন: তিনি কোনো এতিমকে তাড়িয়ে দেবেন না।	৯
রাসূলের শুরুর চেয়ে শেষের সময়টা ভালো হবে। আল্লাহর এত এত নিয়ামাত দেখে তখন তিনি খুশি হয়ে যাবেন।	৪-৫	কেউ তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে, তিনি তিরস্কার করবেন না।	১০
আল্লাহ তাঁকে এতিম ও পথহারা অবস্থায় পেয়েছেন। এরপর তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন।	৬-৭	আর তাঁর রবের অনুগ্রহের কথা আলোচনা করবেন। এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবেন।	১১

কেইস-স্টাডি

আল্লাহ যদি কোনো বিষয় নিয়ে কসম করেন, তাতে আমাদের জন্য ভাবনার খোরাক থাকে। এ-সূরায় আল্লাহ কসম করেছেন রাত ও দিনের পালাবদল নিয়ে। কুরআনে আল্লাহ বহু জায়গায় পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন, মানুষের জীবন রাত-দিনের পালাবদলের মতো। সুদিন ও দুর্দিন মিলিয়েই মানুষের জীবন চলে। আপনার গোটা জীবনের মাইন্ডসেট বদলে দেওয়ার জন্য এই অনুধাবনটুকুই যথেষ্ট। রাত আঁধারে ঢাকা বলেই তা মন্দ কিছু নয়। রাত আপনাকে বিশ্রামের সুযোগ করে দেয়। নির্জনে রবের ইবাদাত করার সুযোগও কেবল রাতের কারণেই। তেমনি আমাদের জীবনেও যে সময়টা আঁধারে ঢাকা মনে হয়, সাদা চোখে মন্দ ও কষ্টের মনে হয়—সেই সময়টা থেকেও আমাদের কিছু-না-কিছু নেবার আছে। নিজেকে শুধরে নেবার এবং কোমর সোজা করে দাঁড়াবার সুযোগ আছে।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩১/১৯১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে সুন্দর কিছু মুহূর্ত আসে। তখন ইবাদাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর খুব কাছের বান্দা হয়ে উঠি। নামাজে দাঁড়ালেই মনটা শান্তিতে ভরে যায়। রবের পানে দু-হাত তুললেই অঝোরে কান্না আসে। আত্মাটা কেমন সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই মুহূর্তটা সব সময় থাকে না। সময়ে সময়ে আমরা কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলি। নামাজে দাঁড়ালে মনটা আর শান্ত হয় না। ঠিক ওই সময়টায় আপনার-আমার মোটিভেশন—সূরা দুহা। রাসূল ﷺ-এর কাছে মাঝের কিছুদিন ওহি আসা বন্ধ ছিল। তাই নবিজি ভাবতে থাকেন—আল্লাহ কি আমার ওপর রাগ করেছেন? আমি কি এমন কিছু করেছি, যার জন্য ওহি আসা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল? তখন আল্লাহ কী চমৎকার করেই-না নবিজিকে সান্ত্বনা দিলেন। আবার নতুন উদ্যমে ওহি আসা শুরু হবে। আসলে মানুষের জীবনটা এমনই। সময় সর্বদা একরকম যায় না।

আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমাদেরকেও বার্তা দিলেন, তোমাদের ইবাদাতে কখনো ঘাটতি হতে পারে। তখন হতাশ হয়ে একেবারে ইবাদাত করাই ছেড়ে দেবে—এমনটা যেন না হয়। বরং লেগে থাকো। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। ঝলমলে দিনের দেখা পাবে নিশ্চয়ই।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩১/১৯১)

এক-নজরে আলাম নাশরাহ

- সূরা নং: ৯৪
- মাক্কি
- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- আয়াত: ৮

নামের রহস্য

‘আলাম নাশরাহ’ মানে ‘আমি কি প্রশস্ত করে দিইনি?’ সূরার প্রথম আয়াতে রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন—“আমি কি তোমার বুক প্রশস্ত করে দিইনি?” সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে ‘আলাম নাশরাহ’। সূরাটির আরেকটি নাম হলো ‘শারহ’। ‘শারহ’ শব্দটি ‘নাশরাহ’ শব্দ থেকেই এসেছে, যার অর্থ ‘সম্প্রসারণ; প্রশস্তকরণ’।

মেজর থিম

০১ রাসূল ﷺ-এর বুককে আল্লাহ প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

০২ বোঝা সরিয়ে তাঁর পিঠকে হালকা করে দিয়েছেন।

০৩ তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ ﷺ-কে যেসকল নিয়ামাত দান করেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর নবিকে জানিয়ে দিলেন, জীবনে কষ্ট আসবে। আবার সেই কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকবে। তাই সূরার শেষে তাঁকে উপদেশ দিলেন—কষ্টকর অবস্থা থেকে কিছুটা অবসর হলেও, তিনি যেন আল্লাহর কাছে মনের আকুতি পেশ করার ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগ দেন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা দুহা; যা শেষ করা হয়েছে এই বাণীর মাধ্যমে: "আর তোমার রবের অনুগ্রহের কথা আলোচনা করো।" এরপর সূরা আলাম নাশরাহ-তে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেওয়া অনুগ্রহসমূহের একটি বিবরণ তুলে ধরেছেন।

শানে নুযুল

সূরা দুহার পরপরই এই সূরাটি নাযিল হয়। আর এটিও সেই একই উদ্দেশ্যে নাযিল হয়—রাসূলকে সান্ত্বনা দেওয়া। নুবুওয়াত-লাভের আগে মক্কাবাসী তাঁকে অনেক মর্যাদার চোখে দেখত। কিন্তু যেই-না তাওহীদের বাণী নিয়ে লোকদের কাছে ছুটে গেলেন, অমনি বন্ধু থেকে শত্রু বনে গেল সবাই। নবিজি দাওয়াত দিতে বের হলেই কুরাইশরা তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। যদিও নবিজি এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন, তবে নুবুওয়াতের শুরুর দিকটায় ভীষণ কষ্ট পেতেন তিনি। আর তখনই আল্লাহ সূরা দুহার মাধ্যমে নবিজিকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। তাই দুশ্চিন্তা করো না। এই দুঃসময় কেটে যাবে। পাশাপাশি স্বস্তি পাওয়ার জন্য আরও উপদেশ দেওয়া হয়: কাজ-কর্ম থেকে যখনই অবসর হও, তখনই মনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর কাছে চাও। মনের সকল আকুতি তাঁর কাছেই তুলে ধরো।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/১১৫, তাফহীমুল কুরআন, ১৯/১৫৪)

সেগমেন্ট

আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ

আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর ওপর যেসব অনুগ্রহ করেছেন—সূরার শুরুতেই তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কষ্টের সাথে স্বস্তি

ধৈর্য ধরে থাকো। দেখবে, আল্লাহ তোমার বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। মনে রাখবে—যখনই কষ্ট আসবে, তার সাথে সাথে স্বস্তিও আসবে।

করণীয়

এবার তোমার দায়িত্ব বুঝে নাও—যখন কষ্টকর অবস্থা থেকে কিছুটা অবসর হবে, তখন পরম আগ্রহ নিয়ে তোমার রবের প্রতি মনোযোগ দেবে।

ফজিলত

সূরা আলাম নাশরাহ মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সুযোগ মিললেই মহান রবকে স্মরণ করতে হবে;

এতে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক মজবুত হবে।

গতিপথ

১. হৃদয়কে প্রশস্ত করে দেওয়া
নববি মিশনে অনেক চাপ আসবে, আসবে বাধা-বিপত্তি। সেসব বাধা উতরে যাওয়ার জন্য চাই দৃঢ় মনোবল। তাই তো আল্লাহ তাঁর রাসূলের অন্তরকে প্রশস্ত করে দেওয়ার মাধ্যমে মিশনের জন্য প্রস্তুত করে দিলেন।

২. বোঝা নামিয়ে দেওয়া
নববি কাজ করতে গেলে, পিঠে চেপে বসে বিরাট বোঝা। শারীরিক-মানসিক কষ্টে মনটা ভার হয়। তবে একটা সময় আল্লাহ সেই বোঝা নামিয়ে দেন। তখন মেলে স্বস্তি।

সেন্ট্রাল থিম
কষ্টের সাথে স্বস্তি

৩. জীবনের এক ধ্রুব-চক্র
কষ্টের পর স্বস্তি, স্বস্তির পর কষ্ট—জীবনের এক চরম বাস্তবতা। মানুষের জীবনে এই প্রক্রিয়া একটি চক্রের মতো ঘুরপাক খায়। আর এটিই আল্লাহর নির্ধারিত রীতি।

৪. কাজে নামার পালা
কষ্ট কেটে গিয়ে ভালো সময় এলেই কাজে নেমে পড়তে হবে। একাগ্র-চিত্তে আল্লাহর ইবাদাত করে যেতে হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ তাআলা রাসূলের বুককে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ওপর থেকে বোঝা নামিয়ে, তাঁকে হালকা করেছেন।	১-৩	তাই যখনই স্বস্তির দেখা দেবে, কষ্টকর অবস্থা থেকে কিছুটা মুক্তি মিলবে, তখনই আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।	৭
বিশ্ববাসীর সামনে আল্লাহ তাআলা রাসূলের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।	৪	পরম আগ্রহ নিয়ে রবের কাছে মনের আকুতি তুলে ধরতে হবে।	৮
দুঃখ-কষ্ট মানুষের জীবনে চিরকাল থাকে না। কষ্টের পরপরই স্বস্তির দেখা মেলে।	৫-৬		

কেইস-স্টাডি

কষ্টের পর স্বস্তি এলে, আমাদের করণীয় কী? এ ব্যাপারে এই সূরার ৭ ও ৮ নং আয়াতে এসেছে—"সুতরাং যখন (কষ্টকর অবস্থা থেকে) কিছুটা অবসর হও, তখন (আল্লাহর কাছে চাওয়ার ব্যাপারে) পূর্ণ মনোযোগ দাও: পরম আগ্রহ নিয়ে তোমার রবের কাছে মনের আকুতি পেশ করো।" দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে বাধা-বিপত্তি এলে, ধৈর্য ধরতে হবে। আর বাধা কেটে গেলে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। হাড়ভাঙা খাটুনির পরও রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। মনের আকুতি তাঁর কাছে তুলে ধরতে হবে। কারণ, তিনিই যে সবচেয়ে ভালো শ্রোতা ও দাতা। তাই কুরআনের এই আয়াত-দুটো নিয়ে আমরা কেইস-স্টাডি করব। তা হলে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে আরও বেশি সজাগ হতে পারব।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৫৯৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৪ নং আয়াতটি দেখুন—"আর তোমার মর্যাদা সমুন্নত করে দিয়েছি।" আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে ঠিক এভাবেই আশ্বস্ত করেছিলেন। তবে এমন একটি সময় নবিকে আশ্বস্ত করেছিলেন, যখন মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন লোক তাঁর অনুসারী। চারিদিকে তাঁর বিরোধিতা চলছে। তাই কীভাবে রাসূলের মর্যাদা সমুন্নত হবে, তা ছিল এক বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহ তাঁর পরিকল্পনা ঠিকই বাস্তবায়ন করলেন। রাসূলের নামডাককে তিনি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিলেন মক্কা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে। আর এই কাজটি তিনি এমন লোকদের দিয়ে করিয়েছেন, যারা সব সময় রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকত। নবিজির কাছে যাতে কোনো মানুষ না যায়, তাঁর দাওয়াত যেন কেউ গ্রহণ না করে, সেজন্য কাফিররা চক্রান্ত শুরু করল। হজ্জের মওসুমে তারা হাজীদের প্রতিটি তাঁবুতে যেত। আর গিয়ে বলত, এখানে 'মুহাম্মাদ' নামের এক লোক আছে। সে যার সাথে কথা বলে, সে-ই জাদুতে আক্রান্ত হয়। ফলে বাপ-ছেলে, ভাই-ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরে। বিচ্ছেদ দেখা দেয়। খবরদার, তার সাথে কথা বলবেন না। এভাবে কাফিররা আরবের প্রতিটি গোত্রের কাছে নবিজির নাম পৌঁছে দেয়। এর ফলে মানুষ তাঁর ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে নবিজি মদীনায় হিজরত করেন। আর মাত্র দশ বছরের মধ্যেই নবি ﷺ-এর খ্যাতি সমগ্র আরবে সমুন্নত হয়ে গেল। চারিদিকে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ"-এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তারপর খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল থেকে নবিজির মোবারক নাম উচ্চারিত হতে লাগল সারা দুনিয়ায়। এই সিলসিলাটি আজ পর্যন্ত বেড়েই চলছে। এখন দিন-রাতের এমন একটুখানি সময়ও ফাঁকা নেই, যখন সারা দুনিয়ার কোথাও-না-কোথাও তাঁর মোবারক নাম পাঠ করা হচ্ছে না!

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৫৯৬; সা'লাবি, তাফসীর, ২৯/৫২৮; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/১৫৯)

সূরা তীন

سُوْرَةُ التِّيْنِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২৮-তম সূরা। এর আগে সূরা বুরূজ ও পরে সূরা কুরাইশ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯৫-তম সূরা। এর আগে আছে সূরা আলাম নাশরাহ ও পরে সূরা আলাক।

এক নজরে তীন

- মাক্কি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ৯৫
- আয়াত: ৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘তীন’ ডুমুর-জাতীয় আর ‘যাইতুন’ জলপাই-জাতীয় এক-ধরনের ফল। সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা তীন-যাইতুন, সিনাই পর্বত ও নিরাপদ ভূমি শব্দগুলো দিয়ে কসম করেছেন। তাফসীরবিদদের মত হচ্ছে—এর মাধ্যমে ইবরাহীম ﷺ থেকে শুরু করে মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ ﷺ-সহ অসংখ্য নবি-রাসূলের প্রতি ইঙ্গিত করে এই কসম করা হয়েছে। আর আল্লাহ যখন সূরার শুরুতেই কোনোকিছুর কসম করেন, তখন সূরার নামও হয় কসমের বিষয়টি ধরে। সেখান থেকেই এ-সূরার নাম হয়েছে ‘তীন’।

মেজর থিম

০১ সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টি, কর্ম মানুষকে নিকৃষ্ট বানায়।

০২ উত্তম হবার উপায়: ঈমান ও ভালো কাজ।

০৩ পরকাল সুনিশ্চিত। সেদিন সবার সঙ্গে আল্লাহ ন্যায়-বিচার করবেন।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ বলেছেন, আমি মানুষকে সর্বোত্তম গড়নে সৃষ্টি করেছি। আর শেষে এসে বলেছেন, আমিই সর্বোত্তম বিচারক। তার মানে, তিনি বার্তা দিলেন—এরকম সুন্দর গড়নে সৃষ্টি করার পরও, মেধা বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দেওয়ার পরও যে আমার বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার উপযুক্ত বিচারের জন্য আমিই যথেষ্ট।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আলাম নাশরাহ। সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি কি তোমার বুক প্রশস্ত করে দিইনি?" অর্থাৎ সংকুচিত বুককে আসমানি জ্ঞানের দ্বারা প্রশস্ত করা হয়েছে। আর এ-সূরাতে এই বার্তা আরও স্পষ্ট করা হয়েছে: ঈমান ও ভালো কাজের মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ পরিণত হয় সর্বোত্তম বান্দায়।

শানে নুযুল

নবিজির আমলে কিছু লোক বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছুল। একসময় বয়সের কারণে তারা যখন স্মৃতিশক্তি হারাতে বসল, তখন লোকজন তাদের ব্যাপারে নবিজির কাছে জানতে চাইল—'আল্লাহর রাসূল, এই বৃদ্ধ লোকগুলো তো আর আমল-ইবাদাত কিছুই করতে পারবে না। ঈমানের সাক্ষ্যও দিতে পারবে না। এদের কী হবে!' তখন সেসব বয়স্ক লোকের জন্য শিথিলতার সুসংবাদ নিয়ে এ-সূরাটি নাযিল হয়। সুসংবাদটি হলো—স্মৃতিশক্তি হারানোর আগে তারা যে যেমন আমল করেছে, তাদের প্রতিদানও হবে সে-অনুযায়ী।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/৫০৮)

সেগমেন্ট

রেপ্লিকা (উদাহরণ)

অতীতের নবি-রাসূলদের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেন ওই সময়কার ঘটনাবলির প্যাটার্ন বোঝার চেষ্টা করা হয়। অধিকাংশ মানুষই শুরুতে নবিদের বিরোধিতা করেছিল।

ডিনায়াল (অস্বীকার)

আসলে মানুষ স্বভাবতই নীচ প্রকৃতির। ওহির জ্ঞান না-থাকা অবস্থায় তার আর অন্য প্রাণীর মাঝে খুব একটা তফাত নেই। এ কারণেই শুরুতে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

মেনে-নেওয়া

কিন্তু একসময় সে সত্যটা মেনে নেয়। ঈমান আনে, এবং ভালো কাজ করে। এ কারণে ধারাবাহিকভাবে ম্যাসেজিং চালিয়ে যেতে হবে।

ফজিলত

রাসূল ﷺ বলেন: 'তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি ওয়াত-তীন ওয়ায-যাইতুন পড়বে, তারপর সূরাটির শেষ আয়াতে পৌঁছুবে—মানে 'আল্লাহ কি সর্বোত্তম বিচারক নন?' তিলাওয়াত করবে—সে যেন তখন এই বলে উত্তর দেয়: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (হ্যাঁ, আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সবচেয়ে উত্তম বিচারক)।' নবিজি নিজেও সব সময় এমনটা করতেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ৮৮৭)

বারা ইবনু আযিব 🕮 বলেন, 'এক সফরে আমি নবিজির সঙ্গে ছিলাম। এ-সময় এশার নামাজের ওয়াক্ত হলো। তিনি এশার নামাজ পড়ালেন। আর দু-রাকআতের এক রাকআতে তিনি সূরা তীন তিলাওয়াত করলেন।

(বুখারি, ৭৬৭; মুসলিম, ৪৬৪)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আমাদের দৈহিক গঠন-সহ আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামাত নিয়ে ভেবে দেখলে; → আল্লাহর সম্মুখে বিনয় ও আত্মসমর্পণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

ওহির লেগাসি বা পরম্পরা এবং মানুষের বৈশিষ্ট্য

১. বিশেষ তিনটি জায়গার কসম

এই কসমের মাধ্যমে অসংখ্য নবি-রাসূলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, আসমানি ওহির ধারাবাহিকতা বোঝানো। আমরাও যেন ওহির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার এই ধারাবাহিকতা চালু রাখি, সেই ম্যাসেজ দেওয়া।

২. ব্যালেন্স: মানুষের গড়ন

মানুষকে বানানোই হয়েছে এমন গড়ন দিয়ে যে—সে তার কথা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে অন্য মানুষকে বোঝাতে পারবে। দুনিয়ায় আল্লাহর দাসত্বের ধারা চালু রাখতে পারবে।

৩. ওহির বার্তা প্রত্যাখ্যানের ফল

মানুষকে অবশ্যই ওহির বাণী মেনে নিতে হবে। তা না হলে তার এই চমৎকার গড়ন, বুদ্ধিমত্তা ও বৈশিষ্ট্য কোনো কাজে আসবে না। সে পরিণত হবে নিচুর-চেয়েও-নিচু প্রকৃতির প্রাণীতে।

৪. আল্লাহ সর্বোত্তম ন্যায়-বিচারক

সুতরাং কারও প্রতি সামান্যতম জুলুমও করা হবে না। যে ভালো কাজ করবে, সে পুরস্কার পাবে। আর যে খারাপ কাজ করবে, সে শাস্তি পাবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহ তাআলা বিশেষ তিনটি জায়গার কসম করে জানালেন—তিনি সর্বোত্তম গড়নে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।	১-৪	এরপর মানুষকে বিচার দিবসের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হলো।	৭
কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা করার শাস্তি হিসেবে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয় সর্বনিম্ন স্তরে।	৫	নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়-বিচারক। বিচার দিবসে তিনিই চূড়ান্ত ফায়সালাকারী।	৮
তবে যারা ঈমানের ওপর অটল থেকেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের কথা ভিন্ন। তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ সম্মান আর পুরস্কার।	৬		

কেইস-স্টাডি

কুরআনে অগণিত জায়গায় আল্লাহ মানুষের গড়ন নিয়ে কথা বলেছেন। একটা বিষয় খেয়াল করবেন—ডাক্তারদের মধ্যে নাস্তিকতার প্রবণতা খুবই কম। কেননা, একটা দেহের যে জটিল ফাংশন, কারও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তা কোনোভাবেই সচল থাকা সম্ভব নয়। মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে মাথায় আর বুকের ভেতর। সামান্য আঘাতেই এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বুককে বানিয়ে দিলেন শক্তিশালী খাঁচার মতন। আর মস্তিষ্কের চারপাশে দিলেন লোহার মতোই শক্ত হাড়ের আবরণ। কেবল নিউরনের গঠন নিয়ে গবেষণা করাই একজন মানুষের জন্য আল্লাহর ওপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। এ কারণেই আমাদের উচিত, নানান ব্যস্ততার বাইরেও নিজের শারীরিক গঠন নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করা।

(দেখুন—সূরা যারিয়াত, ৫১:২১; বাগাবি, তাফসীর, ৭/৩৭৩; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৩৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষ সেরা জীব। আকার-আকৃতি, বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি কিংবা অনুধাবন শক্তি—সকল দিক দিয়েই বাকি যে-কোনো প্রাণীর চেয়ে মানুষই এগিয়ে। সৃষ্টি হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিলেন স্বয়ং স্রষ্টা। এই সূরার ৪র্থ আয়াতে তিনি ঘোষণা দিলেন, "আমি মানুষকে সর্বোত্তম গড়নে সৃষ্টি করেছি।" তবে, মানুষ তার এই শ্রেষ্ঠত্বকে সব সময় ধরে রাখতে পারে না। শুধু শ্রেষ্ঠত্ব যে হারায় তা না; বরং নিজেকে টেনে নামিয়ে ফেলে সৃষ্টির সর্বনিম্ন স্তরে। এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন—"তারপর (অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে) তাকে পরিণত করেছি নিচুদের মধ্যে সর্বনিম্ন শ্রেণিতে।" অর্থাৎ মানুষ যখন আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, তখন আর সে সেরা জীব থাকে না। তার অবাধ্যতা যত বাড়তে থাকে, ততই সে নিচের দিকে নামতে থাকে। এভাবে নামতে নামতে তার মধ্যে মানুষের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। সে পৌঁছে যায় সর্বনিম্ন শ্রেণিতে। তখন অন্যের হক নষ্ট করতে সে দ্বিধা করে না। মানুষের ওপর হিংস্রতা চালানো তার কাছে স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয়। তাই, আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হবে। সব সময় চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, আমার দ্বারা আল্লাহর কোনো অবাধ্যতার কাজ হয়ে যাচ্ছে না তো! এমনটা হলে, মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যেতে হবে।

সূরা আলাক

سُوْرَةُ الْعَلَقِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১ম সূরা। এরপরে সূরা মুদ্দাসসির/ সূরা কলম নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা তীন ও পরে সূরা কদর।

এক নজরে আলাক

- মাক্কি যুগের শুরুতেই নাযিল
- সূরা নং: ৯৬
- আয়াত: ১৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘আলাক’ মানে ‘জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড’। মানুষের সৃষ্টির শুরুর ধাপ সেটা। সূরার দ্বিতীয় আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘আলাক’।

মেজর থিম

০১ জ্ঞান দান করে মানুষকে অনুগ্রহধন্য করা হয়েছে।

০২ মানুষের সীমালঙ্ঘন।

০৩ সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণতি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পড়ার আদেশ দিয়েছেন। পড়ার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান লাভ করবে। আর জ্ঞানের বৈশিষ্ট হলো—এটি মানুষকে বিনয়ী করে। অর্থাৎ যে যত জ্ঞানী, তিনি তত বিনয়ী হবেন। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ সূরার শেষে মানুষকে তাঁর উদ্দেশ্যে সাজদা করবার আদেশ দিলেন—যা বিনয় প্রকাশের সর্বোচ্চ ধরন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা তীন; যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আমি মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি।" আর সেই মানুষ-সৃষ্টি বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা এই সূরাটিতে এসেছে।

শানে নুযুল

সূরা আলাক পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিল-হওয়া সূরা। নবিজির ওপর এই সূরার শুরুর পাঁচ আয়াত নাযিলের মধ্য দিয়ে ওহি আসা শুরু হয়। এর আগে থেকে রাসূল ﷺ হেরা গুহায় নিয়মিত যাওয়া-আসা করছিলেন। সেখানে তিনি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করতেন। হঠাৎ একদিন জিবরীল ﷺ সেখানে হাজির হন। এসেই তিনি নবিজিকে বললেন, 'পড়ো'। নবিজি বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না'। এ-কথা শুনে জিবরীল তাঁর বুকের সাথে ধরে নবিজিকে ভীষণ জোরে চাপ দিলেন। এরপর আবার বললেন, 'পড়ো'। নবিজি আবারও একই জবাব দিলেন। জিবরীলও আবার একই কাজ করলেন। এমন করে মোট তিনবার হলো। শেষবার চাপ দেওয়ার পর জিবরীল ﷺ বললেন, 'পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন...।' আর এভাবেই সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতে ছোট্ট পরিসরে মানুষকে রবের পরিচয় দেওয়া হয়। এরপর কেটে গেল অনেকদিন। নবিজি তখনো প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেননি। তবে আল্লাহর আদেশে মসজিদে হারামে একা একা নামাজ পড়তেন। আবু জাহল বুঝতে পেরেছিল—নবিজি হয়তো 'নতুন কোনো ধর্ম' নিয়ে আসতে যাচ্ছেন। তাই সে নবিজিকে নামাজ পড়তে দিতে চাইত না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সূরার বাকি অংশটুকু নাযিল হয়।

(দেখুন—বুখারি, ৩; মুসলিম, ২৭৯৭)

সেগমেন্ট

ওহির প্রথম বার্তা: 'পড়ো'

রাসূলের ওপর নাযিল-হওয়া প্রথম শব্দটিই ছিল—পড়ো। অর্থাৎ মানুষের জন্য 'পড়া' বা জ্ঞানার্জন করার কোনো বিকল্প নেই।

পড়তে হবে যাঁর নামে

মানুষ এমন এক সত্তার নামে পড়বে—যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে কলমের ব্যবহার শিখিয়েছেন, যেই কলমের লেখনীতে জ্ঞান ছড়ায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

অহংকারী লোকের স্বভাব ও পরিণতি

অহংকারী লোক আল্লাহর পথে চলতে মুমিনদেরকে বাধা দেয়। এদেরকে আল্লাহ ভীষণভাবে পাকড়াও করবেন। মুমিনরা কখনো অহংকারী লোকদের অনুগত হবে না।

ফজিলত

নবি ﷺ মুআয ইবনু জাবাল ﵁-কে উপদেশ দিয়েছিলেন: যখন তুমি মানুষের ইমামতি করবে, তখন সহজ করবে। সূরা শাম্‌স, আ'লা, আলাক, লাইল—এই সূরাগুলো দিয়ে নামাজ পড়াবে।

(দেখুন—মুসলিম, ৪৬৫)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, পড়তে ও লিখতে শিখিয়েছেন;

তাই সঠিকভাবে ও সঠিক জায়গায় জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে, তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা জরুরি।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

ওহির জ্ঞান আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা

১. সৃষ্টির সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক

রাসূল ﷺ-এর ওপর নাযিল-হওয়া প্রথম শব্দ থেকেই বোঝা যায়—জ্ঞানের সাথে আমাদের সম্পর্ক কতটা গভীর হওয়া উচিত। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার বিশ্বাসকে পাকাপোক্ত করবে, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবে।

২. চেতনার উৎকর্ষে ওহির ভূমিকা

আল্লাহ মানুষকে কলমের ব্যবহার শিখিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদেরকে জ্ঞানের নিয়ামাত দান করেছেন। আর এই জ্ঞান সরাসরি তাঁর ওহির মাধ্যমে এসেছে।

৩. নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবা যাবে না

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া মহাবিশ্বের আর কেউ-ই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। মানুষ যখন নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে না, তখনই সে অবাধ্যতার পথে ছোটে।

৪. ওহি প্রত্যাখ্যানের পরিণতি

যে বা যারা নিজে ওহির নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়, তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়ংকর।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
পড়া, জ্ঞান অর্জন করা ও লেখার আদেশ দেওয়া হয়েছে।	১-৫	আল্লাহর পথে বাধাদানকারী জালিমের স্বভাব ও পরিণতির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।	৯-১৮
মানুষ আল্লাহর অবাধ্যতার পথে ছোটে। কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে।	৬-৮	মুমিন কিছুতেই এ-ধরনের অবাধ্য লোকদের মর্জি-মাফিক চলতে পারে না।	১৯

কেইস-স্টাডি

এ-সূরার ৬-৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, “সাবধান! মানুষ অবাধ্যতার পথে ছুটছে, কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।” অর্থাৎ, মানুষের অবাধ্যতার পেছনে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করাটাই প্রধান কারণ। একজন মানুষ যখন মনে করে, আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই, তখনই সে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ তার ভাবনা হলো, আল্লাহর কাছে তার আর কিছু চাওয়ার নেই। সে কেন ‘শুধু-শুধু’ আল্লাহর কাছে নত হবে? এই চেতনাটা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রকৃত অর্থে, মানুষ কোনোদিনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। কেননা, মানুষের কোনো অবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। তথাকথিত ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ’ অবস্থাও পরিবর্তনশীল। আর অবস্থার এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়। তাই নিজেদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে হবে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সামনে নত হতে হবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৬০৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ এই যে—তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানসম্পন্নই বানাননি, কলমের ব্যবহারও শিখিয়েছেন। তিনি যদি মানুষকে লেখার কৌশল শিক্ষা না দিতেন, তা হলে মানুষের জ্ঞান অর্জন অনেকটা অনর্থক হয়ে পড়ত। কারণ সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার কোনো উপায় থাকত না। মানব সভ্যতার ক্রমাগত বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ত। এ সূরার ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানালেন—তিনিই কলমের ব্যবহার শিখিয়েছেন। সুতরাং আপনার কলম দিয়ে আপনি কী লিখবেন, তা খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। কারণ, আপনার লেখা হয়তো অনেকের কাছে পৌঁছে যাবে। সেই লেখা হয় আলোর পথ দেখাবে, আর নয়তো নিয়ে যাবে অন্ধকারের দিকে।

(দেখুন—ইবনু মাজাহ, ২০৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১০৫৫৬)

নবি ﷺ রাতের নামাজে এত দীর্ঘ সময় দিতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। এটা যে আল্লাহ তাআলার নিকটভাজন হওয়ার পথ, সূরার শেষ আয়াত থেকে আমরা তা বুঝতে পারি—“(আল্লাহর উদ্দেশ্যে) সাজদা করো আর (তাঁর) নিকটভাজন হও।” এখানে সাজদা দ্বারা উদ্দেশ্য নামাজ। কারও নামাজ দেখেই বোঝা যায়—সে আল্লাহর কতটা কাছের, আর কতটা আপন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়—তারা দীর্ঘ সময় নামাজে ব্যয় করেন। নামাজে দাঁড়ালে তাদের কোন তাড়াহুড়া দেখা যায় না। কেননা, নামাজের চেয়ে উত্তম কোনো কাজ নেই, আর মসজিদের চাইতেও দামি কোনো জায়গা নেই। তাই এটা উপলব্ধি করা জরুরি—আমরা যত বেশি আল্লাহর নিকটভাজন হতে চাইব, আমাদেরকে ঠিক তত বেশি সাজদা করতে হবে।

(দেখুন—বুখারি, ৪৮৩৭; তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ৭১৯৯)

সূরা কদর

سُوْرَةُ الْقَدْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২৫-তম সূরা। এর আগে সূরা আবাসা ও পরে সূরা শামস নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আলাক ও পরে সূরা বাইয়্যিনা।

এক নজরে কদর

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- আয়াত: ৫
- সূরা নং: ৯৭
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘কদর’ মানে ‘শক্তি; নির্ধারণ; ফায়সালা’। সূরার প্রথম আয়াতে ‘কদর’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে এই শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

মেজর থিম

০১ মর্যাদাপূর্ণ এক রাত।

০২ পৃথিবীর বুকে ফেরেশতাদের আগমন।

০৩ ভোর-পর্যন্ত শান্তির সুবাতাস।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু হয়েছে রাতের আলোচনা দিয়ে—“আমি কুরআন নাযিল করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাতে।” আর শেষ হয়েছে ভোরের আলোচনা দিয়ে—“প্রভাত উদয় হওয়া-পর্যন্ত রাতটি থাকে নিরাপদ।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা কদরে মর্যাদাপূর্ণ রাতে কুরআন নাযিল হবার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। এর আগে সূরা আলাক শেষ করা হয়েছে সাজদা করার আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং, কুরআন যেন আমাদেরকে বলে দিলো—আমরা যেন কদরের রাতে বেশি বেশি সাজদা ও কুরআন তিলাওয়াত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি।

শানে নুযুল

একদিন সাহাবিদের নিয়ে মসজিদে বসে গল্প করছেন নবিজি। পুরনো দিনের গল্প। আগেকার নবি ও তাঁদের উম্মতদের নিয়ে কথা হচ্ছে। কথায় কথায় নবিজি জানালেন, আগেকার উম্মতরা অনেক লম্বা হায়াত পেতেন। অনেকে তো বেঁচে ছিলেন প্রায় হাজার বছর। অনেক অনেক বছর আল্লাহর ইবাদাত করতে পারতেন তারা। বনী ইসরাঈলের এক লোক তো আল্লাহর রাস্তায় হাজার মাস জিহাদ করেছিল। মানে, তার জীবনের ৮৩ বছর সে কেবল তরবারি-ই চালিয়েছে। এই কথা শুনে নবিজির সামনে-থাকা সকল সাহাবি খুব অবাক হয়ে গেলেন। এক লোক ৮৩ বছর যুদ্ধ করেছে! অথচ আমাদের বেশিরভাগ লোক তো ৮৩ বছর হায়াতও পায় না। তারা এত লম্বা সময় ধরে আল্লাহর ইবাদাত করে যেই মর্যাদা পেয়েছে, আমাদের পক্ষে তা কী করে অর্জন করা সম্ভব! এই আলোচনার সময় জিবরীল ﷺ সেখানে সুসংবাদ নিয়ে হাজির হলেন। সূরা কদর নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, কদরের মাত্র একটি রাত-জুড়ে ইবাদাত করলেই মিলবে হাজার মাস ইবাদাত করার সাওয়াব!

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৪৯০; ওয়াহিদি, আত-তাফসীরুল বাসীত, ২৪/১৯৩; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৫০৯)

সেগমেন্ট

আলোকিত এক রাত

লাইলাতুল কদরের মর্যাদা বলে শেষ করা যাবে না। এই রাতেই নাযিল হয় পবিত্র কুরআন। তাই এ রাতটা সহস্র রাতের চেয়েও উজ্জ্বল, ঝলমলে।

হাজার মাসের চেয়েও উত্তম

হাজার মাস ইবাদাত করলে যে-পরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে, তা মিলবে এই এক রাতের ইবাদাতেই। এ-এক মহা-সুযোগের রাত।

প্রশান্তিময় রজনি

সুবহে সাদিক হবার আগ-পর্যন্ত এই রাতটি থাকে শান্তিময়, নিরাপদ।

ফজিলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান ও সাওয়াবের আশাসহ ইবাদাত করবে, তার আগের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

(বুখারি, ২০১৪; মুসলিম, ৭৬০)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

কদরের রাতে ভোর অবধি চারিদিক থাকে শান্তিময় ও নিরাপদ;

তাই এই রাতে মন-প্রাণ উজাড় করে আল্লাহর ইবাদাত করা ও তাঁর অনুগ্রহ খোঁজা উচিত।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

লাইলাতুল কদরের শ্রেষ্ঠত্ব

১. লাইলাতুল কদরের তাৎপর্য

আল্লাহ তাআলা লাইলাতুল কদরের একটিমাত্র রাতকে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলেছেন। এই রাতে চারিদিকে শুধু কল্যাণ বইতে থাকে।

২. ফেরেশতাদের আগমন

এই রাতে অগনতি ফেরেশতা নেমে আসেন ধরার বুকে। এমনকি ফেরেশতা-প্রধান জিবরীল ﷺ-ও আল্লাহর আদেশে জমিনে আগমন করেন।

৩. সময়ের মূল্য

মাত্র একটি রাত, হ্যাঁ, সারা বছরে কেবল এই একটি রাত ইবাদাত করলেই মিলবে হাজার মাস ইবাদাত করার সাওয়াব। তাই এ-রাতের প্রতিটি সেকেন্ড অত্যন্ত মূল্যবান। অমূল্য রত্নের চেয়েও বেশি দামি।

৪. স্নিগ্ধ প্রশান্তি

এই রাতে চমৎকার এক পরিবেশ বিরাজ করে চারিদিকে। আল্লাহ তাঁর গোলামদেরকে প্রশান্তির আবরণে ঢেকে দেন। রাতভর তারা ইবাদাতে মগ্ন থেকে তাঁরই অনুগ্রহ তালাশ করে, আর গুনাহ থেকে ক্ষমা চায়।

ওভারভিউ	আয়াত
কদরের রাত বা লাইলাতুল কদরের মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	১-৫

কেইস-স্টাডি

এই সূরার ২য় আয়াতে আল্লাহ বলেন, "কদরের রাতটি কত গুরুত্বপূর্ণ তা এখনো তোমার বুঝে আসেনি!" নবিজিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা এই কথাটি বলেছেন। তা হলে ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই রাতটি! পরের আয়াতে আল্লাহ নিজেই জানালেন, "কদরের রাতটি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।" এখানে আল্লাহ শুধু বললেন, হাজার মাস। কিন্তু কত হাজার মাস, তা কিন্তু তিনি উল্লেখ করেননি! তার মানে এই রাতের মর্যাদা, সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না। সহজ কথায় বললে, এই রাতের গুরুত্ব সীমাহীন। তাই, এই কদরের রাত মুমিন বান্দার জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। তবে, বিশেষ এই রাতটির তারিখ নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। হাদীস-বিশারদদের মাঝেও আছে মতানৈক্য। অবশ্য এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন, আমরা যেন শুধু একটি রাত নিয়েই পড়ে না থেকে, বরং রমাদানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে তাঁর দুয়ারে হাত পাতি। তাঁর সাথেই সম্পর্ক গড়ি।

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরাটির প্রথম আয়াতেই আল্লাহ ঘোষণা দিলেন, "আমি কুরআন নাযিল করেছি ফায়সালার রাতে।" আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন রাতের বেলায়, দিনের বেলায় নয়; এটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে যে, রাতের আলাদা একটা মর্যাদা আছে। কুরআন-সুন্নাহ হতে এ বিষয়টি স্পষ্ট; যেমন কুরআনে এসেছে—"আর রাতের বেলা তাহাজ্জুদ আদায় করো—তোমার জন্য সেটা ঐচ্ছিক", "আর তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো রাতের বেলা ও নামাজ শেষে", "নিঃসন্দেহে রাতে জেগে ওঠা প্রবৃত্তি-দমনের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী ও কুরআন পাঠের জন্য অধিক উপযুক্ত" ইত্যাদি। আর হাদীসে এসেছে—"প্রত্যেক রাতেই মহামহিম আল্লাহ রাতের শেষ-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে পৃথিবীর কাছাকাছি আসমানে নেমে আসেন"। এই সকল আয়াত-হাদীস প্রমাণ করে যে—আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও বিশেষ করুণা লাভের উপযুক্ত সময় হলো রাত। কারণ, রাতের সময়টায় অন্তর চিন্তামুক্ত থাকে, ব্যস্ততাও তেমন থাকে না, আবার পরিবেশও থাকে শান্ত। অন্তরকে আল্লাহর দিকে সহজেই নিমগ্ন করা যায়। মানুষের জীবনে নানান ধরণের ব্যক্তিগত সমস্যা থাকে। দেখা দেয় পারিবারিক আর সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। রাতের মর্যাদাকে কাজে লাগিয়ে বিপদ-মুক্তির চেষ্টা হলো বান্দার জন্য একটি বিশেষ সুযোগ। তাই এসব সমস্যার একটি সহজ সমাধান হলো, হৃদয়ে আকুতি নিয়ে রাতের বেলায় নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

(দেখুন—শানকিতি, তাফসীর, ৯/৩৮)

সূরা বাইয়্যিনা

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১০০-তম সূরা। এর আগে সূরা তালাক ও পরে সূরা হাশর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কদর ও পরে সূরা যিলযাল।

এক নজরে বাইয়্যিনা

- মাদানি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ৯৮
- আয়াত: ৮
- মাদানি

নামের রহস্য

'বাইয়্যিনা' শব্দের অর্থ 'অকাট্য প্রমাণ'। সূরার প্রথম আয়াতেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে 'বাইয়্যিনা'।

মেজর থিম

০১ আগের আসমানি কিতাবের অনুসারী ও তাদের অবাধ্যতা।

০২ কুরআনের বৈশিষ্ট্য: বক্রতামুক্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ।

০৩ সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টির পরিচয়।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে, আহলে কিতাব ও মুশরিকরা হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহির পথে চলতেই থাকবে, যতক্ষণ-না তাদেরকে রাসূল ﷺ আর তাঁর ওপর নাযিল-হওয়া কিতাবের মাধ্যমে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখানো হয়। আর সেই সুস্পষ্ট প্রমাণ যারা আঁকড়ে ধরে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও পুরস্কারের বর্ণনা দিয়ে সূরাটি শেষ হয়েছে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা কদর; যাতে রাসূল ﷺ-এর ওপর মহিমাময় কুরআন নাযিল হওয়ার বিশাল মর্যাদাপূর্ণ রাতটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরপরই সূরা বাইয়্যিনাতে বর্ণিত হয়েছে সেই কিতাবের প্রভাব। অনুগত বান্দাদের জন্য সেটি দলিল-প্রমাণের মতোই।

শানে নুযুল

দুনিয়ায় রাসূল পাঠানোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম এই সূরাটি নাযিল করেন। ইহুদি, খ্রিষ্টান কিংবা মুশরিক—যা-ই হোক না কেন—সবাই কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। এই কুফরের বেড়াজাল থেকে বের করতে আল্লাহ একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর সেই রাসূলের নিজ ব্যক্তিত্ব-ই তাঁর রাসূল হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তিনি লোকদের সামনে আল্লাহর কিতাবকে তুলে ধরেছেন সঠিকরূপে। তাঁকে দেওয়া হয়েছে এমন কিতাব—যা শতভাগ সঠিক ও বিশুদ্ধ শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, নাযমুদ দুরার, ২২/১৮৫)

সেগমেন্ট

মানুষ

মানুষের প্রকৃতিই এমন—সুযোগ পেলেই সে অন্ধকার জগতে হাঁটতে শুরু করে। তাই কিতাব ও রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে বিধি-নিষেধের আওতায় রাখতে হয়।

নানা দলে বিভক্তি

আসমানি কিতাবের মতো অকাট্য প্রমাণ পেয়েও মানুষ নানান দল—প্যাগান, ইহুদি, খ্রিষ্টানে বিভক্ত হয়েছে।

সেসব দল ও আল্লাহর দলের পরিণতি

এই শত দল-মতের শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর দলে শামিল হয়, তারা থাকবে চিরস্থায়ী জান্নাতে।

ফজিলত

আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি ﷺ উবাই ইবনু কা'ব ﵁-কে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন—আমি যেন তোমাকে লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারু (সূরা বাইয়্যিনা) পড়ে শোনাই।' উবাই ইবনু কা'ব বললেন, 'আল্লাহ তাআলা কি আমার নাম ধরে ডেকেছেন?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ।' এ-কথা শুনে উবাই ইবনু কা'ব ﵁ (আবেগে) কাঁদে ফেললেন।'

(বুখারি, ৪৯৫৯; মুসলিম, ৭৯৯)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

চিরসুখের জান্নাতের নিয়ামাতের কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে;

এতে জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ইবাদাত ও ভালো কাজের আগ্রহ বাড়বে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

ওহির দিক-নির্দেশনা এবং ঈমান-কুফরের পার্থক্য

১. অকাট্য প্রমাণ

রাসূল ﷺ এবং ওহির মাধ্যমে গোটা মানব-জাতির কাছে আল্লাহ অকাট্য দলিল পেশ করেছেন। বিশেষ করে ইহুদি-খ্রিষ্টান ও মুশরিকদেরকে এর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

২. ইবাদাত বিশুদ্ধকরণ

ইহুদি-খ্রিষ্টানরা দ্বীনকে শির্‌ক দিয়ে দূষিত করে ফেলেছে। নিত্য-নতুন বিষয় দ্বীনের সাথে যোগ করেছে। এমনটা কিছুতেই করা যাবে না। ইবাদাত হবে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে—তাঁরই নির্দেশিত পথে।

৩. মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে ব্যবধান

মুমিন তারাই, যারা আল্লাহর বাণীকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আর ইহুদি-খ্রিষ্টান-মুশরিক সবাই কাফির। কারণ, এরা সত্য দেখেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

৪. মুত্তাকীদের পুরস্কার

যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে ভালো ভালো কাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত সাজিয়ে রেখেছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মানুষকে বিধি-নিষেধের আওতায় আনতে, আল্লাহ পাঠালেন অকাট্য প্রমাণ।	১	আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্যে দলাদলির ব্যাপারটা স্পষ্ট করা হয়েছে।	৪-৫
রাসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর পবিত্র পয়গাম পাঠ করে শোনান।	২	কাফিরদের জন্য সতর্কবাণী ও মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।	৬-৮
এই পয়গামের মধ্যে কোনো বক্রতা নেই। আছে ভারসাম্যপূর্ণ বিধি-বিধান।	৩		

কেইস-স্টাডি

মানুষ কিংবা মেশিন কোনোকিছুই দিক-নির্দেশনা ছাড়া ঠিকঠাক চলতে পারে না। তাই আল্লাহ মানুষকে দিক-নির্দেশনা দিলেন—তাঁর রাসূল ও কুরআনের মাধ্যমে। এ-সূরার শুরুর দুই আয়াতে আল্লাহ তেমনটাই জানালেন আমাদেরকে। এখন সকল মানুষের করণীয় হলো: আল্লাহর পাঠানো এই পয়গামকে সত্য বলে মেনে নেওয়া, এই পয়গামের আলোকে জীবনকে সাজিয়ে নেওয়া। কেবল এতেই মানব-মুক্তি সম্ভব। এর বাইরে যত যা-ই করা হোক না-কেন, কোনো লাভ হবে না। হবে শুধু পণ্ডশ্রম। তাই সূরাটি আমাদের সকলের জন্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে বুঝতে হবে—আল্লাহর এই বিধি-নিষেধ ঠেকিয়ে রাখে সমাজের বিশৃঙ্খলা।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/৫৫২; বুখারি, ৭২৮০)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"অথচ এদেরকে কেবল এ-আদেশ দেওয়া হয়েছে: এরা যেন শুধু আল্লাহর দাসত্ব করে—আনুগত্যকে একমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারিত রাখে।" এই সূরার ৫ নম্বর আয়াতে আনুগত্যকে কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করার আদেশ এসেছে। এখান থেকে বোঝা যায়—ইবাদাতে নিয়ত করা ফরজ। তবে তা মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়। কারণ, ইখলাস বা একনিষ্ঠতা অন্তরের বিষয়। সুতরাং যখন নামাজ পড়ছেন, তখন অন্তরে শুধু এটুকু খেয়াল রাখলেই হবে—আমি অমুক ওয়াক্তের নামাজ পড়ছি। আর এই নামাজ কেবলই আল্লাহর জন্য।

যেকোনো কাজের ক্ষেত্রেই নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ত ভালো থাকলে সাধারণ কাজও হয়ে যায় ইবাদাত। আবার নিয়ত খারাপ হলে অনেক ইবাদাতও হয়ে যায়—গুনাহের মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কারণেই রিয়া বা লোক দেখানোর প্রবণতাকে ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং, যেকোনো ইবাদাত করার আগে নিয়ত বিশুদ্ধ করে নিন। কারণ, নিয়ত যেমন হবে, ফলাফলও তেমনই মিলবে।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ২০/১৪৪; বুখারি, ১)

সূরা যিলযাল

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৯৩-তম সূরা। এর আগে সূরা নিসা ও পরে সূরা হাদীদ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা বাইয়্যিনা ও পরে সূরা আদিয়াত।

এক নজরে যিলযাল

- মাদানি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ৯৯
- আয়াত: ৮
- মাদানি

নামের রহস্য

'যিলযাল' শব্দের অর্থ 'কম্পন'। সূরার ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, পৃথিবীকে ভয়ংকরভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে। এখান থেকেই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'যিলযাল'।

মেজর থিম

০১ প্রবল ভূমিকম্প।

০২ পৃথিবী তার ভেতরকার সব বোঝা বের করে দেবে।

০৩ অণু-পরিমাণ ভালো বা মন্দ কাজ—কিছুই বাদ যাবে না।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

কিয়ামাতের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সূরাটি শুরু হয়েছে। আর সূরাটির শেষে ওই ভয়ংকর দিনে আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন: "যে অণু-পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে; আর যে অণু-পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেটাও সে দেখতে পাবে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা বাইয়্যিনা; যাতে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করলেন, কাফিররা জাহান্নামে যাবে আর মুমিনরা যাবে জান্নাতে। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কখন হবে সেটা? তো এর জবাবই যেন আল্লাহ তাআলা সূরা যিলযালের শুরুতে বলে দিলেন, "যখন পৃথিবীকে ভয়ংকরভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে।"

শানে নুযুল

কিয়ামাতের অবস্থা কতটা ভয়াবহ হবে, এ-সূরাতে আল্লাহ তাআলা অল্প কথায় তা জানিয়ে দিয়েছেন। সাঈদ ইবনু জুবাইর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "'খাবারের প্রতি নিজেদের প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবী, এতিম ও বন্দিদেরকে খাবার খাওয়ায়।' সূরা দাহরের এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর, মুসলমানরা মনে করতে লাগল যে, কোনো তুচ্ছ ও ছোটো জিনিস দান করলে বুঝি সাওয়াব পাওয়া যাবে না। ফলে ভালো মানের জিনিস দান করা সম্ভব না হলে, তারা ভিক্ষুককে খালি হাতেই ফিরিয়ে দিতে লাগল। আবার আরেকদল লোকের ধারণা ছিল, ছোট ছোট গুনাহের কারণে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কেবল কবীরা গুনাহ করলেই জাহান্নামের শাস্তি পেতে হবে। এই দুটো ভুল ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা এ-সূরার শেষ-দুটি আয়াত নাযিল করেন—'যে ব্যক্তি অণু-পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে; আর যে অণু-পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সেটাও সে দেখতে পাবে'।"

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৪৬৪)

সেগমেন্ট

কিয়ামাত

সূরার শুরুতেই কিয়ামাতের সূচনা পর্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের বিস্ময়

পৃথিবী যখন তার মধ্যকার সবকিছু বের করে দেবে, তখন মানুষ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে—এর হলো কী?

হিসেব হবে কড়ায়-গণ্ডায়

মানুষ অণু-পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তার প্রতিদান পাবে। আবার অণু-পরিমাণ খারাপ কাজ করলেও, সে তা দেখতে পাবে।

ফজিলত

আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা ইযা যুলযিলাত পাঠ করবে, তাকে অর্ধেক কুরআন (পাঠ)-এর সমান সাওয়াব দেওয়া হবে।"'

(তিরমিযি, ২৮৯৩)

এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলেছিল তাকে এমন একটি সূরা শেখাতে, যা বিভিন্ন সূরার তাৎপর্য ধারণ করে। তখন নবি ﷺ তাকে সূরা যিলযাল শিখিয়ে দেন।

(দেখুন—আবু দাউদ, ১৩৯৯, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

ভালো কাজ যত ছোটই হোক—মুসলিম ভাইয়ের প্রতি এক টুকরো মুচকি হাসি হলেও—ছাড়া যাবে না;

কারণ, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ এই ছোট্ট কাজটিরও বদলা দেবেন।

গতিপথ

১. কিয়ামাতের প্রলয়

ভীষণ ভূমিকম্পের মাধ্যমে কিয়ামাতের সূচনা হবে। আর এর মাধ্যমে পৃথিবী চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

২. কঠিন হিসেবের কাঠগড়ায়

সেদিন কোনোভাবেই পার পাওয়া যাবে না। পৃথিবী নিজে মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে—তার ওপর অবস্থান করে মানুষ কী কী অপকর্ম করেছে।

৩. মানুষের বিস্ময়ের সীমা থাকবে না

মানুষ যখন তার আমলনামা দেখবে, তখন অবাক বিস্ময়ে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর বলবে, 'হায়! এ কেমন আমলনামা! ছোট-বড় কোনোকিছুই যে বাদ যায়নি এতে!'

৪. শতভাগ গ্রহণযোগ্য বিচার

আল্লাহ তাআলার বিচার শতভাগ ইনসাফপূর্ণ। তিনি মানুষের মতো পক্ষপাতপূর্ণ বিচার করেন না, কারও ওপর অবিচারও করেন না। কিয়ামাতের দিন যার যা পাওনা, তা তিনি পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবেন।

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাত ও বিচার

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।	১-৫	প্রত্যেককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যে অণু-পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে ওটুকুরই প্রতিদান পাবে। আবার যে অণু-পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে-ও ওটুকুর-ই শাস্তি পাবে।	৬-৮

কেইস-স্টাডি

ভালো কাজ করে যেতে হবে। তা বড় না ছোট সেটা মুখ্য বিষয় নয়। যেহেতু ভালো-মন্দ কোনো কাজই আল্লাহর দৃষ্টি এড়ায় না, তাই সুযোগ পেলেই ভালো কাজ করে ফেলতে হবে। ধরুন, রাস্তায় দুটি কিশোরকে মারপিট করতে দেখলেন। ওদেরকে একটু ছাড়িয়ে দিয়ে, মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে, দুটো উপদেশ আপনি চাইলেই দিতে পারেন।

আর চাইলে রাস্তায় অন্ধ বা বৃদ্ধ কোনো মানুষের হাত ধরে তাকে রাস্তাটা পারও করে দিতে পারেন। এই ছোট ছোট কাজগুলো করলে আপনি ঠকবেন না। বরং হিসেবের খাতায় জমা হবে আপনার এই ছোট্ট আমলগুলোও। আর এমন ছোট্ট একটি আমলও আপনাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে ভয়ংকর আগুন থেকে।

(দেখুন—বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১৮২; মুসলিম, ২৬২৬; আবু দাউদ, ৪০৮৪)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

৪ নং আয়াতের "أَخْبَارَ الْأَرْضِ/জমিনের সংবাদ" শব্দ-দুটি নিয়ে একটু ভাবুন। এই শব্দ-দুটির মানে হলো—আপনি-আমি জমিনের বুকে যা কিছু করছি, সে-সবকিছুর খবরাখবর। কিয়ামাতের দিন জমিন এসব খবর ফাঁস করে দেবে। জমিনের যে অংশে দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে কোনো বান্দা গুনাহ করে, ওই অংশটাই সেদিন হবে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী। অবশ্য অনেকের কাছে এই বিষয়টি আজগুবি মনে হতে পারে। জমিন আবার সাক্ষ্য দেবে কী করে! কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কারের কল্যাণে এ-বিষয়টি বোঝা এখন অত্যন্ত সহজ। সমস্ত শব্দই তরঙ্গ; আর তাই তরঙ্গাকারে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি ধ্বনি। সুতরাং মানুষ যত নির্জনেই কোনো অপরাধ করুক-না-কেন, তা রেকর্ড হয়ে থাকছে। আল্লাহ তাআলা যখনই চাইবেন, সেগুলো সাক্ষী হিসেবে হাজির হয়ে যাবে। আর এসব সাক্ষীর বিপক্ষে সেদিন কোনো যুক্তি দাঁড় করানো যাবে না। সুতরাং, আমাদের প্রতিটি কাজের ব্যাপারে সাবধান হওয়া জরুরি।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৭/২২২; সা'দি তাফসীর, ৯৩২; তিরমিযি, ২৪২৯)

এই সূরার ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে: "সেদিন মানুষেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ছুটে আসবে, যাতে তাদের আমলনামা তাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হয়।" কিয়ামাতের দিন এমন কেউ থাকবে না, যে আফসোস করবে না। নেককার ব্যক্তি নিজেকে তিরস্কার করবে—সে কেন আরও বেশি বেশি ভালো কাজ করল না। আর যদি পাপী হয়, তবে তো কথাই নেই! কেন সে খারাপ কাজগুলো থেকে বিরত থাকেনি—সেজন্য ভীষণ আফসোসে ভুগতে থাকবে। প্রশ্ন আসে, কিয়ামাতের এই অবস্থার কথা আল্লাহ আগেই কেন জানিয়ে দিলেন? কারণ, আল্লাহ তাআলা চান না—তাঁর কোনো বান্দা আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা ভোগ করুক। তাই আল্লাহ আমাদের শুধরে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

(দেখুন—কুরতুবি,তাফসীর, ২০/১৫০; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ৩০/৩৬৫)

সূরা আদিয়াত

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১৪-তম সূরা। এর আগে সূরা আসর ও পরে সূরা কাউসার নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা যিলযাল ও পরে সূরা কারিআ।

এক নজরে আদিয়াত

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ১০০
- আয়াত: ১১
- মাক্কি

নামের রহস্য

'আদিয়াত' মানে 'সেসব ঘোড়া, যেগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে'। সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'আদিয়াত' শব্দ থেকে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। সূরাটির আরও একটি নাম পাওয়া যায়—সূরা ফার্‌স। 'ফার্‌স' মানে 'ঘোড়া'।

মেজর থিম

০১ যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার ভূমিকা।

০২ সম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ।

০৩ কিয়ামাত দিনের চিত্র।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া ও এর প্রভাবের কথা। আর সূরার শেষে জানালেন, পুনরুত্থানের দিন সবার সব বিষয় আল্লাহ তাআলার ভালোভাবেই জানা থাকবে! সুতরাং কে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাঁর পথে ঘোড়া ছোটাল আর কে ধন-সম্পদ আর ক্ষমতার লোভে তা করল; কে আল্লাহর পক্ষে আর কে বিপক্ষে—সবকিছুই তিনি সেদিন জানিয়ে দেবেন।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা যিলযাল; যাতে ভালো-মন্দ কাজের প্রতিদান দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা আদিয়াতে আলোচনা করা হয়েছে মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কথা। তো এখান থেকে বোঝা যায়, মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে বেরিয়ে এসে আল্লাহর বিধি-নিষেধ মেনে চললেই, মিলবে চমৎকার প্রতিদান।

শানে নুযুল

এ-সূরাটি মাক্কি যুগে নাযিল হয়েছে। এতে উঠে এসেছে তখনকার মরু আরবের মাঝে জুলুম, অবিচার এবং মারামারি-হানাহানির এক বাস্তব চিত্র। সেকালে মানুষ সামাজিক জীবনে চরম দুর্ভোগ পোহাত। রাতের আঁধারে লুকিয়ে এক গোত্রের ওপর চড়াও হতো অন্য গোত্র। নারীদের বন্দি করে বানানো হত দাসী। আর অন্যের সম্পদ লুটপাট করা ছিল তাদের কাছে নিত্যদিনের ঘটনা। সেই সময়ে মানব জীবনের কোনো নিরাপত্তাই ছিল না। কুরআন এই বিষয়টির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এর রহস্য আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। এসব অপরাধ সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ হলো—পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও অবিশ্বাস। এর ফলে মানুষ আল্লাহর-দেওয়া শক্তি ব্যবহার করে অন্যের ওপর জুলুম-নির্যাতন করে। আর আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়। পরকালে ন্যূনতম বিশ্বাস থাকলে, মানুষ এসব নিকৃষ্ট কাজ অবলীলায় করে যেতে পারে না।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/২১০; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/২০২)

সেগমেন্ট

ছুটে চলা ঘোড়ার শপথ

যেসব ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে, ভোরে অতর্কিতে হামলা করে, সূরার শুরুতেই আল্লাহ সেসব ঘোড়ার শপথ করেছেন।

মানুষের অকৃতজ্ঞতা

এরপর আল্লাহ জানালেন— “নিঃসন্দেহে মানুষ তার রবের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ।” এর কারণ, “সম্পদের প্রতি তার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল।”

পুনরুত্থান

সকল মানুষকে অবশ্যই আবার জীবিত করে তোলা হবে। সেদিন সবার অন্তরের সবকিছু প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

ফজিলত

সূরা আদিয়াত মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, “মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।”

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সম্পদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ জীবন থেকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে হবে;

নইলে আল্লাহর থেকে বান্দা অনেক দূরে সরে যাবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

শত নিয়ামাত পেয়েও মানুষ অকৃতজ্ঞ

১. মানুষ: যেন যুদ্ধের এক তেজি ঘোড়া

যুদ্ধের ময়দানে কোনো তেজি ঘোড়া যেমন ভীষণ বেগে দৌড়ায়, ধুলো উড়িয়ে নিরলস ছুটে চলে, দুনিয়াবি সম্পদ অর্জন করার বেলায় মানুষও ঠিক যেন তেমনই এক তেজি ঘোড়া বনে যায়।

২. মানুষের অকৃতজ্ঞ স্বভাব

মানুষকে এত এত নিয়ামাত দেওয়ার পরও সে দুনিয়ার পেছনে এমনভাবে ছুটে চলে যে, আল্লাহকে স্মরণ করার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না!

৩. সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা

সম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। সম্পদের ওপর তার যতটুকু ভালোবাসা, অন্য কোনো কিছুর ওপর এর ছিটেফোঁটাও নেই। এই স্বভাব তার জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়ে দেয়।

৪. বিচার দিবস: ভুলিয়ে দেবার এক দিন

সূরার শেষ অংশে মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়—যতই সম্পদের মোহে ডুবে থাকো না কেন, একদিন আল্লাহর কাছেই ফিরতে হবে। সেদিন এই ধনদৌলতের কথা ভুলে যাবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
মানুষের দুইটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলা হয়েছে এখানে। (১) সে তার রবের নিয়ামাতগুলোর প্রতি অকৃতজ্ঞ, আর (২) সম্পদের প্রতি তার আকর্ষণ প্রবল।	১-৮	তবে মৃত্যুর পর তাকে আবারও জীবিত করা হবে। সেদিন তার অন্তরের সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবই জানেন।	৯-১১

কেইস-স্টাডি

এ-সূরার ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা সম্পদকে 'কল্যাণ' বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়—সম্পদ মূলত খারাপ কিছু নয়। সম্পদ বরং কল্যাণই বয়ে আনে। যদি-না তা খারাপ পন্থায় আসে; আর অন্যায় পথে ব্যয় না হয়। আসলে সম্পদের ভালো-মন্দ নির্ভর করে এর ব্যবহারের ওপর। আপনি কীভাবে তা উপার্জন করছেন, আর কোথায় ব্যয় করছেন—সে অনুসারেই প্রতিদান দেওয়া হবে। ইসলাম সম্পদশালী হতে নিষেধ করে না। সম্পদ না হলে তো হজ্জ-যাকাতের মতো আমলগুলো করা সম্ভব হয় না! অভাবীদের দান করা, আত্মীয়দের খবর নেওয়ার জন্যও অর্থকড়ি দরকার। তাই সৎপথে উপার্জন করুন, ভালো কাজে ব্যয় করুন। কিন্তু খবরদার! হারাম পথে এগোবেন না, নয়তো দিনশেষে ধ্বংস অনিবার্য।

(দেখুন—আলুসি, তাফসীর, ১৫/৪৪৫; রাযি, তাফসীর, ৩২/২৬২)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৬-৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বললেন, "নিঃসন্দেহে মানুষ তার রবের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ, এ-ব্যাপারে সে নিজেই বড়ো সাক্ষী।" মানুষ নিজেই কীভাবে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে, ভেবে দেখেছেন? আল্লাহর-দেওয়া-নিয়ামাতে জীবনযাপন করে মানুষ আল্লাহর-ই নাফরমানি করে। তাঁর শুকরিয়া আদায় না করে অহংকার দেখায়। আল্লাহর দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়োজিত করে তাঁরই বিরুদ্ধে। তাই, কিয়ামাতের দিন অপরাধীদের প্রতিটি অঙ্গই তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। বলে দেবে খারাপ কাজগুলোর কথা। সেদিন স্পষ্ট হবে, মানুষ নিজেই নিজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সাক্ষী, অন্য কারও সাক্ষ্য না-হলেও চলবে। তাই সময় থাকতেই তাওবা করে ফিরে আসতে হবে করুণাময় রবের পথে। নইলে যে বাঁচার উপায় থাকবে না।

(দেখুন—আলুসি, তাফসীর, ১৫/৪৪৫)

"সে কি জানে না—যখন কবরের ভেতরের সবাইকে আবার জীবিত করে বের করে আনা হবে, আর অন্তরের সবকিছু প্রকাশ করে দেওয়া হবে!" এ-সূরার ৯-১০ নং আয়াতের এই কথাগুলো আসলে আমাদের জন্য সাবধানবাণী। অথচ আমাদের যেন কোনো হুঁশই নেই। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা প্রথমে কবর থেকে আমাদের দেহকে বের করে আনবেন। এরপর শুরু হবে দুনিয়ায়-করে-আসা কাজের জবাবদিহিতা। সেদিন ফাঁস হয়ে যাবে সব কিছু—তাই আমাদের অন্তর কপটতা-মুক্ত হওয়া দরকার। দেহের ভেতর-বাহির—সবখানেই যেন কেবল আল্লাহর আনুগত্য বিরাজ করে।

(দেখুন—ইবনুল কাইয়িম, আত-তিবইয়ান ফী আইমানিল কুরআন, ১৩২)

সূরা কারিআ

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩০-তম সূরা। এর আগে সূরা কুরাইশ ও পরে সূরা কিয়ামাহ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আদিয়াত ও পরে সূরা তাকাসুর।

এক নজরে কারিআ

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ১০১
- আয়াত: ১১
- মাক্কি

নামের রহস্য

'কারিআ' শব্দের অর্থ 'ভীষণ-আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী ঘটনা'। সূরার প্রথম আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকে সূরাটির নাম হয়েছে 'কারিআ'।

মেজর থিম

০১ কিয়ামাতের বিভীষিকা।

০২ মানুষের অবস্থা।

০৩ অপরাধীদের সীমাহীন দুর্ভোগ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতকে ভীষণ-আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। আর এর মাধ্যমে সতর্ক করেছেন গোটা মানব-জাতিকে। আবার, সূরাটির শেষে এসেছে জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে সতর্কবার্তা: "(সেটি হলো) সীমাহীন উত্তপ্ত আগুন!"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আদিয়াত; যা শেষ হয়েছে কিয়ামাত ও পুনরুত্থানের বর্ণনা দিয়ে। এরপর ভীষণ-আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী কিয়ামাতের আলোচনা দিয়েই সূরা কারিআ'র শুরু।

শানে নুযুল

এই সূরাটি নাযিল করে কিয়ামাত শুরুর একটি নকশা এঁকে দেওয়া হয়েছে। সূরার প্রথমেই এমন ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যা শুনে মানুষের মন ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। সূরাটিতে 'ভীষণ-আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী-কিয়ামাত!' কথাটি তিনবার বলার মাধ্যমে এর ভয়াবহতা মানুষের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর দেখানো হয়েছে—কিয়ামাতের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিটা ঠিক কেমন হবে। সেদিন বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় মানুষ ছুটতে থাকবে দিগ্‌বিদিক। তাদের দৌড় দেখে মনে হবে যেন দিশেহারা মাতাল। পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে তুলার মতো। আকাশ ভেঙে পড়বে। ভয়ংকর ফুঁসে উঠবে সমুদ্র। ওদিকে চলবে বিচার কাজ শুরু করার প্রক্রিয়া। হাশরের মাঠে 'মীযান' বা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে সবার কাজগুলো মাপা হবে। ভালো কাজের পাল্লা ভারী হলে, আল্লাহ তাদেরকে আরাম-আয়েশের জীবন দেবেন। আর খারাপ কাজের পাল্লা ভারী হলে, জাহান্নামে যেতে হবে।

(দেখুন—ইবনু জুযাই, তাফসীর, ২/৫০৭; বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/২২০)

সেগমেন্ট

ভীষণ-আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী

সূরার শুরুতেই আল্লাহ কিয়ামাতকে তুলে ধরেছেন—ভীষণ-আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী হিসেবে।

আমলের ওজন

মানুষের কাজগুলোকে 'মীযান' তথা দাঁড়িপাল্লায় ওঠানো হবে। তার ভালো কাজের চেয়ে মন্দ কাজের ওজন বেশি না কম, সেটি দেখা হবে।

চূড়ান্ত গন্তব্য

দাঁড়িপাল্লার ফলাফলের ভিত্তিতে মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য—জান্নাত কিংবা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে।

ফজিলত

সূরা কারিআ মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী, কিছু ভালো কাজকে অভ্যাসে পরিণত করুন,

এতে কিয়ামাতের দিন এর বিশাল প্রতিদান মিলবে—নেক কাজের পাল্লা ভারী হবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

কিয়ামাত দিবসের সামগ্রিক অবস্থা

১. প্রবল বিশৃঙ্খলা

কিয়ামাত যখন শুরু হবে, তখন চারিদিকে ভীষণ আতঙ্ক নেমে আসবে। সেই সাথে শুরু হবে প্রবল বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল।

২. মানুষের অসহায়ত্ব

কিয়ামাত শুরু হয়ে গেলে মানুষ ভীষণ অসহায় হয়ে পড়বে। তারা কীট-পতঙ্গের মতো ছোটাছুটি শুরু করবে—শুধু একটুখানি আশ্রয়ের আশায়।

৩. দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে

সেদিন প্রত্যেকের ভালো-মন্দ কাজের হিসেব নেওয়ার জন্য আল্লাহ দাঁড়িপাল্লা বসাবেন। সেখানে প্রত্যেকের প্রতিটি আমলই ওজন করা হবে।

৪. বিচারের নীতি

দাঁড়িপাল্লায় আমলগুলো ওঠানো হলো। এবার দেখার পালা কোন আমলের পাল্লা বেশি ভারী—নেক আমল নাকি বদ আমল। আমল অনুসারে মানুষের গন্তব্য নির্ধারিত হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
ভীষণ-আতঙ্ক-সৃষ্টিকারী-কিয়ামাতের ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি-আকর্ষণ।	১-৩	দুনিয়ার কর্ম অনুযায়ী পরকালে মানুষ ফল ভোগ করবে—এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে।	৬-১১
সেদিন মানুষের অবস্থা হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো। পাহাড়গুলো উড়বে ধুনা তুলার মতো।	৪-৫		

কেইস-স্টাডি

কিয়ামাতের দিন দাঁড়িপাল্লায় আপনার কাজগুলোকে ওঠানো হবে। এক পাশে থাকবে ভালো কাজ। আরেক পাশে থাকবে মন্দ কাজ। ভালো কাজের পাল্লাটা যদি বেশি ঝুঁকে যায়, তা হলে বুঝতে হবে, আপনি ছাড় পেয়ে গেলেন। আর যদি মন্দ কাজের পাল্লাটা বেশি ঝুঁকে পড়ে, তা হলে ধ্বংস অনিবার্য। পুড়তে হবে সীমাহীন উত্তপ্ত আগুনে। তাই, ভালো কাজ যত ছোটই হোক না-কেন, তা ছাড়া যাবে না। কারণ একটু একটু ভালো কাজই আপনার নেকির পাল্লাকে ভারী করে দেবে। আবার গুনাহ যত ছোটই হোক, তাতে জড়ানো যাবে না। কারণ ওই অল্প অল্প গুনাহই ভারী করে তুলবে আপনার মন্দ-আমলের পাল্লা।

(দেখুন—ইবনু মাজাহ, ৪২৪৩; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২২৮০৮; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৭২৬৭)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ/তার ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) গভীর খাদ।" সূরাটির ৯ নং আয়াতে 'উম্মু' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ 'মা'। মা শব্দটি এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ শিশুর ঠিকানা যেমন হয় তার মায়ের কোল, তেমনি কাফির-মুশরিক-মুনাফিকদের ঠিকানাও হবে জাহান্নাম। মা শিশুকে পরম মমতায় আগলে রাখে। কিন্তু জাহান্নাম তাদেরকে আগলে রাখবে অনন্তকাল পোড়ানোর উদ্দেশ্যে।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৫১৪)

সূরার শেষ আয়াতে জাহান্নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে—"(সেটা হলো) সীমাহীন উত্তপ্ত আগুন!" জাহান্নামের আগুন কতটা উত্তপ্ত হবে, একটি হাদীসের বর্ণনায় তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়—জাহান্নামের আগুন এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা টকটকে লাল রং ধারণ করেছিল। আরও এক হাজার বছর জ্বালানোর পর আগুনের রং দাঁড়ায় ধবধবে সাদা। এরপর আবারও এক হাজার বছর জ্বালানোর পর তা কুচকুচে কালো বর্ণের হয়ে যায়। সুতরাং জাহান্নামের আগুন এখন ঘোর কালোয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই উত্তপ্ত আগুনে যে পড়বে, প্রতি মুহূর্তে তার দেহ-অস্থি-মজ্জা গলতে থাকবে মোমের মতন। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৫৯১; ইবনু মাজাহ, ৪৩২০)

সূরা তাকাসুর سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১৬-তম সূরা। এর আগে সূরা কাউসার ও পরে সূরা মাঊন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কারিআ ও পরে সূরা আসর।

এক নজরে তাকাসুর

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ১০২
- আয়াত: ৮
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘তাকাসুর’ শব্দের অর্থ ‘প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা’। সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেন, “বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে।” সেখান থেকে এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘তাকাসুর’।

মেজর থিম

০১ প্রাচুর্য অর্জনের প্রতিযোগিতা ও এর কুফল।

০২ পরকালের ব্যাপারে মানুষের জ্ঞানগত দৈন্যতা।

০৩ আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতেই দুনিয়ার প্রাচুর্য নিয়ে মানুষের ব্যস্ততা ও দৌড়ঝাঁপের আলোচনা এসেছে। মৃত্যুর পয়গাম আসার আগ-পর্যন্ত এই ব্যস্ততার শেষ নেই। তাই সূরাটির শেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" অর্থাৎ দুনিয়ায় কী নিয়ে এত ব্যস্ততা, আর সেই ব্যস্ততার চাপে আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া ঠিকমতো আদায় করেছি কি-না, তার হিসাব আমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা কারিআ। সেখানে বলা হয়েছে, "তার ঠিকানা হবে (জাহান্নামের) গভীর খাদ।" এখন প্রশ্ন হতে পারে, 'এমনটি কেন হবে?' এর উত্তরই যেন সূরা তাকাসুরে বলা হলো যে, দুনিয়া-কেন্দ্রিক ব্যস্ততা তোমাদেরকে আখিরাত থেকে উদাসীন করে রেখেছে। আর এই উদাসীনতাই তোমাদেরকে গভীর খাদে ফেলবে।

শানে নুযুল

জাহিলি যুগে সামান্য কোনো বিষয় নিয়ে এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে যেত। তখন নিজ গোত্র ছাড়া তাদের আর কোথাও নিরাপত্তা ছিল না। শুধু নিজ গোত্রের লোকদের জন্য তারা লড়াই করতে রাজি ছিল। অর্থাৎ গোত্রপ্রীতিই ছিল তাদের একমাত্র মানদণ্ড। বর্তমান বিশ্বে 'জাতীয়তাবাদ' বলতে যা বোঝায়! তো, সে-সময়ে এই গোত্রপ্রীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। যেকোনো মূল্যে এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইত। এজন্য ধন-দৌলত আর খ্যাতি অর্জনে এদের মাঝে ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা। এমনকি এসব অর্জন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচারও করত তারা। তাদের একদল বলত, 'তোমাদের মধ্যে কি আমাদের অমুকের মতো এত বড় বীর, এত বড় সম্পদশালী কেউ আছে?' আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, কবরবাসীকে নিয়েও তারা এই বাড়াবাড়ি করতে ছাড়ত না। কবরের কাছে গিয়ে একটা কবর দেখিয়ে বলত, 'তোমাদের মাঝে কি আমাদের এই লোকের মতো সাহসী-যোদ্ধা কেউ ছিল?' অপর গোত্রও তখন ছেড়ে কথা বলত না। এভাবেই এসব দুনিয়াবি তুচ্ছ বিষয়াদি নিয়ে তারা বিবাদে জড়াত। কিন্তু রাসূল ﷺ আসার পর এই জাহিলি প্রথা বন্ধ করা জরুরি ছিল। তাই এই সূরা নাযিল করে আল্লাহ তাদেরকে ভীষণভাবে সাবধান করে দেন। এসব থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৫১৫; ওয়াহিদি, আসবাবুন নুযুল, ৪৯০)

সেগমেন্ট

প্রতিযোগিতা

মানুষের স্বভাব—‘যত পাই, তত চাই। তা-ও আবার অন্যের চাইতে বেশি চাই।’ তাই প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় এরা লেগেই থাকে।

কবরের বাস্তবতা

কবরের সাথে সাক্ষাতের সাথে সাথেই ওই প্রতিযোগিতা থেমে যাবে।

পরকালের ব্যাপারে জ্ঞান

পরকালের ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান অতি নগণ্য। পরকালের ব্যাপারে যাদের ন্যূনতম জানাশোনা আছে, তারা দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত হয় না।

ফজিলত

ইবনু উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার বললেন, ‘তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন ১ হাজার আয়াত পড়তে পারবে না?’ সাহাবিগণ বললেন, ‘কে পারবে এটা?’ তখন রাসূল ﷺ বললেন, ‘তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাসুর পড়তে পারবে না?’ অর্থাৎ সূরা তাকাসুর পড়লে ১ হাজার আয়াত পড়ার সমান সাওয়াব মিলবে।

(হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২০৮১)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দুনিয়ায়-পাওয়া সকল নিয়ামাতের ব্যাপারে হিসেব চাওয়া হবে; → তাই প্রতিটি নিয়ামাতের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা জরুরি।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

দুনিয়াবি প্রতিযোগিতার বিভ্রম ও হিসেবের বাস্তবতা

১. দুনিয়াবি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ধোঁকা

মানুষ একটা প্রতিযোগিতার ঘোরে আচ্ছন্ন। আর সেই প্রতিযোগিতাটি হলো সম্পদ কামাইয়ের প্রতিযোগিতা। হৃদয়ে-মস্তিষ্কে শুধু একটাই ভাবনা—কী করে আরও সম্পদ কামাই করা যায়!

২. প্রতিযোগিতার সমাপ্তি

কিন্তু এই প্রতিযোগিতা খুব বেশি সময় ধরে চলে না। একসময় মৃত্যু এসে দুয়ারে কড়া নাড়ে। আর তখনই রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি জমাতে হয় পরকালের উদ্দেশ্যে।

৩. পরকালের দৃশ্য চোখ খুলে দেয়

পরকালীন জগতে মানুষের প্রথম সাক্ষাৎ হয় কবরের সাথে। আর তখনই মানুষের বোধোদয় হয়—যা কিছু অর্জন করলাম, তার কিছুই তো সাথে এল না।

৪. অনুগ্রহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে অসংখ্য নিয়ামাতের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন। কিয়ামাতের দিন সেসব নিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে—কী কাজে তা ব্যয় করেছে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা মানুষকে খুব ব্যস্ত করে রেখেছে। ফলে, সে আল্লাহর ব্যাপারে বেখবর।	১	পরকালের ব্যাপারে মানুষের বিশ্বাস পাকাপোক্ত নয়। হলে সে এমনভাবে দুনিয়ার পেছনে পড়ে থাকত না।	৫
আর ঠিক এভাবেই সে একদিন কবরে চলে যায়।	২	মানুষ নিজের চোখে একদিন জাহান্নামের দাউদাউ-করা আগুন দেখবে।	৬
কিন্তু এমন উদাসীনতার পরিণাম মারাত্মক। একদিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। সেইদিন টের পাবে এমন ব্যস্ততার ফল।	৩	সত্যিই সে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন দেখবে। আর সম্পদের পেছনে ছোটার কথা মনে করে, আফসোসে হাত কামড়াবে।	৭
মানুষকে সেই চূড়ান্ত দিনটির ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে।	৪	দুনিয়ায়-পাওয়া নিয়ামাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। পূর্ণ হিসাব বুঝিয়ে দেবার আগে একচুলও নড়তে দেওয়া হবে না।	৮

কেইস-স্টাডি

সূরাটি শুরু থেকেই আমাদেরকে ভীষণ সতর্কবার্তা দিয়ে গেছে। সাবধান করেছে আমাদের ব্যস্ততার ব্যাপারে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের দিনগুলো ভীষণ খাটাখাটনির মধ্য দিয়ে যায়। একেকটা দিন খুবই ব্যস্ততায় কাটে। এবার নিজের সাথে সৎ থেকে বলি, এই যে আমার এত এত ব্যস্ততা—তার কতটুকু দুনিয়ার জন্য, আর কতটুকু পরকালের জন্য? খুব দ্রুতই আমরা ধরে ফেলতে পারব, আমার সারাটা দিন শুধু দুনিয়ার ভাবনাতেই কেটে গেল। পরকালের কথা চিন্তা করার তো সময়ই পেলাম না! আফসোস আমাদের জন্য! অথচ এই সূরায় আল্লাহ বলছেন—"না, (সকল ব্যস্ততা দুনিয়া-কেন্দ্রিক হওয়া) কিছুতেই উচিত নয়! (এমন ব্যস্ততার পরিণাম) তোমরা অচিরেই বুঝতে পারবে।" তাই আসুন, প্রতিদিন একটুখানি সময় বের করি। নিবিষ্ট মনে আল্লাহকে স্মরণ করি।

(দেখুন—তিরমিযি, ২৩৭৭, ২৪৬৫; ইবনু মাজাহ, ৪১০৯)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সূরাটির শেষ আয়াতে বলা হলো, "তখন নিয়ামাতের ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" এখানে কোন নিয়ামাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, তা বলা হয়নি। অর্থাৎ মানুষ যেন চিন্তা করে বের করে, তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কতশত নিয়ামাত দান করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটির হিসেব নেওয়া হবে—সেগুলো সে কী কাজে লাগিয়েছে। ওগুলো পেয়ে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে, নাকি মনমতো চলেছে? আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য অসংখ্য নিয়ামাত দিয়েছেন। যেমন: বাতাস, পানি, আলো, অন্ধকার ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার—মানুষ এগুলোকে আল্লাহর অনুগ্রহ নয়, বরং নিজের অধিকার মনে করছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। দুনিয়াতে কোনোকিছুই এমনি এমনি হয় না। সবকিছুরই একটা সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। আবার অনেক নিয়ামাত আছে, যা মানুষকে পরিশ্রম করে উপার্জন করতে হয়। যদিও আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, এটি তো আমার নিজ রোজগারের পয়সা। এখানে আল্লাহর কোনো ভূমিকা নেই। তা হলেও মানুষ ভুল করবে। কারণ এই অর্থ উপার্জনের পেছনে যে শারীরিক সক্ষমতা ও মেধার প্রয়োজন, সেটা কিন্তু আল্লাহই মানুষকে দিয়েছেন। এটিও আল্লাহর বিরাট নিয়ামাত। তাই এই উভয় ধরনের নিয়ামাত সম্পর্কেই কিয়ামাতের দিন জবাব দিতে হবে।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/৫০২; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৫৪৩)

সূরা আসর

سُوْرَةُ الْعَصْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১৩-তম সূরা। এর আগে সূরা আলাম নাশরাহ ও পরে সূরা আদিয়াত নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা তাকাসুর ও পরে সূরা হুমাযা।

এক নজরে আসর

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ১০৩
- আয়াত: ৩
- মাক্কি

নামের রহস্য

'আসর' শব্দের অর্থ 'সময়'। সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ 'সময়'-এর ওপর শপথ করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে চাইলেন। তো, সেখান থেকেই সূরাটির নাম হয়েছে 'আসর'।

মেজর থিম

০১ সময়ের গুরুত্ব।

০২ ক্ষতির মধ্যে মানুষের ডুবে থাকা।

০৩ ক্ষতি থেকে পরিত্রাণের উপায়।

৫ সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই আল্লাহ সময়ের শপথ করেছেন। আর শেষ আয়াতে জানিয়েছেন—এই সময়কে কী কী কাজে খরচ করলে, মানুষ ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে পরকালীন মুক্তি পেতে পারে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা তাকাসুর; যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়াবি জীবন নিয়েই কেবল ব্যস্ত থাকা নিন্দনীয় ও চরম ক্ষতির কাজ। এরপর সূরা আসরে এ ক্ষতি থেকে বাঁচার চারটি উপায় বলে দেওয়া হয়েছে।

শানে নুযুল

এই সূরাটি অতি ছোট, অথচ এতে বক্তব্য ও ভাবের মহাসমুদ্র লুকিয়ে আছে। মানব জীবনের আসল নীতি-আদর্শ ও কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত, তা জানিয়ে দিতেই আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেছেন। এ-সূরাটি ভাব ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে এত ব্যাপক যে, গোটা ইসলামি জীবন-ব্যবস্থাকেই এতে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই সূরাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে, তার হিদায়াতের জন্য এটিই যথেষ্ট হবে।'

(দেখুন—ইবনুল কাইয়িম, মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ১/১৫২)

সেগমেন্ট

সময়ের শপথ

সময়ের শপথ করার মাধ্যমে আল্লাহ সূরাটির সূচনা করেছেন।

বেশিরভাগ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

কিছু মানুষ ছাড়া দুনিয়ার বাদবাকি সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।

ব্যতিক্রমী যারা

ক্ষতির হাত থেকে তারাই বাঁচবে—যারা আল্লাহর দেওয়া নির্দেশগুলো মেনে জীবন পরিচালনা করবে।

ফজিলত

আবদুল্লাহ ইবনু হিস্ন ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ-এর দুজন সাহাবির মধ্যে সাক্ষাৎ হলে, তারা একে অপরকে সূরা আসর পড়ে শোনানোর আগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতেন না। সূরা আসর পড়া শেষ হলে তারা একে অপরকে সালাম দিতেন, তারপর বিদায় নিতেন।

(তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ৫১২৪)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

ঈমান এনে ভালো কাজ নিজেও করতে হবে, অন্যকেও উৎসাহ দিতে হবে;

আর তাতে পুরো সমাজে আল্লাহর বিধান কায়েম করা সহজ হয়ে যাবে।

গতিপথ

১. টাইম ম্যানেজমেন্ট
সময় মানুষের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক উপাদান। তবে প্রতিটি ক্ষণে সে দূরে সরতে থাকে। তাই সময়ের সঠিক বণ্টন ও ব্যবহার জরুরি।

২. সঠিক দিক-নির্দেশনা ছাড়া মানুষ পথহারা
মানুষ সাধারণত ক্ষতির মধ্যেই পড়ে আছে। সঠিক দিক-নির্দেশনা ছাড়া সে তার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়। ভুলে যায় তার জীবনের আসল উদ্দেশ্য।

সেন্ট্রাল থিম
সময়ের গুরুত্ব

৩. সফলতার সিঁড়ি
আল্লাহর আযাব থেকে যদি আমরা মুক্তি পেতে চাই, তা হলে সময় থাকতে থাকতে দুটি কাজ অবশ্যই করতে হবে—(১) আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে হবে, (২) বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে।

৪. পারস্পরিক উৎসাহ প্রদান
শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলে চলবে না। আল্লাহর আদেশ সামষ্টিকভাবে মেনে চলতে হবে। আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরা ও ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে একে-অপরকে আদেশ দিতে হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
সময়-ই হলো মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আর, আল্লাহ তাআলা সেই সময়েরই শপথ করেছেন।	১	বিরাট এই ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় হলো—ঈমান আনা, ভালো কাজ করা, আল্লাহর বিধান মানতে একে-অপরকে আদেশ দেওয়া এবং ধৈর্য-ধারণ করা।	৩
প্রায় সকল মানুষই বিরাট ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	২		

কেইস-স্টাডি

"মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।" এই একটি মাত্র আয়াতই আমাদের করণীয় ঠিক করে দিতে পারে। আল্লাহ তাআলা নিজে বলছেন—মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। আমরাও সেই ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছি কি-না, সেটা অবশ্যই পরখ করে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? এটা পরীক্ষা করার উপায় হলো এই সূরার শেষ আয়াত—"ব্যতিক্রম কেবল সেসব লোক—যারা আল্লাহর পয়গামকে সত্য বলে মানে, ভালো কাজগুলো করে, একে অপরকে আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরার আদেশ দেয়, আর একে অপরকে (আল্লাহর বিধান মানার ক্ষেত্রে) ধৈর্য ধরার আদেশ দেয়।" এবার নিজেই মিলিয়ে দেখুন—আল্লাহর এই নির্দেশনা আপনার জীবনে কতটুকু কার্যকর আছে। এর ফলাফলই বলে দেবে—আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের দলে নাকি লাভবানদের দলে।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/৪৫৮; আবুস সাঊদ, তাফসীর, ৯/১৯৭)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

সমস্ত মানুষ যদি সূরা আসর নিয়ে তাদাব্বুর বা চিন্তাভাবনা করত, তবে হিদায়াতের জন্য এই সূরাটিই হতো যথেষ্ট। কারণ, ঈমানের পূর্ণতা অর্জনের চারটি স্তর রয়েছে—**প্রথম স্তর:** সত্যের পরিচয় পাওয়া; **দ্বিতীয় স্তর:** সে অনুযায়ী আমল করা; **তৃতীয় স্তর:** যে জানে না, তাকে তা শেখানো; আর **চতুর্থ স্তর:** ওপরের সবগুলো কাজ করতে গিয়ে যেসব কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়, তাতে সবর করা। এই চারটি স্তরের কথাই আল্লাহ তাআলা এই সূরায় বর্ণনা করেছেন। শুরুতেই সময়ের কসম করে বলেছেন, চারটি কাজ না করলে সব মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। সেই কাজ চারটি হলো—ঈমান আনা, নেক আমল করা, অপরকে শেখানো, ধৈর্য ধরা। মোটকথা, পূর্ণতা অর্জনের সবগুলো কাজের কথাই এখানে বলা হলো। এখন মানুষের ভেবে দেখার পালা—সে পূর্ণতা অর্জনের পথ ধরবে, নাকি ক্ষতির মধ্যেই নিমজ্জিত থাকবে!

(দেখুন—ইবনুল কাইয়িম, মিফতাহু দারিস সাআদাহ, ১/১৫৩)

সূরা হুমাযা

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৩২-তম সূরা। এর আগে সূরা কিয়ামাহ ও পরে সূরা মুরসালাত নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০৪ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা আসর ও পরে সূরা ফীল।

এক নজরে হুমাযা

- নুবুওয়াতের ৩য় বছরে নাযিল
- সূরা নং: ১০৪
- আয়াত: ৯
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘হুমাযা’ মানে ‘যে অন্যের অনুপস্থিতিতে তার দোষচর্চা করে’। সূরার ১ নং আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যারা দোষচর্চায় লিপ্ত, এখানে তাদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। সেখান থেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘হুমাযা’।

মেজর থিম

- ০১ মানুষের কিছু মন্দ স্বভাব।
- ০২ আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে সম্পদের অপারগতা।
- ০৩ ‘হুতামা’ জাহান্নামের বিবরণ।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু করা হয়েছে 'ওয়াইল' শব্দ দিয়ে, যা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। আর সূরাটির শেষে এসেছে 'হুতামা' শব্দটি, যা জাহান্নামের একটি নাম। এর অর্থ 'চূর্ণ-বিচূর্ণকারী'। অর্থাৎ জাহান্নামে যা পড়বে, তা আর আস্ত থাকবে না, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা আসর; যাতে আল্লাহ তাআলা চারটি বৈশিষ্ট্যের মানুষ ব্যতীত অপরাপর সব মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর সূরা হুমাযাতে তুলে ধরেছেন কিছু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অবস্থা।

শানে নুযুল

এই সূরাটিতে জাহিলি যুগের কিছু অন্যায় কাজের নিন্দা করা হয়েছে। সেগুলো হলো—সামনা-সামনি বা আড়ালে অপরের দোষত্রুটি বলে বেড়ানো, ও জমানো-সম্পদকে নিজের দুর্দিনের সুরক্ষাকারী মনে করা। এই দোষগুলো তখনকার সমাজের লোভী নেতাদের মধ্যে বেশি দেখা যেত। তখনো কিছু মানুষ ছিল—যারা বুঝতে পারত এগুলো ভালো কোনো কাজ নয়। কারণ, তারা দেখত, এসব নেতাগোছের লোক সব সময় অন্যের নিন্দা করে, আর অহংকার করে বেড়ায়। এরা গরিবের হক মেরে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। এসব কাজ তো কখনোই ভালো হতে পারে না। আর যেসব কাজ ভালো নয়, তার শাস্তি থাকা চাই। কিন্তু কে এদেরকে শাস্তি দেবে! এদের ক্ষমতা ও সম্পদ এত বেশি যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস নেই। তা হলে এই দুনিয়াতে শাস্তি না হলে, আর কবে এরা শাস্তি পাবে? মানুষের এই আক্ষেপটাকেই কুরআন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে আশ্বাস দিয়েছে—এগুলো ভীষণ মন্দ কাজ। আর এগুলোর জন্য অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। দুনিয়াতে না-পেলেও পরকালে তারা ভীষণ শাস্তি পেতে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ মানুষের মাঝে পরকালের বিশ্বাসকে গেঁথে দিতেই এই সূরাটি নাযিল করেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাজমুদ দুরার, ২২/২৪৩; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/২২৬)

সেগমেন্ট

নিন্দুক

গোপনে অন্যের নিন্দা করা ও মুখের ওপর কাউকে অপমান করা খুবই খারাপ কাজ। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

সম্পদের বাস্তবতা

অনেকে মনে করে, বিপদের দিনে তার সম্পদই তাকে আগলে রাখবে। কিন্তু তাদের সে-ধারণা ভুল। সম্পদ কখনো মানুষের রক্ষাকারী হতে পারে না।

শাস্তি

এই ধরনের স্বভাব বা বিশ্বাস যারা লালন করে, তাদের জন্য আছে ভয়াবহ আগুনের শাস্তি—যা সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

ফজিলত

সূরা হুমাযা মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

গীবত করা, অপবাদ দেওয়া বা কাউকে নিয়ে অনর্থক হাসি-ঠাট্টা করা ভীষণ অন্যায়;

কারণ, এই কাজগুলো শুধু অন্যকে কষ্ট দেয় না, বরং নিজের অন্তরেও কালো দাগ ফেলে।

গতিপথ

১. অপবাদ ও গীবতের প্রভাব

দোষচর্চা ও গীবত সাধারণ কোনো গুনাহ নয়। সমাজে এর মারাত্মক প্রভাব রয়েছে। এটি পারস্পরিক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে। সমাজের নৈতিক কাঠামো ভেঙে দেয়।

সেন্ট্রাল থিম

দোষচর্চা ও লোভের পরিণতি

২. সম্পদ মজুতকরণ

অনেকে মনে করে—সম্পদ তাদেরকে নিরাপত্তা দেবে। বিপদাপদে পড়লে, এই সম্পদই তাদেরকে বাঁচাবে। কিন্তু আল্লাহ জানালেন—হিসেবের দিন এই সম্পদ কিছুতেই কাউকে বাঁচাতে পারবে না।

৩. অহংকার ও লোভের পরিণাম

যারা অপবাদ বা গীবত করে, তারা অহংকারের বশে এগুলো করে। আবার যারা সম্পদ মজুত করে, তারা লোভী। এ-ধরনের মানুষকে আল্লাহ 'হুতামাহ'র মধ্যে ফেলবেন। তা এমন আগুন, যা সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

৪. দেহ ও আত্মার শাস্তি

জাহান্নামের সেই শাস্তি কেবল দেহকেই জ্বালাবে না। বরং তা হৃদয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি হবে সেটি। তাদের ওপরের দিক দিয়ে সেই আগুন ঢেকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ শাস্তিকে করা হবে দীর্ঘস্থায়ী।

ওভারভিউ	আয়াত
যারা অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা করে, কাউকে প্রকাশ্যে অপমান করে, সম্পদকে রক্ষাকবচ মনে করে—তাদের জন্য আছে কিয়ামাত দিনের কঠিন সতর্কবার্তা।	১-৯

কেইস-স্টাডি

কিছু মানুষ সম্পদকে তাদের রক্ষাকর্তা মনে করে। আর এ-কারণে সে গরিবকে দান করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে না। দ্বীনের কোনো প্রয়োজন তার দ্বারা পূরণ হয় না। সে ভাবে—'যদি বড় কোনো অসুখ হয়' 'যদি একটা দুর্ঘটনায় পড়ে যাই' 'ছেলেটার যদি কোনো বিপদাপদ হয়' ইত্যাদি। এসব সাত-পাঁচ ভেবে সে সম্পদ জমানো শুরু করে। সম্পদের লোভে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করতে ভুলে যায়। অথচ এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা এই সূরার ৪ নম্বর আয়াতে বললেন, "না, (তার সম্পদ তাকে) কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না: তাকে অবশ্যই হুতামা (অর্থাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণকারী)-এর ভেতর ছুড়ে ফেলা হবে।" তাই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে আমরা যেন এই মন্দ স্বভাবটা ঝেড়ে ফেলি।

(দেখুন—সা'লাবি, তাফসীর, ৩০/২৫৫)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্প্রীতিময় সমাজ ইসলামের দৃষ্টিতে অনেক দামি। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মদীনায় গেলেন, তখন সেখানকার সমাজে ছিল কাদা ছোড়াছুড়ি। একদল আরেকদলকে দেখতে পারত না। সবার মাঝে সব সময় যুদ্ধংদেহী মনোভাব থাকত। নবিজি সবগুলো দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিলেন। আউস-খাযরাজ চিরশত্রু দুই গোত্রকে ভ্রাতৃত্বের সুতোয় বেঁধে দিলেন। সবার সম্মিলিত শক্তিতে মদীনা হয়ে উঠল ইসলামের মজবুত দুর্গ। অপরদিকে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, এমন বিষয়কে ইসলাম কঠোরভাবে প্রতিহত করেছে। তার একটি নমুনা এই সূরার শুরুতেই দেখা যায়। যারা অপরের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, সামনে-পেছনে সমালোচনা করে, তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 'ওয়াইল' শব্দটি; যা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এত কঠিন শাস্তির কারণ হলো, চোগলখুরি করা, কাউকে অপমান করা, ব্যঙ্গ করা—এগুলোর দ্বারা সমাজে সম্প্রীতি বজায় থাকে না। চরম বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। অথচ আলোকিত সমাজ গড়তে একটি সুস্থ পরিবেশের প্রয়োজন। তাই সুন্দর সমাজ গঠনে আমাদেরকে অগ্রগামী থাকতে হবে।

(দেখুন—কুরতুবি, তাফসীর, ২০/১৮১; বাগাবি, তাফসীর, ৮/৫২৬)

সূরা ফীল

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১৯-তম সূরা। এর আগে সূরা কাফিরূন ও পরে সূরা ফালাক নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০৫ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা হুমাযা ও পরে সূরা কুরাইশ।

এক নজরে ফীল

- মাক্কি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ১০৫
- আয়াত: ৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

'ফীল' মানে 'হাতি'। সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা বলেন, "তুমি কি ভেবে দেখোনি—তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন?" এই হিসেবে সূরাটির নাম হয়েছে 'ফীল'।

মেজর থিম

০১ হস্তীবাহিনীর চক্রান্ত।

০২ আল্লাহর পরিকল্পনা।

০৩ হস্তীবাহিনীর পরিণতি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু হয়েছে একটি প্রশ্ন দিয়ে, "তুমি কি ভেবে দেখোনি—তোমার রব হাতিওয়ালাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন?" সূরাটির শেষে এই হাতিওয়ালাদের পরিণতি বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন: "পরিশেষে তিনি তাদেরকে এমন শস্য-কাণ্ডের মতো বানিয়ে দিলেন, যার শস্যগুলো খেয়ে খড়গুলো রেখে দেওয়া হয়েছে।"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা হুমাযা; যাতে দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত একদল মানুষের বিবরণ দেওয়া হয়। তাদের মন্দ স্বভাব ও পরিণতির বিষয়টিও উঠে আসে সেখানে। আর সূরা ফীল শুরু হয়েছে আরেক দল হতভাগাদের আলোচনা দিয়ে—যারা আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার চক্রান্ত করে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

শানে নুযুল

ইয়ামানের গভর্নর আবরাহা ছিল কট্টর খ্রিষ্টান। আর সে-সময় আরবের অধিকাংশ লোকজন ছিল মূর্তিপূজারি। গুটিকয়েক মানুষ ছিলেন, যারা এক আল্লাহকেই তাদের রব হিসেবে মানতেন। তবে সকলেরই ইবাদাতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহর ঘর কা'বা। আবরাহার সেটা ভালো লাগল না। সে ইয়ামানে বড় একটা গির্জা বানিয়ে ঢাক-ঢোল পেটাতে শুরু করল। লোকজনকে বোঝাতে লাগল—তার গির্জাটাই নাকি নতুন কা'বা-ঘর। কিন্তু তার কথা আরবরা কানে তুলল না। তাই প্রচণ্ড হিংসার বশবর্তী হয়ে সে সিদ্ধান্ত নিল—কা'বাকে ধ্বংস করে ফেলবে। বিশাল সৈন্য-বহর নিয়ে রওনা হলো আবরাহা। পথে যেতে যেতে চলতে লাগল তার বাহিনীর নির্লজ্জ লুটতরাজ। একদিন রাসূল ﷺ-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের ২০০ উটও লুট হয়ে গেল। খবর পেয়ে তিনি ছুটে এলেন আবরাহার কাছে। আবরাহা তাকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। ভাবতে থাকে—কুরাইশদের এই নেতা বুঝি কা'বা ভাঙতে বাধা দেবে। কিন্তু আবরাহাকে অবাক করে দিয়ে আবদুল মুত্তালিব শুধু নিজের উটগুলো ফেরত চাইলেন। আর পরিষ্কার করে বললেন, 'আমি উটের মালিক। তাই আমার উট আমি ফেরত চাই। আর ওই কা'বা-ঘরেরও একজন মালিক আছেন। তাঁর ঘর তিনিই রক্ষা করবেন।' আর হলোও তা-ই। আবরাহা যখন কা'বার কাছাকাছি এসে পৌঁছাল, তখন উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। প্রত্যেকের সাথে ছিল তিনটি করে পাথর—দুপায়ে দুটি, ঠোঁটে একটি। সেই পাথর আবরাহা বাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে শরীরে পচন ধরতে শুরু করল। এভাবে পুরো বাহিনী মারা পড়ে। এই ঘটনাটিকে মনে করিয়ে দিতেই এ-সূরাটি নাযিল হয়।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/৪৬৫-৪৬৬; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৫৫৭)

সেগমেন্ট

হাতিওয়ালাদের সাথে আচরণ

আল্লাহর ঘর ভাঙতে আসায় হাতিওয়ালাদের সাথে কী আচরণ করা হয়েছিল—আল্লাহ সূরার শুরুতেই সে-কথা মনে করিয়ে দিলেন।

আল্লাহর ক্ষমতা

মাত্র কতগুলো ছোট্ট ছোট্ট পাখি। ব্যস! হাতিওয়ালাদের বিরাট বাহিনী নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এটি আল্লাহর ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ।

বাহিনীর ধ্বংস

আল্লাহর ঘর ভাঙবার দুঃসাহস দেখানোর ফলে আবরাহার বিশাল বাহিনী নজিরবিহীন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে।

ফজিলত

মারুর ইবনু সুওয়াইদ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা উমর ﵁-এর সাথে একবার হজ্জের সফরে বের হলাম। তিনি আমাদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। তাতে তিলাওয়াত করলেন—সূরা ফীল ও কুরাইশ।'

(ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৭৭৫৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আবরাহার বিশাল হস্তীবাহিনী সমূলে-ধ্বংস হয়েছে—এই ঘটনাটি স্মরণ রাখুন;

এতে আপনার মনে আল্লাহর অজেয় ক্ষমতার বিষয়টি গেঁথে যাবে।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর নিরাপত্তা ও অহংকারীদের পরিণতি

১. হাতিওয়ালাদের চক্রান্ত

সূরার শুরুতেই কুরাইশ ও মানব-জাতিকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়—আবরাহা বাহিনীর ইতিহাস। সেই হাতিওয়ালারা আল্লাহর ঘর ভাঙার জন্য চক্রান্ত করেছিল।

২. চক্রান্ত ধূলিসাৎ

তাদের সেই চক্রান্তকে আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট্ট ছোট্ট পাখিকে পাথর দিয়ে পাঠান তিনি। সেই পাথরের আঘাতে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটা বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে।

৩. পরিণতি

'ভীষণ শক্তিশালী' সে-বাহিনীকে আল্লাহ এমন শস্য-কাণ্ডের মতো বানিয়ে দিলেন, যার শস্যগুলো খেয়ে খড়গুলো রেখে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অহংকারীরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

৪. পবিত্র ঘরের নিরাপত্তা

কা'বা অত্যন্ত পবিত্র ঘর। এখানে সারা দুনিয়ার মুসলিমরা জমায়েত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে। এটি হবে মুসলিম উম্মাহর কেন্দ্রবিন্দু। তাই স্বয়ং আল্লাহ-ই এই ঘরের নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
নবি ﷺ ও তাঁর উম্মতকে ভেবে দেখার আহ্বান জানানো হলো—হাতিবাহিনীর সাথে আল্লাহ কীরূপ আচরণ করেছেন।	১	শাস্তি দিতে সেই অহংকারী বাহিনীর ওপর আল্লাহ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান। পাখিগুলো তাদের ওপর ভীষণ শক্ত পাথর নিক্ষেপ করে।	৩-৪
হাতিবাহিনীর চক্রান্তকে আল্লাহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।	২	এর ফলে হাতিবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।	৫

কেইস-স্টাডি

৬০ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বহর নিয়ে এসেছিল আবরাহা। সাথে ছিল অনেক হাতি। উদ্দেশ্য—আল্লাহর ঘর ভেঙে ফেলবে। এত বড় এক বাহিনীর জন্য এটা কঠিন কোনো বিষয়ই ছিল না। তারা ভেবেছিল—'যাব, দেখব, আর জয় করব।' পথে তেমন কোনো বাধাও পেল না সত্যি। কিন্তু হঠাৎ-ই আকাশে উড়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। ছোট্ট দুটি পায়ে দুটি আর ঠোঁটে একটি পাথর—বিশাল সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ছিল অস্ত্র! কিন্তু সেই অস্ত্রের কী দাপট! একেবারে পিষে গেল আবরাহার দম্ভ। গলে-পচে ধুঁকে ধুঁকে মরল আবরাহা-সহ তার দলের সৈন্যরা। এই ঘটনা আমাদের জন্য বিশাল শিক্ষা বহন করে। মানুষ পরিকল্পনা করে, আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেন। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনাই যে শ্রেষ্ঠ—এই সত্যকে মনে-প্রাণে ধারণ করতে হবে। যেকোনো বিপদ-মুসিবতে তাঁকেই ডাকতে হবে, হাত পাততে হবে তাঁর কাছেই।

(দেখুন—সূরা তালাক, ৬৫:২-৩; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৩০০)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ / 'তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?' এখানে আমাদের গবেষণার বিষয় একটি শব্দ নিয়ে। মূলে 'কাইদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গোপন কৌশল বা চক্রান্ত' অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে গোপন কী ছিল? তারা যে আল্লাহর ঘর কা'বা ভেঙে ফেলতে এসেছে, এ-কথা তো তারা গোপন করেনি। তারা প্রকাশ্যেই ৬০ হাজার লোকের একটি বিশাল সেনাবাহিনী আর হাতির দল নিয়ে ইয়ামান থেকে মক্কায় এসেছিল। তাহলে তাদের চক্রান্ত ছিল কী নিয়ে? আসলে কা'বা ভেঙে ফেলার পেছনে তাদের গোপন উদ্দেশ্যটি ছিল ভিন্ন। তারা মূলত কুরাইশদেরকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল। সমগ্র আরবকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছিল। যেন দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত যে বাণিজ্য পথ, আরবদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া যায়। এটা ছিল তাদের মক্কা আক্রমণের গোপন কারণ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেই চক্রান্তের কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলেন। কারণ তিনি যে অন্তর্যামী।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৫৪০; কুরতুবি, তাফসীর, ২০/১৯৫; তাফহীমুল কুরআন, ১৯/২৪২)

সূরা কুরাইশ

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

তারতীব বিন-নুযুল।

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২৯-তম সূরা। এর আগে সূরা তীন ও পরে সূরা কারিআ নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ।

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০৬ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ফীল ও পরে সূরা মাউন।

এক নজরে কুরাইশ

- মাক্কি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ১০৬
- আয়াত: ৪
- মাক্কি

নামের রহস্য

মক্কার একটি গোত্রের নাম 'কুরাইশ'। আল্লাহর রাসূল ﷺ এই গোত্রেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সূরাতে কুরাইশদের ওপর আল্লাহর নানাবিধ অনুগ্রহের কথা উঠে এসেছে। তাই এই গোত্রের নামানুসারেই সূরাটির নামকরণ করা হয় 'কুরাইশ'।

মেজর থিম

০১ কুরাইশদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ।

০২ তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু হয়েছে কুরাইশদের ওপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের বর্ণনা দিয়ে। আর শেষ হয়েছে এরূপ অনুগ্রহের কারণ উল্লেখ করার মাধ্যমে। সেই কারণটি হলো—ওই শহরেই আছে আল্লাহ তাআলার ঘর। ফলে কেউ তাদের পেছনে লাগত না, যুদ্ধবিগ্রহে জড়াত না। তারা যে আল-হারামের অধিবাসী!

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা ফীল; যেখানে কা'বার সুরক্ষায় সরাসরি আল্লাহর সাহায্য আসার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ওই ঘটনার ফলে আরবের সর্বত্র কুরাইশদের সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই সূরা কুরাইশে তাদেরকে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন ও শুকরিয়া আদায় করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বংশের নাম ছিল কুরাইশ। এই কুরাইশ গোত্রই কা'বা-ঘর দেখাশোনা করত। তাই আরব অঞ্চলে তাদের প্রভাব ছিল অনেক বেশি। আবরাহা ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে এসেও আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে পারেনি। এর ফলে কা'বা যে এক আল্লাহর ঘর—এটা সবাই বিশ্বাস করতে লাগল। সেই সাথে কুরাইশরা আরবদের মনে আরও বেশি করে জায়গা করে নিল। তা ছাড়া সেই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেও তারা ছিল সবচেয়ে এগিয়ে। মক্কাজুড়ে আর কোনো গোত্র তাদের মতো ধনী ছিল না। শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই তাদের ব্যবসা ছিল জমজমাট। তখন পথে পথে ডাকাতি হলেও, কুরাইশদের কাফেলায় হাত দেবার সাহস কারও ছিল না। মোদ্দাকথা শুধু 'আল্লাহর ঘরের খাদেম' পরিচয়ের দরুন গোটা মক্কা মেনে নিল তাদের একক কর্তৃত্ব। কিন্তু এত এত সাফল্য পাওয়ার পরও তারা আল্লাহকে ভুলে গেল। কয়েকটা নিষ্প্রাণ মূর্তির পূজা শুরু করল। এ-ব্যাপারটির দিকে ইঙ্গিত দিয়েই সূরা কুরাইশ নাযিল করা হয়।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/২৫৯; তাফহীমুল কুরআন ১৯/২৪৫)

সেগমেন্ট

কুরাইশদের নিরাপত্তা

আল্লাহ তাআলা কুরাইশদেরকে সামগ্রিক নিরাপত্তা দিয়েছেন। সূরার শুরুতেই এসেছে সেই আলোচনা।

আনুগত্যের আহ্বান

যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, তাই তাদের উচিত—এক আল্লাহর আনুগত্য করা।

অনুগ্রহ স্মরণ করানো

সূরার শেষেও কুরাইশদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা পুনরায় স্মরণ করানো হয়েছে।

ফজিলত

মারুর ইবনু সুওয়াইদ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা একবার উমর ﵁-এর সাথে হজ্জের সফরে বের হলাম। তিনি আমাদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। আর তাতে তিলাওয়াত করলেন—সূরা ফীল ও কুরাইশ।'

(ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৭৭৫৮)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহ আমাদের রব—খাবার থেকে নিরাপত্তা, সবটাই তাঁর-দেওয়া নিয়ামাত;

সুতরাং আমাদের একনিষ্ঠ ইবাদাত পাওয়ার অধিকার কেবল তিনিই রাখেন।

গতিপথ

১. বিশেষ অনুগ্রহ ও নিরাপত্তা
আল্লাহ তাআলা কুরাইশদেরকে পুরো আরব অঞ্চলে বিশেষ এক মর্যাদা দিয়েছিলেন। শীত ও গ্রীষ্মের ব্যবসায়িক সফরে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
কুরাইশদের ওপর আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ হলো—অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। তারা স্বাচ্ছন্দ্যে ও নির্ভয়ে বিভিন্ন জনপদে বাণিজ্য করতে পারত।

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর ইবাদাতের বাধ্যবাধকতা

৩. একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান
কুরাইশরা যেসব নিয়ামাত পেয়েছে, সেগুলো তাদের নিজেদের অর্জন নয়। বরং আল্লাহর-দেওয়া-অনুগ্রহ মাত্র। আর এই অনুগ্রহের দাবি হচ্ছে—তারা কেবল আল্লাহর দাসত্ব করবে। তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করবে না।

৪. অনুগ্রহের কথা পুনরায় স্মরণ করানো
সূরার শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের ওপর তাঁর অনুগ্রহের কথা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে যে তিনি ক্ষুধা ও ভয় থেকে নিরাপদ রেখেছেন, তা উল্লেখ করেছেন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কুরাইশদের প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন—এই বিষয়টি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো।	১-২	তাদেরকে আহ্বান জানানো হলো—তারা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করে।	৩-৪

কেইস-স্টাডি

আমাদের সকলেরই উচিত—নিজের প্রতি একটু বিশেষ যত্নশীল হওয়া। নিজের লক্ষ্যের দিকে ফোকাস করা। তবে, শুধুমাত্র ক্যারিয়ারের দিকে নয়, বরং ফোকাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ইবাদাত, পরকাল-ভাবনা; সর্বোপরি রবের সাথে আমার সম্পর্ক। এই একটা বিষয় যদি ঠিক হয়ে যায়, তা হলে জীবনের প্রতিটি বিষয় ঠিক হয়ে যাবে। আপনার রবের সাথে যদি আপনার সম্পর্ক মজবুত না হয়, তাঁর সাথে যদি আপনার বোঝাপড়াটা ভালো না হয়—তবে বাদবাকি কোনোকিছুই গোছালো হবে না। কুরাইশরা শুধুমাত্র আল্লাহর ঘর কা'বার দেখাশোনা করত। হজ্জের মওসুমে হাজীদেরকে পানি পান করাত। শুধু এতটুকু কাজের বদলা হিসেবে আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। আমরা যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো যথাযথভাবে মেনে চলি, তবে তিনি আমাদের অন্তরকেও চিন্তামুক্ত করবেন।

(দেখুন—মুসলিম, ২০৫; তিরমিযি, ২৩১০; নাসাঈ, ৩৬৪৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

পেটে ক্ষুধা থাকলে মানুষের সময়গুলো সুখের হয় না। আবার পর্যাপ্ত খাবার থাকা সত্ত্বেও, নিরাপত্তা না থাকলে মানুষ স্বস্তি খুঁজে পায় না। কিন্তু যখন খাদ্যের জোগান ঠিক থাকে, আবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও কোনো হুমকি থাকে না—তখন মানুষের সময়গুলো বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটে। আল্লাহ তাআলা কুরাইশদেরকে এই দুটো নিয়ামাতই দান করলেন। ক্ষুধা মেটাতে তাদেরকে খাবার দিলেন এবং ভয় থেকে রাখলেন নিরাপদ। তাই তাদের সুখের পথে আর কোনো বাধা রইল না। আল্লাহ তাদেরকে আদেশ দিলেন—তারা যেন তাঁর ইবাদাত করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কারণ, ইতোমধ্যেই তারা আল্লাহর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এক আল্লাহর গোলামি ছেড়ে বেছে নিয়েছে অসংখ্য মিথ্যা-ইলাহ।

বর্তমানেও আমরা যারা প্রতিবেলা খাবার পাই, ভয় থেকে নিরাপদ আছি—তাদের উচিত রবের ইবাদাতে নিমগ্ন হওয়া, শুকরিয়ায় সাজদা দেওয়া।

(দেখুন—শানকিতি, তাফসীর, ৯/১১২)

সূরা মাউন

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১৭-তম সূরা। এর আগে সূরা তাকাসুর ও পরে সূরা কাফিরূন নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০৭ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কুরাইশ ও পরে সূরা কাউসার।

এক নজরে মাউন

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ১০৭
- আয়াত: ৭
- মাক্কি

নামের রহস্য

'মাউন' মানে 'প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস'। সূরার শেষ আয়াতের সর্বশেষ শব্দটি হলো 'মাউন'। ওখানে থেকেই শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

মেজর থিম

০১. বিচার দিবসকে অস্বীকারকারী লোকদের বৈশিষ্ট্য।

০২. নামাজের ব্যাপারে উদাসীনতা।

০৩. লোক দেখানো ইবাদাত।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের কিছু বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। আর শেষ অংশে দিয়েছেন মুনাফিকদের আচরণের বিবরণ। তবে সূরাটির শুরু-শেষ মিলিয়ে উভয় দলের জন্যই রয়েছে কঠিন তিরস্কার।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা কুরাইশ; যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যিনি তাদেরকে ক্ষুধার মোকাবিলায় খাবার দিয়েছেন।" এরপর সূরা মাউনে এসে সেইসব মানুষের নিন্দা করেছেন, যারা অসহায়-মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়াতে উৎসাহ দেয় না।

শানে নুযুল

কাফির শুধু আল্লাহর হক-ই নষ্ট করে না। সমান তালে মানুষের হকও নষ্ট করতে থাকে। তার মধ্যে নৈতিকতা বলতে কিছু থাকে না। আসলে যার মধ্যে ইসলামের আলো নেই, সে আল্লাহ ও বান্দার হকের ব্যাপারে উদাসীন থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এই সূরার ২ ও ৩ নং আয়াতটি নাযিল করে কাফিরদের এই নিন্দনীয় স্বভাবটি তুলে ধরা হয়েছে।

কাফিরদের পাশাপাশি আরেকটি নিকৃষ্ট দল হলো মুনাফিকরা। এরা টুকটাক ভালো কাজ করে। কিন্তু তাদের এসব কাজ শুধুমাত্র লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে। মুসলিম সমাজে নিজেদের আসল পরিচয় ঢেকে রাখতেই তারা এগুলো করে থাকে। সূরার বাকি অংশে এই মুনাফিকদের চরিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরলেন। যাতে করে মুসলিমরা সহজেই তাদেরকে চিনতে পারে। কাফির-মুনাফিকদের এসব বৈশিষ্ট্য একজন মুমিনের মাঝে যে কিছুতেই থাকা উচিত নয়—সেটি স্মরণ করিয়ে দিতেই আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেছেন।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/২৭৫)

সেগমেন্ট

পরকালকে অস্বীকার করা

পরকালকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, এমন মানুষদের কিছু কর্মকাণ্ড সূরার প্রথম ভাগেই আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেন।

মুনাফিকি

নামাজের ব্যাপারে উদাসীনতা, মানুষকে দেখানোর জন্য ভালো কাজ করা মুনাফিকির লক্ষণ।

এড়িয়ে যাওয়া

এ-ধরনের মানুষ সকল প্রকার সামাজিক-দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে চলে। মানুষের ছোটখাটো প্রয়োজনেও এরা এগিয়ে আসে না।

ফজিলত

সূরা মাউন মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, “মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।”

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

এতিমদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে, → আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাশাপাশি, সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ছড়িয়ে যাবে।

গতিপথ

১. সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়িয়ে চলা

যারা পরকালকে অস্বীকার করে, তারা মনে করে—আমাদেরকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। খামাখা কেন উটকো ঝামেলা পোহাতে যাব! তাই তারা এতিমকে ঠকায়, সমাজের কোনো বিষয়ে এরা দায়িত্বশীল আচরণ করে না।

সেন্ট্রাল থিম

কুফরি ও মুনাফিকি স্বভাবের তীব্র সমালোচনা

২. দরিদ্র ও অভাবীদের বঞ্চিত করা

ধনীর টাকায় দরিদ্রের অধিকার আছে—এই সত্যটি এই শ্রেণির মানুষ মানতে চায় না। তাই তারা হতদরিদ্র মানুষগুলোর কথা কখনো ভাবে না।

৩. প্রাণহীন ইবাদাত

মুনাফিকরা দায়ে ঠেকে ইবাদাত করে। তাদের ইবাদাতগুলো হয় ভীষণ নিষ্প্রাণ। তাদের ইবাদাতে আল্লাহর প্রতি কোনো একাগ্রতা থাকে না।

৪. লোক-দেখানো ইবাদাতের নিন্দা

যারা লোক-দেখানো ভালো কাজ করে, আল্লাহ তাআলা তাদের সমালোচনা করেছেন। তাদের এসব ইবাদাত কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহর পক্ষ থেকেও পাওয়া যাবে না কোনো প্রতিদান।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের বৈশিষ্ট্য—এরা এতিমকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। অভাবীকে খাওয়ানোর ব্যাপারেও এরা উৎসাহ দেয় না।	১-৩	মুনাফিকরা তাদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তাদের ভালো কাজগুলো হয় লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে। এ ছাড়া এরা ভীষণ কৃপণ স্বভাবের লোক।	৪-৭

কেইস-স্টাডি

মুসলিম কখনো উদাসীন হতে পারে না। কোনো ব্যাপারেই তার উদাসীনতা মানায় না—হোক সেটা ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক। সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা থাকতেই হবে। এই সূরাতে বেশ কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উঠে এসেছে। এতিম, অভাবীদের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আপনার আশেপাশে নিশ্চয়ই কোনো এতিমখানা বা লিল্লাহ-বোর্ডিং আছে! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা দিয়েছেন, সেখান থেকে এতিমদের জন্য কিছুটা ব্যয় করলে, দেখবেন—তাদের হাসিমাখা মুখগুলো আপনার ভেতরে প্রশান্তি এনে দিয়েছে। এই বাচ্চাগুলোর আত্মীয়রা ওদেরকে এতিমখানায় দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব সেরেছে। তাই উৎসবের দিনগুলোতে ওদের সাথে একটু সময় কাটান। আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চয় এর প্রতিদান পাবেন।

(দেখুন—বুখারি, ৫৩৫২, ৬৫৩৯, ৭৪৯৫-৭৪৯৬; মুসলিম, ৯৯৩, ১০১৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

“দুর্ভোগ পোহাতে হবে সেসব নামাজিকে—যারা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন।” ৪-৫ নং আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করুন—আল্লাহ তাআলা শুরুতে বলেছেন ‘নামাজি’, পরে আবার বললেন ‘নামাজের ব্যাপারে উদাসীন’। তা হলে আমরা বুঝতে পারলাম, নামাজিরাও নামাজের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। তারা কখনো নামাজ পড়ে, আবার কখনো পড়ে না। যখন নামাজ পড়ে, তখন দেখা যায়—এমন সময় তারা নামাজে দাঁড়িয়েছে, যখন নামাজের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে আসছে প্রায়। নামাজ পড়লেও তাদের মনের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। যেন কোনো বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নামাজের সময় তারা ব্যস্ত থাকে কাপড় ঠিকঠাক করা নিয়ে। হাই তুলতে থাকে ক্রমাগত। পুরো নামাজের মধ্যে তাদের এ অনুভূতি থাকে না যে, তারা রবের সামনে দাঁড়িয়েছে। নামাজের মধ্যে কী পড়ছে, তা-ও তাদের খেয়াল থাকে না। তাড়াহুড়া করে এমনভাবে নামাজটা পড়ে নেয় যে—কিয়াম, রুকু, সাজদা কোনোটাই ঠিকমতো হয় না। তাদের কানে মুআযযিনের আওয়াজ এলে, পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে মসজিদে যায়, নামাজে দাঁড়ায়। ওপরের আয়াত-দুটিতে এমন নামাজিদের ব্যাপারেই কথা বলা হয়েছে। যাদের জন্য আছে দুর্ভোগ, পরকালের কঠিন শাস্তি।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৬৬২)

সূরা কাউসার

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১৫-তম সূরা। এর আগে সূরা আদিয়াত ও পরে সূরা তাকাসুর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০৮ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা মাউন ও পরে সূরা কাফিরূন।

এক নজরে কাউসার

- মাক্কি বা মাদানি যুগে নাযিল: মাক্কি
- সূরা নং: ১০৮
- আয়াত: ৩

নামের রহস্য

'কাউসার' মানে 'বিপুল কল্যাণ'। নবিজির পুরো জীবন-জুড়ে আল্লাহ তাআলা বিপুল কল্যাণ দিয়েছেন—দুনিয়াতেও, আখিরাতেও। সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত 'কাউসার' শব্দ থেকেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে।

মেজর থিম

০১. রাসূল ﷺ-এর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ।

০২. নবিজির প্রতি আল্লাহর দিক-নির্দেশনা।

০৩. রাসূলের শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির প্রথম আয়াতের একটি শব্দ: আল-কাউসার; যার অর্থ বিপুল কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে দুনিয়ায় বিপুল কল্যাণ দিয়েছেন, আবার পরকালেও বিপুল কল্যাণ দেবেন। অপরদিকে সূরাটি শেষ হয়েছে 'আল-আবতার' শব্দ দিয়ে; যার অর্থ: সব ধরনের কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ যারা রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সব ধরনের কল্যাণ থেকে দূরে থাকবে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা মাউন; যার শেষে কিছু মানুষের কৃপণতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে: "আর (তারা) প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস অন্যদেরকে দেয় না।" আর সূরা কাউসার শুরু হয়েছে আল্লাহর বদান্যতার পরিচয় দিয়ে—"নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে বিপুল কল্যাণ দিয়েছি।"

শানে নুযুল

আল্লাহর রাসূল ﷺ তখনো নুবুওয়াত পাননি। ছেলেবেলা থেকেই তো মক্কাবাসী তাঁকে চিনত। তিনি কোনোদিন মিথ্যা বলেননি, কাউকে কটু কথা বলেননি, আমানত রক্ষা করেছেন শতভাগ, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন। সেই জাহিলিয়াতের যুগেও তাঁকে সবাই 'আল-আমিন' বলে ডাকত। চল্লিশ বৎসর বয়সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নুবুওয়াত পেলেন নবিজি। সকল ধরনের শির্ক বাদ দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদাত করতে বললেন সবাইকে। ব্যস! এতদিনকার সব ভালোবাসা-সম্মান যেন কর্পূরের মতো উবে গেল এক নিমিষেই। এরপর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা رضي الله عنها আর মাথার ওপর ছায়ার-মতো-থাকা চাচা আবু তালিব—এ দুজনের মৃত্যুতে বেশ পেরেশান হয়ে গেলেন তিনি। সেই সাথে একে একে নবিজির তিনজন ছেলে-সন্তান মারা যায়। মুশরিকরা তখন ঠাট্টা করে বলতে লাগল—'এ লোক মরে গেলে তো তার নাম নেওয়ারও কেউ থাকবে না। বাস্তবে তো সে একজন শেকড়-কাটা লোক।' আর তখনই আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল করা হয় সূরা কাউসার। যেখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বিপুল কল্যাণের সুসংবাদ দেওয়া হয়। সেই সাথে আসল শেকড়-কাটাদের পরিচয়ও আল্লাহ জানিয়ে দেন সূরার শেষে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৬৭৪; ওয়াহিদি, আসবাবুন নুযুল, ৪৬৬)

সেগমেন্ট

বিপুল কল্যাণের অনুগ্রহ

সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন—“নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে বিপুল কল্যাণ দিয়েছি।”

অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা

এই বিরাট অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ আল্লাহ তাঁর নবিকে আদেশ দিলেন—তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো, আর কুরবানি করো।

প্রকৃত শেকড়হীন কে?

কাফিররা নবিকে ‘শেকড়হীন’ বলে উপহাস করে। সূরার শেষ আয়াতে আল্লাহ সাফ জানিয়ে দিলেন—তোমাকে যারা ঘৃণা করে, শেকড়হীন আসলে তারাই।

ফজিলত

আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একবার আমরা রাসূলুল্লাহ-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ করেই তাঁর অচেতন অবস্থার মতন সৃষ্টি হলো। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে মাথা তুললেন। আমরা বললাম, “আল্লাহর রাসূল, আপনার হাসির কারণ কী?” তিনি বললেন, “এই মাত্র আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন—পরম করুণাময়, বিশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে। নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে বিপুল কল্যাণ দিয়েছি। সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো আর কুরবানি করো। তোমাকে যারা ঘৃণা করে, তারাই শেকড়হীন।” (দেখুন—মুসলিম, ৪০০)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

নববি ঐতিহ্যকে সামনে রেখে আল্লাহর নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ কুরবানি করতে হবে;

কারণ, এই কুরবানি জীবনের প্রতিটি বাঁকে আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নুইয়ে দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর ইবাদাত করলে, অফুরন্ত নিয়ামাত ও অনুগ্রহ লাভ করা যায়

১. বিপুল কল্যাণের উপহার

আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-কে বিপুল কল্যাণ দিয়েছেন। এই কল্যাণ কেবল কিয়ামাত দিনের 'হাউজে-কাউসার'-এ সীমাবদ্ধ নয়। বরং দুনিয়া ও আখিরাতে রাসূলকে দেওয়া সামগ্রিক কল্যাণকে বোঝায়।

২. ইবাদাতের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আল্লাহ বিপুল কল্যাণের নিয়ামাত দিয়েছেন। এবার চাই সেই নিয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আর কৃতজ্ঞতা তখনই পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভব হবে, যখন নামাজ ও কুরবানির মাধ্যমে—একনিষ্ঠভাবে তাঁর সামনে নত হওয়া যাবে।

৩. রাসূলের বিরোধিতার পরিণাম

যারা রাসূলের বিরোধিতা করবে, তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করবে, তাদেরকেই আল্লাহ শেকড়হীন করে দেবেন। মানে তারা সকল ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা বিপুল কল্যাণ দিয়েছেন—জানানো হলো সে-কথা।	১	রাসূল নন, রাসূলের শত্রুরাই বরং 'আবতার/শেকড়-কাটা'।	৩
আর এই বিপুল কল্যাণের নিয়ামাতের শুকরিয়া হিসেবে তাঁকে নামাজ ও কুরবানির আদেশ দেওয়া হলো।	২		

কেইস-স্টাডি

এ-সূরার তৃতীয় ও সর্বশেষ আয়াত—"তোমাকে যারা ঘৃণা করে, তারাই শেকড়হীন।" রাসূলের উদ্দেশ্যে এই ছিল মহান আল্লাহর বাণী। রাসূলকে কাফিররা কেন ঘৃণা করত, শানে নুযুল অংশে তা বলা হয়েছে। আজকের দিনেও কাউকে ভালো কথা বলতে গেলেই কটু কথা শুনতে হয়। কাউকে সৎ হতে বললে, অন্যায় ছাড়তে বললে—তারা ভালো উপদেশ কানে না তুলে, বরং শুরু করে ব্যক্তিগত আক্রমণ। এ ধরনের দাম্ভিকদের দেখে নেওয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। এই সূরা থেকে আমরা তেমন ইঙ্গিতই পাই। সত্য বলায়, সৎ পথ দেখানোয় যারা রাসূলকে ঘৃণা করে, তাদেরকে আল্লাহ শেকড়হীন করে দেবেন। এবার আমাদের শুধু ধৈর্য ধরার পালা। আল্লাহ অবশ্যই মুমিনদের সঙ্গে আছেন।

(দেখুন—বুখারি, ১৪৬৯; মুসলিম, ১০৫৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

"তোমাকে যারা ঘৃণা করে, তারাই শেকড়হীন।" সূরাটির ৩ নং আয়াত থেকে বোঝা যায়—সত্যের বিরোধীদের যত শক্তিশালীই মনে হোক না কেন, তারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষণস্থায়ী। অপরদিকে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে থাকেন, তাদের নাম থেকে যায়। অনুসারীরা শ্রদ্ধাভরে তাদের স্মরণ করে। তাদের কর্মগুলো স্থায়ী হয়। সূরা আলাম নাশরাহতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান বৃদ্ধির যে সুসংবাদ আল্লাহ দিয়েছেন, তার একটি অংশ মুমিনরাও পান। কারণ, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত দ্বীনের ওপর দৃঢ় থাকেন। বিপরীত দিকে, যারা নিজেদের মনমতো চলে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত দ্বীনকে ঘৃণা করে, তাদের জীবন একটা সময়ে অর্থহীন হয়ে যায়। তাদের কর্মকাণ্ড সময়ের সাথে সাথে ভেসে যায় ধুলার মতন। তাদের অনুসারীরা মৃত্যুর পরপরই তাদেরকে ভুলে যায়। জীবনে ভালো কাজ না থাকায়, এক সময় বন্ধ হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা। এভাবে ধীরে ধীরে মুছে যায় তাদের সব স্মৃতি। শ্রদ্ধাভরে তাদেরকে স্মরণ করার কেউ থাকে না। তারা হয়ে যায় সত্যিকারের শেকড়হীন।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩২/৩২১; কুরতুবি, তাফসীর, ২০/২২২)

সূরা কাফিরূন سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১৮-তম সূরা। এর আগে সূরা মাঊন ও পরে সূরা ফীল নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১০৯ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কাউসার ও পরে সূরা নাসর।

এক নজরে কাফিরূন

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ১০৯
- আয়াত: ৬
- মাক্কি

নামের রহস্য

'কাফিরূন' শব্দটি 'কাফির' শব্দের বহুবচন। অর্থ 'আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যানকারী'। সূরাটির প্রথম আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখান থেকেই সূরাটির নাম হয়েছে 'কাফিরূন'।

মেজর থিম

০১ কাফিরদের প্রস্তাব।

০২ রাসূল ﷺ-কে দেওয়া আদেশ।

০৩ কোনোভাবেই কাফিরদের সাথে আপস করা যাবে না।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে কুফরের প্রতি কঠোরতা দেখিয়ে শেষ অংশে অবাধ্যদেরকে তাদের মতো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে: "তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য।" যেন বলা হয়েছে যে, তোমাদের এইসব জঘন্য কর্মকাণ্ডের সাথে মুমিনদের কোনো সম্পর্ক নেই। এসবের জন্য তোমাদেরকে সতর্ক করছি। কিন্তু তোমরা আসলে অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ আর তোমাদের কাজের হিসাব তোমাদেরই দিতে হবে।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা কাউসার; যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—রাসূল ﷺ-এর প্রতি যারা ঘৃণা ও শত্রুতা রাখে, তাদের কথা। তারা হলো কাফির সম্প্রদায়। আর সূরা কাফিরূনে নবি ﷺ-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন কাফিরদের থেকে ইবাদাত ও দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর বিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা দেন।

শানে নুযুল

নবি ﷺ মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। লোকদেরকে আহ্বান জানালেন, সব ধরনের শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করতে। এতে করে বেজায় খেপে গেল মুশরিকের দল। তাদের মূর্তির নিন্দা তারা কোনোভাবেই সহ্য করবে না। আবার নবিজিকে তখনো আক্রমণ করতে পারছে না। তাই তারা চাইল একটা আপসের রাস্তা বের করতে। প্রথমে তারা নবিজিকে লোভ দেখিয়ে কাবু করতে চাইল। কত ধন-সম্পদ লাগবে, নাও। কোন নারীকে পছন্দ হয়, বিয়ে করো। নেতা হতে চাও? আমরা তো তোমার পেছনেই আছি! যখন দেখল এসব মন-ভোলানো কথায় কাজ হবে না, তখন আবার নতুন প্রস্তাব নিয়ে তারা হাজির—'আচ্ছা ঠিক আছে, এক বছর তুমি আমাদের মূর্তির উপাসনা করবে, পরের বছর আমরা তোমার এক আল্লাহর ইবাদাত করব।' তখনই আল্লাহ নাযিল করলেন সূরা কাফিরূন। যেখানে স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিলেন—শির্কের সাথে কোনো ধরনের আপস চলবে না। কাফিরদের বলে দাও—তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আর আমাদের দ্বীন আমাদের। আমরা কখনো আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করি না।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৫৬১)

সেগমেন্ট

কুফরের সাথে আপসহীনতা

গোটা সূরায় একটা বার্তাই দেওয়া হয়েছে—কুফরের সাথে ঈমানের কোনো আপস নেই। সম্পর্ক থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে নাকচ

আল্লাহ তাঁর নবিকে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিতে বলেন: 'তোমরা যার গোলামি করেছ, আমি তার গোলামি করব না।' অর্থাৎ ভবিষ্যতেও এই আপসের কোনো আশা কোরো না।

শির্‌ক আর আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ এক নয়

এই আপস না হওয়ার পেছনে একটি মতাদর্শই কাজ করে। আর তা হলো: দুটি জীবনাদর্শ—১. শির্‌ক, ২. আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। কক্ষনো এ-দুটি মিলেমিশে একাকার হতে পারে না।

ফজিলত

* ইবনু উমর ﷺ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-কে এক মাস খেয়াল করে দেখেছি—তিনি ফজরের আগের দু-রাকআতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়েছেন।' (তিরমিযি, ৪১৭, হাসান)
* ফারওয়া ইবনু নাওফাল ﷺ নবি ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন-কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি ঘুমানোর আগে পড়ব।' নবি ﷺ বললেন, 'তুমি সূরা কাফিরূন পড়ো, কারণ এতে শির্‌কের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে।' (তিরমিযি, ৩৪০৩, হাসান)
* আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন পাঠ করবে, তাকে চার ভাগের এক ভাগ কুরআন (পাঠ)-এর সমান সাওয়াব দেওয়া হবে।"' (তিরমিযি, ২৮৯৩, হাসান)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দিতে হবে—আমি তাওহীদ গ্রহণ করলাম ও শির্‌ক বর্জন করলাম;

কেননা, এই ঘোষণা একজন সত্যিকার মুসলিমের পরিচয় তুলে ধরে।

গতিপথ

১. প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা
নবিজিকে আল্লাহ আদেশ করেন—তিনি যেন দ্ব্যর্থহীন-কণ্ঠে কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন, 'তোমরা যার গোলামি করো, আমি তার গোলামি করছি না।'

২. ঈমানের প্রশ্নে কোনো ছাড় নয়!
প্রশ্নটা যখন ঈমানকে কেন্দ্র করে, তখন কোনোভাবেই 'কম্প্রোমাইজ' করার সুযোগ নেই। কাফিরদের চটকদার ও লোভনীয় সব প্রস্তাব দৃঢ়চিত্তে এড়িয়ে যেতে হবে।

সেন্ট্রাল থিম
কুফর ও ঈমানের মাঝে স্পষ্ট বিভাজন

৩. মুমিনদের অটল বিশ্বাস
মুমিনদের বিশ্বাস থাকবে পাহাড়ের মতো অটল। যারা দীপ্তস্বরে ঘোষণা দেবে—'তোমরা যার গোলামি করেছ, আমি তার গোলামি করব না।' কোনো ভয় বা চ্যালেঞ্জের মুখে তারা তাদের এই অবস্থান থেকে সরে আসবে না।

৪. বিশাল এক বাধার দেয়াল
কুফরের সাথে ঈমান কখনোই এক বিন্দুতে এসে মিলিত হবে না। কারণ কাফিরদের জীবনাদর্শ হলো শির্ক-মিশ্রিত, আর মুমিনদের সামনে আছে তাদের রবের-সামনে আত্মসমর্পণ করার জীবনাদর্শ।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
কাফিররা যার গোলামি করে, মুমিন তার গোলামি করতে পারে না। আবার মুমিনরা যাঁর গোলামি করে, কাফির তাঁর গোলামি করে না।	১-৩	কারণ এ-দুটি দলের মাঝে আছে আদর্শিক সংঘাত। কাফিরের জীবনাদর্শ শির্ক-মিশ্রিত। আর মুমিন জীবন সাজায় তাওহীদের আলোকে।	৬
মুমিনরা কাফিরদের ইলাহদেরকে মেনে নেবে—এমন কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর কাফিররাও কক্ষনো মুমিনদের ইলাহের গোলামি করবে না।	৪-৫		

কেইস-স্টাডি

ইসলাম—আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত একমাত্র জীবন-বিধান। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় একটি নিয়ামাত। তবে বর্তমান পৃথিবীতে আরও অনেক জীবনাদর্শ আছে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের আদর্শকে সঠিক বলে মনে করে। বছর বছর তাদের মাঝে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ (Interfaith Dialogue) অনুষ্ঠিত হয়। সকল ধর্মকেই তারা সঠিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায়। এক্ষেত্রে, ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আমরা সবার সাথে বসতে পারি। ইসলামের ছায়ায় আসার আহ্বান জানাতে পারি। কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে কখনোই এটা মনে করতে পারি না যে—সকল ধর্মই সঠিক; সকল ধর্মের শেষ পরিণতি সমান। কারণ, আল্লাহ তাআলা কাফিরদের ব্যাপারে সূরা কাফিরূনের শেষ আয়াতে একটি মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন—“তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।”

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩২/৩৩২)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

“তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।” এ আয়াতটির অর্থ দেখে বর্তমানে কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়। তারা বলে, ‘সকল মানুষের ধর্ম যদি সমান না হবে, তবে কুরআনে কেন এ কথা বলা হলো যে, তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার? আসলে এখানে ‘দ্বীন’ শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে; এই লোকগুলো তা অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে তাদের মনে এ উদ্ভট মতাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে দ্বীন শব্দটির অর্থ হলো কর্মফল। যেমন: সূরা ফাতিহায় আল্লাহকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ “কর্মফল দিনের মালিক” বলা হয়েছে। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম হবে—“তোমাদের কর্মফল তোমরা ভোগ করবে, আমার কর্মফল আমি ভোগ করব।”

আবার দ্বীনকে যদি ধর্ম অর্থে গ্রহণও করা হয়, তবুও কাফিরদের ধর্মকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া বোঝায় না। উদাহরণস্বরূপ—আমরা ভর্ৎসনা করে কাউকে বলে থাকি—‘তুমি তোমার পথে, আমি আমার পথে!’ এর দ্বারা কিন্তু তার পথের স্বীকৃতি দেওয়া হলো না। বরং এর মাধ্যমে সেই পথের ভয়াবহ পরিণতির দিকটিকে ইঙ্গিত করা হলো। ঠিক তেমনি, এই আয়াতেও “তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার” বলে কাফিরদের জীবনাদর্শ ও শির্কি কর্মপন্থার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সকল ধর্ম সমান বা সত্য—এমন ভাবও প্রকাশ করা হয়নি। বরং পথভ্রষ্টদের ভয়াবহ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(দেখুন—শানকিতি, তাফসীর, ৯/১৩৬)

সূরা নাসর

سُوْرَةُ النَّصْرِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১১৪-তম সূরা। অর্থাৎ এটিই কুরআনের সর্বশেষ সূরা। এর আগে নাযিল হয়েছে সূরা তাওবা।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১১০ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা কাফিরূন ও পরে সূরা লাহাব।

এক নজরে নাসর

- বিদায় হজ্জের সময় নাযিল
- সূরা নং: ১১০
- আয়াত: ৩
- মাদানি

নামের রহস্য

‘নাসর’ মানে ‘সাহায্য’। সূরার শুরুর আয়াতে আল্লাহ বলেন, “যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।” সেখান থেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ‘নাসর’।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর সাহায্য।

০২ দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণ।

০৩ রাসূল ﷺ-এর ওপর নির্দেশনা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতেই আল্লাহ ইসলামের বিজয় ও সাহায্যের ঘোষণা দিলেন। আর সেই সাহায্য এলে কী করতে হবে, সেই নির্দেশনা দিলেন সূরার শেষভাগে—“তখন তোমার রবের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে।”

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলা সূরা কাফিরূনে নবি ﷺ-কে আদেশ দিয়েছেন কাফিরদের থেকে ও তাদের দ্বীন থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখতে। এর প্রতিদান-স্বরূপ সূরা নাসরে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন—ইসলামের সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং লোকজন দলে দলে আশ্রয় নেবে দ্বীনের সুশীতল ছায়ায়।

শানে নুযুল

এই সূরাটি বিদায় হজ্জের সফরে আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়। এটাই হচ্ছে নবি ﷺ-এর প্রতি নাযিল-হওয়া সর্বশেষ সূরা। এ-সূরাটি আসলে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়নি। বরং এটা হচ্ছে বিশ্বের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বাভাস; শির্‌ক ও পৌত্তলিকতা দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় হওয়ার সংকেত। যে বিশাল উদ্দেশ্য নিয়ে রাসূল ﷺ পৃথিবীতে এসেছিলেন, তা সম্পন্ন হয়েছে। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। এ-সূরা নাযিলের পর নবিজি অল্প কিছুদিন জীবিত ছিলেন—মাস তিনেকের মতো। এ-কারণে এই সূরাকে ‘সূরাতুল বিদা’-ও বলা হয়।

(দেখুন—বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ২২/৩১২)

সেগমেন্ট

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের ফল

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় এলে মানুষ দলে দলে দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে। তাই এই দ্বীনকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে।

বিজয় এলে করণীয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় এলে মুমিনরা নেচে-গেয়ে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তা উদ্‌যাপন করবে না। বরং আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে।

তিনিই অনুশোচনা-কবুলকারী

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে, তিনি বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। কারণ তিনি অনেক বেশি অনুশোচনা-কবুলকারী।

ফজিলত

সূরা নাসর মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

সফলতা ও বিজয় কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে;

তাই যেকোনো সফলতা এলে, আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চাই।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

বিজয় উদ্‌যাপন করার পদ্ধতি

১. সাহায্য ও বিজয়ের ঘোষণা

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ইসলামের অবস্থান পাকাপোক্ত হয়। আর এর মাধ্যমে রাসূলের মিশন সম্পন্ন হয়। সূরার প্রথম আয়াতটিই এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে।

২. ইসলাম কবুল করতে মানুষের ঢল

যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসে, তখন ইসলাম গ্রহণ করতে মানুষের ঢল নামে। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে সব সময় বিজয়ীর অনুসারী।

৩. তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়

বিজয় অর্জিত হলে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করতে হবে। পরিপূর্ণভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

৪. ক্ষমা তালাশ করার আদেশ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি চাইতে হবে আল্লাহর ক্ষমা। বিজয় অর্জন করা মানেই দায়িত্ব ফুরিয়ে যাওয়া নয়। বরং এই বিজয় অর্জনের পেছনে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে, তা যেন ক্ষমা করা হয়—সেটিই হবে মুমিনের চাওয়া।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ঘোষণা এলে, মানুষ দলে দলে ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়।	১-২	সেই সময় মুমিনের করণীয়—আল্লাহর প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণা করবে ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে।	৩

কেইস-স্টাডি

আজকের দুনিয়ায় পোশাকে-আশাকে, কথাবার্তা আর চাল-চলনে পশ্চিমা ভাব না-এলে যেন জাতে ওঠা যায় না। অথচ রবীন্দ্র-রামমোহনরাও কিন্তু এককালে বড় বড় আলখাল্লাই পরত। কারণ, ইংরেজরা এই উপমহাদেশে আসার আগে মুসলিমদের শাসন চলেছে দীর্ঘসময়। তাই পোশাক-আশাকে ছিল ইসলামি সংস্কৃতির ছাপ। অন্যদিকে ব্রিটিশরা ক্ষমতায় আসতেই বাঙালির বেশভূষা পালটে গেল। অর্থাৎ মানুষ সাধারণত শাসককেই অনুসরণ করে। তাই যখন মুসলিমরা ক্ষমতায় ছিল, তখন টুপি-পাঞ্জাবি ছিল অভিজাত পোশাক। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্যান্ট-শার্ট হয়ে ওঠে আভিজাত্যের প্রতীক। তাই ইসলামি সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে, বিজয়ীর আসনে মুসলিমদের বসা প্রয়োজন। এই সূরাতেও আল্লাহ জানালেন, তাঁর সাহায্য ও বিজয় এলে, লোকজন দলে দলে দ্বীনের পথে আসবে।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, তাফসীর, ৩২/৩৪১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরায় বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা রয়েছে; যা খালি চোখে ধরা পড়ে না। ইসলাম বান্দাকে এই আদব ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে যে—মানুষ কখনো আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করতে পারে না। আল্লাহর পথে একজন মুমিন যতই ত্যাগ স্বীকার করুক, তার মনে কখনো এ ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া উচিত নয় যে—তার ওপর আল্লাহর যে হক ছিল, তা সে পুরোপুরি আদায় করে ফেলেছে। বরং সব সময় তার মনে করা উচিত—আল্লাহর হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব ভুলত্রুটি সে করেছে, তিনি যেন তা মাফ করে দেন। এরকম করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল স্বয়ং নবিজিকেও। অথচ আল্লাহর পথে তাঁর চেয়ে বেশি অগ্রগামী আর কোনো মানুষের কথা কল্পনাই করা যায় না। সুতরাং আমাদের আমলকে বড় মনে করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহর অধিকার কেউ পূরণ করে ফেলেছে, এই ভাবনার কোনো সুযোগই নেই। কারণ, যথাযথভাবে আল্লাহর হক আদায় করার ক্ষমতা কোনো সৃষ্টিরই নেই। তাই নিজের সবটুকু আল্লাহর পথে নিয়োজিত করার পরও, আল্লাহর হক আদায় হয়নি বলে মনে করা উচিত। যেটুকু ভালো কাজ আমরা করছি, তা মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ফল। এজন্য অহংকারে মত্ত না হয়ে রবের প্রশংসা করতে হবে। আর নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করা প্রয়োজন।

(দেখুন—সা'দি, তাফসীর, ৯৩৬)

সূরা লাহাব

سُوْرَةُ اللَّهَبِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ৬ষ্ঠ সূরা। এর আগে সূরা ফাতিহা ও পরে সূরা তাকভীর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১১১ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা নাসর ও পরে সূরা ইখলাস।

এক নজরে লাহাব

- মাক্কি যুগের প্রথমদিকে নাযিল
- সূরা নং: ১১১
- আয়াত: ৫
- মাক্কি

নামের রহস্য

'লাহাব' মানে 'আগুনের লেলিহান শিখা'। সূরার শুরুর আয়াতেই এসেছে এই শব্দটি। এ-সূরার আর দুটি নাম আছে: (১) সূরা তাব্বাত; 'তাব্বাত' মানে 'ধ্বংস'। সূরাটি শুরুই হয়েছে এই শব্দটি দিয়ে। (২) সূরা মাসাদ; 'মাসাদ' মানে 'পাকানো রশি'। সূরাটি শেষ হয়েছে এই শব্দটি দিয়ে।

মেজর থিম

০১. আবু লাহাবের প্রতি অভিশাপ।

০২. ওর স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ।

০৩. দুনিয়াবি কোনো শক্তি আবু লাহাবের উপকারে আসবে না।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটি শুরু করা হয়েছে আবু লাহাবের প্রতি কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করে। কারণ সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিত। আর সূরাটি শেষ করা হয়েছে তার স্ত্রী উম্মু জামীলের প্রতি কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়ে; কারণ সে আবু লাহাবকে সহযোগিতা করত।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা নাসর; যেখানে রাসূল ﷺ-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে কাফিরদের ওপর তাঁকে জয়ী করা হবে, সাহায্য করা হবে। আর সূরা লাহাবে বলা হয়েছে, আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর মতো কাফিররা আখিরাতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে এবং চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শানে নুযুল

আরবের একটি রীতি ছিল—কোনো ব্যক্তি যত যা-ই করুক না কেন, তার নিজ গোত্র তাকে নিরাপত্তা দেবে। বাইরের কোনো শত্রুর হাতে তাকে তুলে দেবে না। সেই সাথে আরেকটি বিষয়ের প্রচলন ছিল—কারও বাবা মারা গেলে, চাচাই হতো তার অভিভাবক। নবিজির আপন চাচা ছিল আবু লাহাব। তবুও সে নবিজিকে কষ্ট দিতে ছাড়েনি। এক ভোরে নবিজি সাফা পাহাড়ে উঠলেন। আর জোরে জোরে তাঁর গোত্রের সবাইকে ডাকতে লাগলেন। সবাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সেই পাহাড়ের দিকে। নবিজি তখন সবাইকে বলতে লাগলেন—আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পেছনে একদল শত্রুসেনা লুকিয়ে আছে, তারা হঠাৎ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তা হলে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই একযোগে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন, 'তা হলে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। আগামীতে কঠিন আযাব আসছে'। এই কথা শুনে আবু লাহাব ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠে, 'ধ্বংস হোক তোমার, তুমি কি শুধু এজন্য আমাদেরকে ডেকেছিলে?' রাসূলকে এভাবে অভিশাপ দেওয়ার কারণে, আল্লাহ তাআলা সূরা লাহাব নাযিল করলেন। জানালেন—নবিজি নয়, ধ্বংস হবে সে নিজেই। আবু লাহাবকেই আল্লাহ পালটা অভিশাপ দিলেন। কিয়ামাত পর্যন্ত মুসলিমরা সূরা লাহাব পড়বে। আর আবু লাহাবের ওপর এই অভিশাপ পড়তেই থাকবে।

(দেখুন—বুখারি, ৪৯৭১; মুসলিম, ৫০৮; আহমাদ, ২৮০১)

সেগমেন্ট

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত

সূরার শুরুতেই আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংসের অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এখানে 'দুই হাত' দ্বারা তার পুরো সত্তা বা ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে।

অভিশপ্ত ব্যক্তির সম্পদ

আল্লাহ যাকে অভিশাপ দেন, তার অর্থ-সম্পদ, দল, ক্ষমতা কোনোকিছুই কাজে আসে না। ধ্বংস ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

শেষ ঠিকানা জাহান্নাম

রাসূলের শানে বেয়াদবি করা লোকের শেষ ঠিকানা—চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

ফজিলত

সূরা লাহাব মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ-সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন, "মুফাস্‌সাল সূরাগুলোর মাধ্যমে আমাকে (অন্যান্য নবির চেয়ে) অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।"

(আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

অহংকারের মতো জঘন্য বৈশিষ্ট্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে, → মানুষ সত্যকে মেনে নেওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

গতিপথ

১. আবু লাহাবের অহংকার ও শত্রুতার নিন্দা

আবু লাহাব রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করত, আর নিজেকে খুব বড় মনে করত। এই অহংকার ও শত্রুতা তার নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে। স্বয়ং আল্লাহ ওকে লানত করেছেন।

২. সম্পদ ও স্ট্যাটাসের অসারতা

এই ধরনের অহংকারী মানুষের সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা কিয়ামাতের দিন কোনো কাজে আসবে না। এই সম্পদ ও মর্যাদা তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে না।

সেন্ট্রাল থিম

অহংকার ও রাসূলের সাথে শত্রুতার পরিণতি

৩. অনিবার্য শাস্তি

কিয়ামাতের দিন এসব লোকের জন্য থাকবে ভীষণ শাস্তি। এরা লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে ঢুকবে।

৪. মন্দ কাজে সহযোগিতার পরিণতি

আবু লাহাবের স্ত্রীও রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতায় আবু লাহাবকে সহযোগিতা করত। তাই কিয়ামাতের দিন তার ঘাড়ে থাকবে পাকানো সুতার রশি। অর্থাৎ ভীষণ অপমান তাকে ঘিরে ধরবে।

ওভারভিউ	আয়াত
আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর প্রতি ভীষণ অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা।	১-৫

কেইস-স্টাডি

এই সূরার মূল চরিত্র আবু লাহাব। রাসূল ﷺ-এর সাথে সে বেয়াদবি করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। আর এই কাজে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা জুগিয়েছে তার স্ত্রী। তাই তারও ওই একই পরিণতি হবে, যে পরিণতি অপেক্ষা করছে তার স্বামী আবু লাহাবের জন্য। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হলো—আমরা নিজেরা মন্দ কাজ করব না; কোনো ধরনের মন্দ কাজের সহযোগীও হব না। মন্দ কাজ ঠেকানোর শক্তি না থাকলে, আল্লাহর কাছে সামর্থ্য চাইব। প্রয়োজনে সেখান থেকে সরে পড়ব। কিন্তু কিছুতেই মন্দ কাজে নিজেকে শামিল করব না। কেননা জালিমকে সাহায্য-সমর্থন দিলে, পরকালে আমাদেরকেও তার ফল ভোগ করতে হবে।

(দেখুন—বাগাবি, তাফসীর, ৮/৫৪২; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৫১৫)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

আমাদের সমাজে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। পরিবারের কোনো একজন হাফেজ বা আলিম হলে, অন্যরা মনে করে, তার মাধ্যমে পরিবারের সবারই নাজাতের একটা ব্যবস্থা হবে। এটি একদম গলদ চিন্তা। নিজের কর্ম ভালো না হলে কিয়ামাতের দিন কেউ কারও উপকারে আসবে না; তা যত রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়ই হোক না-কেন। সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আবু লাহাব ছিল স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর চাচা। অথচ জাহান্নামে কত ভয়াবহ হবে তার পরিণাম! তাই এই আশায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না—অমুকের অসিলায় পার পেয়ে যাব। যদি এমন ভাবনা অন্তরে বাসা বাঁধে, তবে এই সূরাটি গভীর মনোযোগের সাথে কয়েকবার পড়ুন। বোঝার চেষ্টা করুন—সম্পর্ক নয়, ঈমান আর আমলেই নির্ধারিত হবে আমাদের পরিণতি।

(দেখুন—মুসলিম, ২৫৬৪; ইবনু মাজাহ, ৪১৪৩; বাইহাকি, আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত, ২/২৩৪)

সূরা ইখলাস

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২২-তম সূরা। এর আগে সূরা নাস ও পরে সূরা নাজম নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১১২ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা লাহাব ও পরে সূরা ফালাক।

এক নজরে ইখলাস

- মাক্কি যুগের শুরুতে নাযিল
- সূরা নং: ১১২
- আয়াত: ৪
- মাক্কি

নামের রহস্য

‘ইখলাস’ মানে ‘(তাওহীদের) একনিষ্ঠ ঘোষণা’। পুরো সূরায় আল্লাহ তাআলার একত্বের একনিষ্ঠ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে ‘ইখলাস’।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি।

০২ তাঁর একত্ববাদ।

০৩ কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরা ইখলাস শুরু হয়েছে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিয়ে—"বলো, 'আল্লাহ এক।'" আর শেষও হয়েছে তাঁর একত্ববাদের পরিচয় দিয়ে: "কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়।" এ ছাড়া আরও একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়—একটি শব্দের মাধ্যমেই সূরাটির শুরু ও শেষ করা হয়েছে; শব্দটি হলো 'আহাদ'।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

এ-সূরার আগের সূরা হলো—সূরা লাহাব; যেখানে দুই পাপিষ্ঠের উদাহরণ টানা হয়েছে: আবু লাহাব ও তার স্ত্রী। এরা রাসূলের কথা না মেনে শির্‌কে লিপ্ত ছিল। এর পরপর এল সূরা ইখলাস—এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর পরিচয় নিয়ে। আল্লাহর ব্যাপারে সকল শির্‌কি ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে।

শানে নুযুল

ইসলামের একদম শুরুর দিকের কথা। আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন। সবাইকে ডাকছেন এক আল্লাহর দিকে। তখন আরবে একটা প্রচলন ছিল। কোনো অপরিচিত মানুষকে চিনতে হলে তারা প্রশ্ন করত—এই ব্যক্তি কার সন্তান? কোন গোত্রের, কোন বংশের? ঠিক তেমনি করে, নবিজি যখন মক্কাবাসীকে এক আল্লাহর দিকে ডাকা শুরু করলেন, তখনও তারা প্রশ্ন ছুড়ে দিলো—আপনার রবের বংশ-পরিচয় কী? তিনি কোত্থেকে এসেছেন? এ-জাতীয় আরও নানান প্রশ্ন। তাদের এ-সকল প্রশ্নের উত্তর জানাতেই আল্লাহ তাআলা এই সূরা নাযিল করেন। এরপর থেকে কেউ রাসূলের কাছে আল্লাহর ব্যাপারে জানতে চাইলে, তিনি এই সূরা তিলাওয়াত করে তাদেরকে আল্লাহর পরিচয় জানিয়ে দিতেন।

(দেখুন—তাবারি, তাফসীর, ২৪/৭২৭; বাগাবি, তাফসীর, ৮/৫৮৪)

সেগমেন্ট

আল্লাহ এক

‘আল্লাহ এক’—এই ঘোষণা না দেওয়া হলে সৃষ্টি তাঁর সৃষ্টি-রহস্যের তল-ই খুঁজে পাবে না। আল্লাহর আনুগত্যের প্রথম শর্ত হলো—আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি।

তিনিই চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী

চূড়ান্ত কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। এখানে আর কারও খবরদারি চলে না।

কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়

মহাবিশ্বে তিনিই একমাত্র সত্তা—যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

ফজিলত

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘সূরা ইখলাস কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান।’

(বুখারি, ৭৩৭৪, ৫০১৫)

এক সাহাবি নামাজের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস পড়ে অন্য সূরা মেলাতেন। এমন করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি এটি ভালোবাসি।’ তখন রাসূল ﷺ বলেন, ‘এর প্রতি তোমার বিশেষ ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।’

(দেখুন—আহমাদ, ১২৪৩২, সহীহ; বুখারি, ৭৭৪, মুআল্লাক)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহ তাআলা স্বয়ংসম্পূর্ণ, গোটা বিশ্ব-জগৎ তাঁর ওপর নির্ভরশীল;

এই বিশ্বাস দৃঢ় হলে, কঠিন বালা-মুসিবতে পড়লেও হতাশা আসবে না।

গতিপথ

১. তাওহীদের ঘোষণা: আল্লাহর একত্ব
সূরাটির শুরুই হয়েছে এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে—“বলো, আল্লাহ এক।” এই ঘোষণাটিই তাওহীদের ভিত্তি। অর্থাৎ দাসত্ব লাভের একচ্ছত্র অধিকারী কেবল তিনিই।

সেন্ট্রাল থিম

আল্লাহর একত্ব ও অনন্য বৈশিষ্ট্য

২. তিনি আত্মনির্ভরশীল ও চিরঞ্জীব
দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণী বা বস্তু তাঁর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি কারও ওপর নির্ভরশীল নন। তাঁর অস্তিত্বও কোনোদিন বিলীন হবে না।

৩. মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র
মানুষ খাবার খায়, ঘুমায়, কারও থেকে জন্ম নেয়, আবার কাউকে জন্ম দেয়। আল্লাহ তাআলা এসব কাজ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আবার কারও থেকে জন্ম নেননি। তাঁর কোনো বংশ-ধারাও নেই।

৪. আল্লাহর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য
আল্লাহ এমন এক সত্তা—যাঁর সাথে তুলনা করা যায়, এমন আর কিছুই নেই। তাঁর মতো কেউ নেই; না আসমানে, না জমিনে, না জমিনের নিচে। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

ওভারভিউ	আয়াত
মহামহিম আল্লাহর একত্ববাদের কথা ঘোষিত হয়েছে এ-সূরায়।	১-৪

কেইস-স্টাডি

কুরআনের ছোট্ট একটি সূরা—সূরা ইখলাস। অথচ কী অসাধারণ তার শব্দচয়ন! এর প্রত্যেকটি আয়াত নিয়ে আলাদা আলাদা করে বিস্তর কথা বলার সুযোগ আছে। জীবন ফুরিয়ে গেলেও, আল্লাহর মহত্ত্ব নিয়ে কথা বলা শেষ হবে না। সূরার সর্বশেষ আয়াতটি খেয়াল করুন—"কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়।" সত্যি তো তা-ই! আল্লাহর মতো আর কোনো সত্তা থাকলে তো 'দুই রব' মিলে মহাযুদ্ধ বাধিয়ে ফেলত। উলট-পালট হয়ে যেত সমগ্র জগৎ। যেহেতু আসমান-জমিন সবকিছু অক্ষুণ্ন আছে, তার মানে বুঝতে হবে, রাজাধিরাজ আল্লাহর সাথে আর কোনো অংশীদার নেই। ইবাদাত-লাভের যোগ্য তো একমাত্র তিনিই—যিনি আসমান-জমিনসহ সবকিছু বানালেন। এত সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন আমাদের। কত চমৎকার এই মহান সৃষ্টিকর্তা!

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/৫১১)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

কাফিররা নবিজির কাছে আল্লাহর বংশপরিচয় জানতে চাইত। এই সূরার ৩ নং আয়াতে, "তিনি (আল্লাহ) কাউকে জন্ম দেননি, কারও কাছ থেকে জন্ম নেননি" ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ ওই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

কাফিরদের দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত, জ্ঞান সামান্য। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহকেও তারা সৃষ্টিজগতের নিয়ম দিয়ে বিবেচনা করে। কিন্তু যার জন্ম বা সৃষ্টি আছে, শুধুমাত্র তারই জন্মপরিচয় থাকা সম্ভব। অন্যদিকে, আল্লাহ হলেন চিরন্তন। তিনি ছিলেন, আছেন এবং সর্বদাই থাকবেন। তাঁর যেমন জন্ম নেই, তেমনি কেউ তাঁকে সৃষ্টিও করেনি। তাই তাঁর বংশপরিচয় সম্পর্কে যেকোনো প্রশ্নই ত্রুটিপূর্ণ; আর এমন প্রশ্ন করাটা হলো মূর্খের পরিচয়।

এছাড়া, মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট-জীবের সীমাবদ্ধতাগুলো থেকে মুক্ত। জীবন-মৃত্যু দুটোই তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে; এবং তিনি উভয়েরই ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। তাই শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধিহীন লোকেরাই আল্লাহর শুরু-শেষ নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

সূরা ফালাক

سُورَةُ الْفَلَقِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২০-তম সূরা। এর আগে সূরা ফীল ও পরে সূরা নাস নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১১৩ নং সূরা। এর আগে আছে সূরা ইখলাস ও পরে সূরা নাস।

এক নজরে ফালাক

- মাদানি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ১১৩
- আয়াত: ৫
- মাদানি

নামের রহস্য

‘ফালাক’ মানে ‘ভোর বা ভোরের আলো’। সূরাটির প্রথম আয়াতেই শব্দটি এসেছে, সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে ‘ফালাক’। সূরা ফালাক ও নাস—এ দুটোকে একসঙ্গে ‘মুয়াওয়িযাতান’ বলা হয়। মানে, ‘আল্লাহর কাছে ঠাঁই ও নিরাপত্তা পাওয়ার দুটো সূরা’। ইমাম বায়হাকি ﵀ তাঁর ‘দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ’ বইতে লিখেছেন: ‘ফালাক ও নাস—সূরা দুটো নাযিল হয়েছে এক বসায়, একসঙ্গে।’ তাই আলিমগণ এ-দুটোকে ‘জোড়া-সূরা’ হিসেবে পরিচয় করিয়েছেন।

মেজর থিম

০১ ভোরের রবের কাছে আশ্রয় চাওয়া।

০২ সকল অনিষ্ট থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে হবে।

০৩ রাতের অকল্যাণ থেকেও চাইতে হবে নিরাপত্তা।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরার শুরুতে সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আর সূরার শেষে সব অনিষ্টের মূল থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। সেটি হলো 'হাসাদ' বা হিংসা-বিদ্বেষ। কারণ এই অনিষ্ট মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়ানো। দুনিয়ার বুকে প্রথম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল এই হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা ফালাকের প্রধান বিষয়বস্তু হলো রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা। এবার প্রশ্ন আসতে পারে—কোন সে রব? কী তাঁর পরিচয়? এই প্রশ্ন মনে জাগার আগেই এর উত্তর আল্লাহ দিয়ে রাখলেন এর আগের সূরা অর্থাৎ সূরা ইখলাসে। গোটা সূরায় এল পরম করুণাময় আল্লাহর পরিচয়।

শানে নুযুল

হাদীসে সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিলের একটি প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়। যাইদ ইবনু আরকাম ﵁ থেকে বর্ণিত—নবি ﷺ-কে ইহুদি লাবিদ ইবনু আ'সাম জাদু করেছিল। এতে নবিজি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওহি নিয়ে আসলেন জিবরীল ﵇। তখন নবিজির ওপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হয়। জিবরীল ﵇ বলেন, ইহুদিদের একজন আপনাকে জাদু করেছে। জাদুর জিনিসপত্র অমুকের কূপে রাখা আছে। এরপর নবিজি আলি ﵁-কে সেখানে পাঠালে তিনি সেগুলো নিয়ে আসেন। ওগুলোতে এগারোটি গিঁট ছিল। নবিজি এই সূরা-দুটির একটি করে আয়াত পাঠ করা শুরু করলেন, আর একটি করে গিঁট খুলে যেতে লাগল। সবগুলো গিঁট খুলে গেলে নবি ﷺ উঠে দাঁড়ান, যেন কোনো রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত হলেন। এর পরপরই নবিজির সকল অসুস্থতা কেটে গেল। তবে এত কিছুর পরও, নবিজি সেই ইহুদিকে এই জঘন্য কাজের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। তাঁর চেহারায় রাগের কোনো চিহ্নও দেখা যায়নি।

(দেখুন—ত্বহাবি, শারহু মুশকিলিল আছার, ৫৯৩৫; শাওকানি, ফাতহুল কাদীর, ৫/৫৩৮)

সেগমেন্ট

ভোরের রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

ভোরের আগমনে নতুন একটি দিনের সূচনা হয়। আর এই ভোরের মালিক আল্লাহ। সারাদিন নিরাপদে থাকার জন্য আশ্রয় চাইতে হবে ভোরের রবের কাছেই।

রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়

রাতকে কেন্দ্র করে শয়তানদের আনাগোনা বেড়ে যায়। জাদুকররাও এ-সময়টায় বেশি সক্রিয় থাকে। তাই রাতের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।

হিংসা থেকে আশ্রয় চাওয়া

আশ্রয় চাইতে হবে হিংসুকের হিংসা থেকেও। কারণ হিংসার প্রভাব খুবই মারাত্মক।

ফজিলত

উকবা ইবনু আমির ﷺ বলেন—সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস সম্পর্কে নবিজি বলেছেন: 'এগুলো ভুলে যেয়ো না, এগুলো না পড়ে একটি রাতও কাটিয়ো না।' (আহমাদ, ১৭৩৩৪, হাসান)

আয়িশা ﷺ বলেন, 'নবিজি যে-বারই অসুস্থ হতেন, তিনি 'মুআওয়িযাত' সূরা-দুটো পড়ে নিজ-শরীরে ফুঁ দিতেন। যখন তাঁর রোগ কঠিন হয়ে গেল, তখন বারাকাত অর্জনের জন্য আমি এই সূরা পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে শরীর মাসেহ করিয়ে দিতাম।' (বুখারি, ৫০১৬)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আশ্রয় চাইতে হবে আল্লাহর কাছে;

কারণ, তিনি আশ্রয় দিলে, দুনিয়ার কোনো শক্তিই ক্ষতি করতে পারবে না।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম

দুনিয়ার যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

১. ভোরের রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

ভোর যেমন রাতের আঁধার দূর করে নতুন এক দিনকে হাজির করে, ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল বিপদাপদ দূর করে তাকে নতুন জীবনে প্রবেশ করাবেন। তাই আশ্রয় খুঁজতে হবে তাঁর কাছেই।

২. সৃষ্টির অনিষ্টের ব্যাপারে আশ্রয় প্রার্থনা

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ, জিন, অন্য সকল প্রাণী, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অজানা যেকোনো বিষয় থাকতে পারে—এই সকল কিছুর অনিষ্ট হতে রক্ষা পেতে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৩. রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

অজানা যত শঙ্কা, তার বেশিরভাগই জেগে ওঠে রাতে। তাই এই রাতের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে।

৪. জাদু ও হিংসার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

জাদুকর ও হিংসুকদের হিংসারও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে মানুষের জীবনে। তাই সূরার শেষে এসব বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওভারভিউ	আয়াত
মহান আল্লাহর কাছে যাবতীয় সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে এ-সূরায়।	১-৫

কেইস-স্টাডি

গোটা সূরাতেই কোন কোন বিষয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে, আল্লাহ তাআলা তা শিখিয়েছেন। কুরআন আমাদেরকে এখানে জাদুকর ও হিংসুকদের চক্রান্ত থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছে। কারণ, এগুলো মানুষের জীবনকে ছারখার করে দেয়। কিন্তু আমাদের মাঝে কেউ কেউ বলেন—জাদু বা বদনজর বলে কিছু নেই। এভাবে তারা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত একটা বিষয়কে অস্বীকার করে বসে। এই জাদুর প্রভাবেই আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। যদিও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারও উপকার বা ক্ষতি কোনোটিই হয় না; তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি ছিল একটি পরীক্ষা। এখন, জাদুগ্রস্ত হলে কবিরাজের কাছে দৌড়ানো যাবে না; বরং আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা-ই করতে হবে।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৭/৭০৯; নাসাফি, তাফসীর, ৩/৬৯৮)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এ-সূরার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন—“(আমি আশ্রয় চাই,) অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা ছেয়ে যায়।” এতকিছু থাকতে অন্ধকার থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ কী? এর কারণ হলো রাত একটি বিশেষ সময়। ভালো লোকেরা এসময় তাহাজ্জুদের মতো ইবাদাতে মশগুল থাকে। আবার খারাপ লোকেরা নিরিবিলি এই সময়ে অপরাধে লিপ্ত হয়। অধিকাংশ খুন-খারাবি তখনই ঘটে। চোর-ডাকাতরাও তখন লুটতরাজ চালাতে বেরিয়ে পড়ে। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার চেষ্টা করছিল, তারাও বেছে নিয়েছিল রাতের আঁধার। তাই আল্লাহর কাছে অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইতে হবে। আর রাতের বেলায় ডিজিটাল ডিভাইসের ফাঁদে না পড়তে, নিজেদের সতর্ক থাকতে হবে।

(দেখুন—ফাখরুদ্দীন রাযি, ৩২/৩৭৪; যুহাইলি, আত-তাফসীরুল মুনীর, ৩০/৪৭৫)

সূরা নাস

سُوْرَةُ النَّاسِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ২১-তম সূরা। এর আগে সূরা ফালাক ও পরে সূরা ইখলাস নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ১১৪ নং সূরা। এটিই কুরআনের সর্বশেষ সূরা। এর আগে আছে সূরা ফালাক।

এক নজরে নাস

- মাদানি যুগে নাযিল
- সূরা নং: ১১৪
- আয়াত: ৬
- মাদানি

নামের রহস্য

'নাস' মানে 'মানুষ'। সূরাটির শুরুর আয়াতেই 'নাস' কথাটি এসেছে, সেখান থেকেই সূরার নাম হয়েছে 'নাস'। সূরা ফালাক ও নাস—এ দুটোকে একসঙ্গে 'মুয়াওয়িযাতান' বলা হয়। মানে, 'আল্লাহর কাছে ঠাঁই ও নিরাপত্তা-লাভের দুটো সূরা'। ইমাম বায়হাকি ﷺ তাঁর 'দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ' গ্রন্থে লিখেছেন: 'ফালাক ও নাস—সূরা দুটো নাযিল হয়েছে এক বসায়, একসঙ্গে।' তাই আলিমগণ এ-দুটোকে 'জোড়া-সূরা' হিসেবে পরিচয় করিয়েছেন।

মেজর থিম

০১ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, আশ্রয় দেওয়ার মালিক একমাত্র তিনিই।

০২ আল্লাহকে নিরাপত্তার উৎস ভাবা, শয়তানের ব্যাপারে সজাগ থাকা।

০৩ দুষ্ট লোক থেকে দূরে থাকা, হৃদয়ে খারাপ কিছু জায়গা না দেওয়া।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

সূরাটির শুরুতে মানুষের রব তথা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। কিন্তু কী বিষয়ে আশ্রয় চাইতে হবে, আল্লাহ তা জানালেন সূরার শেষাংশে—"যে মানুষের অন্তরে কুপরামর্শ দেয়, (হোক সে) জিন অথবা মানুষ।" সূরাটির শুরু-শেষের আরও একটি সম্পর্ক আছে—সূরাটির শুরু ও শেষ একই শব্দের মাধ্যমে হয়েছে; তা হলো 'নাস/ মানুষ'।

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

আল্লাহর কাছে যা যা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়, সেই বিবেচনায় সূরা নাসকে ধরা হয় সূরা ফালাকের পরিশিষ্ট ও পরিপূরক।

শানে নুযুল

সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট একই; ইতোমধ্যেই সূরা ফালাকের শানে নুযুলে যার বর্ণনা এসেছে। এই দুটি সূরাকে একত্রে 'মুআওয়িযাতান' বলা হয়, যা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহ তাআলা এই সূরা-দুটি নাযিল করে মুমিনদেরকে সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকার মূলমন্ত্র জানিয়ে দিয়েছেন।

সূরা ফালাকে আল্লাহ শারীরিক ও বাহ্যিক ক্ষতির হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। অপরদিকে, সূরা নাস মানুষের আত্মার অভ্যন্তরীণ কুমন্ত্রণা থেকে সুরক্ষা দেয়। বিশেষত, শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার আহ্বান জানায়। এই দুটি সূরা একত্রে একজন মুমিনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় সুরক্ষাই নিশ্চিত করে।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সূরা-দুটি নিয়মিত পাঠ করতেন, বিশেষত ঘুমানোর আগে এবং কোনো বিপদ বা অসুস্থতার সময়। এটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে—আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিজগতের যেকোনো ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকতে পারি।

(দেখুন—বুখারি, ৫০১৭; আবু দাউদ, ৫০৮২; আহমাদ, ১৭৩৩৪)

সেগমেন্ট

আল্লাহই অধিপতি

মানুষ ও জিন—এই দু-জাতির অধিপতিই একমাত্র আল্লাহ।

আশ্রয় চাইতে হবে তাঁর কাছেই

তিনিই যেহেতু এই দু-জাতির অধিপতি, তাই এদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে, তাঁর দুয়ারেই হাত পাততে হবে; চাইতে হবে আশ্রয়।

ফলাফল

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হলে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কুমন্ত্রণা-দাতাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দেবেন।

ফজিলত

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সন্ধ্যায় ও সকালে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস তিনবার করে পড়ো; যেকোনো ব্যাপারে তোমার জন্য এগুলো যথেষ্ট হবে।'

(আবু দাউদ, ৫০৮২, হাসান)

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ প্রত্যেক রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় দু-হাতের তালু একত্র করে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে তাতে ফুঁ দিতেন, তারপর হাতের তালু-দুটি দিয়ে সাধ্যমতো শরীর মুছে নিতেন—প্রথমে মাথা, তারপর চেহারা ও শরীরের সামনের অংশ। এটি তিনি তিনবার করতেন।

(বুখারি, ৫০১৭)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করুন; → এতে কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান ও মানুষ আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

গতিপথ

১. মানুষের রব ও অধিপতির কাছে আশ্রয় চাওয়া
আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাদের মালিক। মানুষের ওপর তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন। তাই মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচতে হলে, তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

সেন্ট্রাল থিম

শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও প্রতারণার ব্যাপারে রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

২. মানুষের ইলাহের কাছে আশ্রয় চাওয়া
আল্লাহ মানুষের একমাত্র ইলাহ। কেবল তিনিই বান্দার দাসত্ব 'ডিসার্ভ' করেন। তাই অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে হলে, বান্দাকে তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

৩. শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তাদের পলায়ন
শয়তান ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা মানুষকে গুনাহের কাজে প্ররোচনা দেয়। মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়। তবে যেই-না আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, অমনি ওরা পালিয়ে যায়।

৪. জিন ও মানুষের ব্যাপারে আশ্রয় চাওয়া
জিন কিংবা মানুষও আমাদেরকে কুমরামর্শ দিতে পারে। এসব দুষ্ট জিন ও মানুষদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। না-হলে এরা আমাদেরকে বিপথে চালানোর অপচেষ্টা করবে।

ওভারভিউ	আয়াত
মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে এখানে।	১-৬

কেইস-স্টাডি

শেষ সূরার নাম 'আন-নাস' হওয়া থেকে, কুরআনের প্রধান শ্রোতা যে মানুষ, সে ব্যাপারে একটি ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। এই পবিত্র কিতাব অনুযায়ী সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব মানুষের। কিন্তু, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে চায় শয়তান; অন্তরে ঢুকিয়ে দেয় নানান কুমন্ত্রণা। তাই কুরআনের সর্বশেষ এই সূরায়, শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। মানুষের জীবনে অনিষ্ট আসতে পারে—এমন একটি দিকের কথাও এখানে বাকি রাখা হয়নি। এসব ব্যাপারে মানুষ যদি আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা পায়, তা হলে তার কোনো অস্থিরতা থাকবে না। সে নিশ্চিন্তে-নির্ভাবনায় দিনযাপন করতে পারবে। তাই, আমাদের সকলের উচিত—আমরা যেন গোটা কুরআনকেই গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিই। কেননা, এর যেখান থেকেই মানুষ পাঠ করবে, সেখান থেকেই সে উপকৃত হবে। তাই কুরআনকে নিজের জীবনে গেঁথে নিন। দেখবেন, জীবনটা হবে সুন্দর, সহজ ও আল্লাহর রঙে রঙিন।

(দেখুন—সূরা ইসরা, ১৭:৯; রাযি, তাফসীর, ২০/৩০৩; বুখারি, ৫০১৭; তিরমিযি, ২৯০৬)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

এই সূরার শেষ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি—জিন-শয়তানও আপনার-আমার অনিষ্ট করে; আবার মানুষ-শয়তানও আমাদের পেছনে লাগে। জিন-শয়তানের চেয়ে কিন্তু মানুষ-শয়তান আমাদের জন্য বেশি ভয়ানক। কারণ, তারা আমাদের আশপাশেই থাকে, আমাদের সাথেই ওঠাবসা করে। আমাদের মনে কুমন্ত্রণা দেয় বিভিন্ন পন্থায়—লেখা ও সাহিত্য দিয়ে, বক্তৃতা ও কথা দিয়ে, অশালীন গান ও ছবির মাধ্যমে। তাই আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দিলেন, জিন-শয়তান থেকে যেমন আশ্রয় চাইতে হবে, তেমনি আশ্রয় চাইতে হবে মানুষ-শয়তান থেকেও। পৃথিবীর পথচলায় অনেক ধরনের মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে। তাদের কারও কারও কথায় দ্বীনের ব্যাপারে হাজারো দ্বন্দ্ব এসে অন্তরে ভিড় করবে। আসলে ওরা শয়তানের মতো করেই আপনার কাছে হাজির হয়। তাই শয়তান ও মানুষের সকল ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় চাইতে হবে আল্লাহর কাছে।

(দেখুন—আলুসি, রূহুল মাআনি, ১৫/৫২৬; কুরতুবি, ২০/২৬৩)

গ্রন্থপঞ্জি

(০১) তাবারি (৩১০ হি.), জামিউল বায়ান আন তা'বীলি আ-য়িল কুরআন, দারু হিজর, কায়রো, মিশর, ২০০১ খ্রি.।

(০২) ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.), তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, দারু ইবনিল জাওযি, রিয়াদ, ২০১০ খ্রি.।

(০৩) বাগাবি (৫১০ হি.), মাআলিমুত তানযীল, দারু তাইয়্যিবা, রিয়াদ, ১৯৯৭ খ্রি.।

(০৪) কুরতুবি (৬৭১ হি.), আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০০৬ খ্রি.।

(০৫) মাহমুদ আলুসি (১২৭০ হি.), রুহুল মাআনি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯৪ খ্রি.।

(০৬) ফাখরুদ্দীন রাযি (৬০৪ হি.), মাফাতীহুল গায়িব/ আত-তাফসীরুল কাবীর, দারু ইহ্‌ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রি.।

(০৭) যুহাইলি (১৪৩৬ হি.), আত-তাফসীরুল মুনীর, দারুল ফিকর, দিমাশক, ২০০৯ খ্রি.।

(০৮) বুরহানুদ্দীন বিকাঈ (৮৮৫ হি.), আন-নাজমুদ দুরার ফী তানাসুবিল আয়াতি ওয়াস সুয়ার। দায়িরাতুল মাআরিল আল-উসমানিয়্যা, হায়দারাবাদ, ১৯৮৪ খ্রি.।

(০৯) সা'দি (১৩৭৬ হি.), তাইসীরুল কারীমির রহমান, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২০০২ খ্রি.।

(১০) নাসাফি (৭১০ হি.), মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকায়িকুত তা'বীল, দারুল কালিমুত তাইয়্যিব, বৈরুত, ১৯৯৮ খ্রি.।

(১১) সা'লাবি (৪২৭ হি.), আল-কাশফু ওয়াল বায়ান আন তাফসীরিল কুরআন, দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ২০০২ খ্রি.।

(১২) আবুস সাউদ (৯৮২ হি.), ইরশাদুল আকলিস সালীম, দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ।

(১৩) ইবনু আবী হাতিম (৩২৭ হি.), তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, দারু ইবনিল জাওযি, রিয়াদ, ১৯৯৮ খ্রি.।

(১৪) মাওয়ারদি (৪৫০ হি.), আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

(১৫) শানকিতি (১৩৯৪ হি.), আদওয়াউল বায়ান ফী ইদাহিল কুরআন বিল-কুরআন, দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, মক্কা।

(১৬) ইবনু আশূর (১৩৯৩ হি.) আত-তাহরীর ওয়াত তানবীর, দারুত তিউনিসিয়া, ১৯৮৪ খ্রি.।

(১৭) ঝাজ্জাজ (৩১১ হি.), তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দিমাশক।

(১৮) সুয়ুতি, (৯১১ হি.) তাফসীরুল জালালাইন, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।

(১৯) ইবনুল জাওযি (৫৯৭ হি.), যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, আল-মাকতাবাতুল ইসলামি।

(২০) কুশাইরি (৪৬৫ হি.), লাতায়িফুল ইশারাত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

(২১) মুহাম্মাদ আলি সাবুনি (১৪৪২ হি.), সফওয়াতুত তাফাসীর, দারুস সাবুনি, কায়রো।

(২২) শাওকানি (১২৫০ হি.), ফাতহুল কাদীর, দারুল মা'রিফা, বৈরুত।

(২৩) ওয়াহিদি (৪৬৮ হি.), আত-তাফসীরুল বাসীত।

(২৪) ওয়াহিদি (৪৬৮ হি.), আসবাবুন নুযুল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

(২৫) ইবনুল কাইয়্যিম (৭৫১ হি.), আত-তিবইয়ান ফী আইমানিল কুরআন, দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, মক্কা।

(২৬) ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি.), মাজমুউল ফাতাওয়া, দারুল মামুন লিত-তুরাস, বৈরুত।

(২৭) সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদি (১৪০০ হি.), তাফহীমুল কুরআন, আধুনিক প্রকাশনী।

(২৮) মুফতি শফী উসমানি (১৩৯৬ হি.), মাআরিফুল কুরআন (সৌদি ছাপা)।

(২৯) বুখারি (২৫৬ হি.), আস-সহীহ, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ২০১৮ খ্রি.।

(৩০) বুখারি (২৫৬ হি.), আল-আদাবুল মুফরাদ, আল-মাতবাআতুস সালাফিয়্যা, কায়রো।

(৩১) মুসলিম (২৬১ হি.), আস-সহীহ, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
(৩২) তিরমিযি (২৭৯ হি.), আস-সুনান, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
(৩৩) আবু দাউদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
(৩৪) নাসাঈ (৩০৩ হি.), আস-সুনা, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুতন।
(৩৫) নাসাঈ (৩০৩ হি.), আস-সুনানুল কুবরা, বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়্যা, বৈরুত।
(৩৬) ইবনু মাজাহ (২৭৩ হি.), আস-সুনান, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
(৩৭) আহমাদ (২৪১ হি.), আল-মুসনাদ, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
(৩৮) ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি.), আস-সহীহ, দারুত তাসীল, কায়রো।
(৩৯) ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি.), আস-সহীহ, দারু ইবনি হাযম, বৈরুত।
(৪০) হাকিম (৩৯৩ হি.), আল-মুসতাদরাক, দারুল মিনহাজ, দিমাশক।
(৪১) মালিক (১৭৯ হি.), আল-মুআত্তা, দারু ইহ্ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, বৈরুত।
(৪২) ত্বহাবি (৩২১ হি.), শারহু মুশকিলিল আছার, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত।
(৪৩) তাবারানি (৩৬০ হি.), আল-মু'জামুল কাবীর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
(৪৪) তাবারানি (৩৬০ হি.), আল-মু'জামুল আওসাত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
(৪৫) বাগাবি (৫১০ হি.), শারহুস সুন্নাহ, মাকতাবাতুল ইসলামি, দিমাশক।
(৪৬) বাযযার (২৯২ হি.), আল-মুসনাদ, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াক হিকাম, মদীনা মুনাওয়ারা, ২০০৯ খ্রি.।
(৪৭) মুনযিরি (৬৫৬ হি.), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ।
(৪৮) বাইহাকি (৪৫৮ হি.), শুআবুল ঈমান, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ২০০৩ খ্রি.।
(৪৯) বাইহাকি (৪৫৮ হি.), দালায়িলুন নুবুওয়াহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
(৫০) বাইহাকি (৪৫৮ হি.), আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত, মাকতাবাতুস সুওয়াদি, জেদ্দা।
(৫১) সুয়ূতি (৯১১ হি.), জামিউল আহাদীস, দারুল ফিকর, দিমাশক।
(৫২) ইবনু হাজার আসকালানি (৮৫২ হি.), হিদায়াতুর রুওয়াত, দারু ইবনিল কাইয়িম।
(৫৩) ইবনু হাজার আসকালানি (৮৫২ হি.), ফাতহুল বারী, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা, মিশর।
(৫৪) ইবনু আবদিল বার (৪৬৩ হি.), জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী, দারু ইবনিল জাওযি, রিয়াদ।
(৫৫) খতীব বাগদাদি (৪৬৩ হি.), আর-রিহলাহ ফী তলাবিল হাদীস, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, কায়রো।
(৫৬) ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি.), মিফতাহু দারিস সাআদাহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
(৫৭) ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি.), আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়া/আল-জাওয়াবুল কাফী, দারু আতাআতিল ইলম, রিয়াদ।
(৫৮) ইবনুল আরাবি (৫৪৩ হি.), আরিদাতুল আহওয়াযি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
(৫৯) আবু নুআইম (৪৩০ হি.), হিলইয়াতুল আউলিয়া, মাতবাআতুস সাআদা, মিশর।
(৬০) আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুওয়াইতিয়্যা, ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ।
(৬১) যুরকানি (১৩৬৭ হি.), মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন, মাতবাআতু ঈসা আল-বাবি আল-হালাবি।
(৬২) যারকাশি (৭৯৪ হি.), আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, দারু ইহ্ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, বৈরুত।
(৬৩) সুয়ূতি (৯১১ হি.), আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, আল-হায়আতুল মিসরিইয়্যা আল-আম্মাহ লিল-কিতাব, মিশর।
(৬৪) ফায়িয ইবনু সাইয়্যাফ আস-সারীহ, মাআলিমুস সুওয়ার, দারুল হাদারাহ।
(৬৫) ড. মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল আযীয, বিতাক্বতুত তা'রীফ বি-সুওয়ারিল মুসহাফিশ শারীফ, মুআসসাসাতু আলিল জামীহিল খাইরিয়্যা।

আমার ভাবনা...

আমার ভাবনা...

এক-নজরে কুরআন বইটির বৈশিষ্ট্য

কুরআন এসেছে মানুষকে পথ দেখাবার জন্যে। কুরআন কথা বলে মানুষের সাথে। একবার কুরআনের সাথে কথা বলা শুরু করলে, আপনি রীতিমতো চমকে উঠবেন—আরে! কুরআন আমার এত্তোটা আপন, এটা তো জানতাম-ই না!

এক-নজরে কুরআন এমন একটি বই, যা আপনার ভেতরটাকে নাড়িয়ে দেবে, কুরআনকে জানার তৃষ্ণা আরো বাড়াবে। এটি অনুবাদ কিংবা তাফসীর-গ্রন্থ নয়। এ বইতে বরং গোটা কুরআনের সারনির্যাসকে এক-নজরে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। গতানুগতিক কোনো ধাঁচে নয়, কুরআন-থেকে-পাওয়া লেসনগুলোকে সাজানো হয়েছে ইনফোগ্রাফিক স্টাইলে। যাতে কুরআনের বার্তাগুলো খুব সহজেই মনে রাখা যায়।

এই বইটিতে অল্প সময়ের জন্য চোখ বোলালেও, একেকটি সূরার মূলকথা, মেজর থিম ও ফজিলত-সহ আরো অনেক তথ্য জেনে নিতে পারবেন অল্প সময়ের মধ্যেই। কোন সূরা কখন, কোথায় এবং কোন প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে, সুন্নাহ থেকে উঠে এসেছে সেসব চিত্রও। এ ছাড়া রিফ্লেকশনস আর কেইস-স্টাডিতে জায়গা পেয়েছে মহান ইমামদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের সিনোপসিস। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—এ বইটি পড়ার মাধ্যমে, হাজারো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনকে জানার সুযোগ হবে, ইন শা আল্লাহ।

নামের রহস্য: কুরআনের ১১৪ টি সূরার নামকরণ কীভাবে হলো, এই নামগুলো রাখার কারণটাই-বা কী—এই কৌতূহলটা অনেকের মধ্যেই হয়তো জেগে ওঠে। এক-নজরে কুরআন বইতে প্রতিটি সূরার নামকরণের রহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক: কুরআনের সূরাগুলোর শুরু আর শেষে দেখা যায় এক দারুণ মেলবন্ধন। কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে সূরাগুলোর সূচনা হয়। এরপর নানা প্রসঙ্গ ও ঘটনা পেরিয়ে, সূরার শেষটাও হয় শুরুর-ওই-আলোচনার সাথে মিল রেখে। প্রতিটি সূরার শুরু-শেষের এই সম্পর্ককে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এক সূরার সাথে সম্পর্ক রয়েছে অন্য সূরার। এ-বিষয়টিও উঠে এসেছে এক-নজরে কুরআন বইটিতে।

সেগমেন্ট: প্রতিটি সূরাকে তিনটি পর্বে ভাগা হয়েছে। সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ধাপ বেছে নেওয়া হয়েছে সেগমেন্ট অংশের জন্য। এখান থেকে প্রতিটি সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

কেইস-স্টাডি: গবেষণাক্ষেত্রে কেইস-স্টাডি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি টুল। যেখানে বিভিন্ন ঘটমান বিষয়কে সামনে রেখে বর্তমান-ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করা হয়। বইটির এই অংশে কিছু আয়াতকে উদাহরণ হিসেবে তুলে আনা হয়েছে। আর সেসব নজিরকে সামনে রেখে, আমাদের করণীয় সম্পর্কে সজাগ করা হয়েছে।

রিফ্লেকশনস/তাদাব্বুর: কুরআন বারবার মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছে। তবে কোন কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করা যায়, অনেকেই তা বুঝে উঠতে পারি না। 'রিফ্লেকশনস' অংশে এমন দু-একটি আয়াত হাজির করা হয়েছে, যেগুলো আমাদের জন্য চিন্তার খোরাক জোগাবে। প্রাণবন্ত এসব আলোচনার মধ্য দিয়ে কুরআনের সাথে আমাদের আন্তরিক বন্ধন তৈরি হবে।

লেখক পরিচিতি

ড. মিজানুর রহমান আজহারি

স্বপ্নবাজ ও প্রতিশ্রুতিশীল একজন আলিম। মার্জিত ও রুচিশীল মননের এক ব্যক্তিত্ব। যিনি ডুবে থাকেন নানা কল্যাণমুখী ভাব-চিন্তায়। চিন্তার প্রতিফলন ঘটে আলোচনা, লেখনী আর গবেষণায়। তার বেশকিছু গবেষণা-পত্র আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই পরিণত হয়েছেন গ্লোবাল দা'ওয়াহ-র আইকনিক ফিগারে। দেশ ছাপিয়ে তার কণ্ঠ পৌঁছে গেছে আরব বিশ্ব-সহ পশ্চিমা বিশ্বেও। অগণিত সভা-সেমিনারে কুরআন-সুন্নাহর কথামালা তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন বোধ ও হিকমাহ-র অনন্য মিশেলে। বিশ্বাসের পরশে আলোড়িত করে তুলছেন কুরআনপ্রেমী প্রজন্মের হৃদয়কে। প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেছেন অনেকগুলো আন্তর্জাতিক একাডেমিক কনফারেন্সে। কী-নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য দিয়েছেন বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কনভেনশনে।

তিনি মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তাফসীর অ্যান্ড কুরআনিক সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে স্নাতক এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ধাপেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন এ স্কলার। পরবর্তীতে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিও অর্জন করেন। এমফিল-এ তার থিসিসের বিষয় ছিল 'হিউম্যান এমব্রিয়োলজি ইন দ্য হোলি কুরআন' এবং পিএইচডি থিসিসের বিষয় ছিল 'হিউম্যান বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন ইন দ্য হোলি কুরআন'। পুরো একাডেমিক জীবন কেটেছে কুরআন গবেষণায়। আর স্বপ্নগুলোও রাঙিয়েছেন কুরআনের রঙে। একটি আলোকিত সমাজ উপহার দেবার স্বপ্নে ছুটে চলছেন জনপদ থেকে জনপদ। প্রান্তর থেকে প্রান্তর।